মীর মশাররফ হোসেন

বিষাদ সিন্ধু

মীর মশাররফ হোসেন

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম ❑ ঢাকা

বিষাদ সিন্ধু

মীর মশাররফ হোসেন

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

পল্টন টাওয়ার

৮৭ পুরানা পল্টন লীন (৮ম তলা) ঢাকা

ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ২২৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

BISAD SHINDU: **Writen by Mirmosarrof Hossain,** Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 225.00 U$: 5/-

ISBN 984-70241-0024-5

প্রকাশকের কথা
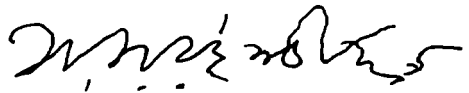
বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন লেখক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মশাররফ এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন সব্যসাচী লেখক। বিষয় বৈচিত্র্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবীয় অভিব্যক্তি ও স্পষ্টবাদী মনোবৃত্তির জন্য মীর মশাররফ এক অনন্য স্থান দখল করে আছে।

বিষাদসিন্ধু মীর মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষাদসিন্ধু মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন। কারবালার সেই মর্মান্তিক ও বিষাদময় কাহিনীই এই বইয়ের বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থে মানুষের নিয়তি লাঞ্ছিত মানবভাগ্যের বেদনাসহ পরিণতিই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে হোসেনের জীবনবিশ্বাস, আত্মমর্যাবোধ ও ন্যায়-মনোবৃত্তি এবং এজিদের ক্ষমতালিপ্সা, দাম্ভিকতা ও চরিত্রহীনতা যথার্থরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এজিদ ছিলো নিষ্ঠুর স্বভাবের অধিকারী এবং প্রতিহিংসাপরায়ন। সেকারণে তিনি ন্যায়, সত্য এবং সুন্দরকে নষ্ট করে অসত্য ও অন্যায়ের পূজারী হয়ে ওঠেছিলেন। একারণে সত্য পথের পথিকদের নিকট তিনি সমাদৃত হতে পারেননি।

কারবালা প্রান্তরের বিয়োগান্তক ঘটনা পরবর্তী সময়ে অসংখ্য কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে নানা দেশে। মীর মশাররফ হোসেন এই কিংবদন্তি থেকে যে সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে বিষাদসিন্ধু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। যুগে যুগে পাঠক কর্তৃক এই গ্রন্থটি যে পঠিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে বিষাদসিন্ধু অনেক প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে। তবুও বিষাদ সিন্ধু বেশী করে পাঠক সমাদৃত হবার কারণেই বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বিষাদসিন্ধু প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দ বোধ করছে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক ইনচার্জ ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর যে কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুসলমান সাহিত্য-সাধক মীর মশাররফ হোসেন। তিনি নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরবর্তী লাহিনী পাড়া গ্রামে ১৮৪৭ সালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন। গৃহে মুন্সির কাছে আরবি-ফারসি শিক্ষার পর পাঠশালায় পন্ডিতের কাছে বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় অধ্যয়নের পর তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে যথাক্রমে কুমার খালির ইংরেজি বিদ্যালয়, পদমদী নবাব স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বাইরে বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত 'কাদম্বরী' গ্রন্থের মাধ্যমে। ইতঃমধ্যে বাল্যকালেই তিনি বাংলা হেঁয়ালী ও 'বয়েত বাহাস' রচনা করেন। 'কাদম্বরী' গ্রন্থের বাইরে তিনি 'জৈগুনের পুঁথি', 'সোনাভান', 'সামর্থভান', 'আমির হামজা' প্রভৃতি পুঁথি পাঠ করেন। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সুর করে পুঁথি পাঠ করে শোনাতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি স্বীকার করেন, পুঁথির কথার অর্থ বুঝাতেন না, বুঝাতে চেষ্টাও করতেন না-অনর্গল পড়ে যেতেন শুধু।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে মশাররফ হোসেন কলকাতার কালিঘাট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি লাহিনীপাড়ায় এসে পিতৃসম্পত্তি দেখা-শুনা করতে থাকেন। এসময় তিনি পিতার বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত চিঠিপত্রের মুসাবিদা লিখতেন।
আলীপুর আদালতের আমীন নাদির হোসেনের গৃহে মশাররফ হোসেন কিছুকাল অবস্থান করেন। এসময়ে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরের' তদানীন্তন সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। উক্ত পত্রিকায় সংবাদ প্রেরণে ভুবনচন্দ্র তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। 'কুষ্টিয়ার সংবাদ-দাতা' নামে তিনি সংবাদ প্রেরণ করতে থাকেন।

১৮৬৫ সালে নাদের হোসেনের ষড়যন্ত্রে তাঁর বুদ্ধিহীনা অযোগ্য কন্যার সঙ্গে মশাররফ হোসেনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে মশাররফ হোসেন সুখী হতে পারেন নি। পরে তিনি বিবি কুলসুমকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

এসময়ে মশাররফ হোসেন সাহিত্যিক সমাজ সেবী ও বাউল-শিরোমনি হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। কুমারখালি গ্রাম থেকে হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় মশাররফ

হোসেন নিয়মিত লিখতেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিনাথ মজুমদার সে সময়ে মশাররফ হোসেনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিভার পরিচয় পান এবং পত্রযোগে তাঁকে উৎসাহিত করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় প্রেরিত সংবাদাদি ঘটনার নিছক বর্ণনামাত্র হলেও এরি মধ্যে মশাররফ হোসেনের সমকালীন ঘটনা ও জীবনকে দেখার পর্যবেক্ষণ শক্তি সজাগ হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে তাই আমরা তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বাল্য ও কৈশোরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র পাই।

কর্মজীবনে মশাররফ হোসেন প্রথমে ফরিদপুর নবাব এস্টেটে এবং পরে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার পদে চাকরি করেন। এসময় তিনি সাহিত্য চর্চায় অভিনিবেশ করেন এবং ১৮৬৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থরচনায় এটি তাঁর প্রথম উদ্যম হলেও তিনি ভাষাসঙ্গতি ও গল্পের বন্ধনে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেছেন।

মীর মশাররফ হোসেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর লেখনী প্রসারিত ছিল।

মীর মশাররফ হোসেন প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সমালোচকদের দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত হয়। প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) প্রশংসা লাভ করে প্রধানত ভাষার জন্য। গোরাই ব্রিজ বা গৌরীসেতুর সমালোচনা প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৭৩)। উক্ত পত্রিকায় সম্পাদক স্বয়ং মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' গ্রন্থটির (১৮৭৩) সমালোচনা লেখেন। মশাররফ হোসেন প্রণীত প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় সমালোচনায় মুসলমান লিখিত নাটকে অন্য সমাজের ভাষা ও আচারাদি ব্যবহারের প্রশংসা করা হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর সালতামামি রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই নাটককে Well written বলেছেন, মশাররফ হোসেনের কাব্যচর্চার সূত্রপাত 'গৌরী সেতু' গ্রন্থে হলেও 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭) গ্রন্থেই কবির কবিতা ও গান রচনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়।

পরবর্তী গ্রন্থ 'গো জীবন' (১৮৮৯) বহুল আলোচিত হলেও বিতর্কিত। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেন- "এটি ঠিক উপন্যাস নয়- উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ।" 'দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের পরে নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে লেখক এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় 'গাজী মিয়ার বস্তানী'।

এটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ হলেও রম্যরচনামূলক। সমকালীন 'প্রদীপ' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ সমালোচনায় গ্রন্থের দোষ-গুণ দুই-ই বলা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মশাররফ হোসেন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। যথা- 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৪), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হজরত বেলালের জীবন' (১৯০৫) হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫) প্রভৃতি। এগুলি ক্ষুদ্র ও অপাংক্তেয় বিধায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি।

মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার জীবনী' ও 'কুলসুমের জীবনী গ্রন্থ দুটির কোনো সমালোচনা আমাদের নজরে পড়েনি।

এবার বিষাদসিন্ধু প্রসঙ্গে

'বিষাদসিন্ধু' তিনটি খন্ড বা পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি যথাক্রমে 'মহরম পর্ব' (১৮৮৫), উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭) এবং 'এজিদ বধ পর্ব ' (১৮৯১)।
'বিষাদসিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের একটি বহুল সমাদৃত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। কারবালার বেদনাবহ কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে এটি মুসলিম সমাজে আপামর জনসাধারণকে যুগে যুগে পরিতৃপ্ত করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যের মর্সিয়া-গীতি বা জঙ্গনামার সঙ্গে এ গ্রন্থের বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও বিষাদসিন্ধু আধুনিক সাহিত্যের নতুন সৃষ্টি। সমালোচকগণ বলে থাকেন-

> "বিষাদসিন্ধু খাঁটি ঐতিহাসিক নয়, জীবনচরিতও নয়, তেমনি আটঘাট-বাঁধা বিধিবদ্ধ Organic Hot- এর উপন্যাস নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগমাখানো। এক সংকর সৃষ্টি। এতে উপন্যাসের লক্ষ্ম আছে প্রচুর, একটা মূল আবেগও আছে, শিথিল বিন্যস্ত প্লটকে একীকরণের চেষ্টা আছে, সংলাপ আছে এবং সমগ্র আখ্যানকে একটা পরিণতি দেবার সজ্ঞান প্রচেষ্টাও আছে (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান)'

মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে ইতিহাস রচনা করতে চাননি। তিনি উপন্যাসের ন্যায় সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। এ গ্রন্থে ইমাম হোসেনের তুলনায় এজিদ চরিত্র অধিকতর প্রাণবন্ত। জয়নাবের রূপবহ্নিতে দগ্ধ হয়ে এজিদ অর্ন্তদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে। অন্যদিকে জায়দা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে জয়নাবের উপর প্রতিশোধ স্পৃহায় হাসানকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করে। ডক্টর আনিসুজ্জামান যথার্থই বলেছেন- 'বিষাদ সিন্ধুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের এই

অদৃষ্টলাঞ্ছিত মূর্তির আলেখ্য পুরষ্কারের এই শোচনীয় পরিণামের কাহিনী ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মীর মশাররফ হোসেনের বিভিন্ন গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিষাদসিন্ধুর সমালোচনায় কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আমরা কয়েকটি সমালোচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

১। 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের ভাষা ও রচনাশৈলী বিষয়ে 'চারুবার্তায় বলা হয়, " ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, মধুর ও লালিত্যপূর্ণ"। ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করে-"গ্রন্থখানি যদিও একজন মুসলমানের লিখিত, কিন্তু ইহার ভাষা দেখিয়া কিছুতেই মুসলমানের বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

২। "বিষাদসিন্ধু" গ্রন্থে উপন্যাস ও ইতিহাসের মিশ্রণ ঘটেছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'ভারতী' পত্রিকার সমালোচনায়-"ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস-ইতিহাস" (ফাল্গুন ১২৯৩)।

৩। কাহিনী -বিন্যাসের প্রশংসা করতে গিয়ে 'চারুবার্তা' পত্রিকায় লেখা হয়- "একদিকে হাসান হোসাইনের অসাধারণ ধর্মবিশ্বাস, মহত্ব ও উদারতা অন্যদিকে এজিদের ক্রুর প্রকৃতি, নিষ্ঠুরতা, মজ্জাগত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা এমন অপূর্ব কৌশলে চিত্রিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আলোড়িত, হৃদয় বিক্ষুব্ধ ও মন হর্ষ বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়ে" (চারুবার্তা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)। 'বিষাদসিন্ধু' বহুকাল ধরে যে পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে তার মূল সত্যটি 'চারুবার্তা'র সমালোচনায় নিহিত রয়েছে।

৪। 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে চরিত্র সৃষ্টির কুশলতা প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়- 'কবি যে চরিত্র গড়েন, তাহাতে কল্পনা থাকে। সুতরাং তাহা পাঠে লোকের মনে বিস্ময় ভাবাদি সহজে উদয় হইতে পারে; কিন্তু মায়মুনা-রূপ রাক্ষসী, জায়েদা-রূপ ঈর্ষান্বিতা ও বিশ্বাসঘাতিনী, এজিদের ন্যায় স্বার্থপর, আত্মাভিমানী ও ধার্মিক-বিদ্বেষী লোক সকল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আছে ইহা কি বিস্ময়কর। ইমাম হাসান হোসাইনের প্রতি ইহাদের ব্যবহার বাস্তবিক বিষাদসিন্ধু উথলিত করে। যে হাসান বৃদ্ধের হস্ত হইতে বর্শাঘাত পাইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, জায়েদা বিষ খাওয়াইয়াছেন জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং সে কথা সম্পূর্ণ গোপনে রাখিলেন- তাঁহারও এজগতে ভয়ানক শত্রু হয়। (১৯ বৈশাখ ১২৯৩)।

'চারুবার্তা' পত্রিকা এই সমালোচনার উপসংহারে মন্তব্য করে- "যাহারা পবিত্র সত্য উপন্যাস পাঠ করিতে চাহেন -তাঁহারাও ইহা পাঠ করুন।"

বিষাদসিন্ধু'র একটি সমালোচনায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর সালতামামি রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি অতিসংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে বিবৃত করেন- The earnestness and pathos of the work, its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high level and mark a distinct departure both in manner, from the current examples of imagenative writing in Bengali.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বিষাদসিন্ধুকে' বাংলা ভাষায় রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা রূপে চিহ্নিত করে যথার্থই বলেছেন- "এ গ্রন্থের 'অন্তর্নিহিত আন্তরিকতা ও বেদনা' 'সমুন্নত নীতিবোধ' এবং 'মার্জিত রচনাশৈলী' এ গ্রন্থকে অনন্য সৃষ্টির গৌরব এনে দিয়েছে।"

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম
অধ্যাপক (সাবেক)
বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

উপক্রমণিকা

একদা প্রভু মোহাম্মদ প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময় স্বর্গীয় প্রধান দূত "জিব্রাইল" আসিয়া তাঁহার নিকট পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল। প্রভু মোহাম্মদ ক্ষণকাল ম্লানমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্তই ভয়াকুল হইলেন। কি কারণে প্রভু এরূপ চিন্তিত হইলেন, কেহই কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সবিষাদ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পবিত্র বদনের মলিনভাব দেখিয়া সকলের নেত্রই বাষ্প-সলিলে পরিপ্লুত হইল। কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা হঠাৎ এরূপ দুঃখিত ও বিষাদিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

শিষ্যগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অগোচর কি আছে? ঘনাগমে কিংবা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠাৎ মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে? আমরা আপনার চির আজ্ঞাবহ। অকস্মাৎ প্রভুর পবিত্র মুখের মলিন ভাব দেখিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যতক্ষণ আপনার সহাস্য আস্যের ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ ততই আমাদের দুঃখবেগ পরিবর্ধিত হইবে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, সামান্য বাতাঘাতে পর্বত কম্পিত হয় নাই। সামান্য বায়ু-প্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভু! অনুকম্পা প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।"

প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে। হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নিধন করিবে।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ নির্বাক হইলেন। কাহারও মুখে একটিও কথা সরিল না। কণ্ঠ-রসনা ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,– "প্রভুর অবিদিত কিছুই নাই। কাহার সন্তানের দ্বারা এরূপ সাংঘাতিক কার্য সংঘটিত হইবে, শুনিতে পাইলে তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারি। যদি তাহা ব্যক্ত না করেন, তবে আমরা অদ্যই বিষপান করিয়া আত্মবিসর্জন করিব। যদি তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া নারকী হইতে হয়, তবে সকলেই অদ্য হইতে আপন আপন পত্নীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে আর স্ত্রী-মুখ দেখিব না, স্ত্রীলোকের নামও করিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "ভাইসকল! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারও সাধ্য নাই; তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। তাঁহার

আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তবে তোমরা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা স্মরণ করিয়া কেন দুঃখিত থাকিবে? নিরপরাধিনী সহধর্মিণীগণের প্রতি শাস্ত্রের বহির্ভূত কার্য করিয়া অবলাগণের মনে কেন ব্যথা দিবে? তাহাও ত মহাপাপ। তোমাদের কাহারও মনে দুঃখ হইবে বলিয়াই আমি তাহার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। নিতান্ত পক্ষেই যদি শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ কর, --"তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র জগতে এজিদ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া প্রাণবধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তথাচ সেই অসীম জগন্নিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনই হইবে না। সেই অব্যক্ত সুকৌশল সম্পন্ন অদ্বিতীয় প্রভু-আদেশ কখনই ব্যর্থ হইবে না।"

মাবিয়া ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন থাকিতে বিবাহের নামও করিব না; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "প্রিয় মাবিয়া! ঈশ্বরের কার্য, তোমার মত ঈশ্বরভক্ত লোকের এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তাঁহার মহিমার পার নাই, ক্ষমতার সীমা নেই, কৌশলেরও অন্ত নাই।" এই সকল কথার পর সকলেই আপন আপন বাটিতে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ" লইয়াছেন; সেই কুলুখ এমন অসাধারণ বিষসংযুক্ত ছিল যে, তিনি বিষের যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধব সকলের কর্ণেই মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ গেল, অনেকরূপ চিকিৎসা হইল; ক্রমশঃ বৃদ্ধি ব্যতিত কিছুতেই যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। মাবিয়ার জীবনের আশায় সকলেই নিরাশ হইল। ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয় প্রভু মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইলে তিনি মহাব্যস্তে মাবিয়ার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া বিষসংযুক্ত স্থানে ফুৎকার প্রদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময় স্বর্গীয় দূত আসিয়া বলিলেন, "হে মোহাম্মদ! কি করিতেছ? সাবধান! ঈশ্বরের নাম করিয়া মন্ত্র-পূত করিও না। এ সকলই ঈশ্বরের লীলা। তোমার মন্ত্রে মাবিয়া কখনই আরোগ্য লাভ করিবে না। সাবধান! ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রীসহবাস। স্ত্রীসহবাস মাত্রেই মাবিয়া বিষম বিষযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। উহা ব্যতীত এ বিষনিবারণের ঔষধ জগতে আর নাই।" এই কথা বলিয়া স্বর্গীয় দূত অন্তর্দ্ধান হইলেন।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এ রোগের ঔষধ নাই। ইহজগতে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই। একমাত্র উপায় স্ত্রী সহবাস। যদি মাবিয়া স্ত্রীসহবাস করিতে সম্মত হন, তবেই প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

মাবিয়া স্ত্রী সহবাসে অসম্মত হইলেন। আত্মহত্যা মহাপাপ প্রভু কর্তৃক এই উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে, অশীতি বর্ষীয়া কোন বৃদ্ধা স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিবেন। কার্যেও তাহাই ঘটিল। বিষম রোগ হইতে মাবিয়া মুক্ত হইলেন। জীবন রক্ষা হইল।

অসীম করুণাময় পরমেশ্বরের কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া উঠা মানব-প্রকৃতির সাধ্য নহে। অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মাবিয়া পূর্ব হইতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্র হয়, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু পুত্রের সুকোমল বদনমন্ডলের প্রতিভা এক বার নয়নগোচর করিবামাত্রই বৈরীভাব অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। হৃদয়ে সুমধুর বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিল। তখন পুত্রের প্রাণ হরণ করিবেন কি, নিজেই পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপন প্রাণ হইতেও তিনি এজিদকে অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিদারুণ হৃদয়-বিদারক বাক্য মনে করিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইতেন। কিছু দিন পরে মাবিয়া দামেস্ক নগরে স্থায়ীরূপে বাস করিবার বাসনা প্রভু মোহাম্মদ ও মাননীয় আলীর নিকটে প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আরও বলিলেন, "এজিদের কথা আমি ভুলি নাই। হাসান-হোসেনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষেই আমি মদিনা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

মাননীয় আলী সরলহৃদয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাবিয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া নিজ অধিকৃত দামেস্ক নগর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, 'মাবিয়া! দামেস্ক কেন, এই জগৎ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।"

মাবিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অল্প দিবস মধ্যে তিনি সপরিবারে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া দামেস্ক নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজাপালন ও ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভু মোহাম্মদ হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বেলা ৭ম ঘটিকার সময় পবিত্র ভূমি মদিনায় পবিত্র দেহ রাখিয়া স্বর্গবাসী হইলেন। প্রভুর দেহত্যাগের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা (প্রভূ-কন্যা, হাসান-হোসেনের জননী, মহাবীর আলীর সহধর্মিণী) হিজরী ১১ সনে পুত্র ও স্বামী রাখিয়া জান্নাত-বাসিনী" হইলেন। মহাবীর হযরত আলী হিজরী ৪০ সনের রমজান মাসের চতুর্থ দিবস রবিবারে দেহত্যাগ করেন। তৎপরেই মহামান্য ইমাম হাসান মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দামেস্ক নগরে এজিদ বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে পরবর্ণিত ঘটনা আরম্ভ হইল।

প্রথম প্রবাহ
মহরম পর্ব

"তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এই অতুল বিভব, সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সকলই তোমার। দামেস্ক-রাজমুকুট অচিরে তোমারই শিরে শোভা পাইবে। তুমি এই রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার অধীশ্বর হইয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং জাতীয় ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সর্বত্র পূজিত এবং সকলের আদৃত হইবে। বলতো তোমার কিসের অভাব? কি মনস্তাপ? আমি তো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি সর্বদাই মলিনভাবে বিষাদিতচিত্তে বিকৃতমনার ন্যায় অযথা চিন্তায় অযথা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছে। সময়ে সময়ে যেন একেবারে বিষাদ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া জগতের সমুদয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবিনাশে প্রস্তুত হইতেছ; ইহারই বা কারণ কি? আমি পিতা, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিও না। মনের কথা অকপটে প্রকাশ কর। যদি অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধনভাণ্ডার কাহার জন্য? যদি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, আমি এই মুহূর্তেই তোমাকে মহামূল্য রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া রাজমুকুট তোমার শিরে অর্পণ করিতেছি, এখনই তোমাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইতেছি। আমি স্বচক্ষে তোমাকে রাজকার্যে নিয়োজিত দেখিয়া নশ্বর বিশ্বসংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাহা অপেক্ষা ঐহিকের সুখ আর কি আছে? তুমি আমার একমাত্র পুত্ররত্ন। অধিক আর কি বলিব-তুমি আমার অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের পুত্তলী, মস্তকের অমূল্য মণি, হৃদয়ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, জীবনের জীবনীশক্তি– আশাতরু অসময়ে মুঞ্জরিত, আশা-মুকুল অসময়ে মুকুলিত, আশা-কুসুম অসময়ে প্রস্ফুটিত। বাছা, সদাসর্বদা তোমার মলিন মুখ ও বিমর্ষভাব দেখিয়া আমি একেবারে হতাশ হইতেছি, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মনের কথা অকপটে আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি পিতা হইয়া মনের বেদনায় আজ তোমার হস্তধারণ করিয়া বলি, – সকল কথা মন খুলিয়া আমার নিকট কি জন্য প্রকাশ না কর?" মাবিয়া নির্জ্জনে নির্ব্বেদসহকারে এজিদকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এজিদ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিতে অগ্রসর হইয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠরোধ হইয়া জিহ্বায় জড়তা আসিল। মায়ার আসক্তির এমন শক্তি যে, পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া অবসর প্রাপ্ত হইয়াও মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াও মুক্তহৃদয়ে প্রকৃত মনের কথা পিতাকে বুঝাইতে পারিলেন না। যদিও বহুকষ্টে "জয়" শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু সে শব্দ মাবিয়ার কর্ণগোচর হইল না। কথা যেন নয়নজলেই ভাসিয়া গেল, "জয়" শব্দটি কেবল জলমাত্রেই সার হইল। গণ্ডস্থল হইতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিষাদ-বারিতে সিক্ত হইতে লাগিল। সেই বিষাদবারি-প্রবাহ দর্শন করিয়া অনুতাপী মাবিয়া আরও অধিকতর দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। জলে অগ্নি নির্বাণ হয়; কিন্তু প্রেমাগ্নি অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রথমে নয়ন দু'টির আশ্রয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে। পরিণামে জলে পরিণত হইয়া স্রোত বহিতে থাকে। সে জলে হয় তো বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে,

কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ জ্বলিয়া উঠে। এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত ও রাজমুকুটের প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষী নহেন। তিনি যে রত্নের প্রয়াসী, তিনি যে মহামূল্যধনের প্রত্যাশী, তাহা তাঁহার পিতার মনের অগোচর, বুদ্ধিরও অগোচর। পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া মাবিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে অশ্রুসম্বরণে অক্ষম হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, 'এজিদ'। তোমার মনের কথা মন খুলিয়া আমার নিকট ব্যক্ত কর। অর্থে হউক বা সামর্থ্যে হউক, বুদ্ধি-কৌশলে হউক, যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার মনের আশা আমি পূর্ণ করিবই করিব। তুমি আমার রত্নের রত্ন, অদ্বিতীয় স্নেহাধার। তুমি পাগলের ন্যায় হতবুদ্ধি, অবিবেকের ন্যায় সংসারবর্জ্জিত হইয়া পিতা-মাতাকে অসীম দুঃখসাগরে ভাসাইবে, বনে বনে, পর্বতে পর্বতে, বেড়াইয়া বেড়াইয়া অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে হয় তো কোন দিন আত্মঘাতী হইয়া এই কিশোর বয়সে মৃত্তিকাশায়ী হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণ নিতান্তই আকুল হইতেছে; কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। জীবন যেন দেহ ছাড়িয়া যাই যাই করিতেছে, প্রাণ-পাখী যেন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ি উড়ি করিতেছে। বল দেখি বৎস! কোন চক্ষে মাবিয়া তোমার প্রাণে মাবিয়া প্রাণশূন্য দেহ দেখিবে? বল দেখি বৎস! কোন তোমার মৃতদেহ শেষ বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে?"

এজিদ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পিতা"! আমার দুঃখ অনন্ত, এই দুঃখের সীমা নাই, উপশমের উপায় নাই। আমি নিরুপায় হইয়াই জগতের আশা হইতে একেবারে বহু দূরে দাঁড়াইয়া আছি। আমার বিষয়বিভব, ধনজন, ক্ষমতা সমস্তই অতুল, তাহা আমি জানি। আমি অবোধ নই; কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনীয় মূর্তির সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই। পিতাঃ! সে বেদনার প্রতীকারের প্রতীকার নাই! যদি থাকিত, তবে বলিতাম। আর বলিতে পারি না। এত দিন অতি গোপনে মনে মনে রাখিয়াছিলাম, আজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া মনের কথা যত দূর সাধ্য বলিলাম। আর বলিবার সাধ্য নাই। হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন, এজিদ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশ নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোন নির্জ্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে। আর অধিক বলিতে পারিতেছি না, ক্ষমা করিবেন।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধা মহিষী এক গাছি সুবর্ণ যষ্টি আশ্রয়ে ঐ নির্জ্জন গৃহমধ্যে আসিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এজিদ শশব্যস্তে উঠিয়া জননীর পদচুম্বন করিয়া পিতার পদধুলি গ্রহণান্তর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দামেস্কাধিপতি মহিষীর অভ্যর্থনা করিয়া অতি যত্নে মসনদের পার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহর্ষি! তোমার কথাক্রমে আজ বহু যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না; মনের কথা কিছুতেই ভাঙ্গিল না। পরিশেষে আপনিও কাঁদিল, আমাকেও কাঁদাইল। সে রাজ্যধনের ভিখারী নহে, বিনশ্বর ঐশ্বর্যের ভিখারী নহে; কেবল এইমাত্র বলিল যে, আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আর শেষে যাহা বলিল, তাহা মুখে আনা যায় না; বোধ হইতেছে যেন কোন মায়াবিনী মোহিনীর মোহনীয় রূপে বিমুগ্ধ হইয়া মোহময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজমহিষী অতি কষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি অনেক সন্ধানে জানিয়াছি, আর এজিদও আমার নিকটে আভাসে বলিয়াছে, – আব্দুল জব্বারকে বোধ হয় জানেন।"
মাবিয়া কহিলেন, "তাহাকে তো অনেক দিন হইতেই জানি।"
"সেই আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম জয়নাব।"
"হাঁ হাঁ, ঠিক হইয়াছে! আমার সঙ্গে কথা কহিবার সময় 'জয়' পর্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারে নাই।" একটু অগ্রসর হইয়া মাবিয়া আবার কহিলেন, "হ্যাঁ, সেই জয়নাব কি?"
"আমার মাথা আর মুণ্ড! সেই জয়নাবকে দেখিয়াই তো এজিদ পাগল হইয়াছে। আমার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,- মা, যদি আমি জয়নাবকে না পাই, তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না, নিশ্চয় জানাজা (মৃত শরীরের সদগতির উপাসনা) ক্ষেত্রে কাফনবস্ত্রের তাবুতাসনে ধরাশায়ী দেখিবেন।" এই পর্যন্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহিষী পুনর্বার কহিলেন, "আমার এজিদ যদি না বাঁচিল, তবে আর এই জীবনে ও বৃথা ধনে ফল কি?"
যেন একটু সরোষে মাবিয়া কহিলেন, "মহির্ষি! তুমি আমাকে কি করিতে বল?"
"আমি কি করিতে বলিব? যাহাতে এজিদের প্রাণরক্ষা হয়, তাহারই উপায় করুন। আপনি বর্তমান থাকিতে আমার সাধ্যই বা কি– কথাই বা কি?"
মাবিয়া রোষভরে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, বৃদ্ধা মহিষী হস্ত ধরিবামাত্র অমনি বসিয়া পড়িলেন। বলিতে লাগিলেন, "পাপী আর নারকীয়রা এ কার্যে যোগ দিবে। আমি ওকথা আর শুনিতে চাই না। তুমি আর ওকথা বলিয়া আমার কর্ণকে কলুষিত করিও না। আপনার জিহ্বাকেও পাপ কথায় অপবিত্র করিও না। ভাবিয়া দেখ দেখি, ধর্ম পুস্তকের উপদেশ কি? পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে যে একবার দৃষ্টি করিবে, কোন প্রকার, কুভাবের কথা মনোমধ্যে যে একবার উদিত করিবে, তাহারও প্রধান নরক 'জাহান্নামে' বাস হইবে। আর ইহকালের বিচার তো দেখিতে পাইতেছ। লৌহদণ্ড দ্বারা শত আঘাতে পরস্ত্রীহারীর অস্থি চূর্ন, চর্ম ক্ষয় করিয়া জীবনান্ত করে। ইহা কি একবারও এজিদের মনে হয় না? প্রজার ধন, প্রাণ, মান, জাতি এ সমুদয়ের রক্ষাকর্তা রাজা। রাজার কর্তব্য কর্মই তাহা। এই কর্তব্য অবহেলা করিলে রাজাকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হয়, পরিণামে নরকের তেজোময় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসাৎ হইতে হয়। তাহাতেও নিস্তার নাই। সেই ভস্ম হইতে পুনরায় শরীর গঠিত হইয়া পুনরায় শাস্তিভোগ করিতে হয়। এমন গুরুপাপের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, শুনিতেও পাপ আছে। এজিদ আত্মবিনাশ করিতে চায়, করুক, তাহাতে দুঃখিত নহি! এমন শত এজিদ- শত কেন, সহস্র এজিদ এই কারণে প্রাণত্যাগ করিলেও মাবিয়ার চক্ষে এক বিন্দু জল পড়া দূরে থাকুক, বরং সসন্তোষ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। একটি পাপী জগৎ হইতে বহিস্কৃত হইল বলিয়া ঈশ্বরের সমীপে এই মাবিয়া সেই জগৎপিতার নামে সহস্র সহস্র সাধুবাদ সমর্পণ করিবে। পুত্রের উপরোধে, কি তাহার প্রাণরক্ষার কারণে ঈশ্বরের বাক্য-লংঘন করিয়া মাবিয়া কি মহাপাপী হইবে? তুমি কি তাহা মনে কর মহির্ষি? আমার প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না মাবিয়া জগতে থাকিতে তাহা ঘটিবে না– কখনই না?"

বৃদ্ধা মহিষী একটু অগ্রসর হইয়া মহারাজের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন মহারাজ! এজিদ যে ফাঁদে পড়িয়াছে, সে ফাঁদে জগতের অনেক ভাল লোক বাঁধা পড়িয়াছেন। শত শত মুনি ঋষি, ঈশ্বরভক্ত কত শত মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ এই ফাঁদে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আসক্তি, প্রেম ও ভালবাসার কথা ধর্মপুস্তকেও রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, মানুষের মনেই ভালবাসার জন্ম; ইহা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না, দেখাদেখিও কেহ শিক্ষা করে না, ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। বাদশাহ নামদার! ইহাতে নূতন কিছুই নাই। আপনি যদি মনোযোগ দিয়া শুনেন, তবে আমি এই প্রণয় প্রসঙ্গ অনেক শুনাইতে পারি, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেও পারি। জগতে শত শত ভালবাসার জন্ম হইয়াছে, অনেকেই ভালবাসিয়াছে, তাহাদের কীর্তিকলাপ আজ পর্যন্ত-কেন, জগৎ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত মানবহৃদয়ে মনোভাবে অঙ্কিত থাকিবে। বলিবেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা চাই। ভালবাসারূপ সমুদ্র যখন হৃদয়াকাশে মানসচন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন আর পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। পিতা, মাতা, সংসার-ধর্ম, এমন কি ঈশ্বরকেও মনে থাকে কিনা সন্দেহ। ইহাতে এজিদের দোষ কি, বলুন দেখি? এই নৈসর্গিক কার্য নিবারণ করিতে এজিদের কি ক্ষমতা আছে? না আমার ক্ষমতা আছে? না আপনারই ক্ষমতা আছে? যাহাই বলুন মহারাজ! ভালবাসার ক্ষমতা অসীম।"

মাবিয়া বলিলেন "আমি কি ভালবাসার দোষ দিতেছি? ভালবাসা তো ভাল কথা। মানব-শরীর ধারন করিয়া যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে কি মানুষ? প্রেমশূন্য হৃদয় কি হৃদয়? এজিদের ভালবাসারও তো সেরূপ ভালবাসা নয়। তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই।" মহিষী কহিলেন "আমি বুঝিয়াছি, আপনিই বুঝিতে পারেন না। দেখুন মহারাজ! আমার এই অবস্থাতেই ঈশ্বর সদয় হইয়া পুত্র দিয়াছেন। এই জগতে সংসারী মাত্রেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। বিষয়বিভব, ধন-সম্পত্তি অনেকেরই আছে; কিন্তু উপযুক্ত পুত্ররত্ন কাহার ভাগ্যে কটি ফলে, দেখুন দেখি? পুত্র কামনায় লোকে কি না করে? ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক লোকের অনুগ্রহের প্রত্যাশা, যথাসাধ্য দীনদুঃখীর ভরণপোষণের সাহায্য প্রভৃতি যত প্রকার সৎকার্যে মনে আনন্দ জন্মে, সন্তান কামনায় লোকে তাহা সকলই করিয়া থাকে। আপনি ঈশ্বরের নিকট কামনা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন নাই; আমিও পুত্রলাভের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শোণিত-বিন্দু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি নাই? দয়াময় ভগবানের প্রসাদ, অযাচিত এবং বিনাযত্নে আমরা উভয়ে এই পুত্ররত্ন লাভ় করিয়াছি। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ করিতে হয়। যে এজিদের মুখ এক মুহূর্ত না দেখিলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হন, যে এজিদকে সর্বদাই নিকটে রাখিয়াও আপনার দেখিবার সাধ মিটে না, – আমি তো সকল জানি; কোন সময়ে এই এজিদকে প্রাণে মারিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা, পারিলেন কৈ? ঐ মুখ দেখিয়াই তো হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়াছিল। অস্ত্রাঘাতে পুত্রের প্রাণবধ সঙ্কল্প সাধন করিবেন দূরে থাকুক, ক্রোড়ে লইয়া শত শতবার মুখচুম্বন করিয়াও মনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই।"

মাবিয়া বলিলেন, "আমাকে তুমি কি করিতে বল?"

মহিষী বলিলেন, "আর কি করিতে বলিব। যাহাতে ধর্ম রক্ষা পায়, লোকের নিকটেও নিন্দনীয় না হইতে হয়, অথচ এজিদের প্রাণ রক্ষা পায়, এমন কোন উপায় অবলম্বন করাই উচিত।"

"উচিত বটে, কিন্তু উপায় আসিতেছে না। মূল কথা, যাহাতে ধর্ম রক্ষা পায়, ধর্মোপদেষ্টার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়, অথচ প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়, ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল। লোকনিন্দার ভয় কি? যে মুখে লোকে একবার নিন্দা করে, সে মুখে সুখ্যাতির গুণগান করাইতে কতক্ষণ লাগে?"

মহিষী বলিলেন, "আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, কিছু বলিতেও হইবে না; কিন্তু কোন কার্যে বাধা দিতেও পারিবেন না। মারওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আমি সকল কার্য করিব। যেখানে ধর্মবিরুদ্ধ, ধর্মের অবমাননা কি ধর্মোপদেষ্টার আজ্ঞা লঙ্ঘনের অণুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতে পান, বাধা দিবেন, আমরা ক্ষান্ত হইব।"

মহারাজ মহাসন্তোষে মহিষীর হস্তচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তাহা যদি পার, তবে ইহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কি আছে? এজিদের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। যদি সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য উদ্ধার করিতে পার, তবেই সর্বপ্রকারের মঙ্গল; এজিদও প্রাণে বাঁচে, আমিও নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর-উপাসনা করিতে পারি।"

শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা মহিষী অনুকূলভাবে বিজ্ঞাপনসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তখন তাঁহার মনের যে কি কথা, রসনা তাহা প্রকাশ করিল না, আকার ইঙ্গিত পতিবাক্যে সায় দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মৌন যেন কথা কহিয়া কহিল, "এই সঙ্কল্প স্থির।"

দ্বিতীয় প্রবাহ

মহারাজের সহিত মহিষীর পরামর্শ হইল। এজিদও কথার সূত্র পাইয়া তাহাতে নানা প্রকার শাখাপ্রশাখা বাহির করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদুল জব্বারের নিকট 'কাসেদ' প্রেরণ করিলেন।

পাঠক "কাসেদ যদিও বার্তাবহ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় ডাকহরকরা কি পত্রবাহক মনে করিবেন না। রাজপত্রবাহক, অথচ সভ্য ও বিচক্ষণ;– মহামতি মুসলমান লেখকগণ ইহাকে কাসেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাসেদের পরিচ্ছদ সভ্যতাবর্জিত নহে। সুধীর, সুগম্ভীর, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, সুশ্রী না হইলে কাসেদপদে কেহ বরিত হইতে পারিত না। তবে দূত ও কাসেদ অতি সামান্য প্রভেদমাত্র, 'কাসেদ' দূতের সমতুল্য মাননীয় নহে। বিশেষ মনোনীত করিয়াই আবদুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরিত হইয়াছিল। আবদুল জব্বার ভদ্রবংশজাত, অবস্থাও মন্দ নহে,– স্বচ্ছন্দে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারিতেন; তজ্জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইত না, কিন্তু তাঁহার ধনলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিসে দশ টাকা উপার্জন করিবেন, কি উপায়ে নিজ অবস্থার উন্নতি করিবেন, কি কৌশলে ঐশ্বর্যশালী হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন, এই চিন্তাই সর্বদা তাহার মনে জাগরূক ছিল। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী জয়নাব, স্বামীর অবস্থাতেই পরিতৃপ্তা ছিলেন, কোন বিষয়েই তাঁহার

উচ্চ আশা ছিল না। যে অবস্থাতেই হউক, সতীত্বধর্ম পালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ধর্মচিন্তাতেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। আবদুল জব্বার সুশ্রী না হইলেও তাঁহার প্রতি তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। স্বামীপদসেবা করাই স্বর্গলাভের সুপ্রশস্ত পথ, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল। লৌকিক সুখে তিনি সুখী হইতে ইচ্ছা করিতেন না, ভালও বাসিতেন না। ভ্রমেও ধর্মপথ হইতে একপদ বিচলিত হইতেন না। আবদুল জব্বার নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সময়ে সময়ে এজিদের ঐশ্বর্য ও এজিদের রূপলাবণ্য ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে সতী-সাধ্বী জয়নাব মনে মনে নিতান্ত ক্ষুন্ন হইতেন। নিতান্ত অসহ্য হইলে বলিতেন, "ঈশ্বর যে অবস্থায় যাহাকে রাখিয়াছেন, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া কায়মনে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তব্য। পরের ধন, পরের রূপ দেখিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। দেখুন, জগতে কত লোকে আপনার অপেক্ষা দুঃখী ও পরপ্রত্যাশী আছে যে, তাহা গণনা করা যায় না। ঈশ্বরের বিবেচনা অসীম। মানুষের সাধ্য কি যে তাঁহার বিচার এবং বিবেচনায় দোষার্পণ করিতে পারে। তবে অজ্ঞ মনুষ্যগণ না বুঝিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্যের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তিনি এমনি মহান, এমনি বিবেচক, যাহার যাহা সম্ভব, যে যাহা রক্ষা করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বঞ্চিত করেন না। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার গুণানুবাদ করাই আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য।:"

স্ত্রীর কথায় আবদুল জব্বার কোন উত্তর করিতেন না, কিন্তু কথাগুলি বড় ভাল বোধ হইত না। তাঁহার মত এই যে, ধনসম্পত্তিশালী না হইলে জগতে সুখী হওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তিনি সর্বদাই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য যখন যাহা সুবিধা মনে করিতেন, তখন তাহাই অবলম্বন করিতেন, নিকটস্থ বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়িগণের নিকট প্রায় সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া অর্থোপার্জনের পথ অনুসন্ধান করিতেন, কেবল আহারের সময় বাড়ি আসিতেন। আহার করিয়া পুনরায় কার্যস্থানে গমন করিতেন। আজ জয়নাব স্বামীর আহারীয় আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র রন্ধনকার্য সমাধা করিলেন এবং স্বামীর সম্মুখে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিয়া স্বহস্তে ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। স্বামী যাহাতে সুখে আহার করিতে পারেন, সে পক্ষে সেই সাধ্বী সতী পরম যত্নবতী। একে উত্তপ্ত প্রদেশ, তাহাতে জ্বলন্ত অনলের উত্তাপ, এই উভয় তাপে জয়নাবের মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ললাটে আর কপোলে ঘর্মধারা ধরিতেছে না। ললাটে ও নাসিকার অগ্রভাগে ক্ষুদ ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় ঘর্মবিন্দু শোভা পাইতেছে। গণ্ডদেশ বহিয়া বুকের বসন পর্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠবসনের তো কথাই নাই, এত ভিজিয়াছে যে, সে সিক্তবাস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশের সুদৃশ্য কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পরিহিত বস্ত্রের স্থান কালির চিহ্ন, হস্তে ও মুখে নানা প্রকার ভস্মের চিহ্ন। এই সকল দেখিয়া আবদুল জব্বার বলিলেন, "তুমি যে বল, ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি কি প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, বল দেখি? আমি যদি ধনবান হইতাম, আমার যদি কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে তোমার এত কষ্ট কখনই হইত না। স্থানবিশেষে, পাত্রবিশেষে ঈশ্বরের বিবেচনা নাই, এইটাই বড় দুঃখের বিষয়। তোমার এ শরীর কি

আগুনের উত্তাপ সহনের যোগ্য? এই শরীরে কি এত পরিশ্রম সহ্য হয়? দেখ দেখি, এই দর্পণখানিতে মুখখানি একবার দেখ দেখি, কিরূপ দেখাইতেছে।"

আবদুল জব্বার এই কথা বলিয়া বাম হস্তে একখানি দর্পণ লইয়া স্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন। জয়নাব তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া দর্পণখানি গ্রহণ পূর্বক উপবেশন স্থানের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। গম্ভীর বদনে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কার্য কি?"

আবদুল জব্বার বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আমার অবস্থা ভাল হইলে অসংখ্য দাসদাসী রাখিয়া দিতাম; তাহারই সকল কার্য করিত। তোমাকে এত পরিশ্রম, এত কষ্ট কখনই সহ্য করিতে হইত না।"

জয়নাব বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন, আমি তাহাতে সুখী হইতাম না। আপনি বোধ হয় স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদের অনেক দাসদাসী আছে, মণিমুক্তার অলঙ্কার আছে, বহুমূল্য বস্ত্রাদি আছে, তাহারাই জগতে সুখী। তাহা মনে করিবেন না; মনের সুখই যথার্থ সুখ।"

আবদুল জব্বার বলিলেন, "ও কোন কথাই নহে। টাকা থাকিলে সুখের অভাব কি? আমি যদি এজিদের ন্যায় ঐশ্বর্যশালী হইতাম, তোমাকে কত সুখে রাখিতাম, তাহা আমি জানি আর আমার মনই জানে। ঈশ্বর টাকা দেন নাই, কি করিব, মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল।"

গম্ভীর বদনে জয়নাব কহিলেন, "ও কথা বলিবেন না। শাহজাদা এজিদের ন্যায় আপনি ক্ষমতাবান বা ধনবান হইলে আমার ন্যায় কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা জন্মিত না। আপনারই নয়ন আমাকে দেখিয়া ঘৃণা করিত। ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র। কাহাকেও তিনি সীমাবিশিষ্ট করিয়া রূপবতী করেন নাই। উচ্চাসনে বসিলে আপনার মন সেইরূপ উচ্চরূপেই মোহিত হইত। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মনের পরীক্ষা হয়?"

"অবস্থার পরিবর্তন হইলেই কি প্রণয়, মায়া, মমতা, ভদ্রতা ও সুহৃদভাবের পরিবর্তন হয়?"

"হীন অবস্থার পরিবর্তনে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন হয়, – কিছু কেন? প্রায়ই পরিবর্তন হইয়া থাকে। চারিদিকে চাহিলেই অনেক দেখিতে পাইবেন। যাহারা ধনপিপাসু, অর্থকেই যাহারা ইহকাল পরকালের সুখসাধন মনে করে, অর্থলোভে অতি জঘন্য কার্য করিতে তাহারা একটুও চিন্তা করে না, অতি আদরের ও যত্নের ভালবাসার জিনিসটিও অর্থলোভে বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না।"

কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া আবদুল জব্বার কহিলেন, "এ কথাটা এক প্রকার আমাতেই বর্তিল! তুমি যাহাই বল, জগতের সমুদয় অর্থ, সমুদয় ঐশ্বর্য একত্র করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেও আমি আমার ভালবাসাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সকলেরই মূল্য আছে, ভালবাসার মূল্য নাই! যখন মূল্য নাই, তখন আর তাহার সঙ্গে অন্য বস্তুর তুলনা কি, কথাই বা কি?"

আবদুল জব্বারের আহার শেষ হইল। রীতিমত হস্তমুখাদি প্রক্ষালয় করিয়া ব্যবসায়ের হিসাবপত্রাদি লইতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। যেখানে যাহা রাখিয়াছেন, একে একে সংগ্রহ করিলেন। ব্যবসায়ের সাহায্যকারী অথচ নিকটস্থ আত্মীয় ওসমানের নাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখনও আসিল না। আজ অনেক অসুবিধা হইবে। আর কতক্ষণ বিলম্ব করিব?" এই কথা বলিয়াই বাড়ি হইতে যাত্রা করিবেন, এমন সময়ে

ওসমান অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "আবদুল জব্বার! দামেস্ক হইতে একজন কাসেদ আসিয়াছে– অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় পরিশ্রান্ত, অতিশয় ক্লান্ত। সেই লোক তোমাকেই অন্বেষণ করে, তোমার বাসস্থানের অনুসন্ধান না পাইয়া অনেক ঘুরিয়াছে। শুনিলাম, তাহার নিকটে দামেস্কাধিপতির আদেশপত্র আছে।"
ওসমানের মুখে এই কথা শুনিয়া আবদুল জব্বার শশব্যস্তে বাড়ির বাহিরে আসিলেন। কাসেদ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া দামেস্কাধিপতির বন্দনার পর অতি বিনীতভাবে আবদুল জব্বারের হস্তে শাহী-নামা প্রদান করিলেন।
আবদুল জব্বার শত শত বার সেই শাহী-নামা চুম্বন ও মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কাসেদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর শাহী-নামা হস্তেই অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ ভক্তিসহকারে শাহী নামাখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে-
"সম্ভ্রান্ত আবদুল জব্বার!
"তোমাকে জানান যাইতেছে যে, দামেস্কাধিপতি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে স্মরণ করিয়াছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রসাদলাভে সৌভাগ্য জ্ঞান কর।

প্রধান উজীর–
মারওয়ান।"

আবদুল জব্বার এতৎপাঠে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া জয়নাবকে কহিলেন, "আমি এখনই দামেস্ক নগরে যাত্রা করিব। আমি এমন কি পূণ্যকার্য করিয়াছি যে, স্বয়ং বাদশাহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ঈশ্বর জানেন, ভবিষ্যতে কি আছে?"
আবদুল জব্বারের এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশীরা সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। আবদুল জব্বারের মহাসৌভাগ্য! সকলেই শাহীনামা মহামান্য মস্তকোপরি রাখিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের গৌরবরক্ষা করিলেন। সকলেই একবাক্যে আবদুল জব্বারের গুণানুবাদ করিয়া কহিলেন-
"আবদুল জব্বারের কপাল ফিরিল।" সমবয়সীরা বলিতে লাগিল, "ভাই, তুমি তো ভাগ্যগুণে বাদশাহের নিকট পরিচিত হইলে, সম্মানের সহিত রাজ-দরবারেও আহূত হইলে, আমাদের কথা মনে রাখিও।"
আবদুল জব্বার ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজধানী গমনে উদ্‌যোগী হইলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ প্রতিবাসীগণের নিকট ও জয়নাবের সমক্ষে বিনম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শাহী দরবারের গমন-উপযোগী যে সকল বসন তাঁহার ছিল, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া বাহন-বাহন-সমভিব্যাহারে দামেস্কনগরাভিমুখী গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবাসীবর্গ সহাস্যবদনে তাঁহার প্রশংসাগান কীর্তন করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের চক্ষু দুইটি বাষ্পসলিলে পরিপূর্ণ হইল। মনের উল্লাসে আবদুল জব্বার তৎকালে এত দূর বিহ্বল হইলেন যে, যাত্রাকালে প্রিয়তমা জয়নাবকে একটিও মনের কথা বলিয়া যাইতে মনে হইল না। সামান্যতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াই ত্বরিত গতিতে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। পদমর্যাদার এমনই কুহক!

তৃতীয় প্রবাহ

এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিতবিন্দুর প্রতি পরমাণু অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে, স্বপ্নে, জয়নাব-লাভের চিন্তা অন্তরে অবিরতভাবে রহিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তার উপরেও আর একটি চিন্তা শুদ্ধ মস্তিস্ক মধ্যে ঘুরিতেছে। এক সময়ে এক মনে দুই প্রকারের চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু মূল কার্যের কৃতকার্যতা লাভের আশায় অন্য একটি চিন্তা বা কল্পনা আশ্রয় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া যায়, এরূপ নহে। প্রথম চিন্তায় কৃতকার্য হইবার আশাতেই বাহ্যিক চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠে। চিন্তার আধার মস্তক, কিন্তু ভালবাসার চিন্তাটুকু মস্তকে উদিত হইয়াই একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থান অধিকার করিয়া বসে। তাহা যখনই মনে উদয় হয়, অন্তরে ব্যথা লাগে, হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে, হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ রাগে বাজিয়া উঠে। এজিদ আপাততঃ বাহ্য চিন্তাতেই মহাব্যস্ত। কারণ এই চিন্ত ার মধ্যে আশা, ভরসা, নিরাশা সকলই রহিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন বোধ হইতেছে। এজিদের নয়নে ললাটে ও মুখশ্রীতে যেন ভিন্নভাব অঙ্কিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন দগ্ধীভূত বিকৃত ধাতুর উপরে কিঞ্চিৎ রজতের পাকা গিল্টী হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে চাকচিক্যবিশিষ্ট রজতপাত্র বলিয়াই ভ্রম জন্মে। কিন্তু মনোনিবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে, সমাবৃত বিকৃত ধাতুর পরমাণু-অংশ নয়নগোচর হইয়া চাকচিক্যবিশিষ্ট উজ্জ্বলভাব যেন বহু দূরে সরিয়া যায়। পুরবাসিগণ এবং অমাত্যগণ সকলেই রাজপুত্রের তাদৃশ বাহ্যিক প্রসন্নভাব দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

মারওয়ান যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু এজিদের বুদ্ধি, বল, সহায়, সাহস যত কিছু কার্য, সকলই মারওয়ান। প্রধানমন্ত্রী হামান কেবল রাজকার্য ব্যতীত সাংসারিক অন্য কোন কার্য্যে মারওয়ানের মতে বাধা দিতে পারিতেন না, কারণ তিনি এজিদের প্রিয়পাত্র। সকল সময়েই সকল বিষয়েই মারওয়ানের সহিত এজিদের পরামর্শ হইত। পরামর্শের সময় অসময় ছিল না। কি পরামর্শ, তাহা তাঁহারাই জানিতেন।

মারওয়ান বলিলেন, "পুত্রের স্বাধীনতা কোথায়? কি করি, পিতা বর্তমানে পিতার অমতে কোন কার্যে অগ্রসর হওয়া পুত্রের পক্ষে অনুচিত। আমি হাসান-হোসেনের ভক্ত নহি; শাহজাদা বলিয়া মান্য করি না, তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করি না; নতশিরে তাহাদের নামে দণ্ডবৎ করি না; সেই জন্য পিতা মহাবিরক্ত। আবার অন্যায় বিচারে একজনের প্রাণবধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে সাহস হয় না, ইচ্ছাও করে না। লোকাপবাদ-তাহার পর পরলোকের দণ্ড! আর কেন? মহারাজ যে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতেই তো মনস্কামনা সিদ্ধি-আর কি চাই? ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে কোন কার্যে বাধা দিবেন না। ইহাই যথেষ্ট। যে যন্ত্রণা করিয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, যদি কৃতকার্য হইতে পারি, তবে আর অন্য পথে যাইবার আবশ্যক কি? একটা গুরুতর পাপভার মাথায় বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি? নরহত্যা মহাপাপ।"

হঠাৎ সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এজিদ কহিলেন, "অসময়ে আনন্দ-বাদ্য কি জন্য? বুঝি আবদুল জব্বার আসিয়া থাকিবে।" উভয়ে একটু এস্তভাবে দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজকর্মচারিগণের প্রতি যে যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ই প্রতিপালিত হইয়াছে। কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খল হয় নাই দরবার পর্যন্ত গমনপথে

শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ এখন পর্যন্ত যথাস্থানে দন্ডায়মান। তদ্দর্শনে তাঁহারা আরও অধিকতর উৎসাহ দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে কাসেদের সহিত দেখা হইল। কাসেদ স-সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "রাজাদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। আবদুল জব্বার সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। মহারাজ আম দরবার বরখাস্ত করিয়া আবদুল জব্বারের সহিত খোশমহলে বার দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া কাসেদ পুনরায় অভিবাদন পূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এজিদ মারওয়ানের সহিত আনন্দ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিলেন এবং রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া আবদুল জব্বারের সহিত মহারাজের কথোপকথন শুনিবার অপেক্ষায় উৎসুক রহিলেন।

আবদুল জব্বার বিশেষ সতর্কতার সহিত জাতীয় সভ্যতা রক্ষা করিয়া করজোড়ে মহারাজ সমীপে বসিয়া আছেন। পুত্রের পরামর্শমত এজিদের জননী স্বামীর নিকট যাহা বলিয়াছেন, যে প্রকার কথার প্রস্তাব করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, মাবিয়া অবিকল সেইরূপ বলিতে লাগিলেন, "আবদুল জব্বার! আমার ইচ্ছা, তোমাকে আমি সর্বদা আমার নিকটে রাখি। কোন প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহাতে সময়ে নানা প্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইবে, মন্ত্রিদলের আজ্ঞানুবর্তী হইতে হইবে। অথচ রাজনীতি অনুসারে কোন প্রকার পদমর্যাদা রক্ষা করা তোমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। কাজেই সকলের নিকট হাস্যসম্পদ হওয়াই সম্ভাবনা। আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে নিশ্চিতভাবে রাজপরিবারের মধ্য রাখিয়া দেই।"

করজোড়ে আবদুল জব্বার বলিলেন, "আমি দাসানুদাস আজ্ঞাসহ ভৃত্য। যাহা আদেশ করিবেন, শিরোধার্য করিয়া প্রতিপালন করিব। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আমি আমার আশার অতিরিক্ত আদৃত হইয়া রাজসমীপে উপবেশনের স্থান পাইয়াছি।"

মাবিয়া বলিলেন– "আব্দুল জব্বার! আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রধান উজীর মারওয়ানের মুখে শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। আমার উপাসনার সময় অতীত প্রায়, আমি আজিকার মত বিদায় হইলাম।"

এই বলিয়াই মাবিয়া খোশমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মন্ত্রী মারওয়ান বাদশাহের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিতে লাগিলেন– "মাননীয় আবদুল জব্বার সাহেব! আমাদের ইচ্ছা যে, রাজসংসার হইতে রাজোচিত আপনার নিত্যনিয়মিত ব্যয়োপযোগী সম্পত্তি প্রদানপূর্বক অদ্বিতীয় রূপযৌবনসম্পন্না বহুগুণবর্তী নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা মহামাননীয়া রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্রসঙ্গত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এই দামেস্ক নগরে আপনাকে স্থায়ী করি। ইহাতে আপনার মত কি?"

কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র আবদুল জব্বার মনের আনন্দে বিভ্রান্ত হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। এজিদের ভগ্নী সালেহার পানিগ্রহণ করিবেন, স্বাধীনভাবে ব্যয়বিধান জন্য সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? জীবনে যাহা তিনি আশা করেন নাই, স্বপ্ন যে অমূলক চিন্তা, সে স্বপ্নেও কোন দিন যাহা উপদেশ পান নাই, অভাবনীয়রূপে আজ তাহাই তাহার ভাগ্যে ঘটিল। ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। মন্ত্রিমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আবদুল জব্বার যেন ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন। তখনই সম্মতিসূচক অভিপ্রায় জানাইতেন, কিন্তু হর্ষবিহ্বলতা আশু

তাঁহার বাকশক্তি হরণ করিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আমার পরম সৌভাগ্য! রাজাদেশ শিরোধার্য।"

মারওয়ান বলিলেন, "আপনার অঙ্গীকারে আমরাও পরমানন্দ লাভ করিলাম সমস্তই প্রস্তুত, এখনই এই সভায় এই শুভলগ্নে শুভকার্য সুসম্পন্ন হউক।"

পূর্ব হইতেই এজিদ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মারওয়ানকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত, অমাত্যবর্গ, পরিজনবর্গ সকলেই এক সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। পুরোহিতের আদেশ মত এজিদ পাত্রীপক্ষের প্রতিনিধি সাব্যস্ত হইলেন; মারওয়ান এবং আব্দুর রহমান সাক্ষী হইলেন।

এই স্থানে হিন্দু পাঠকগণের নিকট কিছু বলিবার আছে। আমাদের বিবাহ প্রথা একটু সংক্ষেপে বুঝাইয়া না দিলে, এ উপস্থিত বিবাহ বিষয় বুঝিতে একটু আয়াস আবশ্যক হইবে। আমাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পাত্রপক্ষীয় কোন পুরুষ কি স্ত্রীর পাত্রীকে দেখিবার প্রথা নাই।

পাত্র পূর্ণবয়স্ক হইলে পুরোহিতের উপদেশক্রমে যে দেশে হউক না, কয়েকটি কথা আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ করিতে হয়। পাত্রীপক্ষীয় অভিভাবকগণের মনোনীত প্রতিনিধিকে পাত্রের সেই কথাগুলির প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকটি কথা বলিতে হয়। বিবাহের মূল কথাই এই যে, প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব কবুল)। পাত্রী যে বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটি সাক্ষীর প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আমাদের বিবাহে অন্য কোন প্রকার ধর্মার্চ্চনা, কি মন্ত্রপাঠ, কি অন্য কোন প্রকারের ক্রিয়া কিছুই নাই। তবে লৌকিক প্রথানুসারে ধর্মভাবে শিথিলযত্ন ব্যক্তিগণ কি কেহ আমাদের অঙ্গ মনে করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। তাহা না করিলেও বিবাহ বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি শিথিল হয় না। নিয়ম-লংঘন-দোষে কোন প্রকার অমঙ্গল ভয়েও কোন পক্ষকে ভয়াতুর হইতে হয় না।

প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ের আর অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। তবে একটা স্থূল কথা দেনমোহর। অধুনা যে প্রকার লক্ষ লক্ষ টাকার দেনমোহর প্রথা ভারতে মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, যে প্রথানুসারে স্বামীর যথাসর্বস্ব কন্যার কোষগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারী করা হইতেছে, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। বৃটিশ বিধিও এই ধর্মসংক্রান্ত এবং শাস্ত্রসঙ্গত, কেবল মাত্র স্বীকার উক্তিধনে যথার্থ টাকার দায়িত্ব স্বীকারের ন্যায় স্বামীকে দায়ী করিয়া তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি, আবাসভূমি বিক্রয়, পরিশেষে দেহ পর্যন্ত বন্দিশ্রেণীর সহিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন; ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! আমাদেরও দোষ না আছে, এরূপ নহে! আপন আপন দুহিতার ভবিষ্যৎ হিতকামনায় আমরা ক্রমে "মোহরানার" সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি করিতেছি। যাঁহারা ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, সেই প্রভু মোহাম্মদের পরিবারগণের মোহরানার সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন। প্রভু মোহাম্মদের কন্যা, হাসান-হোসেনের জননী বিবি ফাতেমার দেনমোহর আধুনিক পরিমাণ মুদ্রার হিসাব অনুসারে চারি টাকা চারি আনার বেশি ছিল না।

পাত্রীর সম্মতিসূচক স্বীকারবাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিনিধি মহাশয় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সভায় প্রত্যাগত হইয়া জাতীয় রীত্যনুসারে সভাস্থ সভ্যগণকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, "বিবি সালেহা এ বিষয়ে অসম্মত নহেন; কিন্তু তাঁহার একটি কথা আছে। সে কথা এই যে, তিনি পরম্পরায় শুনিয়াছেন, এই মাননীয় সম্ভ্রান্ত আব্দুল জব্বার সাহেবের জয়নাব নামে আর একটি স্ত্রী আছেন, ধর্মশাস্ত্রানুসারে জয়নাবকে পরিত্যাগ না করিলে, তিনি এ বিবাহে সম্মতি দান করিতে পারেন না।" আরও তিনি বলিলেন, "জয়নাবের যত দেনমোহরের জন্য আবদুল জব্বার দায়ী, তাহার পরিমাণ তিনি জানিতে চাহেন না, তদতিরিক্ত জয়নাবের ভরন-পোষণের জন্য আরও সহস্র মুদ্রা প্রদানেও তিনি প্রস্তুত আছেন'।" এই প্রস্তাবে হয়ত অনেকেরই মস্তক ঘুরিয়া যাইত, চিন্তাশক্তির পরীক্ষা হইত, আন্তরিক ভাবেরও পরীক্ষা হইত, কিন্তু আব্দুল জব্বারের বিবেচনাশক্তি এতদূর প্রবল যে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার জন্য তাঁহার চিন্তাশক্তিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত করিলেন না; যেমনি প্রশ্ন তেমনি উত্তর।

আবদুল জব্বার বলিলেন, "আমি সম্মত আছি। মুখের কথা কেন, তালাকনামা (স্ত্রী-পরিত্যাগ পত্র) এখনি লিখিয়া দিতেছি।"

লেখনী ও কাগজ সকলই প্রস্তুত ছিল, আব্দুল জব্বার প্রথমে পরমেশ্বরের নাম, পরে প্রভু মোহাম্মদের নাম লিখিয়া পতিপরায়ণা নিরপরাধিনী সতী সাধ্বী সহধর্মিণী জয়নাবকে তালাক দিলেন। সভ্যস্থ অনেক মহোদয় সাক্ষীশ্রেণীতে স্ব স্ব নাম ধাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতিনিধির হস্ত দিয়া সেই তালাকনামাখানি সালেহার নিকট প্রেরিত হইল। জয়নাবের অনুমানবাক্য সফল হইল। প্রতিনিধি পুনরায় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলেই প্রফুল্লচিত্তে সুস্থির হইয়া বসিলেন, নতুন রাগে, নুতন তালে, আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী। আবদুল জব্বারের ভবনে জয়নাবের হৃদয়তন্ত্রী ছিড়িয়া গেল। জলপূর্ণ আঁখি দুইটি বোধ হয় জলভারে ডুবিল। আব্দুল জব্বারের প্রত্যুত্তর অবধি তালাকনামা লিখিয়া প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করা পর্যন্ত জয়নাবের মুখশ্রীর ও তাঁহার অজ্ঞাত বিপদ সময়ে চিত্তচাঞ্চল্যর প্রকৃত ছবি প্রকৃতরূপে চিত্র করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না। কারণ তাহা কল্পনাশক্তির অতীত-মসী-লেখনীর শক্তি বহির্ভূত।

প্রতিনিধি ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব রীত্যনুসারে সভ্যাস্থ সকলেই পুনরভিবাদন করিয়া বলিলেন–

"এ সভায় রাজমন্ত্রী, রাজসভাসদ, রাজপরিষদ, রাজআত্মীয়, রাজ-হিতৈষী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত আছেন। সালেহা বিবি যাহা বলিলেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া আমি তাহা অবিকল বলিতেছি, আপনারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন–

"যে ব্যক্তি ধনলোভে, কি রাজ্যলোভে, কি মানসম্ভ্রম বৃদ্ধির আশায় নিরপরাধিনী সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, বহুকালের প্রণয় ও ভালবাসা যে ব্যক্তি এক মুহূর্তে ভুলিতে পারে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রণয়ের বন্ধন-রজ্জু অকাতরে ছিন্ন করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস কি? তাহার কথায় আস্থা কি? তাহার

মায়ায় আশা কি? এমন বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীবিনাশক অর্থলোভী নরপিশাচের পানিগ্রহণ করিতে সালেহা বিবি সম্মত নহেন।"

সভাস্থ সকলেই রাজকুমারীর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আবদুল জব্বারের মস্তকে যেন সহস্র অশনির সহিত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার আকাশকুসুমের আমুল চিন্তাবৃক্ষটি এককালে নির্মূল হইয়া গেল। প্রতিনিধির বাক্য বজ্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন-তরু দগ্ধীভূত হইল। পরিচারকগণ রাজকুমারীর অঙ্গীকৃত অর্থ আব্দুল জব্বারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। আব্দুল জব্বার তাহা গ্রহণ করিলেন না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভাভঙ্গের গোলযোগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া রাজদত্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন; গৃহে আর প্রতিগমন করিলেন না।

কথা গোপন থাকিবার নহে। আব্দুল জব্বারের সঙ্গীরা ফিরিয়া যাইবার পূর্বেই তাঁহার আবাসপল্লীতে উক্ত ঘটনা রাষ্ট্র হইয়াছিল। মূল কথাগুলি নানা অলঙ্কারে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া বাতাসের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া জয়নাবকে এবং প্রতিবাসিগণকে মহা দুঃখিত করিয়াছিল। তখন পর্যন্তও নিশ্চিত সংবাদ কেহ পান নাই। অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সে অনেকের মধ্যে জয়নাবও একজন। আব্দুল জব্বারের সঙ্গীগণ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে সন্দেহ দূর হইল। জয়নাবের আশাতরী বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। জয়নাব কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কেবল তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিয়া অতি মলিন বেশে দুঃখিত হৃদয়ে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ প্রবাহ

পথিক উর্দ্ধশ্বাসে চলিতেছেন, বিরাম নাই, মুহূর্তকালের জন্য বিশ্রাম নাই। এজিদ গোপনে বলিয়া দিয়াছেন, যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইবে, চলৎ-শক্তি রহিত হইবে, ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, সেই সময় একটু বিশ্রাম করিও। কিন্তু বিশ্রামহেতু যে সময়টুকু অপব্যয় হইবে, বিশ্রামের পর দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবে। পথিক এজিদ আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছেন। একে মরুভূমি, তাহাতে প্রচণ্ড আতপতাপ, বিশেষ ছায়াশূন্য প্রান্তর- বিশ্রাম করিবার স্থান অতি বিরল। দেশীয় পথিকের পক্ষে বরং সহজ, অপরিচিত ভিন্নদেশীয় পথিকের পক্ষে এই মরুস্থানে ভ্রমণ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। এ পথিক দেশীয় এবং পরিচিত; দামেস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছেন। কোথায় কোন পর্বত, কোথায় কোন নির্ঝরিণীর জল পরিষ্কার ও পানোপযোগী, তাহাও পূর্ব হইতে জানা আছে। পথিক একই ক্ষুদ্র পর্বত লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাইতেছেন। কয়েক দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিয়া এক্ষণে অনেক দুর্বল হইয়া অতি কষ্টে যাইতেছেন। নির্দিষ্ট পর্বতের নিকটস্থ হইলে পূর্ব পরিচিত আব্বাস ও তৎসহ কয়েকজন অনুচরের সহিত দেখা হইল।

মোসলেমকে দেখিয়া আব্বাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই মোসলেম! কোথায় যাইতেছ?"। মোসলেম উত্তর করিলেন, "পিপাসায় বড়ই কাতর, অগ্রে পিপাসা নিবৃত্তি করি, পরে আপনার কথার উত্তর দিতেছি।"

আব্বাস বলিলেন, "জল অতি নিকটেই আছে। ঐ কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষের নিকট দিয়া সুশীতল নির্ঝরিণী অতি মৃদু মৃদুভাবে বহিয়া যাইতেছে। চল ঐ খর্জ্জুর বৃক্ষতলে বসিয়া সকলেই একটু বিশ্রাম করি। আমিও কয়েক দিন পর্যন্ত ক্লান্ত হইতেছি।"

সকলে একত্র হইয়া সেই নির্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। আব্বাস এক খন্ড প্রস্তর ভূমি হইতে উঠাইয়া তত্তলস্থ ঝর্ণার সুস্নিগ্ধ জলে জলপাত্র পূর্ণ করিয়া এবং থলিয়া হইতে কতকগুলি খোরমা বাহির করিয়া মোসলেমের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মোসলেম প্রথমে জলপান করিয়া কথাঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। দুই একটি খোরমা মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই আব্বাস! এজিদের বিবাহ-পয়গাম (প্রস্তাব) লইয়া আমি জয়নাবের ভবনে যাত্রা করিতেছি।"

আব্বাস বলিলেন, "সে কি! আব্দুল জব্বার কি মরিয়াছে?"

মোসলেম বলিলেন, – "না আবদুল জব্বার মরেন নাই! জয়নাবকে তালাক দিয়াছেন।"

আব্বাস বলিলেন, "আহা! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি দোষে পরিত্যাগ করিল? জয়নাবের মত পতিপরায়ণা ধর্মশীলা পতিপ্রাণা নম্রস্বভাবা রমণী এই প্রদেশে অতি কমই দেখা যায়। আবদুল জব্বারের প্রাণ এত কঠিন, ইহা তো আমি আগে জানিতাম না। কোন প্রাণে সোনার জয়নাবকে পথের ভিখারিণী করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে?"

মোসলেম বলিলেন, "ভাই! ঈশ্বরের কার্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে কি করেন, কাহারও মনে কি গতি কি কারণে কোন কার্যসাধনে কোন সময়ে কি কৌশলে কিরূপ করিয়া যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ভ্রমপূর্ণ অজ্ঞ মানব; আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তকে, এই ক্ষুদ্র চিন্তায়, সেই অনন্ত বিশ্বকৌশলীর বিচিত্র কৌশলের অণুমাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, সাধ্যও নাই।"

আব্বাস জিজ্ঞাসিলেন, "কত দিন আব্দুল জব্বার জয়নাবকে পরিত্যাগ করিয়াছে?"

"অতি অল্প দিন মাত্র।"

"বোধ হয়, এখনও এদ্দৎ (শাস্তসম্মত বৈধব্যব্রত) সময় উত্তীর্ণ হয় নাই।"

"প্রস্তাবে তো আর কোন বাধা নেই। এদ্দৎ সময় উত্তীর্ণ হইলেই শুভ কার্য সম্পন্ন হইবে।"

"ভাই মোসলেম "আমিও তোমাকে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিলাম। জয়নাবের নিকট প্রথমে এজিদের প্রস্তাব, শেষে আমার প্রার্থনার বিষয়ও প্রকাশ করিও। রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া যে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে, যদিও উহা সম্ভবই নহে, তথাপি ভুলিও না দেখ ভাই! আশাতেই সংসার, আশাতেই সুখ এবং আশাতেই জীবন। আশা কাহারও কম নহে। আমার কথা ভুলিও না। জয়নাব রূপলাবণ্যে দেশবিখ্যাত, পুরুষমাত্রেই চক্ষু জয়নাবরূপে মোহিত; স্বভাব, চরিত্র, ধীরতা ও নম্রতাগুণে জয়নাব সকলের নিকটেই সমাদৃত; তাহা আমি বেশ জানি। এই অবস্থাতেও বোধ হয়, আমার আশা দুরাশা নহে। দেখ ভাই! ভুলিও না– মনের অধিকারী ঈশ্বর। তিনি যেদিকে মন ফিরাইবেন, যেদিকে চালাইবেন, তাহা নিবারণ করিতে এজিদের রূপের ক্ষমতা নাই; অর্থেরও কোন ক্ষমতা নাই; সেই ক্ষমতাতীতের নিকটে কোন ক্ষমতারই ক্ষমতা নাই; যাহাই হউক, আমার প্রার্থনা জয়নাবের নিকট অবশ্যই জানাইও। আমার মাথা খাও ঈশ্বরের দোহাই এই বিষয়ে অবহেলা করিও না।"

এইরূপ কথোপকথনের পর পরস্পর অভিবাদন করিয়া উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেলেন। মোসলেম কিছু দূর যাইয়াই দেখিলেন, মাননীয় এমাম হাসান সশস্ত্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। এমাম হাসান এক্ষণে স্বয়ং মদিনার সিংহাসনে বসিয়া শাহী মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছেন; রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। মোসলেমকে দূর হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি আলিঙ্গনার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন। মোসলেম পদানত হইয়া হাসানের পদচুম্বন করিয়া জোর করে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শাহজাদা হাসান বলিলেন, "ভাই মোসলেম! আমার নিকট এত বিনয় কেন? কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, অসঙ্কোচে প্রকাশ কর। তুমি তো আমার বাল্যকালের বন্ধু।

মোসলেম কহিলেন "আপনি ধর্মের অবতার, ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা আপনার পদাশ্রয়েই সমস্ত মুসলমানদের পরিত্রাণ, আপনার পবিত্র চরণযুগল দর্শনেই মহাপূণ্য;–আপনার পদধূলি পাপ বিমোচনের উপযুক্ত মহৌষধি; আপনাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে কাহার না ইচ্ছা করে? আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়? আপনার পবিত্র উপদেশ শ্রবণ করিতে কে না সমুৎসুক হইয়া থাকে? আমি দাসানুদাস, আদেশের ভিখারী, আদেশ প্রতিপালনই আমার সৌভাগ্য।"

"আজ আমার শিকারযাত্রা সুযাত্রা। আজিকার প্রভাত আমার সুপ্রভাত। বহুদিনান্তরে আজ বাল্যসখার দেখা পাইলাম। এক্ষণে তুমি ভাই কোথায় যাইতেছে?"

"এজিদের পরিণয়ের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতেছি। হযরত মাবিয়ার আদেশ, যত শীঘ্র হয়, জয়নাবের অভিপ্রায় জানিয়া সংবাদ দিতে হইবে।"

"এজিদ যে কৌশলে এই ঘটনা ঘটাইয়াছে, তাহা সকলই আমি শুনিয়াছি। হযরত মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের কার্যে প্রতিপোষকতা করিয়াছেন, তাহাও জানিয়াছি। অথচ মাবিয়া যে ঐ সকল ষড়যন্ত্রের মূল বৃত্তান্ত ঘৃণাক্ষরেও অবগত নহেন, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই।"

"আক্কাস ও জয়নাবের প্রার্থী। বিশেষ অনুনয় করিয়া, এমন কি ঈশ্বরের শপথ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, -অগ্রে এজিদের প্রস্তাব করিয়া, পরিশেষে আমার প্রস্তাবটি করিও। এজিদ ও আক্কাস, উভয়েরই পয়গাম লইয়া আমি জয়নাবের নিকট যাইতেছি। তিনি যে কাহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

হাস্য করিয়া হাসান কহিলেন, "মোসলেম! আক্কাসের প্রস্তাব লইয়া যাইতে যখন সম্মত হইয়াছে, তখন এই গরীবের কথাটাই বা বাকী থাকে কেন? আমিও তোমাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। সকলের শেষে আমার প্রার্থনাটিও জয়নাবকে জ্ঞাপন করিও। স্ত্রীজাতি প্রায়ই ধনপিপাসু হয়, আবার কেহ কেহ রূপেরও প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আমার না আছে ধন, না আছে রূপ। এজিদের তো কথাই নাই, আক্কাসও যেমন ধনবান, তেমনি রূপবান; অবশ্যই ইহাদের প্রার্থনাই অগ্রগণ্য। জয়নাব-রত্ন ইহাদেরই হৃদয়ভাণ্ডারে থাকিবার উপযুক্ত ধন। সে ভাণ্ডারে যত্নের ত্রুটি হইবে না, আদরেরও সীমা থাকিবে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই বাহ্যিক সুখকেই যথার্থ সুখ বিবেচনা করিয়া থাকে। আমার গৃহে সাংসারিক সুখ যত হইবে, তাহা তোমার অবিদিত কিছুই নাই। যদিও আমি মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছি, কিন্তু ধরিতে গেলে আমি ভিখারী। আমার গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কোন প্রকার সুখবিলাসের আশা নাই। বাহ্যজগতে সুখী হইবার এমন

কোন উপকরণ নাই যে, যাহাতে জয়নাব সুখী হইবে। সকলের শেষে আমার এই প্রস্তাব জয়নাবকে জানাইতে ভুলিও না; দেখ ভাই! মনে রাখিও। ফিরিয়া যাইবার সময় যেন জানিতে পারি যে, জয়নাব কাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।" এই বলিয়া পরস্পর অভিবাদনপূর্বক উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিলেন।

পথিক যাইতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন, "হ্যাঁ! ঈশ্বরের কি মহিমা। এক জয়নাব-রত্নের তিন প্রার্থী- এজিদ, আক্কাস আর মাননীয় হাসান। এজিদ তো পূর্ব হইতেই জয়নাব-রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। যে দিন জয়নাবকে দেখিয়াছে, জয়নাবের অজ্ঞাতে যে দিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল-সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ জয়নাবকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব-রূপ-সাগরে আত্মবিসির্জ্জন করিয়াছে, জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব-নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান, জয়নাব জ্ঞান! আক্কাস তো এতো অর্থশালী, এমন রূপবান পুরুষ, তাহারও মন আজ জয়নাব নামে গলিয়া গেল। এমাম হাসান-যাঁহার পদছায়াতেই আমাদের মুক্তি, যাঁহার মাতামহপ্রসাদাৎ আমরা এই অক্ষয় ধর্মের সুবিস্ত ারিত পবিত্র পথ দেখিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে চিনিয়াছি, যাঁহার ভক্তের জন্যই সর্বদা স্বর্গের দ্বার বিমোচিত রহিয়াছে, এমন মহাপুরুষও জয়নাব লাভের অভিলাষী! আহা! জয়নাব কি ভাগ্যবতী! পথিক মনে মনে এই রূপ নানা কথা আন্দোলন করিতে করিতে পথবাহন করিতে লাগিলেন। চিন্তারও বিরাম নাই, গতিরও বিশ্রাম নাই।

পঞ্চম প্রবাহ

পতিবিয়োগে নারী জাতিকে চারি মাস দশ দিন বৈধব্যব্রত প্রতিপালন করিতে হয়। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিয়মিতাচারে মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হয়, সুগন্ধতৈল স্পর্শ, চিকুরে চিরুণী দান, মেহেদী কি অন্য কোন প্রকারের অঙ্গরাগ শরীরে লেপন, যাহাতে স্ত্রীসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাহার সমুদয় হইতে একেবারে বর্জ্জিত থাকিতে হয়। জয়নাবের বৈধব্যব্রত এখনও শেষ হয় নাই, পরিধানে মলিন বসন। আবরু অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যস্থিত উভয় পার্শ্ব হইতে কপোল ওষ্ঠের নিম্ন দিয়া সমুদয় স্থানকে আবরু কহে। এই আবরুস্থান অপর পুরুষের চক্ষু পরিলেই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ। স্ত্রীলোকের পদতলে উপস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ। সমুদয় অঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করিয়া যদি উপরিস্থত স্থানদ্বয় অনাবৃত রাখে, তাহা হইলে তাহাকে উলঙ্গ জ্ঞান করিতে হয়। স্থুল কথা, মণিবন্ধ হইতে পায়ের গুলফ পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আবরু-স্থান বস্ত্রাবৃত না থাকিলে, জাতীয় ধর্মানুসারে তাকে উলঙ্গ জ্ঞান করতে হয়। এই প্রকারের বস্ত্রের ব্যবহার করিতে না পারা সত্ত্বেই আমাদের দেশে "জানানা" রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আবার কোন কোন দেশে শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় "বোরকা" অর্থাৎ শরীরাবরণ বনের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে সচরাচর প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে হইলে বোরকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জয়নাব শাস্ত্রসঙ্গত বৈধব্য অবস্থায় শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় দিবসযামিনী যাপন করিতেছেন। হস্তে তসবীহ (জপমালা), সংসারের সমুদয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের লিখন অখন্ডনীয় বিবেচনাতেই আন্তরিক দুঃখ সহ্য করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই নির্ভর করে। জয়নাব পিতার বর্তমানে ও দেশীয় প্রথানুসারে এবং শাস্ত্রসঙ্গত স্বাধীনভাবেই মোসলেমের সহিত কথা সহিতে লাগিলেন; তাঁহার পিতা অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মোসলেম বলিলেন, "ঈশ্বরের প্রাসাদে পথশ্রম দূর হইয়াছে। সত্যি! যে উদ্দেশ্যে আমি দৌত্য-কর্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, একে একে নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। যদিও আপনার বৈধব্যব্রত আজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই, কিন্তু প্রস্তাবে অধর্ম নাই। আমাদের দামেস্কাধিপতি হযরত মাবিয়ার বিষয় আপনার অবিদিত কিছুই নাই; তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন, সেই দামেস্কাধিপতির একমাত্র পুত্র এজিদের বিবাহ-পয়গাম লইয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যিনি এজিদকে স্বামিত্বে বরণ করিবেন, তিনিই দামেস্ক রাজ্যের পাটরাণী হইবেন। রাজভোগ ও রাজপরিচ্ছেদে তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। আর অধিক কি বলিব, তিনিই সেই সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন। আর একটি কথা। পথে আসিতে আসিতে প্রভু মোহাম্মদের প্রিয় পারিষদ আব্বাস আমাকে কহিলেন, তিনিও আপনার প্রার্থী। ঈশ্বর তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া পুরুষ জাতির সৌন্দর্যের অতুল আদর্শ দেখাইতেছেন। তিনি অতুল বিভবের অধীশ্বর! তিনিও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। অধিকন্তু প্রভু মোহাম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমার গর্ভজাত হযরত আলীর ঔরসসম্ভূত-পুত্র মদিনাধিপতি হযরত হাসানও আপনার প্রার্থী। কিন্তু এজিদের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য-সম্পদ নাই, সৈন্য-সামন্ত নাই, সমুজ্জ্বল রাজপ্রাসাদও নাই। এই সকল বিষয়ে সম্ভ্রমসম্পদশালী এজিদের সহিত কোন অংশেই তাঁহার তুলনা হয় না। তাঁহার দ্বারা ইহকালের সুখসম্ভোগের কোন আশাই নাই, অথচ সেই হাসান আপনার প্রার্থী। এই আমার শেষ কথা। বিন্দুমাত্রও আমি গোপন করিলাম না–কিছুমাত্রও অত্যুক্তি করিলাম না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া জয়নাব অতি মৃদুস্বরে সুমধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "আজ পর্যন্ত আমার বৈধব্যব্রত শেষ হয় নাই। ব্রতাবসানে অবশ্যই আমি স্বামী গ্রহণ করিব। কিন্তু এই সময় সে বিষয়ে আলোচনা করিলেও আমার মনে মহা কষ্টের উদ্রেক হয়। কি করি, পিতার অনুরোধে এবং আপনার প্রস্তাবে অগত্যা মনের কথা প্রকাশ করিতে হইল। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃজন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যের গুহ্য কারণ কেবল তিনিই জানেন। আমি তাঁহার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ, তাহা আমার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি কেন-অনেকে আপন আপন মূল্যের পরিমাণ বুঝিতে অক্ষম। দয়াময় ঈশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন, বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় এবং অনিবার্য। কাজেই সকল অবস্থাতেই সেই সর্বশক্তিমান, ঈশ্বরের নিয়োজিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা সর্বতোভাবে কর্তব্য। জীবন কয় দিনের? জীবনের আশা কি? এই চক্ষু মুদ্রিত হইলেই সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। তবে কয়েক দিনের জন্য দুরাশার বশবর্তী হইয়া অমূলক উচ্চ

আশায় লালায়িত হওয়ার ফল কি? ধন-সম্পত্তি, রাজ্য বা রূপের আমি প্রত্যাশী নহি। বড় মানুষের মন বড়, আশাও বড়, তাঁহাদের সকল কার্যই আড়ম্বরবিশিষ্ট অথচ কিছুই নহে। বিশ্বাসের ভাগ অতি অল্প। স্থূল কথা-বিষয়বিভব, রাজপ্রাসাদ এবং রাজভোগের লোভী আমি নহি। সে লোভ এ জীবনে কখনই হইবে না। মনের কথা আজ অকপটে আপনার নিকট বলিলাম।"

মোসলেম কহিলেন, "ইহাতে তো আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।"

"ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কি হইতে পারে? যিনি ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, তিনি যখন আমাকে দাসীশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তখন আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমনী অতি কমই দেখিতে পাইবে। আর ইহা কে না জানে যে, যাঁহার মাতামহের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি; আদিপুরুষ হযরত আদম জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াই সেই দয়াময়ের আসনের শিরোবাগে যাঁহার নাম প্রথমেই দেখিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রভু হযরত মোহাম্মদের দৌহিত্র। তিনি যখন জয়নাবকে চাহিয়াছেন, তখন জয়নাবের স্বর্গসুখ ইহাকালেই সমাগত। পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় না আছে? কিন্তু সাধুপুরুষের পদাশ্রিত হইতে পারিলে, পরকালের মুক্তিপথের পাপকন্টক বিদূরিত হইয়া স্বর্গের দ্বার পরিষ্কার থাকিব। তাঁহারা যাহার প্রতি একবার সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া প্রধান স্বর্গ জেন্নাতে নত হইবে।" আর অধিক কি বলিব, আমার বৈধব্যব্রত পূর্ণ হইলেই প্রভু হাসান যে সময়ে আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিবেন, আমি মনের আনন্দে সেই সময়েই সেই পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ করিব। অন্য কোন প্রার্থীর কথা আর মুখে আনিব না।

মোসলেম বলিলেন, "জয়নাব! তুমি জগতে পবিত্র কীর্তি স্থাপন করিলে। জগৎ বিলয় পর্যন্ত তোমার এই অক্ষয় কীর্তি সকলের অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে। ধন-সম্পত্তি সুখ বিলাসের প্রত্যাশিনী হইলেনা, রূপমাধুরীতেও ভুলিলেনা, কেবল অনন্তধামে অনন্ত সুখের প্রত্যাশাতেই দৃঢ় পণ করিয়া পার্থিব সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিলে। আমি তোমাকে সহস্রবার অভিবাদন করি। আমার আর কোন কথা নাই। আমি বিদায় হইলাম।"

ষষ্ঠ প্রবাহ

মোসলেমকে জয়নাবের নিকট পাঠাইয়া এজিদ প্রত্যহ দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণনা অনুসারে যে দিন মোসলেমের প্রত্যাগমন সম্ভব, সে দিন চলিয়া গেল। মোসলেমের আগমন- প্রতীক্ষায় এজিদ সূর্যাস্তের কামনা করিয়া সন্ধ্যাদেবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তমোময়ী সন্ধ্যাও দিবাকরের অস্তাচলে গমনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন। কিন্তু এজিদ মোসলেমকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর ক্রমে সপ্তাহ যায়, মোসলেমের সংবাদ নাই। যে পথ অতি কষ্টে একদিন অতিবাহিত করা যায়, সে পথে এজিদ মনঃকল্পিত গণনায় অর্দ্ধ দিনে আনিয়া মোসলেমের প্রত্যাগমন সম্ভব স্থির করিয়া যে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সে তাঁহার ভ্রম নহে। কারণ, প্রণয়াকাঙ্খার প্রাণ আকাঙ্খিত প্রণয়রত্ন লাভের সুসংবাদ শুনিতে অমূল্য সময়কে যত শীঘ্র হয় দূর করিয়া এক দিনে

দুই তিন বার সূর্যকে উদয় অস্ত করতে ইচ্ছা করে। আবার সুখসময়ের দীর্ঘতার জন্য অনেকে অনেক সময়ে লালায়িত হয়; ল্যাপল্যান্ডবাসীকে সহস্রবার ধন্যবাদ দেয়। ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধি আছে যে, সুখ-সূর্য শীঘ্রই অস্তমিত হয়, সুখ-নিশি শীঘ্র উষাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রভাতকে আনয়ন করে। সুখী দুঃখী, পরস্পর সকলেরই আক্ষেপ এবং সকলেরই দুঃখ। কিন্তু স্বভাব কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। প্রণয়ীর প্রতি অথবা প্রণয়ের প্রতিও ফিরিয়া তাকায় না। বিরহীর দুঃখেও দুঃখিত হয় না। সময় যে নিয়মে যাইতেছে, সেই নিয়মে কত দিন যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এজিদের মনে কত কথাই উদয় হইতেছে, কথা ভাঙ্গিবার একমাত্র দোসর মারওয়ান। সে মারওয়ানও এক্ষণে উপস্থিত নাই। নানা প্রকার চিন্তায় চিন্তিত।

মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম। এজিদের সেদিকে দৃকপাত নাই, পিতার সেবা-শুশ্রূষাতেও মন নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদল- বিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমন্ডলের আভা, সে আয়তলোচনার নয়নভঙ্গীর সুদৃশ্য দৃশ্য, - দিবারাত্রি তাঁহার অন্তর-পটে আঁকা। ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্ত র ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর। সেই নাসিকার সরলভাবে সর্বদাই আকুল। সেই ঈষৎলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্যন্ত চকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই। সামান্য অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছেন, সেই দোলায় তাঁহার মস্তক আজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত দুলিতেছে, ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি যাহা অর্দ্ধচন্দ্রকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ ভাগ ললাটের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনঃপ্রাণ সেই জালে আটক পড়িয়া আজ পর্যন্তও ছটফট করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাসির আভা, জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছেন, কতবার নিদ্রা গিয়াছেন, কত শতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্যন্তও চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া যাই নাই, সমস্তই মনে জাগিতেছে।

মোসলেম আসিলেই জয়নাবের কথা শুনিবেন। কত আগ্রহে জয়নাব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে, কথার ছলে, সেই কথাটি অন্ততঃ দুইবার তিনবার দোহারাইয়া শুনবেন। কিভাবে বলিয়াছিল, মোসলেমকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আদি অন্ত তন্ন তন্ন রূপে শুনিবেন। প্রথম মিলনের নিশিতে জয়নাবকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আজ পর্যন্তও তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সালেহার বিবাহের আদি অন্ত ঘটনা এবং তাহার ভগ্নীমাত্র কেহই নাই, অথচ সালেহার নাম–এই ষড়যন্ত্র যে কেবল জয়নাব লাভের জন্য হইয়াছিল, তাহা অকপটে বলিবেন কি না আজ পর্যন্তও স্থির করিতে পারেন নাই। এই সকল অমূলক চিন্তায় এবং মোসলেমের প্রত্যাগমনের বিলম্বে পূর্ব হইতে আরও অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন। আজ খাদ্যসামগ্রী যথাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে, সেবকগণ প্রভুর আহারের প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া কত কি বলিতেছে, মৃদু মৃদু ভাবে নানা প্রকার অকথ্য কথনে এজিদের নিন্দা করিতেছে, "ঈশ্বর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে, কি করিব উপায় নাই" এই বলিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর গত হইল, তথাচ এজিদের চিন্তার শেষ হইল না। কখনও উঠিতেছেন, গৃহমধ্যে দুই চারি পদ চালনা করিয়া আবার বসিতেছেন, ক্ষণকাল

ঐ উপবেশন শয্যাতেই শয়ন করিয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিলে অবশ্যই আহারের প্রতি মনোযোগ করিতেন। সমস্তই ভুল, কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

সকল সময়েই সকল স্থানেই এজিদের নিকট মারওয়ানের যাইবার অনুমতি ছিল; মারওয়ান আসিয়াই অভিবাদন করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এজিদের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "যখন কোন পথ ছিল না, তখনই চিন্তিত হইবার কথা, এখন তো হস্তগত হইবারই অধিক সম্ভাবনা; এখন আর চিন্তা কি? বলুন তো জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে? আবার সে সুখ সামান্য সুখ নয়, একেবারে সীমার বহির্ভূত। অবস্থার একটু উচ্চ পরিবর্তন হইলেই লোকে মহাসুখী হয়; এ তো একটু পরিমাণ নয়, একেবারে পাটরাণী। বিশেষ স্ত্রীজাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয়। আপনি কোন প্রকার সন্দেহ মনে স্থান দিবেন না; নিশ্চয় জানিবেন, জয়নাব কখনই অসম্মত হইবে না; আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিতে পারি যে, জয়নাব আপনারই হইবে এবং আপনার অঙ্ক শোভা করিবে।"

এজিদ বলিলেন, "সন্দিহান মনের সন্দেহ অনেক। সকলগুলি যে যথার্থ সন্দেহ, তাহা নহে। আমি সে জন্য ভাবিতেছি না। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সমাধা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।"

"সেই বা আর কত দিন? সময় যাইতেছে, ফিরিতেছে, এক ভাবেও থাকিতেছে না। সময়ের গতির বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, শান্তি নাই। অবশ্যই যাইবে, অবশ্যই বৈধব্যব্রত সমাধা হইবে।"

এজিদ সর্বদাই চকিত। কোন প্রকার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই এজিদের মন কাঁপিয়া উঠিত। কারণ আর কিছু নহে, কেবল মোসলেমের আগমন সম্ভব। এজিদ উঠিয়া বসিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কর্ণে কোন প্রকারের শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা না হইলে উঠিয়া বসিবেন কেন? মাওয়ানের তত মনোযোগ নাই। এজিদ উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার প্রধানা পরিচারিকা এস্তে আসিতেছে। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন, মহারাজা আপনাকে মনে করিয়াছেন।"

এজিদ যে বেশে বসিয়াছিলেন, সেই বেশেই পিতার নিকটে গমন করিলেন। মারওয়ানকে বলিয়া গেলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া এজিদ চলিয়া গেলেন।

মাবিয়া পীড়িত, শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। এজিদের মাতা শয্যার পার্শ্বে নিম্নতর আর একটি শয্যায় বসিয়া বিষন্ন বদনে চাহিয়া আছেন। এজিদ সসম্ভ্রমে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া নিকটেই বসিলেন। মাবিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মোসলেম ফিরিয়া আসিয়াছে। (এজিদ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কাহাকেও দেখিলেন না) জয়নাবের বুদ্ধিকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। এত অল্প বয়সে এত ধৈর্যগুণ কাহার? এমন ধর্মপরায়ণা সতী-সাধ্বীর নাম আমি কখনই শুনি নাই। জয়নাবের প্রত্যেক কথায় মন গলিয়া যায়। ইচ্ছা হয় যে, ধর্ম বিষয়ে উপদেশ তাহার নিকট আমরাও শিক্ষা করি। ঈশ্বর তাহাকে যেমন সুশ্রী করিয়াছেন, তেমনি বুদ্ধিমতী করিয়া আরও দ্বিগুণ রূপ বাড়াইয়া দিয়াছেন। আহা! তাহার ধর্মে মতি, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি এবং ধর্মনীতির

সুনীতির কথা শুনিলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? আব্দুল জব্বার নিরপরাধে ঐ অবলা সতীর মনে যে দুঃখ দিয়াছে, ইহার প্রতিফল সে অবশ্যই পাইবে।"

এজিদ আসল কথার কিছুই সন্ধান পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছে না; মনের মধ্যে মনোভাব তোলপাড় করিতেছে। কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাও হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে মনে মনে এই একটু স্থির করিলেন, এত প্রশংসা কেবল আমার শিক্ষার নিমিত্ত। ইহার অর্থই এই যে, আমি তাহাকে বিশেষ আদরে রাখি ও যত্ন করি। এই ভাবিয়া বিশেষ আগ্রহে শুনিতে লাগিলেন।

এজিদের মাতা বলিলেন, "ধর্মে মতি অনেকেরই আছে, সুশ্রীও অনেক আছে।"

এজিদের অন্তরস্থিত জয়নাবের ভ্রুযুগলের অগ্রভাগস্থ সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহা অন্তরে বিধিয়াই ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিল।

মাবিয়া কহিলেন, "অনেক আছে বটে, কিন্তু এমন আর হইবে না। এই তো মহদ্‌গুণের পরিচয় এখনই পাইলে। জয়নাব– রূপ, ধন, সম্পত্তির প্রত্যাশী নহে; রাজরাণী হইতেও তাহার আশা নাই। যাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি পাইবেন, তাঁহার পয়গামই তিনি কবুল করিয়াছেন।"

এজিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি হয়? সে ব্যক্তি কে?"

মাবিয়া বলেন, "তিনি প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্র, মাননীয় আলীর পুত্র হাসান। তুমি যাঁহার নাম শুনিতেও কষ্ট বোধ কর, জয়নাব স্ত্রীবুদ্ধিপ্রভাবে সেই মহাত্মার গুণ জানিয়াই তাঁহার পয়গাম সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। দেখ এজিদ! তুমি আর হাসান-হোসেনের প্রতি ক্রোধ করিও না। মন হইতে সে সকল পাপ দূর কর। সত্যপথ অবলম্বন কর। পৈতৃক ধর্ম রক্ষা কর। পরকালের সুগম্য পথের দুরূহ কন্টক সত্যধর্মের জ্যোতিঃপ্রবাহে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গের দ্বার আবিষ্কার কর। এই সঙ্গে ন্যায় পথে থাকিয়া এই সামান্য রাজ্য রক্ষা কর। আমি আর কয় দিন বাঁচিব। আমি যে প্রকারে ইমাম হাসান-হোসেনের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তুমি তাহার চতুর্গুণ করিবে। তোমা অপেক্ষা তাঁহারা সকল বিষয়েই বড়।"

তখন এজিদের মুখে কথা ফুটিল, বাকশক্তির জড়তা ঘুচিল। পিতৃবাক্যবিরোধী হইয়া বলিতে অগ্রসর হইলেন, "আমি দামেস্কের রাজপুত্র। আমার রাজকোষ ধনে সদা পরিপূর্ণ, সৈন্য-সামন্ত সর্ববলে বলীয়ান আমার সুরম্য অত্যুচ্চ প্রাসাদ এদেশে অদ্বিতীয়। আমি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ এবং অভাবশূন্য। আমি যাহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে অগ্রগামী, যাহার জন্য এত দিন কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনই সহ্য হইবে না। এজিদের প্রাণ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। যে হাসানের এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান নাই, উপবাস যাহাদের বংশের চিরপ্রথা, একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে যাহাদের প্রায় ক্ষমতা হয় না, সেই হাসানকে এজিদ মান্য করিবে? মান্য করা দূরে থাকুক, জয়নাব লাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ তাহাদিগকে দিবে। আমার মনে যে ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাহাদের মনে

ব্যথা দিব। এখনই হউক বা দু'দিন পরেই হউক, এজিদ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবে না; এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।"

মাবিয়া অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন, ওরে নরাধম! কি বলিলি" যে পাষণ্ড! কি কথা আজ মুখে উচ্চারণ করিলি? হায়! হায়! নূরনবী মোহাম্মদের কথা আজ ফলিল তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হইল। ওরে পাপাত্মা! তুই কিসের রাজা? তুই কোন রাজার পুত্র? তোর কিসের রাজ্য? তোর ধনাগার কোথায় রে বর্বর? তুই তো আজই জাহান্নামী (প্রধান নারকী) হইলি! আমাকেও সঙ্গে করিলি! রে দুরাত্মা পিশাচ! তোকে সে দিন কে বাঁচাইল? হায়! হায়! আমি তোর এই পাপমুখ দেখিয়াই হাতের অস্ত্র হাতেই রাখিয়াছিলাম। তাহার ফল আজ হাতে হাতে পাইলাম। ওরে বিধর্মী এজিদ! তোর পিতা যাঁহাদের দাসানুদাস, তুই কোন মুখে তাঁহাদের প্রতি এমন অকথ্য কথা বলিলি? তোর নিস্তার কোন লোকেই নাই- ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই। তুই জানিস, এ রাজ্য- তোর পিতার নহে! সেই হাসানের পিতা আলী অনুগ্রহ করিয়া- ভৃত্যের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া, প্রভু যেমন কিছু দান করেন, সেইরূপ তোর পিতাকে কেবলমাত্র ভোগের জন্য এই রাজ্যদান করিয়াছেন। বল তো, তুই কোন মুখে এমন কর্কশ শব্দ তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিলি! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর ও পাপমুখ আমি আর এ চক্ষে দেখিব না। আর দেখিব না! তুই দূর হ।"

এজিদ ম্লানমুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এজিদের মাতা নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া মাবিয়াকে বুঝাইতে লাগিলেন, আপনি স্থির হউন! ইহাতে আপনার পীড়াই বৃদ্ধি হইবে। আপনি যত বেশি উত্তেজিত হইবেন, ততই আপনার পীড়াই বৃদ্ধি হইবে।"

মাবিয়া বলিলেন, "পীড়াই বৃদ্ধি হউক, আর আমার প্রাণ বাহির হইয়াই যাউক, যে কথা আমি আজ শুনিয়াছি, তিলার্দ্ধ কাল বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই! সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাবিয়া দুই হস্ত তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে দয়াময়! হে করুণাময়! তুমি সর্বশক্তিমান! আমাকে উদ্ধার কর। আমি যেন এজিদের পাপমুখ আর না দেখি। এজিদের কথাও যেন কর্ণে না শুনি। এজিদ আজ আমার অন্তরে যে আঘাত দিয়াছে, আর ক্ষণকাল বাঁচিতেও আমার ইচ্ছা নাই। শীঘ্রই আমাকে এই পাপপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া লও।" হযরত মাবিয়া এই কাতর উক্তিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিলেন।

সপ্তম প্রবাহ

সময় যাইতেছে। যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। আজ যে ঘটনা হইল, কাল তাহা দুই দিন হইবে। ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া দেখিতে কালচক্রের অধীনে বৎসরে পরিণত হইবে। বৎসর বৎসর, অনন্ত বৎসর। যে কোন ঘটনাই হউক, অবিশ্রান্ত গতিতে তাহা বহু দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। হাসান স্বয়ং জয়নাবের ভবনে যাইয়া জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয়া জাএদা, তৃতীয়া জয়নাব। হাসনেবানু প্রধানা স্ত্রী, তদগর্ভজাত একমাত্র পুত্র আবুয়ল কাসেম। আবুয়ল কাসেম পূর্ণবয়স্ক, সর্বগুণে

গুণান্বিত। এ পর্যন্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। পিতার অনুবর্ত্তী থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। পূণ্যভূমি মদিনা অতি পবিত্র স্থান। লোকমাত্রেই ঈশ্বরভক্ত, পাপশূন্য-চরিত্র। কাসেম পবিত্র বংশে জন্মিয়াছেন; তাঁদের আপাদমস্তক পবিত্র। অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশারদ। এই অমিততেজা মহাবীর কাসেমের কীর্তি বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রবল তরঙ্গ। পাঠকগণকে পূর্বেই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখিলাম। জাএদার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। এক ব্যক্তির দুই প্রার্থী হইলেই মহা গোলমাল উপস্থিত হয়। সপত্নীবাদ কোথায় না আছে? হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী, সকলের মাননীয়া। তৎপ্রতি জাএদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব থাকিলেও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। কিন্তু জয়নাবের সহিত তাঁহার সমভাব চলিতে লাগিল। জাএদা ভাবিয়াছিলেন, হাসান তাঁহাতে অনুরক্ত; পূর্বে যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না। এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। এখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, হাসানের ভালবাসা আন্তরিক নহে, – আন্তরিক হইলে এইরূপ ঘটিত না। এক মনও ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারিতেন না। ক্রমেই পূর্ব ভাবের অনেক পরিবর্তন দেখিলেন। হাসানের কথায়, কার্যে ভালবাসার কিছুই ত্রুটি পাইলেন না; তথাচ পূর্ব ভাব, পূর্ব প্রণয়, পূর্ব ভালবাসার মধ্যে কি যেন একটু ছিল তাহা নাই। সেই গৃহ, সেই স্বামী, সেই হাসান, সেই জাএদা সকলই রহিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে কি যেন অভাব হইয়াছে। জাএদা মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, এ দোষ আমার নয়, হাসানের নয়, এ দোষ জয়নাবের! জয়নাবকে যে এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, আজিও করিলেন, কালিও করিলেন, জীবন শেষ পর্যন্ত করিয়া রাখিলেন। সে দোষ ক্রমেই অন্ত রে বদ্ধমূল হইয়া শত্রুভাব আসিয়া দাঁড়াইল। জয়নাব এক্ষণে তাঁহার দুই চক্ষের বিষ। জয়নাবকে দেখিলেই তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানুর ভয়ে যে আগুন এত দিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশি-জ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরে আগুন, মুখেও জয়নাব নাম শ্রবণে একেবারে আগুণ হইয়া উঠিতেন। শেষে হাসনেবানু পর্যন্ত জানিতে পারিলেন যে, জাএদা জয়নাবের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানু কাহাকেও কিছু বলিতেন না; কিন্তু জয়নাবকে মনে মনে ভালবাসিতেন, এখন পর্যন্তও তাহার তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তথাপি জাএদার মনে যে কি প্রকারের উদাসভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন; আর কাহারও জানিবার শক্তি নাই।

এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারের সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না; সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষমতা কত? অপ্রশস্ত অন্ত রের আয়ত্তই বা কত যে, ঐ মহাপুরুষের কীর্তিকলাপে বুদ্ধি চালনা করি। মনের কথা মনেই থাকিল। হাসান প্রকাশ্যে স্ত্রীত্রয়ের মধ্যে যে কিছু ইতর-বিশেষ জ্ঞান করিতেন, তাহা কেহ কখনই জানিতে পারেন নাই। তিন স্ত্রীকেই সমনয়নে দেখিতেন, সমভাবে ভালবাসিতেন; কিন্তু সেই সমান ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হাসনেবানুকে অপেক্ষাকৃত অধিক মান্য করিতেন। জয়নাব সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, স্বভাবতঃ তাঁহাকে বেশি আদর ও বেশি যত্ন করেন, জাএদার মনে একটিই বদ্ধমূল হইল। প্রকাশ্যে কোন বিষয়ে বেশি আদর ও

বেশি যত্ন করেন, জাএদার মনে একটিই বদ্ধমূল হইল। প্রকাশ্যে কোন বিষয়ে বেশি ভালবাসার চিহ্ন কখনও দেখিতে পান নাই, তথাচ তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না। কোন দিন জাএদার প্রতি যত্নের ত্রুটি, কি কোন বিষয়ে ক্ষতি, কি অণুমাত্রও ভালবাসার লাঘব দেখিলেন না। তথাচ জয়নাব তাঁহার পরম শত্রু, চক্ষের শূল, সুখ-পথের প্রধান কন্টক। ইমাম হাসান ধর্মশাস্ত্রের অকাট্য বিধি উলঙ্ঘন করিয়া জয়নাবকে বিবাহ করেন নাই। ইচ্ছা হইলে এখনও চতুর্থ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারেন। ভালবাসার ন্যূনাধিক্যে তাঁহার কোন স্ত্রী তাঁহাকে কোন নিন্দা করিতে পারেন না। তবে জাএদা এত বিষাদিনী হইলেন কেন? কেন জয়নাবকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন? বোধ হয়, জাএদা ভাবিতেন যে, একটি স্ত্রীর তিনটি স্বামী হইলে সে স্ত্রীলোকটি যে প্রকার সুখী হয়, তিনটি স্ত্রীর এক স্বামীও বোধ হয় সেই প্রকার সুখ ভোগ করে। কিন্তু সেই স্বামীত্রয়ের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অসুবিধা কি কোন কারণে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া আত্মকলহ উপস্থিত হয় এবং একের অনিষ্টচিন্তায় দ্বিতীয় যত্ন করে, তৃতীয় কাহারও স্বপক্ষে কি উভয়কে শত্রু মনে করিয়া শত্রুবিনাশে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে আমারই বা না হইবে কেন? আমিও ত শরীরী, আমাও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, মাংসপেশী, ধমনী, হৃদয়, শোণিত, অস্থি, চর্ম ও ইচ্ছা-সকলই আছে, তবে মনোভাবের বিপর্যয় হইবে কেন? এই উপকরণে গঠিত শরীরে স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা ভিন্ন ভাব হওয়া অসম্ভব। জগতের শত্রু তিন প্রকার; প্রথম প্রকৃত শত্রু, দ্বিতীয় শত্রুর বন্ধু, তৃতীয় মিত্রের শত্রু। এই সূত্র অনুসারে মৈত্রীবন্ধন হইতে হাসান যেন অল্পে অল্পে সরিতে লাগিলেন। স্বামীর নিরপেক্ষ ভালবাসা জাএদা আর ভালবাসিলেন না, মনের কথা মনেই থাকিল। কোন দিন কোন প্রকারে, কি কোন কথায়, কি কোন কথার প্রসঙ্গেও সে কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, কণ্ঠে পর্যন্তও আনিলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বভাবতঃ কিছু চাপা। তাহারা কাজকর্মে যেমন ভারী, পরিমাণেও তদপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী; সহজে উঠাইতে কাহারও সাধ্য নাই। এক একটি স্ত্রীলোকের মনের কবাট খুলিয়া যদি বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে দেখা যায়, আর যাহা যাহা আছে তাহা যদি চেনা যায়, তাহা হইলে অনেক বিষয় শিক্ষাও পাওয়া যায় এবং মনের অন্ধকার প্রায়ই ঘুচিয়া যায। সে মনে না আছে এমন জিনিসই নাই; সে হৃদয়ভাণ্ডারে না আছে এমন কোন পদার্থই নাই। জয়নাব হাসনেবানুকে মনের সহিত ভক্তি করিতেন। জাএদাকেও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্যের সহিত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এই ভাবেই চলিল। কোন কালেই কোন প্রকার লোকের অভাব ছিল না; এজিদের চক্রান্তে আব্দুল জব্বারের দুরবস্থা হাসান পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার এখন পর্যন্তও জয়নাবের মোহিনী মূর্তি এজিদের চক্ষে সর্বদা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার বিবাহের পর এজিদের প্রতিজ্ঞা, মাবিয়ার ভৎর্সনা, সকল কথাই মদিনায় আসিয়াছে। কোন কথা শুনিতেই তাঁহার আর বাকী নাই। মাবিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও বলহীন হইতেছেন, বাঁচিবার ভরসা অতি কমই আছে, তাহাও লোকমুখে শুনিতেছেন। এজিদের সহিত বাল্যকালে বাল্যক্রীড়ায় ঝগড়াবিবাদ হইত, এজিদ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে পারিত না, একথা লইয়া সময়ে সময়ে গল্পচ্ছলে জয়নাবকে শুনাইতেন। এক্ষণে জয়নাব লাভে বঞ্চিত হইয়া শত্রুভাব সহস্রগুণে এজিদের অন্তরে দৃঢ়রূপে স্থায়ী হইয়াছে, তাহাও জয়নাবকে বলিতেন। হাসান অনেক লোকের মুখে অনেক কথা

শুনিলেন, সে সকল মনোযোগ, কি বিশ্বাস করিয়া তাহার আদি অন্ত তন্ন তন্ন করিয়া কখনই শুনিলেন না। সাধারণের মুখে এক কথার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া শতসহস্র পত্রে পরিণত হয়। সে সময় মূল কথার অণুমাত্রও বিশ্বাসের উপযুক্ত থাকে না। হাসান তাহাই বিবেচনা করিয়া এক কর্ণে শুনিলেন, অন্য কর্ণে বাহির করিয়া দিলেন। ধর্মোপদেশ, ধর্মচর্চাই জীবনের একমাত্র কার্য মনে করিয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও মদিনার রাজা, কিন্তু রাজসিংহাসনের পারিপাট্য নাই, সৈন্য-সামন্ত ধন-জন কিছুই নাই। কিন্তু আবশ্যক হইলে ঈশ্বরপ্রাদাসে অভাবও নাই। মদিনাবাসীরা হাসান-হোসেন দুই ভ্রাতার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। তাঁহাদের কার্যে, তাঁহাদের বিপদের বিনা অর্থে, বিনা স্বার্থে, বিনা লাভে জীবন দিতে প্রস্তুত।

হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তসবীহ (জপমালা) হস্তে উপাসনা-মন্দির-সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ফকিরের মলিন বেশ, শতগ্রন্থিযুক্ত পিরহান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তসবীহ হস্তে কাষ্ঠষষ্টি। হাসানের কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন, "প্রভো" আমি একটি পর্বতের উপর বসিয়াছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ আসিতেছে, হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ ভূতলে পতিত হইল। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিকটস্থ হইয়া দেখি যে, একটা লৌহশর তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া, কঠিন প্রস্তরখণ্ড বিদ্ধ করিয়াছে। শোণিতের ধারা বহিয়া চলিতেছে। কোথা হইতে কে শর নিক্ষেপ করিল, এমন লঘুহস্তে শর নিক্ষেপে সুনিপূণ, যে এক বাণে পথিকের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ পর্যন্ত ভেদ করিল। তখন তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। দুই একটি কথা অস্ফুট স্বরে যাহা শুনিলাম, আর ভাবেও যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার মর্ম এই যে, হযরত মাবিয়া আপনার নিকট কাসেদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার ভরসা অতি কম। জীবনের শেষ দেখাশুনার জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে বোধ হয়, কাসেদ আসিতেছিল। আমি দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, এজিদ অশ্বোপরি বীরসাজে ধনুহস্তে বেগে আসিতেছে; পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে তূণীর বুলিতেছে; দেখিয়াই পর্বতের আড়ালে লুকাইলাম। আড়াল হইতে দেখিলাম, এজিদ অশ্ব হইতে নামিয়া পথিকের কটিবদ্ধ খুলিয়া একখানি পত্র লইয়া অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে চক্ষুর অগোচর হইল। আপনার নিকট সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আর আমার কোন কথা নাই।" এই বলিয়া আগন্তুক ফকির পুনরাভিবাদন করিয়া একটু দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

হাসান ভাবিতে লাগিলেন, ফকির কে? কেনই বা আমাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছিল? কথার স্বর ও মুখচ্ছবি একেবারে অপরিচিত বলিয়াও বোধ হইল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফকিরের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, এ ফকির আর কেহই নয়, এ সেই আব্দুল জব্বার। একে একে আব্দুল জব্বারের অবয়ব, ভাবভঙ্গী, কথার স্বরে নিশ্চয়ই প্রমাণ হইল যে, আর কেহই নয়, এ সেই আব্দুল জব্বার। কি আশ্চর্য। মানুষের অবস্থা কখন কিরূপ হয়, কিছুই জানিতে পারা যায় না। হযরত মাবিয়ার কথা সেরূপ শুনিলাম, ইহাতে তাঁহার জীবনাশা অতিকমই বোধ হয়; যাহা হইক, হোসেনের সহিত

পরামর্শ করিয়া যাহা করিতে হয়, করিব; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম প্রবাহ

মাবিয়া পীড়িত; এক্ষণে নিজবলে আর উঠিবার শক্তি নাই। এজিদের মুখ দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দামেস্করাজ্য যাঁহাদের পৈর্তৃক রাজ্য, তাঁহাদিগকে দিয়া যাইবেন, মনে মনে স্থির করিয়া হাসান-হোসেনকে আনিবার জন্য কাসেদ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা এ পর্যন্ত আসিতেছেন না, সে জন্য মহাব্যস্ত ও চিন্তিত। সেই কাসেদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এ পর্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রধান উজির হামানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসান-হোসেনের এত দিন না আসিবার কারণ কি?"

হাসান উত্তর করিলেন, কাসেদ যদি নির্বিঘ্নে মদিনায় যাইয়া থাকে, তবে হাসান-হোসেনের না আসিবার কারণ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। আপনার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা যে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছেন, ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কাসেদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ সেই রাত্রি হইতে আর মাবিয়ার সম্মুখে যাইতেছেন না। গুপ্তভাবে অর্থাৎ মাবিয়ার দৃষ্টির অগোচরে কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। হামানের সঙ্গে যে কথা কহিতেছেন, তাহাও তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সমুদয় শুনিতেছেন। মাবিয়া ক্ষণকাল পরে আবার মৃদু-মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এ রাজ্যে মঙ্গলের আর সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কাসেদ কোন বিপদে পড়িয়াছে। তাঁহারা মদিনায় না থাকিলে, অবশ্যই কাসেদ ফিরিয়া আসিত। তাহা যাহাই হউক, আমার চিরবিশ্বাসী বহুদর্শী মোসলেমকেই পুনরায় মদিনায় পাঠাও। আর হাসান-হোসেনের নিকট আমার পক্ষ হইতে একখানি প্রার্থনাপত্র লিখিয়া মোসলেমের সঙ্গে দাও। তাহাতে লিখিয়া দাও যে, আমার বাঁচিবার আশা নাই। পাপময় জগৎ পরিত্যাগের পূর্বে আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে একবার স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি। আরও একটি কথা আমি স্থির-সঙ্কল্পে মনস্থ করিয়াছি। আপনাদের এই পৈতৃক দামেস্ক রাজ্য আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব আমার আর রাখিবার সাধ নাই। এ কথাও লিখিও যে, আপনাদিগকে এই সিংহাসনে বসিতে দেখিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। হামান! মোসলেমকে বিশেষ সাবধানে মদিনায় পাঠাইও। নানা প্রকারের সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত ও উদয় হইয়াছে। (এজিদ এই মাত্র শুনিয়া হামানের অদৃশ্যে তথা হইতে অতি এস্তে প্রস্থান করিলেন।) এত গোপনে মোসলেমকে পাঠাইবে যে, তাহার সন্ধান আর একটি প্রাণী না জানিতে পারে।' হামান বিদায় হইলেন, এবং রাজাদেশ প্রতিপালন করিয়া তখনি মোসলেমকে মদিনায় পাঠাইলেন।

ইমামভক্ত মোসলেম উর্দ্ধশ্বাসে মদিনাভিমুখে চলিলেন। মোসলেম পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। ক্রমে রাজধানী ছাড়িয়া তিনি একটি প্রশস্ত বালুকাময় প্রান্তর মধ্য দিয়া যাইতেছেন। বালুকাময় ভূমি রৌদ্রের উত্তাপে অগ্নিময় হইয়া মোসলেমের গমনে বিশেষ বাধা দিতেছে। কি করেন, শীঘ্র যাইতে হইবে, কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অবিশ্রান্ত যাইতেছেন। অনেক স্থলে ভূমি সমতল নহে, স্থানে স্থানে প্রস্তরকণার ন্যায় স্তুপাকার

বালুকারাশি প্রস্তরে পরিণত হইবে বলিয়া ভূমি হইতে শিরোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মোসলেম দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্তূপাকারে আড়াল হইতে চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ বেগে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঐ আক্রমণকারীদিগের মুখ বস্ত্র দ্বারা এরূপে আবৃত যে, তাহাদের স্বরূপ, রূপ এবং আকৃতি কিছুই দেখা যাইতেছে না। মোসলেম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা কে? কেনই আমার গমনে বাধা দিতেছ?" তাহাদের মধ্য হইতে একজন গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মোসলেম! তোমার সৌভাগ্য যে আজ কাসেদ পদে বরিত হইয়াছ। তাহা না হইলে জিজ্ঞাসা করার অবসর পাইতে না,- "তোমরা কে?" এ কথা উচ্চারিত হইবার পূর্বেই তোমার শির বালুকায় গড়াগড়ি যাইত, দেহটিও দিব্য লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ধরাশায়ী হইত। পরিশ্রম করিয়া আর হাঁটিয়া কষ্ট করিতে হইত না। যাহা হউক, যদি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিতে চাও তবে আর এক পদও অগ্রসর হইও না।"

"কেন হইব না? আমি রাজ-কাসেদ, হযরত মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ লইয়া মদিনা শরীফে ইমাম হাসান-হোসেনের নিকট যাইতেছি, কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে?" এই বলিয়া মোসলেমের পথরোধ করে? গমনে কে বাধা দেয়?" এই বলিয়া মোসলেম চলিলেন। এত দ্রুতবেগে মোসলেমের দিকে কেহ অগ্রসর হইতে পারিল না। উহার মধ্য হইতে একজন হঠাৎ মুখের বস্ত্র খুলিয়া বলিতে লাগিল, "মোসলেম, তোমার চক্ষু কোথায়?" মোসলেমের চক্ষু যেমন তাহার মুখের প্রতি পড়িল, অমনি তরবারি হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া অভিবাদনপূর্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। এজিদের আদেশে সঙ্গীরা মোসলেমের অঙ্গ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইল। মাবিয়ার পত্রখানি এজিদ স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যত দিন মাবিয়ার মৃত্যু না হয়, তত দিন তোমাকে বন্দী অবস্থায় নির্জ্জন কারাবাসে থাকিতে হইবে। তুমি তো বড় ঈশ্বরভক্ত, মাবিয়ার মৃত্যু-কামনাই তোমার আজ হইতে প্রার্থনার এক প্রধান অঙ্গ করিয়া দিলাম। যাও, ঐ লৌহশৃঙ্খল পরিয়া অনুচরদিগের সহিত মহানন্দে নাচিতে নাচিতে যেখানে উহারা লইয়া যায়, সেইখানে গমন কর।"

মোসলেম কিছুই বলিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় এজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনুচরেরা লৌহশৃঙ্খলে মোসলেমের হস্তপদ বন্ধন করিল, শেষে গলদেশে শিকল বাঁধিয়া লইয়া চলিল।- হায় রে স্বার্থ!!

এজিদ বংশীবাদন করিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র একটি বৃহৎ বালুকাস্তূপের পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইল। এজিদ অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে চলিয়া আসিলেন। চারি জন প্রহরী মোসলেমকে বন্দী করিয়া ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

নবম প্রবাহ

দামেস্ক- রাজপুরী- মধ্যে পুরবাসিগণ, দাসদাসিগণ মহা ব্যতিব্যস্ত! সকলেই বিষাদিত। মাবিয়ার জীবন সংশয়- বাকরোধ হইয়াছে, চক্ষুতারা বিবর্ণ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। এজিদের জননী নিকটে বসিয়া স্বামীর মুখে সরবত দিতেছেন, দাসদাসিগণ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আত্মীয়-স্বজনেরা মাবিয়ার দেহ বেষ্টন করিয়া একটু উচ্চস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। হঠাৎ মাবিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া "লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদের রাসূলাল্লাহ" এই শব্দ করিয়া উঠিলেন। সকলে গোলযোগ করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এবার রক্ষা পাইলেন; এবার আল্লাহ্ রেহাই দিলেন।" আবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঐ কয়েকটি কথা ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইল। সেবারে আর বিলম্ব হইল না। অমনি আবার ঐ কয়েকটি কথা পুনর্বার উচ্চারণ করিলেন। কেহ আর কিছুই দেখিলেন না। কেবল ওষ্ঠ দুইখানি একটু সঞ্চালিত হইল মাত্র। উর্দ্ধ-চক্ষু নীচে নামিল। নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষের পাতা অতি মৃদু-মৃদু ভাবে আসিয়া চক্ষুর তারা ঢাকিয়া ফেলিল। নিঃশ্বাস বন্ধ হইল। এজিদের জননী মাবিয়ার বক্ষে হস্ত দিয়া দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই মাবিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। এজিদ অশ্ব হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, মাবিয়ার চক্ষু, নিমীলিত, বক্ষঃস্থল অস্পনন্দ; একবার মস্তকে, একবার বক্ষে হাত দিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই এজিদের চক্ষে জল দেখিতে পাইল না। এজিদ পিতার মৃতদেহ যথারীতি স্নান করাইয়া "কাফন" দ্বারা শাস্ত্রানুসারে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মৃতদেহের সদ্‌গতি উপাসনা (জানাজা) করাইতে তাবুতে (শেষ শয়নাসন) শায়িত করাইয়া সাধারণ-সম্মুখে আনয়ন করিলেন। বিনা আহ্বানে শত শত ধার্মিক পুরুষ আসিয়া জানাজাক্ষেত্রে মাবিয়ার বস্ত্রাবৃত শবদেহের সমীপে আরাধনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই করুণাময় ভগবানের নিকট দুই হস্ত তুলিয়া মাবিয়ার আত্মার মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। পরে নির্দিষ্ট স্থানে "দাফন" (মৃত্তিকাপ্রোথিত) করিয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। মাবিয়ার জীবনের লীলাখেলা একেবারে মিটিয়া গেল। ঘটনা এবং কার্য স্বপ্নবৎ কাহারও কাহারও মনে জাগিতে লাগিল। হাসান-হোসেন মদিনা হইতে দামেস্কের নিকট পর্যন্ত আসিয়া মাবিয়ার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আর নগরে প্রবেশ করিলেন না। মাবিয়ার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনর্বার মদিনায় যাত্রা করিলেন। মাবিয়া জগতের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তথা হইতে আর ফিরিবেন না, এজিদের মুখ আর দেখিবেন না, এজিদকে পাপ কার্য হইতে বিরত এবং হাসান-হোসেনের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতেও আর আসিবেন না, এজিদকে ভৎর্সনাও আর করিবেন না, এজিদ মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দামেস্ক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজমুকুট শিরে শোভা পাইতে লাগিল। সত্যবাদী, নিরপেক্ষ ও ধার্মিক মহাত্মাগণ, যাঁহারা হযরত মাবিয়ার স্বপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমরাও বিষাদ-সিন্ধুর তটে আসিলাম, এজিদ এক্ষণে স্বাধীন রাজ্যের রাজা। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, ইহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল। রাজ-দরবার লোকে লোকারণ্য। পূর্বদিন ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, শহরের সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রেই দরবারে উপস্থিত হইবেন। অনেকের মনেই অনেক কথা উঠিল। কি করেন, রাজ-আজ্ঞা-নিয়মিত সময়ে সকলেই "আম" দরবারে উপস্থিত হইলেন। এজিদও উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান দরবারস্থ সমুদয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমাদের সুখের দিন, আজ আমরা এই দামেস্ক- সিংহাসনে নবীন রাজের অধিবেশন দেখিলাম। উপযুক্ত পাত্রেই আজ রাজসিংহাসন সুশোভিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ! আজ হইতে আপনাদের দুঃখ ঘুচিল। দামেস্ক রাজ্যে আজ হইতে যে সুখ-সূর্যের উদয় হইল, তাহা আর অস্তমিত

হইবে না। আপনারা এই নবোদিত সূর্যকে কায়মানে পুনরায় অভিবাদন করুন!” সভাস্থ সকলেই নতশিরে এজিদকে অভিবাদন করিলেন। মারওয়ান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “মহোদয়গণ! আমার একটি কথা আছে। আজ মহারাজ এজিদ নবীন রাজদণ্ড হস্ত করিয়াছেন, আজই একটি গুরুতর বিচারভার ইহাকে বহন করিতে হইতেছে। আপনাদের সম্মুখেই রাজবিদ্রোহীর বিচার করিবেন বলিয়া আপনাদের আহ্বান করা হইয়াছে।”

মারওয়ানের পূর্ব-আদেশানুসারে প্রহরীরা মোসলেমকে বন্ধনদশায় রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। সভাস্থ সকলে মোসলেমের দুরবস্থা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মাবিয়ার এত বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র, এত সম্মানাস্পদ, এত স্নেহাস্পদ, সেই মোসলেমের এই দুরবস্থা! কি আশ্চর্য! আজিও মাবিয়ার দেহ ভূগর্বে বিলীন হয় নাই, অনেকেই আজ পর্যন্ত শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই, মাবিয়ার নাম এখনও সকলের জিহ্বাগ্রেই রহিয়াছে, আজ সেই মাবিয়ার প্রিয় বন্ধুর এই দুর্দশা! কি সর্বনাশ! এজিদের অসাধ্য কি আছে? অনেকেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আর মঙ্গল নাই, দামেস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। কি পাষাণহৃদয়! উ!! এজিদ কি পাষাণহৃদয়!! কাহারও মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার সাহস হইল না; সকলেই কেবল মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। মোসলেম চিন্তায় ও মনস্তাপে ক্ষীণকায় হইয়াছেন; এজিদ বলিলেন, মাবিয়ার মৃত্যুতে তাঁহার মুক্তি, কিন্তু মাবিয়া আছেন কি না, মোসলেম তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিবে না এবং তাঁহার কথাও কেহ জানিতে পারিবে না,– পূর্ব হইতেই এজিদের এই আজ্ঞা ছিল। সুতরাং মোসলেমকে কোন কথা বলে কাহার সাধ্য?

নগরের প্রায় সমুদয় ভদ্রলোককে একত্র দেখিয়া মোসলেম কিছু আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে জানেন, তিনি কোন অপরাধে অপরাধী নহেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহাতে যদি এজিদ অন্যায়াচারণ করেন, তবে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও কিছু বলিবেন না, মুক্তিলাভের প্রার্থনাও করিবেন না। মাবিয়ার আজ্ঞাক্রমেই হাসান-হোসেনের নিকট মদিনায় যাইতেছিলেন; ইহা যদি অপরাধের কার্য হয়, আর সেই অপরাধেই যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি চিত্ত বিচলিত করিবেন না। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্বক মারওয়ান কহিলেন, এই ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী, আজ ইঁহারই বিচার হইবে। আমাদের নব দণ্ডধর আপনাদের সম্মুখে ইহার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।”

এজিদ বলিলেন, “এই কাসেদ বিশ্বাসী নহে। যাহারা ইহাকে বিশ্বাসী বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং ইহার অনুকূলে যাহারা কিছু বলিবে, তাহারাও বিশ্বাসী নহে। আমার বিবেচনায় ইহার স্বপক্ষ লোকমাত্রেই অবিশ্বাসী– রাজবিদ্রোহী।”

সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। যাঁহারা মোসলেমের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এজিদ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, “মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক, আমার বিবাহ পয়গাম লইয়া জয়নাবের নিকটে গিয়াছিল। আমার পয়গাম গোপন করিয়া আমার চিরশত্রু

হাসান,- যাহার নাম শুনিলে আমার দিগবিদিক জ্ঞান থাকে না, সেই হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট বলিয়া, জয়নাবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমার পয়গাম জয়নাবের কর্ণগোচর হয় নাই। আমার নাম শুনিলে জয়নাব কখনই হাসানকে কবুল করিত না। হাসানের অবস্থা জয়নাবের অবিদিত কিছুই নাই। কেবল মিথ্যাবাদীর চক্রান্তে জয়নাব-রত্ন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। আরও কথা আছে। এই মিথ্যাবাদী যাহা বলে, তাহাই যদি সত্য বিবেচনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। আমার চিরশত্রুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমারই সর্বনাশ করিয়াছে। হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতে আমি ইহাকে নিয়োজিত করি নাই। ইহার অপরাধের শাস্তি হওয়া আবশ্যক। না জানিয়া এই কার্য করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। জয়নাব-লাভের জন্য আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তা কে না জানে? মোসলেম কি জানে না যে, যে জয়নাবের জন্য আমি সর্বস্ব পণ করিয়া শেষে জীবন পর্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, সেই জয়নাবের বিবাহে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল, ইহা অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা আর কি আছে? আর একটি কথা। এই সকল কুকার্য করিয়াও এই ব্যক্তি ক্ষান্ত হয় নই; আমারই সর্বনাশের জন্য, আমাকেই রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, আমাকেই পথের ভিখারী করিবার আশায় মাবিয়ার পত্র লইয়া হাসানের নিকট মদিনায় যাইতেছিল। অতএব আমার এই আজ্ঞা যে, অবিলম্বেই মোসলেমের শিরশ্চেদন করা হউক।" সরোষে কাঁপিয়া কাঁপিয়া এজিদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "সে দণ্ড বধ্যভূমিতে হইবে না, অন্য কোন স্থানেও হইবে না, এই সভাগৃহে আমার সম্মুখেই আমার দন্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হউক।"

মারওয়ান বলিলেন, "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে দণ্ডবিধান রাজনীতির বিরুদ্ধ।"

এজিদ বলিলেন, "আমার আজ্ঞা অলংঘনীয়। যে ইহার বিরোধী হইবে তাহারও ঐ শাস্তি। মারওয়ান সাবধান।"

সকলের চক্ষু যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এজিদের মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই অভাগা মোসলেমের ছিন্নশির ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। জিঞ্জিরাবদ্ধ দেহ শোণিতাক্ত হইয়া সভাস্থলে পড়িয়া সভ্যগণের মোহ ভঙ্গ করিল। তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, মোসলেম আর নাই। রক্তমাখা দেহ মস্তক হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। মোসলেমের পবিত্র শোণিত-বিন্দুর পরমাণু অংশে দামেস্ক রাজভবনের পবিত্রতা, সিংহাসনের পবিত্রতা, দরবারের পবিত্রতা, ধর্মাসনের পবিত্রতা, মাবিয়া যাহা বহু কষ্টে সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই সমস্ত পবিত্রতা- আজ মোসলেমের ঐ শোণিত-বিন্দুর প্রতি পরমাণুতে মিশিয়া বিকট পবিত্রতার আসন পাতিয়া দিল। মোসলেমের দেহবিনির্গত রক্তধারে "এজিদ! ইহার শেষ আছে" এই কথা কয়েকটি প্রথম অঙ্কিত হইয়া রক্তস্রোত সভাস্থল বহিয়া চলিল। এজিদ সগর্বে বলিতে লাগিলেন, "অমাত্যগণ! প্রধান প্রধান সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ! এবং সভাস্থ মহোদয়গণ আপনারা সকলেই মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন। আমার আজ্ঞা যে কেহ অমান্য করিবে, যে কেহ তাহার অণুমাত্র অবহেলা করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মোসলেমের ন্যায় শাস্তি ভোগ

করিবে। আমার ধনবল, সৈন্যবল, বাহুবল সকলই আছে, কোন বিষয়ে আমার অভাব নাই। হাসান-হোসেনের যাহা আছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। সেই হাসানের এত বড় সাহস "এত বড় স্পর্দ্ধা! ভিখারীণীর পুত্র হইয়া রাজরাণীর পাণিগ্রহণ! যে জয়নাব রাজরাণী হইত, সেই ভিখারিণী পুত্র তাহারই পানি গ্রহণ করিয়াছে। আমি উহার বিবাহের সাধ মিটাইব। জয়নাবকে লইয়া সুখভোগ করিবার সমুচিত প্রতিফল দিব। কে রক্ষা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? এজিদ জগতে থাকিতে জয়নাবকে লইয়া সে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। এখনও সে আশা আমার অন্তরে আছে, যে আশা এক প্রকার নিরাশ হইয়াছে, হাসান বাঁচিয়া থাকিতে জয়নাব লাভ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। অথচ সেই মহা-আসক্তি আগুনে এজিদের অন্তর সর্বদা জ্বলিতেছে। যদি আমি মাবিয়ার পুত্র হই, তবে হাসান-হোসেনের বংশ একেবারে নিপাত না করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিব না। শুধু হাসানের মৃতদেহ দেখিয়াই যে সে মহাগ্নি নির্বাপিত হইবে তাহা নহে, হাসানের বংশ মধ্যে সকলের মস্তক দ্বিখন্ডিত করিয়াই যে যে এজিদ ক্ষান্ত হইবে, তাহাও নহে। মোহাম্মদের বংশের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে এজিদ ক্ষান্ত হইবে না; তাহার মনোবেদনাও মন হইতে বিদুরিত হইবে না। আমার অভাব কি? কাহারও সাহায্য চাহি না; হিতোপদেশ অথবা পরামর্শের প্রত্যাশা রাখি না। যাহা করিব, তাহা মনেই থাকিল। তবে এই মাত্র বলি যে, হাসান-হোসেনের এবং তাহাদের বংশানুবংশ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের প্রতি এজিদ যে দৌরাত্ম্য-অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে, যদি তাহা কখনও নিভিয়া যায়, যাইতে পারে, কিন্তু সে তাপ 'রোজ-কেয়ামত' (জগতের শেষ দিন) পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের মনে একইভাবে জাগরিত থাকিবে। আবার যাহারা হাসান-হোসেনের বেশি ভক্ত, তাহারা আজন্মকাল ছাতি পিটিয়া[১] "হায় হাসান! হায় হোসেন! বলিয়া কাঁদিতে থাকিবে।"

সভ্যগণকে এই সকল কথা বলিয়া এজিদ পুনরায় মারওয়ানকে বলিলেন, "হাসান-হোসেনের নিকট যে পত্র পাঠাইবে, সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া ইহাদিগকে একবার শুনাইয়া দাও, ইহাদিগের মধ্যে মোহাম্মদ ভক্ত অনেক আছেন।"

মারওয়ান পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,–

!হাসান ! হোসেন!

তোমরা কি এ পর্যন্ত শুন নাই যে, মহারাজাধিরাজ এজিদ নামদার মধ্যাহ্নকালীন সুর্যসম দামেস্কসিংহাসনের বিরাজ করিতেছেন? অধীনস্থ রাজা-প্রজামাত্রই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া কেহ বা উপঢৌকন প্রেরণ, কেহ বা স্বয়ং আসিয়া অবনতশিরে চির-অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। আপন আপন রাজ্যের নির্ধারিত দেয় করে দামেস্ক রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তোমাদের মক্কা-মদিনার খাজনা আজ পর্যন্ত না আসিবার কারণ কি? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ দামেস্কাধিপতির আম দরবারে উপস্থিত হইয়া নতশিরে নূন্যতা স্বীকারে রাজসিংহাসন চুম্বন কর। আর এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া এজিদ নামদারের নামে খোৎবা[২] পাঠ করিবে। ইহার অন্যথাচরণ হইলেই রাজবিদ্রোহীর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মারওয়ান,
প্রধানমন্ত্রী"

পত্র পাঠ শেষ হইল। তখনই উপযুক্ত কাসেদের হস্তে পত্র দিয়া নবীন রাজা সভাভঙ্গের অনুমতি করিলেন। অনেকেই বিষাদনেত্রে অশ্রুপাত করিতে করিতে সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

১. মহরমের সময়ে শিয়্যগণকে অনেকেই বক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়াছেন, তাহাকেই ছাতিপেটা কহে। ঈদুল ফেতর, ঈদুজ্জোহা, এই দুই ঈদ এবং জুমার নামাজ (উপাসনা) যাহা প্রতি শুক্রবার দুই প্রহরের পর হইয়া থাকে, ঐ তিন উপাসনার পর আরবী ভাষায় ঈশ্বরের গুণানুবাদের পরে, উপাসনার বর্ণনা, পরে স্বজাতীয় রাজার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু ও রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করা হয়। ভারতীয় মুসলমানগণ পূর্বে দিল্লীর মোগল সম্রাটগণের নামে খোৎবা পাঠ করিতেন। এক্ষণে তুরস্কের সুলতানের নাম খোৎবা পাঠ করিতেছেন

২. উক্ত হইয়াছে, হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবা ৭ম ঘটিকার সময় ৬৩ বৎসর বয়সে প্রভু মোহাম্মদ পবিত্র ভূমি মদিনায় মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা খাতুন। প্রভুর দেহত্যাগের পর কোথায় সমাধি হইবে, এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইলে, হযরত আবুবকর এই মীমাংসা করেন যে, পয়গম্বর সাহেব জীবিতাবস্থায় যে স্থানকে প্রিয় মনে করিতেন, সেই স্থানে সমাধি হওয়া আবশ্যক। সকলেই ঐ মতের পোষকতা করায় বিবি আয়শার ঘরে সমাধি দেওয়া সুস্থির হইল। বিবি আয়শা হযরত আবুবকরের কন্যা এবং হযরত মোহাম্মদের সহধর্মিণী। সেই সমাধিস্থানকে রওজা কহে। হযরত ওমর প্রথমতঃ কাঁচা ইটের দ্বারা রওজা গাঁথুনি করেন। তৎপরে অলিদ চতুঃসীমাবন্দী করিয়া মল্লাদার প্রস্তর দ্বারা উহা প্রস্তুত করেন। তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। হিজরী ৫৫০ সালে ইস্পাহান নিবাসী জামালদ্দীন, চন্দন কাষ্ঠের ঝাজুরিদার রেল দ্বারা রওজার চতুর্দিক আবদ্ধ করিয়া দেন। সেই সময়ে শরীফ এবনে আবদুল হিকা মিশরের বহুমূল্য শ্বেতবর্ণ চাদর আনাইয়া উক্ত চাদরের উপরে লোহিতবর্ণ রেশমসূত্রে কোরআন শরীফের সূরা ইয়াসীন লেখাইয়া তদ্দারা ঐ পবিত্র সমাধি আবৃত করেন: সেই সময় হইতে আবরণপ্রথা প্রতি বৎসর প্রচলিত হইয়াছে। যিনি মিশরের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন, তিনিই বহুমূল্য নূতন বস্ত্র দ্বারা প্রতি বৎসর ঐ সমাধিমন্দির আবৃত করিয়া থাকেন। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই প্রথা আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ৬৭৮ হিজরীতে আলাউন সালেহীন রাজত্বকালে মদিনার মসজিদের ছাদ হইতে উচ্চ সবুজ রঙের "কোব্বা" (চূড়া) মসজিদের উপর স্থাপন করিয়াছেন। সেই সুরঞ্জিত উচ্চ চূড়া আজ পর্যন্ত অক্ষরভাবে রহিয়াছে। হিজরী (১০০০) এক হাজার সালে সুলতান সোলেমান খাঁ রুমী রওজা শরীফের প্রাঙ্গণ শ্বেত বর্ণ প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করাইয়াছেন। ওমর-এবনে আব্দুল আজিজ খাদের শাসন-কালের পর রওজা-প্রাঙ্গণের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীরা চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলের বাহির থাকিয়া দর্শন করে। চতুষ্পার্শ্বস্থ রেল বস্ত্রাবরণে সদাসর্বদা আবৃত থাকে।

দশম প্রবাহ

নূরনবী মোহাম্মদের রওজায়* অর্থাৎ সমাধিপ্রাঙ্গণে হাসান-হোসেন, সহচর আবদুল্লাহ ওমর এবং রহমান একত্রে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। যখন কোন বিপদভার মস্তকে আসিয়া পড়ে, কোনরূপ গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অথবা কোন অভাবনীয় চিন্তা সদযুক্তি সৎপরামর্শ করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে, হাসান-হোসেন উভয়ে মাতামহের সমাধিপ্রাঙ্গণে আসিয়া যুক্তি, পরামর্শ এবং কর্তব্য বিষয়ে মত স্থির করিতেন। আজ কিসের মন্ত্রণা? কি বিপদ? বাহ্যিকভাবে, মুখের আকৃতিতে স্পষ্টই যেন কোন ভয়ানক চিন্তার চিত্র চিত্রিত। কি চিন্তা? পাঠক! ঐ দেখুন, সমাধিপ্রাঙ্গণের সীমানির্দিষ্ট স্থানের নিকটে দেখুন, কে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রভু মোহাম্মদের সমাধিপ্রাঙ্গণের সীমামধ্যে অন্য কাহারও যাইবার রীতি নাই। দর্শক, পূজক, আগন্তুক সকলেরই চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে থাকিয়া জেয়ারত (ভক্তিভাবে দর্শন) করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

পাঠক! যে লোক দাঁড়াইয়া আছে, উহাকে কি কখনও দেখিয়াছেন? একটু স্মরণ করুন, অবশ্যই মনে পড়িবে। এই আগন্তুক দামেস্কের কাসেদ। আর হাসানের হস্তে ঐ যে কাগজ দেখিতেছেন, ঐখানি সেই পত্র- যাহা দামেস্কের রাজদরবারে মারওয়ানের মুখে শুনিয়াছিলেন। ওমর বলিলেন, "কালে আরও কতই হইবে। এজিদ মাবিয়ার পুত্র, যে মাবিয়া নূরনবী হযরত মোহাম্মদের প্রধান ভক্ত ছিলেন, দেহ মন প্রাণ সকলই আপনাদের মাতামহের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পুত্র মক্কা-মদিনার খাজনা চাহিতেছে, এজিদের নামে খোৎবা পাঠ করিতে লিখিয়াছে! কি আশ্চর্য! কালে আরও কতই, হইবে তাহা কে বলিতে পারে?"

আব্দুর রহমান বলিলেন, "এজিদ পাগল হইয়াছে! নিশ্চয়ই পাগল। পাগল ভিন্ন আর কি বলিব? এই অসীম জগতে এমন কেহই নাই যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মক্কা-মদিনার কর চাহিতে পারে। এজিদ যে মুখে এই সকল কথা বলিয়াছে, সেই মুখের শাস্তি বিশেষ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পরামর্শ আর কি? আমার মতে কাসেদকে পত্রসহ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়াই সমুচিত বিধি। ঐ পাপপূর্ণ কথাঙ্কিত পত্র পূণ্যভূমি মদিনায় থাকিবার উপযুক্ত নহে।"

ওমর বলিলেন, "ভাই! তোমার কথা আমি অবহেলা করিতে পারি না। দুরাত্মার কি সাহস! কোন মুখে এমন কথা উচ্চারণ করিল! কি সাহসে পত্র লিখিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া পাঠাইল! উহার নিকট কি কোন ভাল লোক নাই? এক মাবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামেস্ক হইতে কি সকলেই চলিয়া গিয়াছে?"

আব্দুর রহমান বলিলেন, "পশুর নিকটে কি মানুষের আদর আছে? হামান- নামে মাত্র মন্ত্রী। হামানের কোন কথাই এজিদ শুনিতে চায় না। মারওয়ানই আজকাল দামেস্কের প্রধানমন্ত্রী, সভাসদ, প্রধান মন্ত্রণাদাতা, এজিদের প্রধান গুরু; বুদ্ধি, বল, যাহা কিছু সকলই মারওয়ান। এই তো সকলের মুখে শুনিতে পাই।"

হাসান বলিলেন, "এই যে মারওয়ানের কার্য, তাহা আমি আগেই জানিতে পারিয়াছি। তাহা যাহাই হউক, পত্র ফিরাইয়া দেওয়াই আমার বিবেচনা।"

হযরত ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হোসেন একটু রোষ ভাবে বলিতে লাগিলেন "আপনারা যাহাই বলুন, আর যাহাই বিবেচনা করুন, পত্রখানা শুদ্ধ ফেরত দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। কমজাত বাঁদীবাচ্চা কি ভাবিয়াছে? ওর এত দূর স্পর্ধা যে, আমাদিগকে উহার অধীনতা স্বীকার করিতে পত্র লিখে? আমরা উহাকে শাহানশাহ (সম্রাট) বলিয়া মান্য করিব? যাহাদের পিতার নামে দামেস্করাজ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আজ এতদূর অপমান! যাঁহাদের পদভারে দামেস্ক রাজ্য দলিত হইয়া বক্ষে সিংহাসন পাতিয়া বসিবার স্থান দিয়াছে, নিয়মিতরূপে কর যোগাইয়াছে, আমরা তাঁহারই সন্তান-তাঁহারই উত্তরাধিকারী, আমরাই দামেস্কের রাজা, দামেস্কের সিংহাসন আমাদেরই বসিবার স্থান। কমজাত কাফের সেই সিংহাসনে বসিয়া আমাদেরই নিকট মক্কা-মদিনার খাজনা চাহিয়াছে, ইহা কি সহ্য হয়?"

হাসান বলিলেন, "ভ্রাতাঃ! একটু বিবেচনা করিয়া কার্য করাই ভাল। আমরা অগ্রে কিছু বলিব না, এজিদ যাহা লিখিয়াছে, তাহার কোন উত্তর করিব না। দেখি কোন পথে যায়, কি উপায় অবলম্বন করে।"

আব্দুর রহমান বলিলেন, "ভ্রাতাঃ! আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বিষধর সর্প যখন ফণা উঠাইয়া দাঁড়ায়, অমনি তাহার মাথা চূর্ণ করা আবশ্যক; নতুবা সময় পাইলে নিশ্চয়ই দংশন করে। এজিদ নিশ্চয়ই কালসর্প। উহার মস্তক প্রথম উত্থানেই চূর্ণ করিয়া ফেলা বিধেয়, বিশেষতঃ আপনার প্রতিই উহার বেশি লক্ষ্য।"

গম্ভীরভাবে হাসান কহিলেন, "আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; এখনও সে সময় হয় নাই। এবারে নিরুত্তরই সদুত্তর মনে করিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু একেবারে নিরুত্তর হইয়া থাকা আমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নহে; আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। আমি কাসেদকে বিদায় করিতেছি। পত্রখানা আমার হস্তে প্রদান করুন।"

হোসেনের হস্তে পত্র দিয়া হাসান রওজা হইতে নিকটস্থ উপাসনা মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কাসেদকে সম্বোধন করিয়া হোসেন বলিতে লাগিলেন, "কাসেদ! আজ আমি রাজনীতির মস্তকে শত পদাঘাত করিতাম, আজ আমি চিরপদ্ধতি প্রাচীন নীতি উপেক্ষা করিয়া এই পত্রের সমুচিত উত্তর বিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ জানিয়া তোমার প্রাণ তোমাকে অর্পণ করিলাম। কমজাত এজিদ যে পত্র দিয়া তোমাকে মদিনায় পাঠাইয়াছে, ইহার প্রতি অক্ষরে শত শত বার পাদুকাঘাত করিলেও আমার ক্রোধের অণুমাত্র উপশম হয় না। কি করি, ধর্মগ্রন্থে লিখিত ভাষার অক্ষর ইহাতে সন্নিবেশিত আছে মনে করিয়াই তাহা করিলাম না। ফিরিয়া গিয়া সেই কমজাতকে এই সকল কথা অবিকল বলিও এবং দেখাইও যে, তাহার পত্রের উত্তর এই–"

এই কথাগুলি বলিয়া পত্রখানি শত খণ্ড করিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া হোসেন আবার বলিলেন, "যাও!– ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া যাও যে, আজ এই উপস্থিত সন্ধ্যাতেই তোমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা হইতে মুক্তি পাইলে।" হোসেন এই বলিয়া কাসেদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে সন্ধ্যাকালীন উপাসনা-সময়ে আহ্বান-সূচক সমধুর ধ্বনি (আজান) ঘোষিত হইল; সকলেই উপাসনা করিতে গমন করিলেন। কাসেদের প্রত্যাগমনের পূর্বেই এজিদ সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যগণের পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্রের পারিপাট্য, আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ, পানীয় জলের সুযোগ,

দ্রব্যজাত বহনোপযোগী বাহন ও বস্ত্রবাস প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন যে, পত্র পাইয়া হাসান-হোসেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিবে; কাসেদের প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া আসা সন্দেহ বিবেচনা করিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, নিশ্চয় যুদ্ধ হইবে। কেবল সংবাদ প্রাপ্তি উপেক্ষা ছিল মাত্র। একদিন আপন সৈন্য-সামন্তগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা দেখিয়া পরে পদাতিক সৈন্যের ব্যূহ-নির্মাণে নৈপুণ্য, আত্মরক্ষা করিয়া বিপক্ষের প্রতি অস্ত্র-চালনের সুকৌশল এবং সমর-প্রাঙ্গণে পদচালনার চাতুর্য দেখিয়া এজিদ মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, 'আমার এই শিক্ষিত সৈন্যগণের অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়ায় এমন বীরপুরুষ আরবদেশে কে আছে? এমন সুশিক্ষিত সাহসী সৈন্য কাহার সাধ্য? হাসান তো দূরের কথা, তাহাদের পিতা যে অত বড় যোদ্ধা ছিল, সেই আলীও যদি কবর হইতে উঠিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়। তাহা হইলেও তাহাদের পরাজয় ভিন্ন জয়ের আশা নাই।"

এজিদ এইরূপ আত্মগৌরব ও আত্মপ্রশংসায় মত্ত ছিলেন, এমন সময় মদিনা হইতে কাসেদ আসিয়া সমুচিত অভিবাদনপূর্বক এজিদের হস্তে প্রত্যুত্তর পত্র দিয়া, হোসেন যাহা বলিয়াছেন, অবিকল বলিল।

এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চঃস্বরে বলিলেন, – "সৈন্যগণ্য ! তোমরা আমার দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা। আমি তোমাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছি, পূর্ব হইতেই বেতন সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, যে যেমন উপযুক্ত, তাহাকে সেই প্রকার সম্মানে সম্মানিত করিয়াছি। এত দিন তোমাদিগকে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিয়াছি। আজ আমার এই আদেশ যে, এই সজ্জিত বেশ আর পরিত্যাগ করিও না, হস্তস্থিত অসিও আর কোষে রাখিও না। ধনুর্দ্ধরগণ! তোমরা আর তূণীরের দিকে লক্ষ্য করিও না। মদিনা সম্মুখ ভিন্ন আর পশ্চাৎ করিও না। এই বেশেই এই যাত্রাই শুভযাত্রা জ্ঞান করিয়া হাসান-হোসেনের বধে এখনই যাত্রা কর। যত শীঘ্র পার, প্রথমে হাসানের মস্তক আনিয়া আমাকে দেখাও। লক্ষ টাকা পুরস্কার! আমি নিশ্চয়ই জানি, তোমরা মনোযোগী হইয়া একটুও চেষ্টা করিলেই উভয়ের মস্তক তোমাদের হস্তেই দামেস্কে আনীত হইবে। আমার মন ডাকিয়া বলিতেছে, তোমাদের তরবারি সেই উভয় ভ্রাতার শোণিতপানে লোলুপ রহিয়াছে।"

সৈন্যগণকে ইহা বলিয়া মন্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মারওয়ান! তুমি আমার বাল্যসহচর। আজ তোমাকেই আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই বীরদলের অধিনায়ক হইতে হইবে। তোমাকেই সৈন্যপত্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ হাসান-হোসেনের বধসাধনের জন্য সৈন্যদলকে মদিনায় পাঠাইতেছি। যদি এজিদের মানরক্ষা করিতে চাও, যদি এজিদের অন্তরাগ্নি নির্বাণ করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নাব-লাভের আশাতরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না। পূর্ব হইতে সকলই আমি সমুচিতরূপে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, আর এজিদের প্রাণ তোমারই হস্তে সমর্পিত হইল। যেদিন হাসান-হোসেনের মৃত্যু সংবাদ এই নগরে আসিবে, সেই দিন জানিও যে, এজিদ পুনর্জ্জীবিত হইয়া দামেস্করাজভাণ্ডারের অবারিত দ্বার খুলিয়া বসিবে। সংখ্যা করিয়া, কিছু হস্তে তুলিয়া দিবে না; সকলেই যথেচ্ছরূপে যথেচ্ছ পরিমাণ গ্রহণ করিবে; কাহারও আদেশের

অপেক্ষায় থাকিবে না। মারওয়ান! সকল কার্য ও সকল কথাতেই 'যদি' নামে একটি শব্দ আছে। আমি যদি কিছু ভয় করি, তবে ঐ 'যদি' শব্দেই সময়ে সময়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যদি যুদ্ধে পরাস্ত হও, নিরুৎসাহ হইও না, হাসান-হোসেনের বধ সঙ্কল্প হইতে কখনই নিরাশ হইও না, দামেস্কেও ফিরিও না। মদিনার নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকিয়া তোমার চিরবন্ধুর চিরশত্রুর প্রাণসংহার করিতে যত্ন করিও। ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, কিংবা অর্থেই হউক, প্রথমে হাসানের জীবন-প্রদীপ তোমার হস্তে নির্বাণ হওয়ার শুভ-সংবাদ আমি শুনিতে চাই। হাসানের প্রাণবিয়োগজনিত জয়নাবের পুনঃ বৈধব্যব্রত আমি সানন্দ-চিত্তে শুনিতে চাই। আর কি বলিব? তোমার অজানা আর কি আছে?"

সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মারওয়ান বলিতে লগিলেন, "বীরগণ"

তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা সকলেই স্বকর্ণে শুনিলে। আমার আর বলিবার কিছুই নাই। ভ্রাতৃগণ! এখন একবার দামেস্ক-রাজের জয়লাভে আকাশ ফাটাইয়া, জগৎ কাঁপাইয়া, মনের আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে এখনই যাত্রা কর। মারওয়ান ছায়ার ন্যায় তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।"

সৈন্যগণ বীরদর্পে ঘোর নাদে বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ এজিদের জয়! জয় মহারাজ দামেস্করাজের জয়!"

কাড়া, নাকারা, ডঙ্কা, গুড় গুড় শব্দ বাজিয়া যেন বিনামেঘে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অবিরত ধ্বনিত হইতে লাগিল। আজ অকস্মাৎ বিনা মেঘে হৃদয়কম্পন বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীমনাদ শ্রবণে নগরবাসীরা ভয়াকুল চিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গগনে মেঘের সঞ্চার মাত্র নাই, কিন্তু রাজপথ প্রস্তররেণু ও বালুকাকণাতে অন্ধকার; অসংখ্য সেনা রণবাদ্যে মাতিয়া শুভসূচক বিজয় নিশান উড়াইয়া মদিনাভিমুখে চলিয়াছে। নগরবাসীগণের মধ্যে কাহারও মনে ব্যথা লাগিল, কাহারও চক্ষু জলে পুরিল, কেহ কেন এজিদের জয় রব করিয়া আনন্দানুভব করিল।

এজিদ মহোৎসাহে নগরের অন্তঃসীমা পর্যন্ত সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া, মারওয়ান, সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ অলীদের নিকটে বিদায় লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

একাদশ প্রবাহ

মদীনাবাসীরা কিছুদিন এজিদের কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা করিলেন। সর্বসাধারণের অন্তরেই এজিদের পত্রের প্রতি ছত্র, প্রতি অক্ষর, সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় বিঁধিয়াছিল। হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অপমানসূচক কথা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার শাস্তি কোথায় হইবে ঈশ্বর যে কি শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহারা তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। প্রাচীনেরা দিবারাত্র হাসান-হোসেনের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পূর্ণবয়স্কেরা বলিতে লাগিলেন, "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কাহার সাধ্য ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি দৌরাত্ম্য করে? আমরা বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম ইমামের প্রতি অযথা ব্যবহার করিবে, তাহাকে শীঘ্রই নরকের জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে জ্বলিতে হইবে।" নব্য যুবকেরা বলিতে লাগিলেন, "দামেস্কের কাসেদকে একবার

দেখিতে পাইলে মদিনার খাজনা দিয়া বিদায় করিতাম। এত দিতাম যে বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার শক্তি থাকিত না। দেহটি এখানে রাখিয়া শুদ্ধ প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া যাইতে হইত।" স্ত্রী-পুরুষমাত্রই এজিদের নামে শত শত পাদুকাঘাত করিয়াছিলেন। কিছু দিন গত হইল, দামেস্কের আর কোন সংবাদ নাই। এজিদের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল।

মদিনাবাসীরা আপন আপন গৃহে শুইয়া আছেন, নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সহসা নাকারার শব্দ শুনিতে পাইয়া অগ্রে প্রান্তবাসীরা জাগিয়া উঠিলেন। অসময়ে রণবাদ্যের কোন কারণই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রভাত নিকটবর্তী। ইহার সঙ্গে সেই বাজনাও নিকটবর্তী হইতে লাগিল। সূর্যোদয় পর্যন্ত নগরের প্রায় সমস্ত লোকের কানেই সেই তুমুল ঘোর রণবাদ্য প্রবেশ করিয়া দীর্ঘসূত্রিরও নিদ্রাভঙ্গ করিল। অনেকে নগরের বাহির হইয়া দেখিলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্য বীরদর্পে গম্যপথ অন্ধকার করিয়া নগর অভিমুখে আসিতেছে। সূর্যদের সহস্র কিরণ মদিনাবাসীকে নিজমূর্তি দেখাইয়া এজিদের চিহ্নিত পতাকা ও সৈন্যদিগের নূতন সজ্জা দেখাইলেন। সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হাসান-হোসেনকে নির্যাতন এবং তাঁহাদের প্রাণহরণ-মানসে এজিদ সসৈন্য সমরে আসিতেছেন।

আব্দুর রহমান আর বিলম্ব করিলেন না। দ্রুত গমন করিয়া হাসান-হোসেনের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন ; তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া এজিদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। মুহূর্ত মধ্যে মদিনার ঘরে ঘরে জেহাদ-রবের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মোহাম্মদীয়গণ জেহাদের নাম শুনিয়া আহলাদে নাচিয়া উঠিলেন। বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেই শহীদ (ধর্মযুদ্ধে শোণিত পাতে, প্রাণত্যাগে মুক্ত হইব, স্বর্গের দ্বার শহীদদিগের নিমিত্ত সর্বদাই খোলা রহিয়াছে, ধর্মযুদ্ধে বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে রক্ত- প্রবাহে মোহাম্মদীয়গণের সমুদয় পাপ বিধৌত) হইয়া পবিত্রভাবে পুণ্যাত্মা রূপ ধারণে নির্বিচারে যে স্বর্গসুখে সুখী হইবে, ইহা মুসলমান মাত্রেরই অন্তরে জাগিতেছে, অনন্তকাল পর্যন্ত জাগিবে।

মদিনার বালক, বৃদ্ধ, পূর্ণবয়স্ক সকলেই রণবেশে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। নগরবাসীরা হাসান-হোসেনকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ঘোষণা প্রচার হইতেই সহস্রাধিক লোক কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া যাহার যে অস্ত্র আয়ত্ত ছিল, যাহার যে অস্ত্র সংগ্রহ ছিল, যে যাহা নিকটে পাইল, তাহাই লইয়া বেগে শত্রুর উদ্দেশ্যে ধাইয়া চলিল। তদৃষ্টে এজিদের সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইল না ; গমনে ক্ষান্ত দিয়া শিবির নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। নগরবাসীরাও শত্রুপক্ষকে নিরুদ্যম দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না ; নগরেও আর ফিরিলেন না, বৃক্ষমূলে প্রস্তরোপরি স্ব স্ব সুযোগমত স্থান নির্ণয় করিয়া হযরত ইমাম হাসানের অপেক্ষায় রহিলেন। এজিদের সৈন্যগণ বহুমূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা শিবির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ সংবাদ হাসানের নিকট পাঠাইলেন।

হাসান ও আব্দুর রহমান প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যবহারে রওজা মোবারকে যাইয়া হাসান প্রথমেই ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন– "দয়াময় ! আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই। তোমার আজ্ঞানুবর্তী দাসানুদাস আমি। তুমি দয়া করিয়া এ দাসের অন্তরে যে বল দিয়াছ, সেই ধর্মবলেই আমার সাহস এবং উৎসাহ। দয়াময় ! এই বলের বলেই আমি এজিদকে– এক এজিদ কেন, শত শত এজিদকে তোমার

কৃপায় তুচ্ছ জ্ঞান করি। কেবল তোমার নাম ভরসা করিয়াই অসীম শত্রুপথে যাইতেছি। তুমি সহায়, তুমিই রক্ষাকর্তা।" সকলেই "আমিন –আমিন" বলিয়া, পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া, একে একে অশ্বারোহণে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে আপনাকে শত্রুসম্মুখে যাইতে দিব না। এই চলিলাম, পৃষ্ঠে আঘাত লইয়া আর ফিরিব না। আঘাতিত দেহ আর মদিনাবাসীদিগকে দেখাইব না। হয় মারিব, নয় মরিব।"

হাসান অশ্ব হইতে নামিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের কার্যে জীবন শেষ করাই জীবের কর্তব্য। লোকে আমাকে মদিনার রাজা বলে, কিন্তু ভ্রাতৃগণ ! তোমরা তাহা কখনই কর্ণে স্থান দিও না। এ জগতে কেহ কাহারও রাজা নহে, সকলেই সেই মহারাজাধিরাজ সর্বরাজাধিরাজ ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু (একমেবাদ্বিতীয়ম) দয়াময়ের রাজ্যের প্রজা। সকলেই সেই মহান রাজার সৃষ্ট, তাঁহার শক্তি মহান, আমরা সেই রাজার প্রজা। সাধ্যানুসারে সেই সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, মহারাজ্যের ধর্ম রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করাই আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য এবং তাহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই ধর্মরাজ্যের বিরোধী হইয়াও অনেক নরাধম এই অস্থায়ী রাজ্যে বাস করিতেছি। আজ তোমরা যে নরাধমের বিরুদ্ধে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইয়াছ, তাহার ধনবল, সৈন্যদল এত অধিক যে, মনে ধারণা করিতেও শঙ্কা বোধ হয়। যদিও আমাদের অর্থ নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, বাহ্যিক আড়ম্বরও নাই, তথাচ আমাদের একমাত্র ভরসা-সেই অদ্বিতীয় ভগবান। তাঁহার নামই আমাদের আশ্রয়। সেই নাম সহায় করিয়াই আমরা তাঁহার ধর্মরাজ্য রক্ষা করিব। ভ্রাতৃগণ! যে পাপাত্মার সৈন্যগণ এই পবিত্রভূমি আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করিবার আশায় নগর-বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিধর্মী এজিদ মদিনার খাজনা আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি তাহার উত্তর দিই নাই ; সেই আক্রোশে এবং বিবি জয়নাব আমার সহধর্মিনী হইয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ আমার প্রাণবধ করিবে। তাহা হইলে এজিদের উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। কারণ, আমার অভাবে মদিনার সিংহাসন তাহারই অধিকৃত হইবে মনে করিয়াছে। সেই বিধর্মী এজিদ নূরনবী হযরত মোহাম্মদের বিরোধী, ঈশ্বরের বিরোধী, পবিত্র কুরআনের বিরোধী। নরাধম এমনই পাপী যে, ভ্রমে কখনও ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না। ভাই সকল ! আমরা যে রাজ্যে বাস করি, যে রাজা আমাদের সুবিধার জন্য কত উপকরণ, কত সুখসামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, বিনা অর্থে, বিনা প্রত্যুপকারের আশায় যে রাজা অকাতরে কত কি দান করিয়াছেন, আমরা আজ পর্যন্ত সে দানের উদ্দেশ্যের কণামাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সেই অদ্বিতীয় রাজার বিরুদ্ধচারী আজ পূন্য-ভূমি মদিনা আক্রমণ করিতে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে, ধর্মপথে, বাধা দিতে, মূল উদ্দেশ্য আমার জীবন প্রদীপ নির্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে ; মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভু জগৎপিতার নামে কত কলঙ্ক রটাইয়াছে। তিনি মহান তাঁহার মহিমা অপার, তাঁহার ক্রোধ, বিরাগ, দুঃখ, অপমান কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সহ্যগুণবিহীন মানব, আমাদের রিপু সংযম অসাধ্য। যে কেহ ঈশ্বরের বিরোধী, আমরা তাহার বিরোধী। আমরা কি সেই বিরোধীর প্রতিবিধান করিব না ? আমাদের অস্ত্র কি চিরকালই কোষে আবদ্ধ থাকিবে ? বিধর্মীয় মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিষ্কোষিত

হইয়া কাফেরের রক্তে রঞ্জিত হইবে না? ঈশ্বরের প্রাসাদে পরাজয় উভয়ই আমাদের মঙ্গল। যদি তাঁহার কৃপায় বিধর্মীর রক্ত আজ মদিনা-প্রান্তরে বহাইতে পারি, ধর্ম রক্ষা, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বিধর্মীর অস্ত্রে যদি আত্মবিসর্জ্জন হয়, তাহাতেও অক্ষয় স্বর্গলাভ। ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা যে, হয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোহাম্মদীয় ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিব, না হয় অকাতরে রক্তস্রোতে আমাদের এই অস্থায়ী দেহ খণ্ডে খণ্ডে ভাসাইয়া দিব।"

এই পর্যন্ত শুনিয়াই শ্রোতৃগণ সমস্বরে "আল্লাহু আকবর" বলিয়া পাগলের ন্যায় কাফেরের মুণ্ডপাত করিতে ছুটিলেন। হাসান সকলকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইয়া সমরক্ষেত্রে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন ; তাহা আর হইল না, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না।

হাসান-হোসেন এবং আবদুর রহমান পুনরায় অশ্বারোহণে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে হাসান আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। আবদুর রহমানকে বলিলেন, "ভাই ! তুমি যত শীঘ্র পার, হোসেনের সহিত যাইয়া মদিনাবাসীদের পৃষ্ঠপোষক হও। আমি অবলাগণকে সান্ত্বনা করিয়া আসিতেছি। ইহাদের এ বেশ আমার চক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইহাদের হস্তে অস্ত্রভার সহিতে হইল, ভাই ! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ কি ? তোমরা যাও' আমার অপেক্ষা করিও না।"

এই কথা বলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়াই ইমাম হাসান অতি বিনীতভাবে নারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগ্নীগণ। নগরের প্রান্তভাবে মহাশত্রু ! নগরবাসীরা আজ শত্রুবধে উন্মত্ত, জন্মভূমি রক্ষা করিতে মহাব্যস্ত। এই বিপদ সময়ে তোমরা এ বেশে কোথা যাইতেছে ? "

স্ত্রীলোকদিগকের মধ্যে একজন বলিলেন, "হযরত ! আর কোথা যাইবে ? আপনপর এই মহাবিপদকালেও কি আমরা অবলাচারের বাধ্য হইয়া অন্তঃপরেই আবদ্ধ থাকিব? ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী সকলকেই শত্রুমুখে পাঠাইয়াছি, ফিরিয়া আসিতে পাঠাই নাই– একেবারে চিরবিদায় প্রদান করিয়াছি। আর আমাদের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? আপনার জন্য স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা যে পথে যাইবে, আমরাও সেই পথের অনুসরণ করিব; বিপদসময়ে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিব। আর তাহারাই যদি বিধর্মীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া ধর্মরক্ষা ও জন্মভূমি রক্ষা করিতে পারে, তবে আমরাই বা কাফেরের মাথা কাটিতে অস্ত্র গ্রহণ করিব না কেন? নূরনবী হযরত মোহাম্মদের দেহ যে মদিনা এজিদ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে, সেই মদিনা এজিদ অধিকার করিবে? যে মদিনার পবিত্রতা গুণে জগতের চারি খণ্ড হইতে কোটি কোটি ভক্ত কত কষ্ট স্বীকার করিয়া শুদ্ধ একবার রওজা শরীফ দর্শন করিতে আসিতেছে, সেই পবিত্র ভূমি কাফেরের পদস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? এ কথা শুনিয়া কে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে? দুনিয়া কয় দিনের? আরও দেখুন! আমরা অবলা, পরাধীনা, যাহাদের মুখাপেক্ষী তাহারাই যখন অস্ত্রসম্মুখে দাঁড়াইল, তখন আমরা শূন্যদেহ লইয়া কেন আর ঘরে থাকিব?"

আর একটি স্ত্রীলোক কহিলেন, "হযরত! আমরা যে কেবল সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতেই শিখিয়াছি, তাহা মনে করিবেন না; এই হস্ত বিধর্মীর মস্তক চূর্ণ করিতেও

সক্ষম, এই অস্ত্রে কাফেরের মুণ্ডপাত করিতেও জানি। সামান্য রক্তবিন্দু দেখিলেই আমাদের মন কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে বেদনা লাগে, কিন্তু কাফেরের লোহিত তরঙ্গের শোভা দর্শনে আনন্দে ও উৎসাহে মন যেন নাচিতে থাকে।"
বিস্মিত হইয়া হাসান বলিলেন, "আমি আপনাদের অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। আমি বাঁচিয়া থাকিতে বিধর্মীবধে আপনাদিগকে অস্ত্র ধরিতে হইবে না। আমার বংশ বাঁচিয়া থাকিতে আপনাদিগকে এ বেশ পরিতে হইবে না। ভগ্নীগণ! আপনারা ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট ধর্ম ও জন্মভূমি রক্ষার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করুন। আমরা অস্ত্রমুখে দাঁড়াইব। আপনারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাগিদকে রক্ষা করিবেন। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনারা শত্রু-সম্মুখীন হইয়া আমার মনে বেদনা প্রদান করিবেন না।"
প্রথমা স্ত্রী সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার আদেশ প্রতিপালন করিলাম; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, মদিনার একটি অবলার প্রাণ দেহে থাকিতে এজিদ কদাচ নগরের সীমায় আসিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকেরা দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,– "এলাহি! আজ আপনার নামের উপর নির্ভর করিয়া হাসানকে শত্রু-সম্মুখে দিলাম। হাসানের প্রাণ, পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা এবং ধর্ম রক্ষা করিতে ভ্রাতা, পুত্র ও স্বামীহারা হইলে আমরা কাতরা হইব না। এলাহি! স্বামী পুত্র ভ্রাতৃগণ বিধর্মীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলে আমাদের চক্ষে কখনই জল আসিবে না। কিন্তু মদিনা নগর কাফেরের পদস্পৃষ্ট হইলেই আমরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। এলাহি! হাসানের প্রাণ আমাদের প্রার্থনীয়। সে প্রাণরক্ষা হইলেই সকল রক্ষা হইবে। এলাহি! হাসানের প্রাণরক্ষা কর; মদিনার পবিত্রতা রক্ষা কর; নূরনবী হযরত মোহাম্মদের রওজার পবিত্রতা রক্ষা কর।"
এই প্রকারে উপাসনা শেষ করিয়া নগরবাসিনী কামিনিগণ হাসানকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, "এলাহির অনুগ্রহ-কবচ আপনার শরীর রক্ষা করুক। বাহুবলে হযরত আলীর দৃষ্টি হউক। বিবি ফাতেমা খাতুনে-জান্নাত আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। শত্রুবিজয়ী হইয়া আপনি নির্ব্বিঘ্নে নগরে আগমন করুন।
এই আশীর্বাদ করিয়া কামিনিগণ স্ব স্ব নিকেতনে চলিয়া গেলেন। হাসানও বিসমিল্লাহ বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত-মধ্যে নগর প্রান্তে আসিয়া ভীষণতর শব্দ শুনিতে শুনিতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলেন। দেখিলেন যে, বিষম বিক্রমে মদিনাবাসীরা বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধের রীতিনীতির প্রতিও কাহারও লক্ষ্য নাই। কেবল মার মার শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা ও মুহূর্তে মুহূর্তে "আল্লাহু" রবে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে, রণভূমিতে শোণিতের প্রবাহ ছুটিয়াছে। সে অভাবনীয় ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া হাসান নিস্তব্ধভাবে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিলেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন না।
মদিনাবাসীরা শত্রুদিগকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। শত শত বিধর্মীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া শেষে নিজে নিজে "শহীদ" হইতেছে। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছে না, কিছু বলিতেছে না, জিজ্ঞাসাও করিতেছে না। হোসেনের চালিত তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকিতেছে। শত্রুপক্ষীয়েরা যে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে, তাহার উপায় নাই। তবে বহু দূর হইতে যাহারা সেই ঘূর্ণিত তরবারির চাকচিক্য দেখিয়াছিল, কেবল তাহারই কেহ জঙ্গলে, কেহ পর্বতগুহায় লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

হোসেনের অশ্ব শ্বেত বর্ণ; শরীরও শ্বেত বসনে আবৃত। এক্ষণে বিধর্মী বিপক্ষের রক্তে একেবারে তাহা লোহিত বর্ণে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রাংশে আরও অধিক শোভা হইয়াছে। সেই শোভা বিধর্মীর চক্ষে ভীষণভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। অশ্বের পদনিক্ষিপ্ত রক্তমাখা বালুকার উৎক্ষিপ্ততা দেখিয়াই অনেকে ছিন্নদেহের আবরণে লুকাইয়া হোসেনের তরবারি হইতে প্রাণ বাঁচাইতেছে। বামে দক্ষিণে হোসেনের দৃষ্টি নাই। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাকেই নরকে পাঠাইতেছেন।

হাসান অনেকক্ষণ পর্যন্ত এক স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া এই ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। হস্তপদ-খণ্ডিত অগণিত দেহ, শোণিত প্রবাহে ডুবিয়া, কতক অর্ধাংশ ডুবিয়া, রক্তস্রোতে নিম্নস্থানে গড়াইয়া যাইতেছে। মদিনাবাসীদের মুখে কেবল "মার! মার! কোথায় এজিদ? কোথায় মারওয়ান?" এই মাত্র রব। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার ভীষণতর কাতর স্বর হাসানের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীরা প্রথমে বিধর্মীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই; ক্রমে দুই একটির প্রতি দৃষ্টি। হোসেন ও আব্দুর রহমান প্রভৃতিকে দেখিয়াছিলেন, অথচ কেহ কাহারও কোন সন্ধান লন নাই। জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা হইতে লাগিল। যাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছিল, ঈশ্বর-কৃপায় তাহারা আর নেই, প্রায় সকলেই রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমে সকলেই একত্র হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসানেরও দেখা পাইলেন। সকলেই উচ্চৈস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়ধ্বনির সহিত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদের রাসূলুল্লাহ"
ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়ধ্বনির সহিত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদের রাসূলুল্লাহ"
বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন। অনন্তর রক্তমাখা শরীরে, আঘাতিত অঙ্গে, মনের আনন্দে হাসানের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। হাসানও সকলকে আশির্বাদ করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা পথের দুই পার্শ্ব হইতে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতার উপাসনা (শোকরানা) করিয়া বিজয়ী বীরপুরুষগণকে মহানন্দে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। জাতীয় ধর্ম ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বীরগণ বিজয়পতাকা উড়াইয়া গৃহে আসিতেছেন, সে সময়ে "বাগে এরামের" (স্বর্গীয় উপরনের) পুষ্প তাঁহাদের মস্তকে বর্ষণ করিতে পারিলেও আশা মিলিত না। নগরবাসীরা কি করেন, মদিনাজাত যাহা তাঁহাদের পারিজাত পুষ্প, মনের আনন্দে মহা উৎসাহে সেই পুষ্পগুচ্ছ বৃষ্টি করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরগণ একেবারে প্রভু মোহাম্মদের রওজা শরীফে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। শেষে হাসান-হোসেন ও আব্দুর রহমানের নিকট বিদায় লইয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্বক পরিবার-মধ্যে সাদরে গৃহীত হইলেন। মদিনার প্রতি গৃহ, প্রতি দ্বার, প্রতি পল্লী ও প্রতি পথ এককালে আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মদিনাবাসীরা বিজয়-নিশান উড়াইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ-মধ্যে প্রাণের ভয়ে যাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, আর জনপ্রাণী মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র দেহ রক্তমাখা হইয়া বিকৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্বদেহে চাপা পড়িয়াছে, কাহারও খণ্ডিত হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে। শরীরের চিহ্নমাত্র নাই! কোন

শরীরে হস্ত নাই, কাহারও জঙ্গা কাটিয়া কোথায় পড়িয়াছে, অপরাংশ কোন অশ্বের পশ্চাৎপদের সহিত রক্তে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অশ্ব দেহে মনুষ্যমস্তক, মনুষ্যদেহে অশ্বমস্তক সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া হতাবশিষ্ট সেনাগণ কি করিবে, কোন উপায়ই নির্ধারণ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে দুইটি তিনটি করিয়া একত্র হইলেন। পর্বতগুহায় যাঁহারা লুকাইয়াছিলেন তাঁহারাও যুদ্ধক্ষেত্রের নীরব বিস্তব্ধ ভাব বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে বাহির হইলেন। তন্মধ্যে মারওয়ান ও ওৎবে অলীদ উভয়েই ছিলেন। সঙ্গীদিগের এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা কিছুই দুঃখিত হইলেন না। কেবল মারওয়ান বলিলেন, "ভাই আলীদ! মদিনাবাসীর অস্ত্রে এত তেজ, হোসেনের এত পরাক্রম ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, গত বিষয়ের চিন্তায় আর ফল কি? পুনরায় চেষ্টা। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা মনে কর। যে 'যদি' শব্দে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যদি সফল হইল, তবে ইহা তো নতুন ঘটনা নহে। মহারাজের শেষ আজ্ঞা পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যাইব,– জীবন লইয়া আর দামেস্কে যাইব না; এ-মুখ আর দামেস্কবাসীদিগকে দেখাইব না। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিব, পুনরায় হাসান বধে চেষ্টা করিব। মহারাজ এজিদের অভাব কিসের? সৈন্যগণ! তোমরা একজন এখনই দামেস্ক নগরে যাত্রা কর। যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, ভাগ্যবলে মুখে বলিতেও সময় পাইলে, অবিকল মহারাজ-সমীপে এই মহাযুদ্ধের অবস্থা বলিও। আর বলিও যে, মারওয়ান মরে নাই, হাসানের প্রাণ-সংহার না করিয়া সে মদিনা পরিত্যাগ করিবে না। আরও বলিও যে, মহারাজের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই সে এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। যত শীঘ্র হয়, পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া মদিনায় প্রেরণ করুন। আর যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, কিছুই গোপন করিও না, তৎসমস্তই অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিও।" মারওয়ানের আজ্ঞা মাত্র এমরান নামক এক ব্যক্তি দামেস্কে যাত্রা করিলেন। মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরের কোন গুপ্ত স্থানে অলীদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। আর আর সঙ্গীরা নিকটস্থ পর্বতগুহায় মারওয়ানের আদেশক্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ প্রবাহ

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ ও শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। পুনরায় বর্দ্ধিত হইলে আর শেষ করা যায় না। রাত্রি দুই প্রহর। মদিনাবাসীরা সকলেই নিদ্রিত। মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, কতই সন্ধান, কতই গুপ্ত মন্ত্রণা অবধারণ করিতেছেন, কাহারও নিকট মনের কথা ভাঙ্গিতে সাহস পান না। মদিনা তন্ন তন্ন করিয়াও আজ পর্যন্ত মনোমত লোক খুঁজিয়া পান নাই। কেবল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত কথায় কথায় অনেক কথার আলাপ করিয়াছেন, আকার ইঙ্গিতে লোভও দেখাইয়াছেন; কিন্তু কোথায় নিবাস কোথায় অবস্থিতি, তাহার কিছুই বলেন নাই। অথচ বৃদ্ধার বাড়ি-ঘর গোপনভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধানে বৃদ্ধার সাংসারিক অবস্থাও অনেক জানিতে পারিয়াছেন। আজ নিশীথ সময়ে বৃদ্ধার সহিত নগরপ্রান্তে নির্দিষ্ট পর্বতগুহার নিকট দেখা হইবে, এরূপ কথা স্থির আছে। মারওয়ান নিয়মিত সময়ের পূর্বে বৃদ্ধার বাড়ির নিকটে গোপনভাবে যাইয়া সমুদয় অবস্থা জানিয়া আসিতেছেন যে, বৃদ্ধার কথায় কোনরূপ সন্দেহ আছে কি না। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া

শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই গিরিগুহার নিকট যাইয়া বৃদ্ধার অপেক্ষায় থাকিবেন।

সেই স্ত্রীলোকের নাম মায়মুনা। মায়মুনার কেশপাশ শুভ্র বলিয়াই লেখক তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মায়মুনা বাস্তবিক বৃদ্ধা নহে। মারওয়ান চলিয়া গেলে, তাহার কিছুক্ষণ পরেই একটি স্ত্রীলোক স্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতে করিতে রাজপথ দিয়া যাইতেছেন; আবরু অনাবৃত। ক্ষণে ক্ষণে আকাশে লক্ষ্য করিয়া সেই স্ত্রীলোক চন্দ্র ও 'আদম সুরাতের' (নরাকার নক্ষত্রের) প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার আর কোন অর্থ নাই, বোধ হয়, নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা। অর্থলোভে পাপকার্যে রত হইবে, তাহাই আলোচনা করিয়া অন্যমনস্কে যাইতেছে! তারাদল এক একবার চক্ষু বুঁজিয়া ইঙ্গিতে যেন তাহাকে নিষেধ করিতেছে। প্রকৃতি স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেও যেন "না – না" শব্দে বারণ করিতেছে। মায়মুনার কর্ণ টাকার সংখ্যা শুনিতে ব্যস্ত। সে বারণ শুনিবে কেন? মন সেই নির্দিষ্ট পর্বত গুহার নিকট; এসকল নিবারণের প্রতি সে মন কি আকৃষ্ট হইতে পারে? নগরের বাহির হইয়া একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

নির্দিষ্ট গিরিগুহার নিকটে মারওয়ান অপেক্ষা করিতেছিলেন, মায়মুনাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইল। উভয়ে একত্র হইলেন, কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

মায়মুনা বলিল, "আপনার কথাবার্তারভাবে আমি অনেক জানিতে পারিয়াছি। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে একটি কথা আগে বলি।"

মারওয়ান কহিলেন, "তোমাকে বিশ্বাস না করিলে মনের কথা ভাঙ্গিব কেন? তোমার কথাক্রমে এই নিশীথসময়ে জনশূন্য পর্বতগুহার নিকটেই বা আসিব কেন? তোমার যাহা ইচ্ছা, বল।"

মায়মুনা কহিল, "কার্য-শেষ করিলে তো দিবেনই, কিন্তু অগ্রে কিছু দিতে হইবে। দেখুন, অর্থই সকল। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আপনার এই কার্যটা সহজ নহে। কত দিনের যে শেষ করিতে পারিব, তাহার ঠিক নাই। এই কার্যের জন্যই আমাকে সর্বদা চিন্তিত থাকিতে হইবে। জীবিকা-নির্বাহের জন্য অন্য উপায়ে একেবারে হস্তসঙ্কোচ করিতে হইবে। দিবারাত্রি কেবল এই মন্ত্রণা, এই কথা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। আপনিই বিবেচনা করুন, ইহার কোন্‌টি অযথার্থ বলিলাম।"

কথার ভাব বুঝিয়া কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মায়মুনার হস্তে দিয়া মারওয়ান বলিলেন, "যদি কৃতকার্য হইতে পার, সহস্র সুবর্ণ মোহর তোমার জন্য ধরা রহিল।"

মোহরগুলি রুমালে বাঁধিয়া মায়মুনা বলিল, "দেখুন! যার দুই তিনটি স্ত্রী, তাহার প্রাণবধ করিতে কতক্ষণ লাগে? সে তো 'আজরাইল'কে (যমদূতকে) সর্বদা নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রাণরক্ষা হওয়াই আশ্চর্য, মরণ আশ্চর্য নয়।"

মারওয়ান কহিলেন, "তাহা নয় বটে, কিন্তু লোকটি আবার কেমন! যেমন লোক স্ত্রীরাও তেমনি। দুই তিনটি স্ত্রী হওয়ায় আর ভয়ের কারণ কি?"

মায়মুনা কহিল "ও কথা বলিবেন না। পয়গম্বরই হউন, ইমামই হউন, ধার্মিক পুরুষই হউন, আর রাজাই হউন, এক প্রাণ কয়জনকে দেওয়া যায়? ভাগী জুটিলেই নানা কথা, নানা গোলযোগ। সপত্নীবাদ না আছে, এমন স্ত্রী জগতে জন্মে নাই। সপত্নীর মনে ব্যথা

দিতে কোন সপত্নীর ইচ্ছা নাই? আমি সে কথা এখন কিছু বলিব না; আপনার প্রতিজ্ঞা যেন ঠিক থাকে।"

মারওয়ান বলিলেন, "এখানে তুমি আর আমি ভিন্ন কেহই নাই,– এ প্রতিজ্ঞার সাক্ষী কাহাকে করি? ঐ অনন্ত আকাশ ঐ অসংখ্য তারকারাজি, ঐ পূর্ণচন্দ্র, এই গিরিগুহা আর এই রজনী দেবীকেই সাক্ষী রাখিলাম; হাসানের প্রাণবধ করিতে পারিলেই আমি তোমাকে সহস্র মোহর পুরস্কার দিব। তৎসম্বন্ধে তুমি যখন যাহা বলিবে, সকলই আমি প্রতিপালন করিব। আর একটি কথা। এই বিষয় তুমি আমি ভিন্ন আর কেহই জানিতে না পারে?"

মায়মুনা বলিল, "আমি এ কথায় সম্মত হইতে পারি না। কেহ জানিতে না পারিলে কার্য উদ্ধার হইবে কি প্রকারে? তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আসল কথাটি আর এক জনের কর্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় জনের কর্ণে প্রবেশ করিবে না।"

"সে তোমার বিশ্বাস। কার্য উদ্ধারের জন্য যদি কাহারও নিকট কিছু বলিতে হয় বলিও; কিন্তু তানজিন ভিন্ন আর একটি প্রাণীও যেন জানিতে না পারে।"

মায়মুনা বলিল, "হযরত! আমাকে নিতান্ত সামান্য স্ত্রীলোক মনে করিবেন না। দেখুন, রাজমন্ত্রীরা রাজ্য রক্ষা করে, যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধির মন্ত্রণা দেয়, নির্জ্জনে বসিয়া কত প্রকারে বুদ্ধির চালনা করে। আমার এ কার্য সেই রাজকার্যের অপেক্ষা কম নহে। যেখানে অস্ত্রের বল নাই, মহাবীরের বীরত্ব নাই, সাহস নাই, সাধ্য নাই, সেইখানেই এই মায়মুনা শত অর্গলযুক্ত দ্বারও অতি সহজে খুলিয়া থাকে। যেখানে বায়ুর গতিবিধি নাই, সেখানেও আমি অনায়াসে গমন করি। যে যোদ্ধার অন্তর পাষাণে গঠিত, তাহার মন গলাইয়া মোমে পরিণত করিতে পারি। যে কুলবধু সূর্যের মুখ কখনও দেখে নাই, চেষ্টা করিলে তাহার সঙ্গেও দুটা কথা কহিয়া আসিতে পারি। নিশ্চয় জানিবেন, পাপশূন্য দেহ নাই, লোকশূন্য জগৎ নাই। যেখানে যাহা খুঁজিবেন, সেইখানেই তাহা পাইবেন।"

মারওয়ান কহিলেন, "মুখে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকে, কার্যে তাহার অর্ধেক পরিমাণ সিদ্ধ হইলেও জগতে অসুখের কারণ থাকিত না, অভাবের নামও কেহ মুখে আনিত না। তোমার কথাও রহিল, আমার কথাও থাকিল। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঐ দেখ শুকতারা পূর্ব গগনে দেখা গিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র নগর-মধ্যে যাওয়াই উচিত। আমি তোমার বাড়ির সন্ধান লইয়াছি। আবশ্যক মত যাইব এবং গুপ্ত পরামর্শ আবশ্যক হইলে নিশীথ সময়ে উভয়ে এই গিরিগুহার সন্নিকটে আসিয়া সমুদয় কথাবার্তা কহিব ও শুনিব।

এই বলিয়া মারওয়ান বিদায় হইলেন। মায়মুনাও বাড়িতে গেল। গৃহমধ্যে শয্যার উপর বসিয়া মোহরগুলি দীপালোকে এক এক করিয়া গণিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক আপনা আপনি বলিতে লাগিল,–

"হাসান আমার কে? হাসানকে মারিতে আর আমার দুঃখ কি? আর ইহাও এক কথা, আমি তো নিজে মারিব না; আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমার পাপ কি?" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মায়মুনা শয়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নগরস্থ উপাসনামন্দিরে প্রভাতীয় উপাসনার জন্য ভক্তবৃন্দ সুস্বরে আহ্বান করিতেছে। "নিদ্রাপেক্ষা ধর্মালোচনা অতি উৎকৃষ্ট" আরব্য ভাষায় এ কথার ঘোষণা করিতেছে। ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিল। নিত্যক্রিয়াদি সমাধা করিবার পর

সকলের মুখেই শত সহস্র প্রকারে ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি যুবতী সকলেই ঈশ্বরের গুণগান করিয়া বিশ্রামদায়িনী বিভাবরীকে বিদায় দান করিলেন। সকলেই যেন ঈশ্বরের নামে তৎপর, ঈশ্বরের প্রেমে উৎসাহী।

মদিনাবাসী মাত্রেই ঈশ্বরের উপাসনায় ব্যতিব্যস্ত; কেবল মায়মুনা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এই মাত্র শয়ন করিয়াছে, উপাসনার সময়ে উঠতে পারে নাই। নিদ্রাভঙ্গের পরেই তাহাকে যে ভয়ানক পাপকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে,–যে সাংঘাতিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা ভাবিলে হৃদয় শুষ্ক হয়। অর্থলোভে পুণ্যাত্মা হাসানের প্রাণবিনাশে হস্ত প্রসারণ করিবে! ওঃ! পাষাণীর প্রাণ কি পাষান অপেক্ষাও কঠিন! নিরপরাধে পবিত্র দেহের সংহার করিবে, এ পাপ কি একটুও তাহার মনে হইতেছে না? অকাতরে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। কি আশ্চর্য! রমণীর প্রাণ কি এতই কঠিন হইতে পারে?

মায়মুনা নিদ্রিত অবস্থাতেই শয্যোপরিস্থ উপাধান চাপিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে বলিতে লাগিল, "আমি নহি, আমি নহি! মারওয়ান;– এজিদের প্রধান উজীর মারওয়ান।" দুই তিনবার মারওয়ানের নাম করিয়া মায়মুনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রিত অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কি কারণে ভয় পাইয়াছিল, কি কষ্টে পড়িয়াছিল, কে কি বলিল, মায়মুনার মনই তাহা জানে। মায়মুনা নিস্তব্ধ অবস্থায় শয্যোপরি বসিয়া রহিল। একদৃষ্টে কি দেখিল, কি ভাবিল, নিজেই জানিল; শেষে বলিয়া উঠিল, স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা। বুদ্ধিহীন মূর্খেরাই স্বপ্ন বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাই আমার কপালে থাকুক, আমি স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, সে ভয়ে হাজার মোহরের লোভ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এ কি কম কথা!– একটা নয়, দুইটা নয় দশ শত মোহর! প্রস্তরাঘাতে মারিবে!- যে দিবে সেই মরিবে! এ কি কথা!- এই বলিয়াই অন্য গৃহে গমন করিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে নূতন আকারে নূতন বেশে গৃহ হইতে বর্হিগত হইল। মায়মুনা এখন ধীরা, নম্রস্বভাবা, সর্বাঙ্গে 'বোরকা'* । বোরকা ব্যবহার না করিয়া স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমন করিলে রাজবিধি অনুসারে দণ্ডণীয় হইতে হয়। সেই জন্য মায়মুনা বোরকা ব্যবহার করিয়া বর্হিগত হইল।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

মায়মুনা আজ কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে বর্হিগত,– কোথায় যাইতেছে, তাহা পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। মায়মুনা ইমাম হাসানের অন্তঃপুরে প্রায়ই যাতায়াত করিত। হাসানেবানুর নিকট তাহার আদর ছিল না। হাসনেবানুকে দেখিলেই সে ভয়ে জড়সড় হইত। জয়নাবের নিকটেও কয়েক দিন চক্ষের জল ফেলিয়া সপত্নীর নিন্দাবাদ করিয়াছিল। হাসনেবানু থাকিতে কাহারও সুখ নাই, এই প্রকার আরও দুই একটা মনভাঙ্গন-মন্ত্র আওড়াইতেছিল। কিন্তু তাহাতে সুফল ফলে নাই। বরং যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে জয়নাবের নিকট চক্ষের জল ফেলিতে আর সাহস করিত না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে জয়নাবের নিকটে আর যাইতও না। জাএদার সহিতই তাহার পুরাতন ভালবাসা। জাএদার সঙ্গেই বেশি আলাপ, বেশি কথা, বেশি কান্না; মায়মুনাকে পাইলেই

---

* আপাত মস্তক আবরণ-বসন।

জাএদা মনের কপাট খুলিয়া বসিতেন। পূর্ব কথা, জয়নাব আসিবার পূর্বে হাসানের ভালবাসা, হাসানের আদর-যত্ন, আর এখনকার অবস্থা বলিতে বলিতে জাএদা দুই এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিতেন, মায়মুনাও সেই কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইত। জাএদা ভাবিয়াছিলেন, মদিনার মধ্যে যদি কেহ দুঃখিত হয়, তবে সে মায়মুনা। দুইটা মুখের কথা কহিয়া সান্ত্বনা করিবার যদি কেহ থাকে, তবে সে মায়মুনা! কোনরূপ উপকারের আশা থাকিলেও সে মায়মুনা। মায়মুনা ভিন্ন সে সময়ে আপন বলিতে আর কাহাকেও চক্ষে দেখেন নাই। মায়মুনাকে দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়মুনা! এ কয়েক দিন দেখি নাই কেন?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "তোমার কাজ না করিয়া কেবল যাওয়া আসায় লাভ কি? তুমি তো বলিয়াই মনের ভার পাতলা করিয়াছ; এখন ভোগ আমার, কষ্ট আমার, মেহনত আমার। তা বোন! তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়, দীন-দুনিয়ার খারাবী হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি যাহাতে হয়, আমি তোমার উপকার করিবই করিব। আমি ভুলি নাই।"

জাএদা কহিলেন, "সে সকল কথা আর আমার মনে নাই। পাগলের মত একদিন কি বলিয়াছিলাম, তুমি তাই মনে করিয়া রাখিয়াছ; যাক, ও কথা যাক, ও তুমি আর কখনই মনে করিও না; কোন চেষ্টা করিও না। আমার মাথা খাও, আর ও কথা মুখেও আনিও না। কৌশলে স্বামী-বশ, মন্ত্রের গুণে স্বামীর মন ফিরান, মন্ত্রে ভালবাসা, ঔষধের গুণে স্বামী বশে আনা, –এ সকল বড় লজ্জার কথা। স্বাভাবিক মনে যে আমার হইল না, তাহার জন্য আর কেন? সকলই অদৃষ্টের লেখা। আমি যত্ন করিলে আর কি হইবে; জয়নাবকে মারিয়াই বা কেন পাপের বোঝা মাথায় করিব? ঈশ্বর তাহাকে স্বামীসোহাগিনী করিয়াছেন, তাহাতে যে বাধা দিবে, সেই অধঃপাতে যাইবে। আমি সমুদয় বুঝিয়া একেবারে নিরস্ত হইয়াছি। যে আমার হইল না, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইল না, তাঁহাকে ঔষধে বশ করিয়া লাভ কি বোন! সে বশ কয় দিনের? সে ভালবাসা কয় মুহূর্তের? যদি মন্ত্রের গুণ থাকে, যদি ঔষধের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও সে কি আর যথার্থ ভালবাসার মত হয়? ধরে বেঁধে আর মনের ইচ্ছায় যে কত প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পার। মানিলাম, ঔষধে মন ফিরাইবে, নূতন ভালবাসার সহিত শত্রুভাব জন্মাইয়া দিবে; কিন্তু আমাকে যে ভালবাসিবে, তাহার ঔষধ কি? তাহাও যেন হইল, কারণ আমি হাতে করিয়া খাওয়াইব, আমাকেই ভালবাসার ভার সহিতে হইবে; কিন্তু ঔষধ তো আর চিরকাল পেটে থাকবে না। ক্রমে ঔষধের গুণ কমিতে থাকবে, ভালবাসাও কমিতে থাকবে; শেষে আবার যে সেই- বরং বেশীরই বেশী সম্ভাবনা।

ব্যঙ্গচ্ছলে মায়মুনা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপোষ হইয়াছে, না ভাগ-বন্টন বিলি-ব্যবস্থা করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছ"– কিংবা মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে?"

জাএদা উত্তর করিলেন, "ভাগ-বন্টন করি নাই, আপোষও করি নাই, মিটমাটও করি নাই, এ জীবনে তাহা হইবেও না; জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবেও না। মনের খেদে আর কি করি বোন! দেখে শুনে একেবারে আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছি, স্বামীর নাম আর করিব না, স্বামীর কথাও আর মুখে আনিব না।

যাহাদের স্বামী, যাহাদের ঘরকন্না, তাহারাই থাকুক– তাহারাই সুখভোগ করুক। জাএদা আজিও যে ভিখারিণী, কালিও সেই ভিখারণী।"

মায়মুনা কহিল, "এত উদাস হইও না। যাহা কর, বুদ্ধি স্থির করিয়া আগুপাছু বিবেচনা করিও। তোমার শত্রু অনেক, মিত্রও অনেক। মনে করিলে তুমি রাজরাণী, আবার মনে করিলে তুমি পথের ভিখারিণী! আবার বোন! আমি ত দেখিতেছি, বড় ইমাম যে চক্ষে জয়নাবকে দেখেন, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার সেই চক্ষে হাসনেবানুকেও দেখিয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তো ভিন্ন ভাব দেখিতে পাই না। শুনিতে পাই, জয়নাবকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, কিন্তু কৈ? আমি তো তাহার কিছুই দেখিতে পাই না; বরং দেখিতে পাই, তোমার প্রতিই তাঁহার টান অধিক।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া জাএদা কহিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? প্রকাশ্যে কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাও না, তাহা ঠিক। ভিতরে যে কি আছে, তাহা কে বুঝিবে? লোকের নিন্দা, ধর্মের ভয়, কাহার না আছে? বিশেষতঃ ইহারা ইমাম। প্রকাশ্যে সকল স্ত্রীকে সমান দেখেন। কিন্তু দেখাও অনেক প্রকার আছে। ধর্মরক্ষা, লোকের মনে প্রবোধ, আমাদের মন বুঝান অনায়াসেই হয়; কিন্তু উহার মধ্যে যে একটু গুহ্য ভাব আছে তাহা আমি মুখে বলিতে পারি না। উপমার কোন সামগ্রী সম্মুখেও নাই যে, তাহা দেখাইয়া তোমাকে বুঝাইব। এখন তিনি কথা কহেন, কিন্তু পূর্বকার সে স্বর নাই, মিষ্টতাও নাই। ভালবাসেন, কিন্তু তাহাতে রস নাই। আদর করেন, কিন্তু সে আদরে মন গলে না, বরং বিরক্তিই জন্মে। আগে জাএদার নিকট সময়ের দীর্ঘতা আশা করিতেন; এখন যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহাই ইচ্ছা পূর্বে কথাবার্তাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তবুও সে কথার ইতি হয় নাই,– মনের কথাও ফুরায় নাই; এখন জাএদার শয্যায় শয়ন করিলে ডাকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হয়। প্রভাতী উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। উষাকালে একত্র শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু উপাসনার ব্যাঘাত নাই। ঘরের কথা, মনের কথা, কে বুঝিবে বল দেখি? আমার দুঃখ অপরে কি বুঝিবে, বল দেখি? কাহাকেই বা বলিব? জগতে আমার, – আমার বলিবার কেহই নাই। মনে কোন আশাও নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র মরণ হইলেই আমি নিস্তার পাই।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা বলিতে লাগিল, "জাএদা" তুমি কেন মরিতে চাও? তুমি কেন মরিতে চাও? তুমি মনে করিলে কি না করিতে পার? ইচ্ছা করিলেই তোমার দুঃখ দূর হয়; তুমি মনে করিলেই তোমার শত্রুর মুখে ছাই পড়ে। আমি তো আগেই বলিয়াছি, তোমার মনই সকল। মনে করিলেই ভিখারিণী!"

জাএদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করিলেই যদি মনের দুঃখ যায়, তবে জগতে কে না মনে করে?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "আমি তো আর দশ টাকা লাভের জন্য তোমার মনোমত কথা বলিতেছি না। যাহা বলি, মন ঠিক করিয়া একবার মনে কর দেখি, তোমার মনের দুঃখ কোথায় থাকে?"

জাএদা কহিলেন, "তোমার কোন কথাটা আমি মনের সহিত শুনি নাই, মায়মুনা? তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। যাহা বলিবে, তাহার অন্যথা কিছুতেই করিব না।"

মায়মুনা কহিল, "যদি মনে না লাগে, তবে করিও না। কিন্তু মন হইতে কখনই মুখে আনিতে পারিবে না। ধর্ম সাক্ষী করিয়া আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, এখনই বলিতেছি।"

জাএদা কহিলেন, "প্রতিজ্ঞা আর কি, তোমারই মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি, যাহা বলিবে, তাহাই করিব; সে কথা কাহারও নিকট ভাঙ্গিব না।"

উত্তম সুযোগ পাইয়া মায়মুনা অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক মনের কথা বলিল। জাএদাও মনোনিবেশপূর্বক শুনিতে শুনিতে শেষের একটি কথায় চমকিয়া উঠিলেন, চমকিতভাবে একদৃষ্টে মায়মুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে থতমত খাইয়া বলিলেন, "শেষের কার্যটি জাএদার প্রাণ থাকিতে হইবে না। এই দুঃখে যদি মরিয়াও যাই, আরও শত শত প্রকার দুঃখ যদি ভোগ করি, সপত্নী-বিষম-বিষে আরও যদি জর্জরিত হই, পরমায়ুর শেষ পর্যন্তও যদি এই দুঃখের সীমা না হয়, তথাপি উহা পারিব না। আমার স্বামী আর আমি-আমার প্রাণের প্রাণ-কলিজার টুকরা আর আমি-"

শেষ কথাটি শেষ করিতে না দিয়েই মায়মুনা কহিল, "শেষের কার্যটি না করিলে কোন কার্যই সিদ্ধ হইবে না। কথাটি আগে ভাল করিয়া বিবেচনা কর, তাহার পর যাহা বলিতে হয়- বলিও। যে রাজরাণী জয়নাব হইত, সেই রাজরাণী,- আবার প্রথমেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার। সকলই সুখের জন্য। জগতে যদি চিরকালই দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হয়, তবে মনুষ্যকুলে জন্মলাভে কি ফল? এমন সুযোগ কি আর হইবে? এ সময় কি চিরকালই এমনি থাকিবে? সময়ে সুযোগ পাইলে হাতের ধন পায়ে ঠেলিতে নাই। তোমার ভাগ্যে আছে বলিয়াই জয়নাব তোমার সপত্নী হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়াও কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার কথা কয়েকটি বড় মূল্যবান। ইহার এক একটি করিয়া সফল করিতে না পারিলে পরিশ্রম, যত্ন সকলই বৃথা। এক একটি কার্যের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অন্যটা সাধিত হইতে পারে না। এ পুরী মধ্যে তোমার কে আছে? বলতো, তোমাকে আপন বলিয়া কে আদর করে! তুমিই না বলিয়াছ, সকলই আছে, অথচ তাহার মাঝে কি যেন নাই। তাহা আমি মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোমার মনই তাহার প্রমাণ। আজি আমি আর বেশি কিছু বলিব না।" এই বলিয়া মায়মুনা জাএদার নিকট হইতে বিদায় হইল।

জাএদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেও স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। পুনরায় নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। এক দিকে রাজভোগের লোভ, অপর দিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুইটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। যদি জাএদা হাসানের পত্নী না হইতেন, যদি জাএদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন তবে কি আজ জাএদা বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি-সুখ সমুদয় এক দিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ-ভিন্ন দিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন? কখনই নহে। কতবার পরিবর্তন করিলেন, দুরাশা পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখ-ভার চাপাইয়া দিবেন, তথাচ স্বামীর প্রাণের দিকেই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদণ্ডের যে দিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিক একেবারে লঘু উচ্চে উঠিল। হঠাৎ এক দিকের লঘুতাপ্রযুক্ত রাজ্যভোগে, ধনলাভস্পৃহা-পরিমাণ একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জাএদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বিবেচনা-তুলাদণ্ড স্বামীর প্রাণের দিকে আর নিচে নামাইতে পারিলেন না। মায়মুনার শেষ কথাটাও মনে পড়িল। "তোমার কেহ নাই, তুমি কাহারও নও।" "এ সংসারে আমার কেহ নাই, আমি কাহারও নহি," বলিতে বলিতে জাএদা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন "আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।

জাএদাই যদি বঞ্চিত হইল, জাএদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল, তবে তাহার চক্ষের উপর জয়নাব সুখভোগ করিবে, তাহা কখনই হইবে না। প্রথম শক্রর প্রতিহিংসা, শক্রর মনে ব্যথা দেওয়া, পরিণামে একের অভাব বটে, কিন্তু মনের এ অর্থের সুখ অসীম। আমার উভয় পক্ষেই সুখ। মায়মুনার কথার কেন অবাধ্য হইবে?"
জাএদা মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বোরকা পরিধানপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্দশ প্রবাহ

স্ত্রীলোক মাত্রেই বোরকা ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছস্থানে বেড়াইতে পারে। ভারতের ন্যায় তথায় পাল্কী বেহারা নাই। লক্ষপতি হউক, রাজ-ললনাই হউন, ভদ্রমহিলাই হউন, বোরকা ব্যবহারে যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দূরদেশে যাইতে হইলে উষ্ট্রের বা অশ্বের আশ্রয় লইতে হয়।
মায়মুনার গৃহ বেশী দূর নহে। জাএদা মায়মুনার গৃহে উপস্থিত হইয়া বোরকা মোচনপূর্বক তাহার শয়ন-কক্ষে যাইয়া বসিলেন। মায়মুনাও নিকটে আসিলেন। আজ জাএদা মনের কথা অকপটে ভাঙ্গিলেন। কথায় কথায় ছলনায়, কথায় ভর দিয়া, কথা কাটাইয়া, কথায় ফাঁক দিয়া, কথায় পোষকতা করিয়া, কথায় বিপক্ষতা করিয়া, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল দিকে যাইয়া আজ মায়মুনা জাএদার মনের কথা পাইল। মায়মুনার মোহমন্ত্রে জাএদা যেন উন্মাদিনী।
সপত্নীনাগিনীর বিষদন্তে যে অবলা একবার দংশিত হইয়াছে, তাহার মন ফিরিতে কতক্ষণ? চিরভালবাসা, চিরপ্রণয়ী পতিত মমতা বিসর্জ্জন করিতে তাহার দুঃখ কি? এক প্রাণ, এক আত্মা, স্বামীই সকল একথা প্রায় স্ত্রীরই মনে আছে, স্ত্রীরই মনে থাকে, কিন্তু সপত্নীর নাম শুনিলেই মনের আগুন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণভাবে জ্বলিয়া উঠে। সে আগুন বাহির হইবার পথ পায় না বলিয়াই অন্তরস্থ ভালবাসা, প্রণয়, মায়ামমতা একেবারে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে।
মায়মুনার সমুদয় কথাতেই জাএদা সম্মত হইলেন। মায়মুনা মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "বোন! এত দিনে যে বুঝিয়াছ, সেই ভাল। আর বিলম্ব নাই, কোন সময়ে কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, কে বলিতে পারে? যত বিলম্ব হইবে ততই তোমার অমঙ্গলের ভাগ বেশি হইবে। যাহা করিতে বসিলে, তাহার উপর আর কথা কি আছে? শুভ-কার্যে আর বিলম্ব কেন? ধর, এই ঔষধ নেও।"
এই বলিয়া মায়মুনা শয্যার পার্শ্ব হইতে খর্জ্জুরপত্র-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পাত্র বাহির করিল। তন্মধ্যে হইতে অতি ক্ষুদ্র একটি কৌটা জাএদার হস্তে দিয়া বলিল, "বোন! খুব সাবধান; এই কৌটাটি গোপনে লইয়া যাও, সুযোগমত ব্যবহার করিও, মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে; এই কৌটার গুণে তুমি সকলই পাইবে। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে।"
জাএদা কহিলেন, "মায়মুনা! তোমার উপদেশেই আমি সকল মায়া পরিত্যাগ করিলাম। জয়নাবের সুখস্বপ্ন আজ ভাঙ্গিব, জয়নাবের অঙ্গের আভরণ আজ অঙ্গ হইতে খসাইব,

সেই আশাতেই সকল স্বীকার করিলাম। আমার দশার দিকে ফিরিয়াও চাহিলাম না। জয়নাবের যে দশা ঘটিবে, আমারও সেই দশা। ইহা জানিয়াও কেবল সপত্নীর মনে কষ্ট দিতে, স্বামী বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখ বোন, আমায় আকুল-সাগরে ভাসাইও না। আমার সর্বনাশ করিতে আমিই তো দাঁড়াইলাম, তাহাতে দুঃখ নাই। জয়নাবের সর্বনাশ করিতে আমার সর্বনাশ এখন সর্বমঙ্গল, ইহাও সর্বসুখ মনে করিতেছি। কিন্তু বোন! তুমি আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিও না।"

ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিয়া জাএদা বিদায় হইলেন। মায়মুনাও গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইল।

জাএদা গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে হস্ত কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু মায়মুনার উপদেশক্রমে সে ভয় বেশীক্ষণ রহিল না। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সেই কৌটার বস্তু মিশাইবেন, ইহাই মায়মুনার উপদেশ। সে সময় আর কিছু পাইলেন না, একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মধু ছিল, তাহাতেই সেই বস্তুর কিঞ্চিৎ মাত্র মিশাইয়া রাখিলেন। কৌটাটিও অতি যত্নে সংগোপনে রাখিয়া দিলেন।

হযরত হাসান প্রতিদিনই একবার জাএদার গৃহে আসিয়া দুই এক দণ্ড নানা প্রকার আলাপ করিতেন। কয়েকদিন আসিবার সময় পান নাই, সেই দিন মহাব্যস্ত জাএদার ঘরে আসিয়া বসিলেন। জাএদা পূর্বমত স্বামীর পদসেবা করিয়া ব্যস্তসমস্তে জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

হাসান ভাবিয়াছিলেন, জাএদার ঘরে কয়েক দিন যাই নাই, না জানি জাএদা আজ কতই অভিমান করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। জাএদা পূর্বাপেক্ষা শতগুণে সরলতা শিখিয়াছে, মানসের পূর্ণ আনন্দে পরিপুরিত রহিয়াছে। এই ভাব দেখিয়া হাসান আজ জাএদা-গৃহেই বাস করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। জাএদাও নানা প্রকার হাবভাব প্রদর্শনে স্বামীর মন হরণ করিয়া প্রাণ হরণ করিতে বসিলেন।

ঈশ্বরভক্তই হউন, মহামহিম ধার্মিক-প্রবরই হউন, মহাবলশীল বীরপুরুষই হউন, কি মহাপ্রাজ্ঞ সুপণ্ডিতই হউন, স্ত্রীজাতির মায়াজাল ভেদ করা বড়ই কঠিন। নারীবুদ্ধির অন্ত পাওয়া সহজ নহে। জাএদা এক পাত্রে মধু ও অন্য পাত্রে জল আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন।

সকৌতুকে হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে মধু?"

মায়াপূর্ণ আঁখিতে হাসানের দিক একবার তাকাইয়া জাএদা উত্তর করিলেন, "আপনার জন্য আজ আট দিন এই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। পান করিয়া দেখুন, খুব ভাল মধু।"

মধুর পেয়ালা হস্তে তুলিয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আমার জন্য আট দিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছ, ধন্য তোমার যত্ন ও মায়া; আমি এখনই খাইতেছি।" হাসান সহর্ষে এই কথা বলিয়া মধুর পাত্র হস্তে তুলিয়া মধু পান করিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই বিষের কার্য আরম্ভ হইল। শরীরের অবস্থার পরিবর্তন ও চিত্তের অস্থিরতাপ্রযুক্ত পিপাসার আধিক্য হইল। ক্রমে কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল, চক্ষু লোহিতবর্ণ হইয়া শেষে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তিনি যেন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জাএদাকে বলিলেন, "জাএদা" এ কি হইল? এ কেমন মধু? এত জল পান করিলাম, পিপাসার

শান্তি হইল না। ক্রমেই শরীর অবশ হইতেছে, পেটের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? কিসে কি হইল?"

জাএদা বায়ুব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মস্তকে শীতল জল ঢালিতে লাগিলেন, কিছুতেই হাসান সুস্থির হইলেন না। ক্রমেই শরীরের জ্বালা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সামান্য শয্যার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পেটের বেদনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি। হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া অবশেষে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, জাএদা! এ কিসের মধু? মধুতে এত আগুন? মধুর এমন জ্বালা? উঃ! আর সহ্য হয় না! আমার প্রাণ গেল! জাএদা! উঃ আর আমি সহ্য করিতে পারি না।"

জাএদা যেন অবাক। মুখে কথা নাই। অনেকক্ষণ পরে কেবল মাত্র এই কথা "সকলই আমার কপালের দোষ। মধুতে এমন হইবে তাহা কে জানে? দেখি দেখি, আমিও একটু খাইয়া দেখি।"

হাসান সেই অবস্থাতেই নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জাএদা, আমার কথা রাখ। ও মধু তুমি খাইও না। আমার মাথা খাও, ও মধু মুখে দিও না। ছুঁইও না। জাএদা! ও মধু নয়, কখনই ও মধু নয়। তুমি-খোদার দোহাই, ও মধু তুমি ছুঁইও না। আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা আমিই জানি। জাএদা ঈশ্বরের নাম কর।"

পত্নীকে এই কথা বলিয়াই হাসান ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। কাহাকেও সংবাদ দিলেন না। জাএদার ঘরেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন। পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র মুখেই দয়াময়ের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিষের বিষম যাতনা নামের গুণে কতক পরিমাণে অল্প বোধ হইতে লাগিল। জাএদা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা-শুশ্রুষা করিলেন। প্রভাতী উপাসনার সময়ে হাসান অতি কষ্টে জাএদার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যাঁহার কৃপাবলে অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পর্বত সাগরে মিশিয়াছে, বিজন বন নগরে পরিণত হইতেছে, জনপূর্ণ মহানগরী নিবিড় অরণ্য হইয়া যাইতেছে, সেই সর্বেশ্বরের অসাধ্য কি আছে? প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা গুণে, ঈশ্বরের মহিমায় হাসান আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই প্রথম বিষপান হইতে মৃত্যু পর্যন্ত (চল্লিশ দিন) প্রায়ই কোন না কোন প্রকারের শরীরের গ্লানি ছিল। এক কথা (প্রথম বিষপান ও আরোগ্য লাভ) অতি গোপনে রাখিলেন। কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

প্রণয়ী বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন। চিরশত্রুর হস্ত হইতে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু মিত্র যদি শত্রু হয়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা কিছুতেই থাকে না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি শত্রুতাসাধনে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, তাহা শেষ না করিয়া প্রাণ থাকিতে ক্ষান্ত হয় না। জাএদা ক্ষান্ত হইবেন কেন? জাএদার পশ্চাতে আরও লোক আছে। জাএদা একটু নিরুৎসাহ হইলে, মায়মুনা নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়া নূতনভাবে উত্তেজিত করিত। একবার বিফল হইলে দ্বিতীয়বার অবশ্যই সুফল ফলিবে, এ কথাও জাএদার কর্ণ মধ্যে ফুৎকারের ন্যায় বাজিতে লাগিল।

মায়মুনা মনে মনে ভাবতেছিল, যাত্রা দিয়াছি, তাহাতে আর রক্ষা নাই। একবার গলাধঃকরণ হইলেই কার্যসিদ্ধি হইবে। হাসান জাএদার গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন, মধুপানে আত্মবিকার উপস্থিত হইয়াছে, গোপনে সন্ধান লইয়া একবারে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, কোন সময়ে হাসানের পুরী হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিবে, নিজেও কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পুরবাসিগণের সহিত হাসানের বিয়োগজনিত ক্রন্দনে যোগ দিবে, এইরূপ আলোচনায় সারা নিশি বসিয়া কাটাইল; প্রভাত হইয়া আসিল, তবুও ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। দুই এক পদ করিয়া জাএদার গৃহ পর্যন্ত আসিল, জাএদার মুখে সমুদয় ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?" জাএদা উত্তর করিল, "উপায় অনেক আছে। তুমি বাজার হইতে আমাকে কিছু মিষ্টি খেজুর আনিয়া দাও। এবারে দেখিও, কিছুতেই রক্ষা হইবে না।"
"খেজুরে কি হইবে?"
"মধুতে যাহা হইয়াছিল, তাহাই হইবে?"
"তিনি কি তোমার ঘরে আর আসিবেন?"
"কেন আসিবেন না?"
"যদি জানিয়া থাকেন– ঘুণাক্ষরে যদি টের পাইয়া থাকেন, তবে তোমার ঘরে আসা দূরে থাক, তোমার মুখও দেখিবেন না।"
"বোন! তুমি আমার বয়সে বড়, অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াও থাকিবে, কিন্তু তোমার ভ্রমও অনেক। স্ত্রীজাতির এমনই একটি মোহনীয় শক্তি আছে যে, পুরুষের মন অতি কঠিন হইলেও সহজে নোয়াইতে পারে ঘুরাইতে পারে, ফিরাইতেও পারে। তবে অন্যের প্রণয়ে মজিলে একটু কথা আছে বটে, কিন্তু হাতে পাইয়া নির্জনে বসাইতে পারিলে, কাছে ঘেঁষিয়া মোহিনী মন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে আওড়াইতে পারিলে, অবশ্য কিছু না কিছু ফল ফলাইতে পারিবেই পারিবে। এ যে না পারে সে নারী নহে- আর আমি তাঁহাকে বিষপান করাইব, এ কথা তো তিনি জানেন না, কেহ তো তাঁহাকে সে কথা বলে নাই; তিনিও তো সর্বজ্ঞ নহেন যে, জয়নাবের ঘরে বসিয়া জাএদার মনের খবর জানিতে পারিবেন। যে পথে দাঁড়াইয়াছি, আর ফিরিব না, যাহা করিতে হয় করিব।"
মায়মুনা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনেই বলিল "মানুষের মনের ভাব পরিবর্তন হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না।" প্রকাশ্যে কহিল, "আমি খেজুর লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"
মায়মুনা বিদায় হইল। জাএদা অবশিষ্ট মধু, যাহা পাত্রে ছিল, তাহা আনিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিলে লাগিলেন, যেমন মধু, তেমনি আছে, ইহার চারিভাগের এক ভাগও যদি উদরস্থ হইত, তবে আজ এতক্ষণ জয়নাবের সুখতরী ডুবিয়া যাইত, সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া একেবারে দুঃখের সাগরে ডুবিত, স্বামীসোহাগিনীর সাধ মিটিয়া যাইত। এ সুমধুর মধুতেই জাএদার আশা পরিপূর্ণ হইত। প্রথমে যে ভাব হইয়াছিল, আর কিছুক্ষণ সেই ভাব থাকিলে আজ জয়নাবের আর হাসিমুখ দেখিতাম না; আমারও অন্তর জ্বলিত না। একবার, দুইবার, তিনবার, – যতবার হয় চেষ্টা করিব, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?
মায়মুনা খেজুর লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "সাবধান! আর আমি বিলম্ব করিব না; যদি আবশ্যক হয়, সময় বুঝিয়া আমার বাড়িতে যাইও।" এই কথা বলিয়া মায়মুনা চলিয়া গেল। জাএদা সেই খেজুরগুলি বাছিয়া বাছিয়া দুই ভাগ করিলেন। এক ভাগের প্রত্যেক খেজুরে এমন একটি চিহ্ন দিলেন যে, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও চক্ষে তাহা

পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না। অবশিষ্ট অচিহ্নিত খেজুরগুলিতে সেই কৌটার সাংঘাতিক বিশ মিশ্রিত করিয়া, উভয় খেজুর একত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

হাসান জয়নাবকে বলিয়াছিলেন, "গত রাত্রে জাএদার গৃহে বাস করিব ইচ্ছা ছিল, দৈববশে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল যে, সমস্ত রাত্রি পেটের বেদনায়, শরীরের জ্বালায় অস্থির ছিলাম। মুহূর্তকালের জন্যও সুস্থির হইতে পারি নাই। ভাবনায় চিন্তায় জাএদা কোন কথাই মুখে আনিতে পারিল না। কেবলমাত্র বলিয়াছিল, 'সকলই আমার কপাল।' তা যাহাই হউক, আজিও আমি জাএদার গৃহে যাইতেছি।"

জয়নাব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া হাসানকে বিদায় করিলেন। জয়নাবের ইচ্ছা যে কাহারও মনে দুঃখ না হয়, স্বামীধনে কেহই বঞ্চিত না হয়, সে ধনে সকলেই সমভাবে অধিকারিনী ও প্রত্যাশিনী।

হাসানের শরীর সম্যক প্রকারে সুস্থ হয় নাই; বিষের তেজ শরীর হইতে একেবারে যে নির্দোষভাবে অপসৃত হইয়াছে, তাহাও নহে। শরীরের গ্লানি ও দুর্বলতা এবং উদরে জড়তা এখনও অনেক আছে। এ সকল থাকা সত্ত্বেও তিনি জাএদা গৃহে উপস্থিত হইয়া গত রাত্রির ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই মধুর কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। জাএদা উত্তর করিলেন, "যে মধুতে এত যন্ত্রণা, এত ক্লেশ, সেই মধু আমি আবার গৃহে রাখিব? পাত্রসমেত তাহা আমি তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।"

জাএদার ব্যবহারে হাসান যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। সুযোগ পাইয়া জাএদা সেই খর্জ্জুরের পাত্র ইমাম হাসানের সম্মুখে রাখিয়া নিকটে বসিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণে অনুরোধ করিলেন। হাসান স্বভাবতঃই খর্জ্জুর ভালবাসিতেন, কিন্তু গত রজনীতে মধুপান করিয়া যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। চতুরা জাএদা স্বামীর অগ্রেই চিহ্নিত খেজুর খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেখাদেখি ইমাম হাসানও চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত উভয়বিধ খেজুর একটি একটি খাইতে আরম্ভ করিলেন। উর্দ্ধসংখ্যা সাতটি উদরস্থ হইলে বিষের কার্য আরম্ভ হইল। হাসান সন্দেহপ্রযুক্ত আর খাইলেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর বিলম্ব করিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না; নিতান্ত দুঃখিতভাবে প্রাণের অনুজ হোসেনের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। এবারও কাহাকে কিছু বলিলেন না; কিছুক্ষণ ভ্রাতৃগৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিদারুণ বিষের যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠল। পুনরায় তিনি প্রভু মোহাম্মদের রওজা মোবারক (পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্রে) যাইয়া ঈশ্বরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াময় এবারেও হাসানকে আরোগ্য করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

জাএদার আচরণ হাসান কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি সে কথা মুখে আনিলেন না; কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "স্ত্রী দুঃখের ভাগিনী, সুখের ভাগিনী। আর, আমার স্ত্রী যাহা, ঈশ্বরই জানেন। আমি জ্ঞানপূর্বক জাএদার কোন অনিষ্ট করি নাই, কোন প্রকারে কষ্টও দিই নাই। জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়াই কি জাএদা আমার প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিয়াছে? স্বহস্তে পতিবধে প্রবৃত্ত হইয়াছে? সপত্নী সম্বন্ধ তাহার নূতন নহে। হাসনেবানু তাহার সপত্নী। যে জাএদা আমার জন্য সর্বদা মহাব্যস্ত থাকিত, কিসে আমি সন্তুষ্ট থাকিব, তাহারই অনুসন্ধান করিত, আজ সেই জাএদা আমার প্রাণবিনাশের

জন্য বিষ হস্তে করিয়োছে দিবে কেন? এ কথা আর কাহাকেও বলিব না। এ বাড়িতেও আর থাকিব না। মায়াময় সংসার ঘৃণার্হ স্থান। নিশ্চয় জাএদার মন অন্য কোন লোভে আক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্যই জাএদা কোন আশায় ভুলিয়াছে, কুহকে পড়িড়য়াছে। সপত্নীবাদে আমাকে বিষ দিবে কেন? এ বিষ জয়নাবকে দিলেই তো সম্ভব; জয়নাবের প্রাণেই তাহার অনাদর হইতে পারে, আমার প্রাণে অনাদর হইলেই তাহার আর সুখ কি? স্ত্রী হইয়া যখন স্বামী-বধে অগ্রসর হইয়াছে, তখন আর আমার নিস্তার নাই। এ পুরীতে আর থাকিব না। স্ত্রী পরিজনের মুখ আর দেখিব না; এই পুরীই আমার জীবন-বিনাশের প্রধান যন্ত্র। কিছুতেই এখানে থাকা উচিত নহে। বাহিরের শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া বরং সহজ, কিন্তু ঘরের শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া দুস্কর? শত্রু দূরে থাকিলেও সর্বদা আতঙ্ক। কোন সময়ে কি ঘটে, কোন সূত্রে, কোন সুযোগে, কি উপায়ে, কোন পথে, কাহার সাহায্যে, শত্রু আসিয়া কি কৌশল শত্রুতা সাধন করে, এই ভাবনায় ও এই ভয়েই সর্বদা আকুল থাকিতে হয়। কিন্তু আমার ঘরেই শত্রু! আমার প্রাণই আমার শত্রু। নিজ দেহই আমার ঘাতক! নিজ হস্তই আমার বিনাশক! নিজ আত্মাই আমার বিসর্জ্জক। উঃ কি নিদারুণ কথা! মুখে আনিতেও কষ্টবোধ হয়। স্ত্রী ও স্বামীতে দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমি তো আর কিছুই ভিন্ন দেখি না। স্বামী ও স্ত্রী এক দেহ হইতে পারে না বলিয়াই ভিন্নভাবে থাকে; কিন্তু আত্মা এক, মন এক, মায়া-মমতা এক, আশা এক, ভরসা এক, প্রাণ এক-সকলই এক। কিন্তু কি দুঃখ! কি ভয়ানক কথা! হ্যাঁ অদৃষ্ট! আমারও সেই এক আত্মা এক প্রাণ স্ত্রীর-তার হস্তে স্বামী বিনাশের বিষ! কি পরিতাপ! যেই কোমল হস্ত স্বামীর জীবন-প্রদীপ নির্বাণের জন্য প্রসারিত! আর এস্থানে থাকিব না। বনে বনে পশুপক্ষীদিগের সহবাসে থাকাই ভাল। এ পুরীতে আর থাকিব না।"

এই রূপে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া হাসান আপন প্রধান মিত্র আব্বাস ও কতিপয় এয়ার সমভিব্যাহারে মদিনার নিকটস্থ মুসাল নগরে গমন করিলেন। মুসালবাসীরা হযরত ইমাম হাসানের শুভাগমনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া অতি সমাদরে বিশেষ উপহারে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার ভাগ্যে বেশি দিন বিশ্রাম ঘটিল না।

পঞ্চদশ প্রবাহ

কপাল মন্দ হইলে তাহার ফলাফল ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুসালনগরে আসিয়া হাসান কয়েক দিন থাকিলেন। জাএদার ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টলিপি যাহা, তাহাই রহিয়া গেল। যখন কপাল টলিয়া যায়, দুঃখ-পথের পথিক হইতে হয়, তখন কিছুতেই আর নিস্তার থাকে না। এক জাএদার ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া মুসালনগরে আসিলেন, কিন্তু সেরূপ কত জাএদা শত্রুতা সাধনের জন্য তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন? এই বিশ্বসংসারে শত্রুসংখ্যা যদি আমরা জানিতে পারি, বাহ্যিক আকারে শত্রু মিত্র যদি চিনিতে পারি, তবে কি আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে? চিনিতে পারিলে কি আর শত্রুরা শত্রুতা সাধন করিতে পারে? সতর্কতা কাহার জন্য? ইমাম হাসানের ভাগ্যে সুখ নাই। যে দিন জয়নাবকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, যে দিন জয়নাবকে নিজ পুরীমধ্যে আনিয়া জাএদার সহিত একত্র রাখিয়াছেন, সেই দিনই

তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই দিনই তাঁহার সুখ-সূর্য অস্তমিত হইয়াছে। জয়নাবের জন্যই জাএদা আজ তাঁহার পরম শত্রু। সেই শত্রুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই হাসান গৃহত্যাগী। সেই গৃহত্যাগেই আর এক শত্রুর শত্রুতা সাধনে সুযোগ। সকল মূলই জয়নাব। আবার জয়নাবই জাএদার সুখের সীমা।

মদিনার সংবাদ দামেস্কে যাইতেছে, দামেস্কের সংবাদ মদিনায় আসিতেছে। ইমাম হাসান মদিনা ছাড়িয়া মুসালনগরে আসিয়াছেন, এ কথাও এজিদের কর্ণে উঠিয়াছে, অপর সাধারণেও শুনিয়াছি। ঐ নগরের একচক্ষুবিহীন জনৈক বৃদ্ধের প্রভু মোহাম্মদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল, শেষে সেই ক্রোধ, সেই শত্রুতা তাঁহার সন্তানসন্ততি, পরিশেষে হাসান-হোসেনের প্রতি আসিয়াছিল। সেই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সুযোগ পাইলেই মোহাম্মদের বংশমধ্যে যাহাকে হাতে পাইবে, তাহারই প্রাণ সংহার করিবে। মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হাসানের মুসাল নগরে আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিশেষ যত্নে হলাহলসংযুক্ত এক সুতীক্ষ্ণ বর্শা প্রস্তুত করিয়া শত্রুতা সাধনোদ্দেশ্যে মুসাল নগরে যাত্রা করিল। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত গমনের পর মুসাল নগরে যাইয়া সন্ধানে জানিল যে, ইমাম হাসান ঐ নগরস্থ উপাসনা-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐ স্থানে আব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ উল্লেখিত উপাসনা মন্দিরের সীমাবর্তী গুপ্তস্থানে বর্শা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকটস্থ হইল। ইমাম হাসানের দৃষ্টি পড়িবামাত্র ধূর্ত বৃদ্ধ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন। আমি এত দিন শয়তানের কুহকে পড়িয়া মোহাম্মদীয় ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বর-কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সত্যধর্মের জ্যোতিঃ প্রভাবে মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, ইমাম হাসান মদিনা হইতে মুসাল নগরে আসিয়াছেন। সেই স্বপ্নেই কে যেন আমায় বলিল যে, শীঘ্র ইমাম হাসানের নিকট যাইয়া সত্যধর্মে দীক্ষিত হও, পূর্ব পাপ স্বীকার করিয়া মার্জনার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর। এই মহার্থপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া আমি ঐ শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি, যাহা অভিমত হয় আজ্ঞা করুন।"

দয়ার্দ্রচিত্ত হাসান আগন্তুক বৃদ্ধকে অনেক আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মোহাম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে এখনই প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়াই ইমাম হাসান তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া তাহাকে "বায়েৎ" (মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত) করিলেন। বৃদ্ধও যথারীতি মোহাম্মদীয় ধর্মে "ঈমান" (মুখে স্বীকার এবং বিশ্বাস) আনিয়া হাসানের পদধূলি গ্রহণ করিল। বিধর্মীকে সৎপথে আনিলে মহাপুণ্য! বৃদ্ধও এই প্রাচীন বয়সে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাতে মাননীয় হাসানের বিশেষ অনুগৃহীত ও বিশ্বাসভাজন হইল।

দুষ্টবুদ্ধি, স্বার্থপর, নরপিশাচ কেবল কার্য উদ্ধারের নিমিত্তই, চিরমনোরথ পরিপূর্ণ করিবার আশায় চিরবৈর-নির্যাতন-মানসেই অকপটভাবে হাসানের শরণাগত হইল; ইহা সরলস্বভাব হাসানের বুদ্ধির অগোচর। প্রকাশ্যে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিল, কিন্তু চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর ও সুযোগ অন্বেষণে সর্বদাই সমুৎসুক। আগন্তুককে বিশ্বাস করিতে নাই, এ কথা যে হাসান না জানিতেন, তাহা নহে; কিন্তু সেই মহাশক্তি

সুকৌশলসম্পন্ন ঈশ্বরের লীলা সম্পন্ন হইবার জন্যই অনেক সময় অনেক লোকে অনেক জানিয়াও ভুলিয়া যায়, চিনিয়াও অচেনা হয়।

উপাসনা মন্দিরের সম্মুখে হাসান এবং এব্‌নে আব্বাস্ বসিয়া আছেন। নূতন শিষ্য কার্যান্তরে গিয়াছে। এব্‌নে আব্বাস্ বলিলেন, "এই যে দামেস্ক হইতে আগত একচক্ষুবিহীন পাপস্বীকারী বৃদ্ধ-আপনার বিশ্বাসভাজন নব শিষ্য, ইহার প্রতি আমার সন্দেহ হয়।"

"কি সন্দেহ?"

আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি– অনেক ভাবিয়াও দেখিয়াছি, এই বৃদ্ধ শুধুমাত্র ধর্মে দীক্ষিত হইতে আসে নাই। আমার বোধ হয়, কোন দুরভিসন্ধি সাধন মানসে কিংবা কোন গুপ্ত সন্ধান লইবার জন্য আমাদের অনুসরণে আসিয়াছে।

অসম্ভব! তাহা হইলে ভক্তিভাবে মোহাম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত হইবে কেন? সাধারণভাবে এখানে অনায়াসেই থাকিতে পারিত, সন্ধানও লইতে পারিত।"

"পারিত সত্য-পারিয়াছেও তা; কিন্তু বিধর্মী, নারকী, দুষ্ট, খল শত্রু কেবল কার্য উদ্ধারের জন্য ধর্মের জন্য ধর্মের ভাণ করিয়া গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ বন্ধন করিতে আসিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যই বা কি?"

"ভ্রাতঃ! ও কোন কথাই নয়। তিন কাল কাটিয়া শেষে কি এই বৃদ্ধকালে বাহ্যিক ধর্ম-পরিচ্ছদে কপটবেশে পাপকার্যে লিপ্ত হইবে? জগৎ কি চিরস্থায়ী? শেষের দিনের ভাবনা বলতে কার না আছে? এই বৃদ্ধ বয়সেও যদি উহার মনের মলিনতা দূর না হইয়া থাকে, পাপজনিত আত্মা গ্লানি যদি এখনও উপস্থিত না হইয়া থাকে, কৃতপাপের জন্য এখনও যদি অনুতাপ না হইয়া থাকে, তবে আর কবে হইবে? চিরকাল পাপপঙ্কে জড়িত থাকিলে শেষ দশায় অবশ্যই স্বীকৃত পাপের জন্য বিশেষ অনুতাপিত হইতে হয়। অনেকেই গুপ্ত পাপ নিজ মুখে স্বীকার করে। যে পাপস্বীকারে প্রাণবিনাশ হইতে পারে, ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে, সে পাপও পাপী লোকে নিজ মুখে স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিয়া থাকে। পাপ কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে,– আবার মন সরল না হইলেও ধর্মে মতি হয় না, ঈশ্বরেও ভক্তি হয় না। যে ব্যক্তি ধর্ম-সুধার পিপাসু হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কত পরিশ্রমে দামেস্ক হইতে মুসাল নগরে এত দূর আসিয়াছে, তাহার মনে কি চাতুরী থাকিতে পারে? মন যে দিকে ফিরাও, সেই দিকেই যায়। ভাল কার্যকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধি চালনা করে,-চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বিচার কর, কি দেখিবে? পদে পদে দোষ-পদে পদে বিপদ! ঐ চিন্তা আবার ভাল দিকে ফিরাও– কি দেখিবে? সুফল, মঙ্গল ও সৎ। এই আগন্তুক যদি সরলভাবে ধর্ম পিপাসু হইয়া আসিয়া থাকে, তবে দেখ দেখি, উহার মন কত প্রশস্ত? ধর্মের জন্য কত লালায়িত?" বল দেখি, স্বর্গ কাহার জন্য? এই ব্যক্তি জান্নাতের যথার্থ অধিকারী।

এব্‌নে আব্বাস্ আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক বৃদ্ধও মন্দিরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার লুক্কায়িত বর্শার ফলকটি বিশেষ মনঃসংযোগে দেখিতেছে এবং মৃদুস্বরে বলিতেছে, "এই তো আমার সময়, এক আঘাতেই মারিয়া ফেলিতে পারিব। আর যে বিষ হইতে সংযুক্ত করিয়াছি রক্তের সহিত একটু মিশ্রিত হইলে কাহার সাধ্য হাসানকে রক্ষা করে? উপাসনার সময়ই উপযুক্ত সময়। যেমন 'সেজ্‌দা' (দণ্ডবৎ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম) দিবে, আমিও সেই সময় বর্শার

আঘাত করিব। পৃষ্ঠে আঘাত করিলে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ না হইলে আর ছাড়িব না। কিন্তু উপাসনা-মন্দিরে হাসানকে একা পাইবার সুযোগ অতি কম। দেখি, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?" এব্‌নে আব্বাসের অলক্ষিতে পাপিষ্ঠ অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিল। কোন ক্রমেই,- কোন সময়েই বর্শা নিক্ষেপের সুযোগ পাইল না।

মন্দিরের দুই পার্শ্বে কয়েকবার বর্শাহস্তে ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু একবারও লোকশূন্য দেখিল না। বৃদ্ধ পুনরায় মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "কি ভ্রম! উপাসনার সময় তা আরও অধিক লোকের সমাগম হইবে। ইমামই সকলের অগ্রে থাকিবে। বর্শার আঘাত করিলেই শত্রু শেষ করিব; কিন্তু নিজের জীবনও শেষ হইবে। এক্ষণে হাসান যেভাবে বসিয়া আছে, পৃষ্ঠে আঘাত করিলে বক্ষস্থল পার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এব্‌নে আব্বাস্ আমাকে কখনই ছাড়িবে না। সে যে চতুর! নিশ্চয়ই তাহার হাতে আমার প্রাণ যাইবে। আব্বাস বড়ই চতুর; এই তো হাসানের সহিত কথা কহিতেছে, কিন্তু দৃষ্টি চতুর্দ্দিকেই আছে। কি করি, কতক্ষণ অপেক্ষা করিব, সুযোগই বা কত খুঁজিব? বর্শার পশ্চাৎভাগ ধরিয়া সজোরে বিদ্ধ করিলে তো কথাই নাই, দূর হইতে পৃষ্ঠ সন্ধানে নিক্ষেপ করিলেও যে একেবারে ব্যর্থ হইবে, ইহাই বা কে বলে?"

বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হাসানের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতেই বর্শা সন্ধান করিল। এব্‌নে আব্বাসের চক্ষু চারিদিকে। এক স্থানে বসিয়া কথা কহিতেন; অথচ মনে, চক্ষে চারিদিকে সন্ধান রাখিতে পারিতেন। হঠাৎ আগন্তুক বৃদ্ধের বর্শাসন্ধান তাঁহার চক্ষে পড়িল। হাসানের হস্ত ধরিয়া টানিয়া উঠাইলেন এবং ধূর্তের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পিশাচ! তোর এই কীর্তি।"

এদিকে বর্শাও আসিয়া পড়িয়াছে। নিক্ষেপকারীর সন্ধান ব্যর্থ হইবার নহে। বর্শানিক্ষেপে সেই ব্যক্তি সবিশেষ শিক্ষিত এবং সিদ্ধ হস্ত; কেবল এব্‌নে আব্বাসের কৌশলেই হাসানের পরিত্রাণ।-বর্শাটা পৃষ্ঠে না লাগিয়া হাসানের পদতল বিদ্ধ করিল। এব্‌নে আব্বাস্ কি করেন, -দূরাত্মাকে ধরিতে যান, কি এদিকে আঘাতিত হাসানকে ধরেন। ইমাম হাসান বর্শার আঘাতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, এব্‌নে আব্বাস্ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অতি এস্তে যাইয়া বৃদ্ধকে ধরিলেন। বর্ষার নিকটে টানিয়া ঐ বর্শার দ্বারা বৃদ্ধের বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত, এমন সময় ইমাম হাসান অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, প্রিয় আব্বাস! যাহা হইবার হইয়াছে, ক্ষমা কর। ভাই! বিচারের ভার নিজ হস্তে লইও না। সর্ববিচারকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বিচারের ভার দিয়া বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও, এই আমার প্রার্থনা।

হাসানের কথায় এব্‌নে আব্বাস্ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য; কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এই ফল।"

শোণিতের ধারা বহিতেছে। উপাসনা-মন্দির রক্তে রঞ্জিত হইয়া লিখিয়া যাইতেছে,-"আগন্তুককে কখনই বিশ্বাস করিও না। প্রকৃত ধার্মিক জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" বর্শার আঘাতে হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তথাচ বলিতে লাগিলেন, "আব্বাস! তোমার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ! তোমার চক্ষুরও সহস্র প্রশংসা। মানুষের বাহ্যিক আকৃতি দর্শন করিয়াই অস্থি-মাংস ভেদ করিয়া মর্ম পর্যন্ত দেখিবার শক্তি, ভাই, আমি তো আর কাহারও দেখি নাই! আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না, আমি কাহারও মন্দ করি নাই, তথাচ আমার শত্রুর শেষ নাই। পদে পদে, স্থানে স্থানে, নগরে নগরে

আমার শত্রু আছে, ইহা আগে জানিতাম না। কি আশ্চর্য! সকলেই আমার প্রাণবধে অগ্রসর, সকলেই সেই অবসরের প্রত্যাশী। এখন কোথায় যাই? যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই হন্তা, সেই দিকেই আমার প্রাণনাশক শত্রু! যে প্রাণের দায়ে মদিনা পরিত্যাগ করিলাম, এখানেও সেই প্রাণ সঙ্কটাপন্ন! কিছুতেই শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার পাইলাম না! আমি ভাবিয়াছিলাম, জাএদাই আমার পরম শত্রু, এখন দেখি, জগৎময় আমার চিরশত্রু।"

হাসান ক্রমেই অস্থির হইতে লাগিলেন। অস্ত্রের আঘাত, তৎসহ বিষের যন্ত্রণা তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিল। কাতরস্বরে এব্‌নে আব্বাস্‌কে বলিলেন, "আব্বাস! যত শীঘ্রই পার, আমাকে মাতামহের 'রওজা শরীফে' লইয়া চল। যদি বাঁচি, তবে আর কখনই 'রওজা মোবারক' হইতে অন্য স্থানে যাইব না। ভ্রমেই লোকের সর্বনাশ হয়, ভ্রমেই লোক মহাবিপদগ্রস্থ হয়, ভ্রমে পড়িয়াই লোকে কষ্টভোগ করে, প্রাণও হারায়। ইচ্ছা করিয়া কেহই বিপদভার মাথায় তুলিয়া লয় না, দুঃখীও হইতে চাহে না। আমি মুসাল নগরে না আসিয়া যদি মাতামহের রওজা শরীফে থাকিতাম, তাহা হইলে কোন বিপদেই পতিত হইতাম না। কপট ধর্ম-পিপাসুর কথায় ভুলিয়া বর্শাঘাতে আহতও হইতাম না। ভাই! যে উপায়েই হউক, শীঘ্রই আমাকে মদিনায় লইয়া চল। অতি অল্প সময়ের জন্যও আর মুসাল নগরে থাকতে ইচ্ছা হইতেছে না। যদি এই আঘাতেই প্রাণ যায়, কি করিব, কোন উপায় নাই। কিন্তু মাতামহের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে প্রাণবিয়োগ হইবে, তাঁহার পদপ্রান্তেই পড়িয়া থাকিব, এই আমার ইচ্ছা। আর ভাই! সেই পবিত্র স্থানে প্রাণ বাহির হইলে সেই সময়ের নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব। আজরাইলের (যমদূতের) কঠিন ব্যবহার হইতেও বাঁচিতে পারিব।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাসান পুনর্বার ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! অবশ্যই আমার আশা-ভরসা সকলই শেষ হইয়াছে। পদে পদে ভ্রম, পদে পদে বিপদ, ঘরে বাহিরে শত্রু, সকলেই প্রাণ লইতে উদ্যত। আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল; কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে। যত শীঘ্রই হয়, আমাকে মদিনায় লইয়া চল।

মুসাল নগরবাসীরা অনেকেই হাসানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মদিনায় পাঠাইয়া দেওয়াই সাব্যস্ত হইল।" এব্‌নে আব্বাস্‌ হাসানকে লইয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন।

যেখানে যমদূতের দৌরাত্ম্য নাই, হিংসাবৃত্তিতে হিংস্র লোকের এবং হিংস্র জন্তুর প্রবৃত্তি নাই, খাদ্যখাদকের বৈরীভাব নাই, নিয়মিত সময়ে হাসান সেই মহাপবিত্র 'রওজা মোবারকে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সর্বাঙ্গে রওজা মোবারকে ধূলা মাখিয়া ঈশ্বরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে বিষের যন্ত্রণা অনেক লাঘব হইল। কিন্তু আঘাতের বেদনা-যাতনা তেমনই রহিয়া গেল। ইহার অর্থ কে বুঝিবে? সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ক্ষতস্থান দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জ্বালাযন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল। ইমাম হাসান শেষে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন হোসেন আসিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! এই 'রওজা মোবারকে" কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষের শরীর অপবিত্র; বিশেষ আপনার যে ব্যাধি, তাহাতে আরও সন্দেহ। পবিত্র স্থানে পবিত্র অবস্থায় না থাকিতে পারিলে স্থানের

অবমাননা করা হয়। ক্ষতস্থান কেমন ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে; বাড়িতে চলুন, আমরা সকলে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব। জগতে জননীর স্নেহ নিঃস্বার্থ; সন্তানের সাংঘাতিক পীড়ায় মায়ের অন্তরে যেরূপ বেদনা লাগে, এমন আর কাহারও লাগে না। যদিও ভাগ্যদোষে সে সে ̣হ-মমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি আজ্ঞাবহ কিঙ্কর বর্তমান আছে। সেই মাতার গর্ভে আমিও জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার সাধ্যমত আমি আপনার সেবা করিব।"

ইমাম হাসান আর বাক্যব্যয় করিলেন না। হোসেনও আবুল কাসেমের স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া অতিকষ্টে বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন। হাসনেবানু, জয়নব অথবা জাএদা এই তিন স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রীর ঘরেই যাইলেন না; প্রিয় ভ্রাতা হোসেনের গৃহেই আবাস গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় রত হইল।

এক জাএদার প্রতি সন্দেহ করিয়া হাসান যেন সকলেরই প্রতি সন্দেহ করিলেন। কিন্তু সেই আন্তরিক ভাব প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তবে ভাবগতিক দেখিয়া বাহ্য ব্যবহারে সকলে বুঝিয়াছিলেন যে, পরিজনবর্গের- বিশেষতঃ স্ত্রীগণের প্রতি হাসান মহাবিরক্ত। হাসনেবানু ও জয়নাবের প্রতি কেবল একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ পাইত। কিন্তু জাএদাকে দেখিয়া ভয় করিতেন।

হাসনেবানুর সেবা-শুশ্রূষায় ইমাম হাসানের বিরক্তিভাব কেহই দেখিতে পায় নাই। জয়নাব আসিয়া নিকটে বসিলেও কিছু বলিতেন না। কিন্তু জাএদাকে দেখিলেই চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিতেন। দুই চারি দিনে সকলেই জানিল যে, ইমাম হাসান বোধ হয়, জাএদাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ অনুসন্ধানেও ত্রুটি হইল না। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, জাএদার ঘরে গেলেই বিপদগ্রস্ত হন, অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হন। এই সকল কারণেই বোধ হয়, জাএদার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে। কেহ এই প্রকার কেহ অন্য প্রকার- কেহ বা অন্য নানা প্রকার কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। ইমাম হাসানের ভাবগতিকক্রিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া হোসেন তাঁহার আহারীয় সামগ্রীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। ভ্রাতার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য হাসনেবানুর সম্মুখে বলিলেন, আপনারা ইহার আহারীয় দ্রব্যাদি বিশেষ যত্নে রক্ষা করিবেন। হাসনেবানু কহিলেন, "আমি সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলি যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে খাদ্যসামগ্রীর কোন দোষে আর পীড়া বৃদ্ধি হইবে না। আমি বিশেষ সতর্ক হইয়াছি। আমি অগ্রে না খাইয়া ইহাকে আর কিছুই খাইতে দিই না। যত পীড়া-যত অপকার সকলই আমি মাথায় লইয়াছি। খোদা এক্ষণে আরোগ্য করিলেই; সকল কথা বলিব।" হাসনেবানুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইমাম হাসান বলিলেন, -"অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। তোমার যাহাতে সন্দেহ দূর হয়, তুমি সেই প্রকারে আমার আহারীয় ও পানীয় সমুদয় দ্রব্য সাবধানে ও যত্নে রাখিও।"

হাসনেবানু পূর্ব হইতেই সতর্কিতা ছিলেন, স্বামীর কথায় একটু আভাস পাইয়া আরও যথাসাধ্য সাবধান ও সতর্ক হইলেন। আহারীয় সামগ্রী বিশেষ যত্নে রক্ষিত হইতে লাগিল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া হাসনেবানু রোগীর পথ্য ইত্যাদি প্রদান করিতে লাগিলেন; জলের সোরাহীর উপর পরিষ্কার বস্ত্র আবৃত করিয়া একেবারে সীলমোহরে

বন্ধ করিলেন। অপর কেহ হাসানের ব্যাধিগৃহে আসিতে না পারে, কৌশলে তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। প্রকাশ্যে কাহাকেও বারণ করিলেন না। হোসেনও সতর্ক রহিলেন। হাসনেবানুও সদাসর্বদা সাবধানে থাকিতে লাগিলেন।

জাএদাও মাঝে মাঝে স্বামীকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু জয়নাবকে স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিলে আর ঘরেই প্রবেশ করিতেন না। জয়নাবের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই জাএদার মুখের আকৃতির পরিবর্তন হইত, বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিত, সপত্নীহিংসা বলবতী হইত, সপত্নী-সৃষ্টিকারীর প্রতি প্রতিহিংসা-আগুন দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিত। স্বামীস্নেহ স্বামী মমতা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া যাইত। অর্ধমচরণে প্রবৃত্তি জন্মিত। কোমল হৃদয় পাষাণে পরিণত হইত। হাসানের আকৃতি বিষবৎ লক্ষিত হইত। ইচ্ছা হইত যে, তখনই-সেই মুহূর্তেই হয় নিজের প্রাণ-নয় জয়নাবের, না হয় যিনি ইহার মূল তাঁহার-

রোগীর রোগশয্যা দেখিতে কাহারও নিষেধ নাই। পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে, কি দেখিতে আসিলে নিবারণ করা শাস্ত্রবহির্ভূত। একদিন জাএদার সহিত মায়মুনাও হযরত হাসানকে দেখিতে আসিল। শয্যার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে জাএদা তৎপার্শ্বেই মায়মুনা। তাঁহাদের নিকট অপরাপর সকলে শয্যার প্রায় চতুস্পার্শ্বে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। মায়মুনা প্রতিবাসিনী; আরও সকলে জানিত যে, ইমামদ্বয়ের জন্মদিবসে মায়মুনা কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। জান্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন; মায়মুনাও তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভালবাসিত। হাসান-হোসেনও মাতার ভালবাসা বলিয়া মায়মুনাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। মায়মুনা এতকাল পর্যন্ত তাঁহাদের সুখ-দুঃখের ভাগিনী বলিয়াই পরিচিতা আছে। মায়মুনার মন যে কালকূট বিষম বিষে পরিপূর্ণ, তাহা জাএদা ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারেন নাই। হাসনেবানু যে মায়মুনাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, সেটি তাহার স্বভাব। মায়মুনা ও হাসনেবানু পতি কথায় কাঁদিয়া মাটি ভিজাইত না, সেটিও মায়মুনার স্বভাব। হাসনেবানু মুখ ফুটিয়া কোন দিন মায়মুনাকে কোন মন্দ কথা বলেন নাই, অথচ মায়মুনা তাঁহাকে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে কাঁপিত।

ইমাম হাসানের পীড়িত অবস্থা দেখিয়া মায়মুনার চক্ষে জল আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আহা! কোলে কাঁধে করিয়া মানুষ করিয়াছে; ও আর কাঁদিবে না?" মায়মুনার চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। মায়মুনা গৃহমধ্যস্থিত সকলের দিকেই এক একবার তাকাইয়া চক্ষের জল দেখাইল। মায়মুনা শুধু চক্ষের জলই সকলকে দেখাইতেছে তাহা নহে; আরও উদ্দেশ্য আছে। ঘরের মধ্যে যেখানে যেখানে যে যে জিনিস, যে যে পাত্র রক্ষিত আছে, তাহা সকলই মনঃসংযোগ করিয়া জলপূর্ণ নয়নে বিশেষরূপে দেখিতে লাগিল।

হাসানের জল-পিপাসা হইয়াছে। সঙ্কেতে হাসনেবানুকে জলপানেচ্ছা জানাইলেন। তিনি মহাব্যস্তে "আবখোরা" পরিস্কার করিয়া সোরাহীর সীল ভগ্ন করিলেন এবং সোরাহীর জলে আবখোরা পূর্ণ করিয়া হাসানের সম্মুখে ধরিলেন। জলপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া হাসান পুনরায় শয্যাশায়ী হইলেন। হাসনেবানু আবখোরা যথাস্থানে রাখিয়া পূর্ববৎ বস্ত্রের দ্বারা মুখবন্ধ ও সীলমোহর করিয়া সোরাহীটিও যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

যে যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, সে তাহার নামও শুনিতে ভালবাসে না। জগতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা স্বভাবতঃই এক একজনকে দেখিতে ভালবাসে না। অন্য পক্ষে, পরিচয় নাই, শত্রুতা নাই, মিত্রতা নাই, আলাপ নাই, বন্ধুত্ব নাই, স্বার্থ নাই, কিছুই নাই, তথাপি মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা করে। মনের সহিত ভালবাসিতেও ইচ্ছা করে। এমন মুখও জগতে অনেক আছে, পরিচয়ে পরিচিতি না হইলেও সেই মুখখানি যতবার দেখিলে পাওয়া যায়, ততবারই সুখবোধ হয়।

হাসনেবানু জলের সোরাহী যথাস্থানে রাখিয়া বিরক্তির সহিত মায়মুনার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে সকলেই নীরব। সকলের মুখাকৃতিই মলিন। মায়মুনার মুখ ফুটিল।

"আহা এ নরাধম জাহান্নামী কে? আহা! এমন সোনার শরীরে কে এমন নির্দয়রূপে আঘাত করিয়াছে! আহা! জান্নাতবাসিনী বিবি ফাতেমার হৃদয়ের ধন, নূরনবীর চক্ষের পুতলী যে হাসান, সেই হাসানের প্রতি এত দূর নিষ্ঠুর অত্যাচার কে করিয়াছে? সে পাপীর পাপ-শরীরে রক্ত-মাংসের লেশমাত্রও নাই। নিশ্চয়ই সে হৃদয় দুর্জ্জয় পাষাণে গঠিত! হায় হায়! চাঁদ মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে।" -এইরূপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা আরও কিছু বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, হাসানের বিরক্তি ভাব ও কাসেমের নিবারণের সে চেষ্টা থামিয়া গেল। -চক্ষের জলও আর আর ফেলিতে পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। চক্ষের জল অলক্ষিতে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া আপনা আপনিই আবার শুষ্ক হইল।

রোগীর পথ্য লইয়া জয়নাব সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাএদা আড়নয়নে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মায়মুনাও হাসনেবানুর আসিবার সাড়া পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহত্যাগ করিল।

ষোড়শ প্রবাহ

মায়মুনার সহিত জাএদার কথোপকথন হইতেছে। জাএদা বলিতেছেন, "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই। মানুষের পেটে বিষ হজম হয়,- একবার নয়, কয়েকবার। আমি যেন জয়নাবের সুখতরী ডুবাইতে আসিয়াছি। আমিই যেন জয়নাবের সর্বনাশ করিতে গিয়া আপন হাতে স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিতে দাড়াইয়াছি। যে চক্ষু সর্বদাই যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, জয়নাবের চক্ষু পড়িয়া অবধি সেই চক্ষু আর তাঁহাকে দেখিতে চায় না! সেই প্রিয়বস্তুকে একেবারে চক্ষের অন্তর করিতে-জগৎ চক্ষুর অন্তর করিতে কতই যত্ন, কতই চেষ্টা করিতেছি! যে হস্তে কতই সুখাদ্য দ্রব্য খাইতে দিয়াছি, এখন সেই হস্তে বিষ দিতেও একটু আগপাছ চাহিতেছি না! কিন্তু কাহার জন্য? যে স্বামীর প্রাণ হরণ করিতে না পারিয়া সেই জাএদা আজ বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে!- কিন্তু কাহার জন্য? মায়মুনা! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হাসানের মরণ নাই। জাএদারও আর সুখ নাই।"

মায়;মুনা কহিল, "চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। একবার, দুইবার, তিনবার- না হয় চারিবার, পাঁচবারের বারে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। হতাশ হও কেন? এই দেখ, এজিদ এই সকল কথা শুনিয়া এই ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছে! ইহাতে কিছুতেই নিস্তার নাই।"

- এই কথা বলিয়াই মায়মুনা আপন কটিদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি বাহির করিয়া জাএদাকে দেখাইল। জাএদা জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?"
"মহাবিষ!"
"মহাবিষ কি?"
মায়মুনা উত্তর করিল, "এ সর্পবিষ নয়, অন্য কোনও বিষ নয়, –লোকে ইহা মহামূল্য জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল্যও অধিক, দেখিতেও অতি উজ্জ্বল। আকার পরিবর্তনে অণুমাত্র পেটে পড়িলে মানুষের পরমায়ু শেষ করে।"
"কি প্রকারে খাওয়াইতে হয়?"
মায়মুনা কহিল, "খাদ্যসামগ্রীর সাথে মিশাইয়া দিতে পারিলেই হইল। পানিতে মিশাইয়া খাওয়াইতে পারিলে তো কথা নাই। অন্য অন্য বিষ পরিপাক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকযন্ত্রের নাই। এ একটি চূর্ণমাত্র; পেটের মধ্যে যেখানে পড়িবে, –নাড়ী, পাকযন্ত্র, কলিজা সমস্তই কাটিয়া কাটিয়া খণ্ড খন্ড করিবে।"
"এত বড় ভয়ানক বিষ! ছুঁইতেও যে ভয় হয়!"
"ছুঁইলে কিছুই হয় না। হাতে করিয়া রগড়াইলেও কিছু হয় না। হুলকমের (অন্ননালীর) নিচে না নামিলে কোন ভয় নাই! এ তো অন্য বিষ নয়, এ হীরক-চূর্ণ।"
"হীরার গুঁড়া!-আচ্ছা দাও।"
মায়মুনা তখনই জাএদার হাতে পুঁটলি দিল। পুঁটলি হাতে লইয়া জাএদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার ঘরে যে আর আসিবেন, সে আশা আর নাই। যেরূপ সতর্ক সাবধানে দেখিলাম, তাহাতে খাদ্য-সামগ্রীর সাথে মিশাইবার সুবিধা পাইব কোথায়?" হাসনেবানু কিম্বা জয়নাব, এই দুইয়ের একজন না মিশাইলে আর কাহারও সাধ্য নাই।"
"সাধ্য নাই কি কথা? সুযোগ পাইলে আমিই মিশাইয়া দিতাম। খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি; অন্য আর একটি উপায় আছে।"
"কি উপায়?"
"ঐ সোরাহীর জলে।"
"কি প্রকারে?– সেই সোরাহী যে প্রকারে যে কাপড় বাঁধা আছে, ঐ কাপড়ের উপরে এই গুঁড়া অতি অল্প পরিমাণে ঘষিয়া দিলেই আর কথা নাই। যেমন সোরাহী, তেমন থাকিবে; যেমন শীলমোহর, তেমনই থাকিবে; পানির রং বদল হইবে না, কেহ কোন প্রকারে সন্দেহ করিতে পারিবে না।"
"তাহা কেন পারিবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে যাওয়া চাই। যদি কেহ দেখে?"
"দেখিলেই বা। ঘরের মধ্যে যাওয়া তো তোমার দোষের কথা নয়, তুমি কেন গেলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি ঘরের মধ্যে যাইতে কোন বাধা না থাকে, তবে দেখিবে সুযোগ আছে কি না? যদি সুযোগ পাও, সোরাহীর কাপড়ের উপরে ঘষিয়া দিও। এই আসিয়াছ, এখন আর যাইবার আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হউক, রোগীও নিদ্রাবশে শয়ন করুক। যাহারা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, তাহারাও বিশ্রামের অবসর পাউক। একটু রাত্রি হইলেই যাওয়া ভাল।"
মায়মুনা তখন জাএদার ঘরে থাকিল। জাএদা গোপনে সন্ধান লইতে লাগিলেন। হাসানের নিকট কে কে রহিয়াছে, কে কে যাইতেছে, কে কে আসিতেছে, কে কি করিতেছে। প্রতি মুহূর্তেই জাএদা গুপ্তভাবে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান জানিতেছেন।

সন্ধান ও পরামর্শ করিতে করিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইল। জাএদা আজ অত্যন্ত অস্থির। একবার আপন ঘরে মায়মুনার নিকটে, আবার বাহিরে; আবার সামান্য কার্যের ছল করিয়া হোসেনের গৃহসমীপে, হাসনেবানুর গৃহের নিকটে, জয়নাবের গৃহের দ্বারে। কে কোথায় কি বলিতেছে, কি করিতেছে, সমুদয়, সন্ধান লইতে লাগিলেন। বাড়ির লোক-বিশেষতঃ হাসানের স্ত্রী, শতশতবার আনাগোনা করিলেও কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু হাসনেবানুর চক্ষে পড়িলে অবশ্যই তিনি সতর্ক হইতেন। স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় হাসনেবানু সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, আহার নিদ্রা একেবারে ছাড়িয়াছেন। জীবনে নামাজ কাজা* করিয়াছেন কি না সন্দেহ, সে নামাজ (উপাসনা) এখন আর সময় মত হইতেছে না। নানা প্রকার সন্দেহ ও চিন্তায় হাসনেবানু একেবারে বিহ্বলপ্রায় হইয়াছেন।

স্বামীর কাতর শব্দে-প্রতি বাক্যে তাঁহার অন্তরের গ্রন্থিসকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যখন একটু সময় পাইতেন, তখনই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেছেন। জয়নাব মনের দুঃখ মনেই রাখিতেছেন; –হাসনেবানুর কথাক্রমে দিবানিশি খাটিতেছেন। বিনা কার্যে তিলার্দ্ধকালও স্বামীর পদছাড়া হইতেছেন না। নিজ প্রাণ ও নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার মায়া-মমতা নাই। হাসানের চিন্তাতেই (জাএদা ছাড়া) বাড়ির সকলেই মহাচিন্তিত ও মহাব্যস্ত।

জাএদার চিন্তায় জাএদা ব্যস্ত। জাএদা কেবল সময় অনুসন্ধান করিতেছেন, সুযোগের পথ খুঁজিতেছেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রিও অধিক হইয়া আসিল। সকলেই আপন আপন স্থানে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। হাসনেবানু প্রতি নিশিতেই প্রভু মোহাম্মদের "রওজা শরীফে" যাইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বামীর আরোগ্য-কামনা করিতেন, আজিও নিয়মিত সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে, তসবীহ হস্তে করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। জাএদা জাগিয়াছিলেন বলিয়াই দেখিলেন যে, হাসনেবানু ঈশ্বরের উপাসনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া আসিয়া মায়মুনাকে বলিলেন, "মায়মুনা। বোধ হয় এই উত্তম সুযোগ। হাসনেবানু এখন ঘরে নাই, রওজা হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব আছে। এখন একবার যাইয়া দেখি যদি সুযোগ পাই, তবে এই-ই উপযুক্ত সময়।"

জাএদা বিষের পুটুলি লইয়া চলিলেন। মায়মুনাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে চলিল। অন্ধকার রজনী, চান্দ্রমাস রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ। চন্দ্র উঠিয়াই অমনি অস্ত গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার। জাএদা সাবধানে সাবধানে পা ফেলিয়া ফেলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর শয়ন-গৃহের দ্বারের নিকটে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থিত সকলে জাগরিত কি নিদ্রিত, তাহা পরীক্ষা করিলেন। গৃহদ্বার যে বন্ধ নাই, তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া গিয়াছেন। কারণ হাসনেবানু স্বামীর আরোগ্য-লাভার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়াই জাএদার গৃহপ্রবেশের আরও সুবিধা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া, হাতের জোর হাতে রাখিয়া, অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাএদা দেখিলেন দীপ জ্বলিতেছে। ইমাম হাসান শয্যায় শায়িত, –জয়নাব বিষন্নবদনে হাসানের পদ দুখানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন। অন্যান্য

---

* কাজা-নিয়মিত সময়ের অতিক্রম।

পরিজনেরা শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন সে গৃহে তখন আর কোন শব্দ নাই।

দীপের আলোতে জয়নাবের মুখখানি জাএদা আজ ভাল করিয়া দেখিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বাভাবিক আকৃতির শোভা যেরূপ দেখায় জাগ্রতে বোধ হয় তেমন কখনই দেখা যায় না। কারণ জাগ্রতবস্থায় কৃত্রিমতার ভাগ অনেক অংশে বেশি হইয়া পড়ে। জাএদা গৃহের মধ্যস্থ শায়িত ব্যক্তি ও দ্রব্যজাতের প্রতি একে একে কটাক্ষপাত করিলেন। সোরাহীর প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সোরাহীর দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ও অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সোরাহীর নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন। আবার গৃহমধ্যস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া, ইমামের মুখের দিকে চক্ষু ফেলিলেন। বিষের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া, কি ভাবিয়া আর, খুলিলেন না, হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুটুলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণহস্তে সোরাহীর মুখবদ্ধ বস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বারবার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সমুদয় চূর্ণ জলে প্রবেশ করিলে জাএদা এস্তভাবে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময় স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া পা ফেলিতেই দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল। এই শব্দে ইমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু চক্ষের পাতা খুলিল না। দ্বার পূর্বমত রাখিয়া জাএদা অতি এস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। শেষে দেখিলেন, আর কেহ নহে- মায়মুনা। জাএদার হাত ধরিয়া মায়মুনা অতি চঞ্চলপদে ব্যস্তভাবে জাএদার গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বারে জাএদার পদাঘাত শব্দে ইমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঐ শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহের মধ্যে সকলেই নিদ্রিত, -দীপ পূর্বমত জ্বলিতেছে। যেখানে যাহা ছিল, সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। হঠাৎ শব্দে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কেবল আক্ষেপের কারণ হইল। জয়নাবকে ডাকিতে লাগিলেন। জয়নাব জাগিবামাত্রই হাসান তাঁহাকে বলিলেন, "জয়নাব! শীঘ্র শীঘ্র আমাকে পানি দাও। অজু (উপাসনার পূর্বে হস্তমুখাদি বিধিমতে ধৌত) করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এইমাত্র পিতা, মাতা এবং মাতামহকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহারা যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। একটু জল পান করিব, –পিপাসা অত্যন্ত হইয়াছে।"

জল আনিতে জয়নাব বাহিরে গেলেন। হাসনেবানু তসবীহ্ হস্তে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইমাম হাসানকে জাগরিত দেখিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই তিনি নিজেই হাসনেবানুকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন। "অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছে, এক পেয়ালা পানি দাও" বলিয়া একটু উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্নবিবরণ শুনিবামাত্রই হাসনেবানুর চিত্ত আরও অস্থির হইল, বুদ্ধিশক্তির লাঘব হইয়া গেল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সোরাহীর বস্ত্রের প্রতি পূর্বে যেরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তাহা আর দেখিবার ক্ষমতা থাকিল না। হাসনেবানু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে বস্ত্রের

উপরিস্থ হীরকচূর্ণ ধর্ষণের কোন না কোন চিহ্ন অবশ্যই তাঁহার চক্ষে পড়িত, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে এমনই বিহ্বল হইয়াছেন যে, সোরাহীর মুখ বন্ধ না থাকিলেও তিনি নিঃসন্দেহে জল ঢালিয়া স্বামীকে পান করিতে দিতেন। এক্ষণে অন্যমনস্কে সোরাহী হইতে জল ঢালিয়া পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। ইমাম হাসানের এই শেষ পিপাসা-হাসনেবানুর হস্তে এই শেষ জলপান-প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলেন। জয়নাবও পূর্ব আদেশমত জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। হাসান হস্তপদাদি প্রক্ষালণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসিয়া বসিয়া জীবনের শেষ উপাসনা,– ইহজগতের শেষ আরাধনা আজ শেষ হইল; অন্তরও জ্বলিয়া উঠিল।

কাতর হইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আজি আবার এ কি হইল! জাএদার ঘরে যে প্রকার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইয়া অস্থির করিয়াছিল, এ তো সেরূপ নয়। কলিজা হৃদয় হইতে নাভি পর্যন্ত সেই কি এক প্রকারের বেদনা, যাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই! ঈশ্বর এ কি করিলেন! আবার বুঝি বিষ! এতো আর জাএদার ঘর নহে। তবে এ কি! –এ কি! যন্ত্রণা! উঃ! –কি যন্ত্রণা!"

বেদনায় হাসান অত্যন্ত কাতর হইলেন। জাএদার ঘরে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চতুর্গুণ বেদনা ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রভাবে কাসেমকে কহিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র হোসেনকে ডাকিয়া আন। আমি নিতান্তই অস্থির হইয়াছি। আমার হৃদয়, অন্তর, শরীর সমুদয় যেন অগ্নিসংযোগে জ্বলিতেছে, সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে। অন্তরস্থিত প্রত্যেক শিরা যেন সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে।"

অতি এস্তে কাসেম যাইয়া পিতৃব্য হোসেনের সহিত পুনরায় সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাড়ির আর আর সকলেও আসিয়া জুটিলেন। সকলের সহিত আসিয়া জাএদাও একপাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হোসেনকে দেখিয়াই হাসান অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, আর নিস্তার নাই! আর সহ্য হয় না! আমার বোধ হইতেছে যে, কে যেন আমার অন্তরমধ্যে বসিয়া অস্ত্রাঘাতে বক্ষঃ, উদর এবং শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশী, সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে! ভাই! আমি এইমাত্র মাতামহ, মাতা এবং পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। মাতামহ আমার হস্ত ধরিয়া স্বর্গীয় উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। মাতামহ ও মাতা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "হাসান! তুমি সন্তুষ্ট হও যে, শীঘ্রই পার্থিব শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলে। এরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিদ্রাভঙ্গের সহিত স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছিল, সোরাহীর জল যেমন পান করিয়াছি, মুহূর্তে না যাইতেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এত বেদনা, এত কষ্ট, আমি কখনই ভোগ করি নাই।"

হোসেন দুঃখিত এবং কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি সকলই বুঝিয়াছি। আমি আপনার নিকট আর কিছু চাহি না। আমার এই ভিক্ষা যে, ঐ সোরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন। দেখি জলে কি আছে!" এই বলিয়া হোসেন সোরাহী ধরিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। হাসান পীড়িত অবস্থাতেই শশব্যস্তে "ও কি কর? হোসেন? ও কি কর?" এই কথা বলিতে বলিতে শয্যা হইতে উঠিলেন, –অনুজের হস্ত হইতে সোরাহী কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সোরাহী শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

অনুজের হস্ত ধরিয়া হাসান নিজ শয্যার উপর বসাইয়া মুখে বার বার চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই! আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব আঘাত, পূর্ব পীড়া, এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলই ভুলিয়াছি। ভাই? দেখ তো, আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্তিত হইয়াছে?

ভ্রাতার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলেন। আর সকলে বলিতে লাগিল, "আহা! জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদ-নীলিমা রেখা পড়িয়াছে?

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, –"ভাই! বৃথা কাঁদিয়া লাভ কি? আমার আর বেশি বিলম্ব নাই, চিরবিদায়ের সময় অতি নিকট। মাতামহ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই! মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন, সেখানে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুজজ্জিত দেখিলেন। একটি সবুজ বর্ণ, আর একটি লোহিত বর্ণ। কাহার ঘর, প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর করিল, "আপনার অন্তরের নিধি, হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুতলী হাসান হোসেনের জন্য এই দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।" ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী কাঁপিয়া নতশির হইল, কোন উত্তর করিল না। জিবরাইল সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি মাতামহকে বলিলেন, "আয় মোহম্মদ! দ্বারবান কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইয়াছে, আমি প্রকাশ করিব। আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্তকথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি, উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি। শ্রবণ করুন। সবুজ বর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য; লোহিত বর্ণ গৃহ কণিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে এক দল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষ পান করাইবে এবং মৃত্যুসময় হাসানের মুখ সবুজ বর্ণ হইবে; তন্নিমিত্তই গৃহটি সবুজ বর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্র দ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকচ্ছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিত বর্ণের কারণ।"– মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে, তখন পরমায়ুও আজ শেষ হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলংঘণীয়। ভাই! ঈশ্বরের কার্য অখণ্ডনীয়।

সবিষাদে ও সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার চির আজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং চির আশির্বাদের আকাঙ্খী;– মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুন তো, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে।"

"ভাই! তুমি কি জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি তাহার প্রতিশোধ নিবে?"

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভাবে দুঃখিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে, –এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকে, – আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষপান করাইয়াছে, – সে কি অমনই বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি এমনই দুর্বল, আমি কি এমনই নিঃসাহসী, আমি কি এমনিই ক্ষীণকায়, আমি কি এমনই কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কি রক্ত নাই, ভ্রাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারিব না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্য ধন সহোদর-রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, যে পাপিষ্ঠ

আজ তিনটি সতী স্ত্রীকে অকালে বিধবা করিল, আমি কি তাহার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোন সন্ধান জানিয়া থাকেন, যদি তাহাকে চিনিয়া থাকেন, যদি অনুমানে কিছু অনুভব করিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চিরকিঙ্করকে বলুন, আমি এখনই আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজন বনে, পর্বতগুহায়, অতল জলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানে হউক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।"

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "ভাই, স্থির হও! আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন। আমার কেবল এই মাত্র আক্ষেপ যে, অকারণে আমাকে নির্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে কি সুখমনে করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লোভেই হউক, যে আশায় হউক, নিরপরাধে যে আমাকে নির্যাতন করিয়া চিরবন্ধুর প্রাণ বধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনই পূর্ণ করিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না! যাহা হউক, ভাই! তাহার নাম আমি কখনই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ হিংসা দ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে না পারি, সে পর্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই! ক্রমেই আমার বাকশক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দিক যে অন্ধকারময় দেখিতেছি!" আবুয়ল কাসেমের হস্ত ধরিয়া হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্ত হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ভাই! ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া আজ আমি তোমার হাতে কাসেমকে দিলাম। কাসেমের বিবাহ দেখিতে বড় সাধ ছিল, পাত্রীও স্থির করিয়াছিলাম, সময় পাইলাম না।" হোসেনের হস্ত ধরিয়া আবার কহিলেন, "ভাই! ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধে, তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিও। আর ভাই! বিষদাতার যদি সন্ধান পাও, কিংবা কোন সূত্রে যদি ধরা পড়ে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না,– ঈশ্বরের দোহাই, তাহাকে ক্ষমা করিও।" –যন্ত্রণাকুল ইমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্যন্ত বলিয়া স্নেহবচনে কাসেমকে বলিলেন, "কাসেম! বৎস! আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। আর বাপ! এই কবচটি সর্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও। যদি কখনও বিপদগ্রস্ত হও, সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতেও কিছুই স্থির করিতে না পারে, তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্য করিও, যাহা লেখা দেখিবে সেইরূপ কার্য করিবে। সাবধান! তাহার অন্যথা করিও না।"

কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া উপর্যুপরি তিন চারিটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, "ভাই! ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও, কেবল জাএদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুক। জাএদার সহিত নির্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।"

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন। শয্যার নিকটে জাএদাকে ডাকিয়া হাসান চুপিচুপি বলিতে লাগিলেন, "জাএদা! তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন চিরদূর হইতেছে- আশীর্বাদ করি, সুখে থাক। তুমি যে কার্য করিলে, সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি।

তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম, বড়ই ভালবাসিতাম, – তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ! ভাল ! সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম! হোসেনকেও ক্ষমা করিতে, বলিয়াছি, তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ। –ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কি অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যিনি সর্বসাক্ষী, সর্বময়, সর্বক্ষমার অধীশ্বর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন কি না, বলিতে পারি না। তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে আমি সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিব। –যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।"

জাএদা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন। একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর সকলেই সেই গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হাসনেবানু ও জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের মার্জনা চাহিলেন। শেষে হোসেনকে কহিলেন, "হোসেন! এস ভাই! জন্মের মতন তোমার সহিত আলিঙ্গন করি।" – এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া অশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, "ভাই! সময় হইয়াছে। ঐ মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। চলিলাম!" – এই শেষ কথা বলিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় ইমাম হাসান সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন ইমাম হাসান মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন, সেই দিন হিজরী ৫০ সনের ১লা রবিয়ল আউয়াল তারিখ। হাসনেবানু, জয়নাব, কাসেম ও আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জাএদা কাঁদিয়াছিলেন কিনা, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

সপ্তদশ প্রবাহ

মদিনাবাসীরা হাসানের শোকে বড়ই কাতর হইলেন। পরিজনেরা দশ দিবস পর্যন্ত কে কোথায় রহিল, কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিল, কে কোথায় চলিয়া গেল, কেহই তাহার সন্ধান লইলেন না; সকলেই হাসানের শোকে দিবারাত্রি অজ্ঞান। পবিত্র দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতে না হইতে নৃশংস মন্ত্রী মারওয়ান দামেস্ক নগরে এজিদের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার সমুদয় কার্য শেষ হয় নাই, সেই জন্য স্বয়ং দামেস্ক যাত্রা করিতে পারিলেন না। ইমাম-বংশ একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে ছদ্মবেশে মদিনায় রহিয়াছেন। দামেস্ক হইতে ক্রমে ক্রমে সৈন্য আসিয়া পূর্বোক্ত পর্বতপ্রান্তস্থ গুপ্তস্থানে জুটিতেছে। হাসানের প্রাণ-বিয়োগের পর পরিজনেরা, – হাসনেবানু, জয়নাব, শাহরেবানু (হাসানের স্ত্রী) ও সখিনা (হোসনের কন্যা) প্রভৃতি শোকে এবং দুঃখে অবসন্ন হইয়া প্রায় মৃতবৎ হইয়া আছেন। হোসেন ও আবুয়ল কাসেম ঈশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া উপস্থিত শোকতাপ হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতেছেন। জাএদা নিজ চিন্তায় চিন্তিত ও মহাব্যতিব্যস্ত। কি করিবেন, হঠাৎ গৃহত্যাগ করিবেন কি না, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। মায়মুনার উপদেশে এত দূর পর্যন্ত

আসিয়াছেন; এক্ষণে তাহার কথাই বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে ধারণা হইল, আবার মায়মুনার শেষ কথা কয়েকটি এক্ষণে আরও ভাল লাগিল। কারণ জাএদা এখন বিধবা। পূর্বে গড়াপেটা সকলই হইয়া রহিয়াছিল, কেবল উত্তেজনা-রসানের সংযোগটি অপেক্ষা মাত্র। মায়মুনা পূর্বেই মারওয়ানের সহিত সমুদয় কথাবার্তা সুস্থির করিয়াছে, মারওয়ানও সমুদয় সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল জাএদার অভিমত অপেক্ষা। জাএদা আজকাল করিয়া তিন দিবস কাটাইয়াছেন; আজ আবার কি বলিবেন, কি করিবেন, নির্জনে বসিয়া তাহাই ভাবিতেছেন। আপন কৃতকার্যের ফলাফল ভাবিতেছেন; অদৃষ্টফলকের লিখিত লিপির প্রতি নির্ভর করিয়া সমুদয় চিন্তা দূর করিতেছেন। পতির চিরবিচ্ছেদে দুঃখ নাই, ভবিষ্যৎ আশায় এবং জয়নাবের প্রতিহিংসায় কৃতকার্য হইয়াও সুখ নাই। অন্তরে শান্তির নামও নাই। সর্বদাই নিতান্ত অস্থির।

মায়মুনা এই নির্জন স্থানে আসিয়া বলিতে লাগিল, "তিন দিন তো গিয়াছে। আজ আবার কি বলিবে?"

"আর কি বলিব? এখন সকলেই তোমার উপর নির্ভর। আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সকলই তোমার হাতে।"

"কথা কখনই গোপন থাকিবে না। পাড়া-প্রতিবেশীরা এখনই কানাঘুষা আরম্ভ করিয়াছে। যে যাহাকে বলিতেছে, সে তাহাকে অপরের নিকট বলিতে বারণ করিতেছে। ধরিতে গেলে অনেকেই জানিয়াছে, কেবল মুখে রৈ রৈ হৈ হৈ হয় নাই। হোসেন ভ্রাতৃশোকে পাগল, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় নিরত; আজ পর্যন্ত তোমার সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিবে। এ সাংঘাতিক সংবাদ শুনিতে কি আর বাকী থাকিবে? তোমার পক্ষ হইয়া কে দু'টা কথা বলিবে, বল তো?

"আমি যে তাহা না ভাবিয়াছি, তাহা নহে; আমার আশা আছে, সন্তোষ-সুখ ভোগের বাসনা আছে। যাহা করিব, পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এই তো রাত্রি অধিক হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর, এখনই আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই একটি বড় দুঃখ মনে রহিল যে, এখানে থাকিয়া জয়নাবের চির-কান্না শুনিতে পাইলাম না।– তাহার বৈধব্যব্রত দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটাইতে পারিলাম না।"

"খোদা যদি সে দিন দেন, তবে জয়নাবকে হাতে আনা কত ক্ষণের কাজ? জয়নাব কি আজ সেই জয়নাব আছে? এখন তো সে পথের ভিখারিণী। যে ইচ্ছা করিবে, সেই তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে। দেখ দেখি, শীঘ্র শীঘ্র সকল কাজ শেষ হইলে কত প্রকার মঙ্গলের আশা? জয়নাবকে লইতে কতক্ষণ লাগিবে? আবার বিবেচনা কর, বিলম্বে কত দোষের সম্ভাবনা। মানুষের মন ক্ষণ-পরিবর্তনশীল। তাহার উপরে একটু আসক্তির ভাবও পূর্ব হইতেই আছে; বাধা-প্রতিবন্ধক সকলই শেষ হইয়াছে;– জয়নাবও যে আপন ভাল মন্দ চিন্তা করিতেছে, তাহাও মনে করিও না; –ওদিকে আসক্তির আকর্ষণ, এদিকেও নিরুপায়। এখন স্বেচ্ছায় বশীভূত হইয়া শরণাগত হইলে সে যে কোথাও স্থান পাইবে না, সে যে আদৃত হইবে না, তাহার বিশ্বাস কি? শক্র-নির্যাতন মনের কষ্টের প্রতিশোধ লইতেই তোমার সঙ্গে এত কথা, –এমন প্রতিজ্ঞা। জয়নাবই যদি অগ্রে যাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তো তোমার সকল আশাই এই পর্যন্ত শেষ হইল। এদিকেও মজাইলে, ওদিক হারাইলে।"

"না–না, – আমি যে আজকাল করিয়া কয়েকদিন কাটাইয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। আমি আজ আর কিছুতেই থাকিব না। লোকের কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? –হাসনেবানু, জয়নাব, শাহরেবানু, এই তিনজনই আজ আমার নাম করিয়া অনেক কথা কহিয়াছে। দূর হইতে তাহাদের অঙ্গভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়াই আমি জানিয়াছি যে, সকলেই সকল কথা জানিয়াছে! হোসেনের কানে উঠিতেই বাকী। সঙ্গে আমি কিছুই লইব না। যেখানে যাহা আছে, সকলই রহিল, এই বেশেই চলিয়া যাইব।"

এই বলিয়া জাএদা উঠিলেন। সেই সঙ্গে মায়মুনাও উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্তিনী হইল। রাত্রি বেশি হয় নাই, অথচ হোসেনের অন্তঃপুর ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথের ন্যায় বোধ হইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ। দুঃখিত অন্তরে কেহ কেহ আপন আপন গৃহে শুইয়া কেহ কেহ বা বসিয়া আছেন। আকাশ তারাদলে পরিশোভিত, কিন্তু হাসান-বিরহে যেন মলিন মলিন বোধ হয়। সে বোধ, – বোধ হয় মদিনাবাসীদিগের চক্ষেই ঠেকিতেছে। বাড়ি-ঘর সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, যে স্থানে তিনি যে কার্য করিতেন, তাহা কেবল কথাতেই আছে, পরিজনের মনেই আছে, কিন্তু মানুষ নাই। চন্দ্রমাও মদিনাবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হাসানের পরিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, – মলিনভাবে অস্তাচলে চলিয়া গেলেন। জাএদাও যাহার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলেন, সে অপেক্ষা আর নাই। মনের আশা পূর্ণ হইল। এখন অন্ধকার। মায়মুনার সহিত জাএদা বিবি চুপি চুপি বাড়ির বাহির হইলেন। কাহারও সহিত দেখা হইল না। কেবল একটি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনস্বর জাএদার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাএদা দাঁড়াইলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তোকে কাঁদাইতেই এই কাজ করিয়াছি। যদি স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকিস, তবে আজ কেন, –চিরকালই কাঁদিবি। চন্দ্র, সূর্য, তারা, দিবা, নিশা সকলেই তোর কান্না শুনিবে। তাহা হইলেই কি তোর দুঃখ শেষ হইবে? তাহা মনে করিস না। যদি জাএদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জাএদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত? শুধু কাঁদাইয়াই ছাড়িবে না। আরও অনেক আছে।" এই তো আজ তোরই জন্য, –পাপীয়সী! – কেবল তোরই জন্য জাএদা আজ স্বামীঘাতিনী বলিয়া চিরপরিচিতা হইল; আজ আবার তোরই জন্য জাএদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।"

তীব্রস্বরে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে মায়মুনার সহিত দ্রুতপদে জাএদা বাড়ীর বাহির হইলেন। বাহির হইয়াই দেখিলেন, কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গমনোপযোগী বাহনাদির সহিত সম্মুখে উপস্থিত। কেহ কোন কথা বলিল না। সৈনিক পুরুষ মায়মুনার ইঙ্গিতে জাএদাকে অভিবাদন করিয়া বিশেষ মান্যের সহিত এক উষ্ট্রে আরোহণ করাইল। মায়মুনাও উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। কিছু দূর যাইবার পর ছদ্মবেশী মারওয়ান তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইলেন। নগরপ্রান্তের সেই নির্দিষ্ট পর্বতগুহার সন্নিকটে আসিয়া মায়মুনার সহিত মারওয়ানের অনেক শিষ্টাচার ও কথোপকথন হইল। অনন্তর মারওয়ান আরও বিংশতি জন সৈন্য সজ্জিত করিয়া জাএদার সহিত দামেস্কে পাঠাইয়া দিলেন।

রজনী প্রভাতে হোসেনের পরিজনেরা দেখিলেন, জাএদা গৃহে নাই। শেষে হোসেনও সেই কথা শুনিলেন। অনেক সন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই জাএদার সন্ধান পাওয়া গেল না। জাএদা যেন গৃহ-ত্যাগিনী হইল, সে কথা বুঝাইয়া বলিতে, কি বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। সকলেই বলিতে লাগিল, "কোন প্রাণে আপন হাতে বিষ পান করাইয়া

প্রাণের প্রিয়তম স্বামীর প্রাণ হরণ করিল? উহার জায়গা কোথায় আছে? জগৎ কি পাপভারে এতই ভারাক্রান্ত হইয়াছে যে, মহাপাপাক্রান্ত জাএদার ভার অকাতরে সহ্য করিবে? – স্বামী ঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে? – নরক কাহার জন্য? বোধ হয়, নরকেও জাএদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই।"

অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, যাহা হয় নাই, তাহাও ঘটাইলেন, জাএদা যাহা কখনও মনে ভাবে নাই, তাহাও কেহ কেহ রটাইয়া দিলেন। হোসেন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নূরনবী মোহাম্মদ মোস্তফার রওজা মোবারকের দিকে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন– বিষদাতার সন্ধান জানিলেও তাহাকে কিছুই বলিবেন না, তাহার প্রতি কোনরূপ দৌরাত্মাও করিবেন না। জাএদা মদিনায় নাই, থাকিলেও কিন্তু হোসেন অবশ্যই ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেন। এখনও তাহাই মনে করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ প্রবাহ

সে দুঃখের কথা কাহার মনে থাকে? নিশ্চয় সূর্য উদয় হইলে প্রাণ-বিয়োগ হইবে, একথা জানিয়াও যদি রাত্রে নিদ্রাভিভূত হয়, তাহা হইলে প্রভাতের ভাবী ঘটনার কথা কি সেই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভাগার মনে পড়ে? দিবসে সন্তান-বিয়োগ হইয়াছে, ঐ কুহকিনী আসিয়া চতুর্দিক অন্ধকার করিল, ক্রমে জগৎ নিস্তব্ধ করিল, অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকে আহ্বান করিল, সন্তানের বিয়োগজনিত দুঃখ কি তখন সন্তান-বিয়োগীর মনে থাকে?– জাএদা প্রমোদভবনে পরিচারিকাবেষ্টিতা হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে স্বর্ণপালঙ্কে কোমল শয্যায় শুইয়া আছেন। কত কি ভাবিতেছেন, তাঁহার তরঙ্গ অনেক। প্রথমতঃ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! তারপর রাজরাণী। এই প্রথম নিশাতেই সুখসোপানে আরোহণ করিয়াছেন। প্রভাত হইলেই রাজ-দরবারে নীত হইবেন, সুখের প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবেন, তৎপরেই গৃহপ্রবেশ। পরমায়ুর শেষ পর্যন্ত সুখ-নিকেতনে বাস করিবেন– মায়মুনা রাজরাণী হইবে না, – শুদ্ধ কেবল স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে মাত্র।

জাএদার শয্যার পার্শ্বেই নিম্নতর আর একটি শয্যায় মায়মুনা শয়ন করিয়া আছে। তাহার মনে কি কোন চিন্তা নাই? আশা নাই?– আছে। মারওয়ানের স্বীকৃত অর্থ মদিনায় বসিয়াই পাইতে পারিত, এত দূর আসিবার কারণ কিছু বেশী প্রত্যাশা। উভয়েই আপন আপন চিন্তায় চিন্তিত, উভয়েই নীরব। নিশার কার্য নিশা ভুলে নাই। ক্রমে ক্রমে উভয়েই নিদ্রার কোলে অচেতন। একবার এই সময়ে এজিদের শয়নগৃহটি দেখিয়া আসা আবশ্যক। আজ এজিদের মনের ভাব কিরূপ? এত আশা এবং এত সুখকামনার মধ্যে আবার কিসের পীড়া?

এজিদ আজ মনের মত মনতোষিণী সুরা পান করিয়া বসিয়া আছেন, এখনও শয়ন করেন নাই। সম্মুখে পান পাত্র, পেয়ালা এবং মদিরাপূর্ণ সোরাহী ধরা রহিয়াছে। রজত-প্রদীপে সুগন্ধি তৈলে আলো জ্বলিতেছে। জনপ্রাণী মাত্র সে গৃহে নাই। গৃহের দ্বারে কিঞ্চিৎ দূরে নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রহরী সতর্কিতভাবে প্রহরিতা করিতেছে। মদ্যপানে অজ্ঞানতা জন্মে, সাধ্যাতীত ব্যবহার করিলে মানব প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। মানুষ তখন পশু হইতেও নীচ হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধ্য-সমতার অতীত না হইলে বোধ হয়, অতি

জঘন্য হৃদয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ভাবও আসিয়া উপস্থিত হয়। এজিদ আজ একা একা অনেক কথা বলিতেছেন। বোধ হয়, সুরাদেবীর প্রসাদে তাঁহার পূর্বকৃত কার্য একে একে স্মরণ পথে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম জয়নাবকে দর্শন, –তাহার পর পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ, – তাহার পর মাবিয়ার রোষ– পরে আশ্বাস প্রাপ্তি, আব্দুল জব্বারের নিমন্ত্রণ, কল্পিতা ভগ্নীর বিবাহ প্রস্তাব, অর্থ-লালসায় আব্দুল জব্বারের জয়নাব পরিত্যাগ, বিবাহের জন্য কাসেদ প্রেরণ– বিফল মনোরথে কাসেদের প্রত্যাগমন, – পীড়িত পিতার উপদেশ – প্রথম কাসেদের শরনিক্ষেপে প্রাণসংহার, মোসলেমের প্রাণদণ্ড, – হাসানের সহিত যুদ্ধঘোষণা, – যুদ্ধে পরাজয়ের পর নতুন মন্ত্রণা, – মায়মুনা এবং জাএদার সহায়ে হাসানের প্রাণবিনাশ, মারওয়ানের প্রভুভক্তি, – জাএদা ও মায়মুনার দামেস্কে আগমন, –প্রমোদভবনে স্থান নির্দেশ। এজিদ ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেন। সুরাপ্রভাবে মনের কপটতা দূর হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা ঐ সময়ে অন্তর হইতে অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। আজ এজিদের চোখের জল পড়িল; কেন পড়িল? কে বলিবে? পাষাণময় অন্তর আজ কেন কাঁদিল? কে জানি? কি আশ্চর্য! যদি সুরার প্রভাবে এখন এজিদের চির-কলুষিত পাপময় কুটিল অন্ত রে সরলভাবে পবিত্রতা আসিয়া থাকে, তবে সূরে! তোমাকে শত শত বার নমস্কার। শত শত বার ধন্যবাদ। জগতে যদি কিছু পুনর্বার আমি ভক্তিভাবে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। এজিদ আর এক পাত্র পান করিলেন। কোন কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমোদভবনে জাএদা ও মায়মুনা নিদ্রিত, রাজপ্রাসাদে এজিদ নিদ্রিত; মদিনায় হাসানের অন্তঃপুরে হাসনেবানু নিদ্রিত; জয়নাবও বোধ হয় নিদ্রিত। এই কয়েকটি লোকের মনোভাব পৃথক পৃথক রূপে পর্যালোচনা করিলে, ঈশ্বরের অপার মহিমার একটি অপরিসীম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ইহারা সকলেই নিদ্রিতাবস্থায় আপন আপন মনোমত ভাবের ফলানুযায়ী স্বপ্নে মাতিয়া থাকেন, তবে কে কি দেখিতেছেন? বোধ হয় জয়নাব আলুলায়িত কেশে, মলিন বসনে, উপাধানশূন্য মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া, –হাসানের জীবিতকালের কার্যকলাপ অর্থাৎ বিবাহের পরবর্তী ঘটনাবলী, –যাহা তাঁহার অন্তরে চিরনিহিত রহিয়াছে, তাহারই কোন না কোন অংশ লইয়া স্বপ্নে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। হাসনেবানুও স্বপ্নযোগে স্বামীর জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহের কান্তি দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। স্বর্গের অপরিসীম সুখভোগে লালায়িত হইয়া ইহজীবন ত্যাগে স্বামী পদপ্রান্তে থাকিতে যেন ঈশ্বরের নিকট কতই আরাধনা করিতেছেন। জাএদা বোধ হয়, এক এক বার ভীষণ মূর্তি স্বপ্নে দেখিয়া নিদারুণ আতঙ্কে জড়সড় হইতেছেন, ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না, পালাইবার উপযুক্ত স্থানও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। স্বপ্নকুহকে এস্তপদে যাইবার শক্তি নাই, মনে মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতই মিনতি করিতেছেন। আবার সে সকলই যেন কোথায় মিশিয়া গেল। জাএদা যেন রাজরাণী, শত শত দাসী-সেবিতা, এজিদের পাটরাণী, সর্বময় গৃহিণী। আবার যেন তাহাও কোথায় মিশিয়া গেল। জাএদা যেন স্বামীর বন্দিনী। প্রাণবিনাশিনী বলিয়া অপরাধিনী, – ধর্মাসনে এজিদ যেন বিচারপতি। মায়মুনা টাকার ভার আর বহিতে ও সহিতে পারিতেছে না। এত টাকা লইয়া কি করিবে? কোথায় রাখিবে? আবার যেন ঐ টাকা কে কাড়িয়া লইল! মায়মুনা কাঁদিতেছে। টাকা-অপহারক

বলিতেছে,– "নে পাপীয়সি! এই নে! তোর এ পাপপূর্ণ টাকা লইয়া কি করিব? এই বলিয়া টাকা নিক্ষেপ করিয়া মায়মুনার শিরে যেন আঘাত করিতে লাগিল। মায়মুনা কাঁদিয়া অস্থির। তাহার কান্নার রবে জাএদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এজিদের বিচার হইতেও তিনি নিস্কৃতি পাইলেন।

যে গৃহে জাএদা ও মায়মুনা, সেই শয়নগৃহে আর আর সকলে নিদ্রিত; কেবল তাঁহারা দুইজনেই জাগিয়া আছেন। উভয়ে পরস্পর অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

এজিদ সুরাপ্রভাবে ঘোর নিদ্রাভিভূত। অনেক দিনের পর পিতাকে আজই বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াই বলিলেন– "আমাকে রক্ষা করুন। আমি আর কখনই হাসানের অনিষ্ট করিব না।"

মাদকতার অনেক লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পিপাসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি। শয়নকক্ষে সুশীতল জলপূর্ণ স্বর্ণসোরাহী ছিল, জলপান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। শুকতারা উদয় দেখিয়া আর ঘুমাইলেন না; –প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া রাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। এদিকে জগৎ-লোচন রবিদের সহস্র কর বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, –কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়! শুকতারা অন্তর্দ্ধান, ঊষার আগমন ও প্রস্থান, দেখিতে দেখিতে সূর্যদেবের অধিষ্ঠান। এজিদের প্রকাশ দরবার দেখিবার আশয়েই যেন লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পূর্বাকাশপতি হাসিতে হাসিতে পূর্বাকাশে দেখা দিলেন– হাসিতে হাসিতে দামেস্ক নগরীকে জাগরিত করিলেন। স্বামীহন্ত্রী জাএদাকে এজিদ পুরস্কৃত করিবেন, সাহায্যকারিণী মায়মুনাকেও অর্থদান করিবেন, জাএদাকে পাটরাণীরূপে গ্রহণ করিবারও ইচ্ছা আছে; সূর্যদেব প্রতি ঘরে ঘরে স্বকীয় কিরণ বিকীরণের সহিত ঐ কথাগুলি ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মহারাজ এজিদ খাস্ দরবারে বার দিলেন। প্রহরিগণ সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অমাত্যগণ এবং পূর্বাহূত নগরস্থ প্রধান প্রধান মাননীয় মহোদয়গণ স্ব স্ব স্থান পূর্ণ করিয়া দরবারের শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন। জাএদা ও মায়মুনা পূর্ব আদেশ অনুসারে পূর্বেই দরবারে নীত হইয়াছিলেন।

শাহী তক্তের বাম পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীলোক। জাএদা রজতাসনে আসীনা, মায়মুনা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা। জাএদার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। যাঁহারা জাএদার কৃতকার্যবিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত, অথচ ইমাম হাসানের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহারা জাএদার সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ঘর্মাক্ত ললাট, বিস্ফোরিত লোচন ও আয়ত ভ্রূযুগলের প্রতি ঘন ঘন সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এজিদ বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, হাসান আমার চিরশত্রু ছিল, নানা প্রকারে আমার মনে কষ্ট দিয়াছে। আমি কৌশল করিয়া এই সিংহাসন রক্ষা করিয়াছি; সেই চিরশত্রু হাসান কোন বিষয়েই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না; তত্রাচ তাহার বংশগৌরব এত প্রবল ছিল যে, নানা প্রকার অযথা কটূক্তি দ্বারা সর্বদাই আমার মনে ব্যথা দিয়াছে। আমি সে দিকে লক্ষ্য করি নাই। রাজ্য বিস্তারই আমার কর্তব্য কার্য। বিশেষ মদিনারাজ্যের শাসনভার নিঃসহায়, নির্ধন ভিখারীর হস্তে থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ কাসেদের দ্বারা তাহাদিগকে আমার বশ্যতা স্বীকার করিবার আদেশ করা হইয়াছিল। সে কথা তাহারা অবহেলা করিয়া কাসেদকে বিশেষ তিরস্কারের সহিত দামেস্ক সিংহাসনের অবমাননা করিয়া, আমার লিখিত পত্র

শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া, উত্তরস্বরূপ সেই কাসেদের হস্তে পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিল। সেই কারণেই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। প্রিয় মন্ত্রী মারওয়ানকে সেই যুদ্ধে "সেপাহ-শালার" (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) পদে বরণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসহ হাসানকে বাঁধিয়া আনিতে মদিনায় প্রেরণ করি। আমার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাসানের পক্ষে মিলিত হয় এবং দামেস্কের অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত করে। কি করি, চিরশত্রু দমন না করিলেও নহে, এ দিকে সৈন্যদিগের চক্রে বাধ্য হইয়া হাসানের প্রাণ কৌশলে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা হয়। এই যে কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্টা বিবি মায়মুনাকে দেখিতেছেন, ইহার কল্যাণে– আর এই রজতাসনে উপবিষ্টা বিবি জাএদার সাহায্যে আমার চিরশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। বিবি জাএদা আমার জন্য বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকবার স্বহস্তে আপন স্বামী হাসানকে বিষপান করাইয়াছিলেন, শেষে হীরক-চূর্ণ জলে মিশাইয়া পান করাইলেন। তাহাতেই চিরশত্রু– আমার চিরশত্রু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি এই মহোদয়ার কৃপাতেই শত্রুবিহীন হইয়াছি, এই গুণবতী রমণীর অনুগ্রহেই আমি প্রাণে বাঁচিয়াছি, এই সদাশয়া ললনার কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে। বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রমের ফল এই মহামতি যুবতীর দ্বারা সুপক্ক হইয়া ফলিয়াছে। আর এই বিবি মায়মুনা, ইহার সহিত এই কথা ছিল যে, যে কৌশলে, যে কুহকেই হউক, হাসানকে প্রাণে মারিতে পারিলে ইনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।"

ইঙ্গিতমাত্র কোষাধ্যক্ষ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ থলিয়া আনিয়া বিবি মায়মুনার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে পূর্ব স্থানে পূর্ববৎ করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

এজিদ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "রজতাসন-পরিশোভিতা এই বিবি জাএদার সহিত এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, যদি ইনি স্বীয় প্রিয়তম পতির প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন, তবে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মূল্যবান বস্ত্র ও মণিময় অলঙ্কার দান করিয়া ইহাকে রাজসিংহাসনে বসাইব।" সঙ্কেতমাত্র কোষাধ্যক্ষ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূরিত কয়েকটি রেশম বস্ত্রের থলিয়া, রত্নময় অলঙ্কার এবং কারুকার্যখচিত বিচিত্র বসন জাএদার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া এজিদ আবার বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, তবে বিবি জাএদা এই সিংহাসনে আমার বাম পার্শ্বে আসিয়া বসুন।– বিবি জাএদা! আপনি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আমিও আমার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করি।"

জাএদা মনে মনে ভাবিলেন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও মোহর, সকলই তো পাইয়াছি; এক রাজরাণী হওয়াই বাকী ছিল, রাজা যখন নিজেই তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিতে আদেশ করিতেছেন, তখন সে আশাও পূর্ণ হইল। বিবাহ না হয় পরেই হইবে। রাজরাণী করিয়া আর আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া বুদ্ধিমতী জাএদা সন্তুষ্ট হৃদয়ে রজতাসন পরিত্যাগপূর্বক রাজ সিংহাসনে এজিদের বাম পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এজিদ বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আমার কয়েকটি কথা আছে। আপনারা সকলেই মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়া এজিদ সিংহাসন ছাড়িয়া একেবারে নীচে নামিলেন। জাএদা আর তখন কি বলিয়া সিংহাসনে বসিয়া

থাকিবেন, সলজ্জভাবে অতি এস্তে তিনিও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সভাস্থলে এজিদের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইলেন।

এজিদের রাজ্য স্রোত বাক্য হইল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। জাএদার সিংহাসন পরিত্যাগ দেখিয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমার শত্রুকে এই বিবি জাএদা বিনাশ করিয়াছেন, আমি ইঁহার নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞতা গুণে আবদ্ধ থাকিলাম। কিন্তু সামান্য অর্থ লোভে এমন প্রিয়তম নির্দোষ পতির প্রাণ যে রাক্ষসী বিনাশ করিয়াছে, তাহাকে আমি কি বলিয়া কোন বিশ্বসে আমার জীবনের চির সঙ্গিনী সহধর্মিণী পদে বরণ করিয়া লইব? আমার প্রলোভনে ভুলিয়া যে পিশাচী এক স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিল, অন্য কাহারও প্রলোভনে ভুলিয়া সে পিশাচী আমার প্রাণও তো অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে! যে স্ত্রী স্বামীঘাতিনী, স্বহস্তে স্বামীর প্রাণ বধ করিতে, যে একবার নয়, দুইবার নয়, কয়েকবার বিষ দিয়া শেষবারে কৃতকার্য হইল, আমি দণ্ডধর রাজা, তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা কি আমার কর্তব্য নহে? ইহার ভার আমি আর কাহারও হস্তে দিব না, পাপীয়সীর শাস্তি আমি গত রাত্রে আমার শয়ন মন্দিরে বসিয়া যাহা সাব্যস্ত করিয়াছি, তাহাই পালন করিব।" এই কথা বলিয়াই কটীবন্ধসংযুক্ত দোলায়মান অসি-কোষ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি রোষভরে নিষ্কোষিত করিয়া জাএদার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! স্ত্রী হইয়া স্বামীবধের প্রতিফল ভোগ কর। প্রিয় পতির প্রাণহরণের প্রতিফল!" এই বলিয়া কথার সঙ্গে সঙ্গেই এজিদ স্বহস্তে এক আঘাতে পাপিনী জাএদাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। শোণিতের ধারা ছুটিল। এজিদের অসি জাএদার রক্তে রঞ্জিত হইল! কি আশ্চর্য!

অসিহস্তে গম্ভীরস্বরে এজিদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ঐ কুহকিনী মায়মুনার শাস্তি আমি স্বহস্তে বিধান করিব না! আমার আজ্ঞায়, উহার অর্দ্ধশরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া প্রস্তর-নিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেল।" আজ্ঞাবহ প্রহরিগণ মায়মুনার হস্ত ধরিয়া দরজার বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। মাটিতে অর্দ্ধদেহ পুঁতিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিল। স্বপ্ন আজ মায়মুনার ভাগ্যে সত্য সত্য ফলিয়া গেল। সভাস্থ সকলেই "যেমন কর্ম তেমনি ফল" বলিতে বলিতে সভাভঙ্গের বাদ্যের সহিত সভাভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। এজিদ হাসান-বধ শেষ করিয়া হোসেন-বধে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও এই উপযুক্ত অবসরে দামেস্ক নগর পরিত্যাগ করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ঊনবিংশ প্রবাহ

মারওয়ান ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নগরীর প্রান্তভাগে যে স্থানে পূর্বে শিবির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনরায় সৈন্যাবাস রচনা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ সৈন্য দামেস্ক হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে, তাহার সহায়ে হোসেনের তরবারির সম্মুখে যাইতে কিছুতেই সাহসী হইলেন না। দামেস্ক হইতে আর কোন সংবাদও আসিতেছে না। জাএদা ও মায়মুনাকে সেই নিশীথ সময়ে কয়েকজন প্রহরী সমভিব্যাহারে দামেস্কে পাঠাইয়াছেন, এ পর্যন্ত তাহার আর কোন সংবাদ পাইতেছেন না, তাঁহারা নির্বিঘ্নে পৌঁছিলেন কি না, তাঁহার অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রা জাএদা ও

মায়মুনা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, জাএদাকে অতিরিক্তরূপে বহুমূল্য কারুকার্যখচিত রত্নময় বসন-ভূষণ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা জাএদা প্রাপ্ত হইয়াছে কি না– মনে মনে এই ভাবনা। আর একটি কথা, – জাএদা পাটরাণী হইয়া এজিদের শোভা করিতেছেন কি না, তাহাও জানিতে পারিতেছেন না, বিষম ভাবনা। এমরানকে কহিলেন, "ভাই এমরান! তুমি সৈন্যসামন্তের তত্ত্বাবধায়ণ কার্যে সর্বদা সতর্ক থাক, আমি ছদ্মবেশে যে সকল সন্ধান, যে সকল গুপ্ত বিবরণ নগরের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া প্রায় প্রতিদিন জানিয়া আসিয়াছি, ওতবে অলীদ আমার সেই কার্য করিবেন। আমি কয়েক দিনের জন্য দামেস্ক যাইতেছি। যদিও আমার যাইবার উপযুক্ত সময় নয়, কিন্তু কি করি, বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে। তোমরা সাবধানে থাকিও। কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। আমি দামেস্ক হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হোসনে-বধে প্রবৃত্ত হইব।" এই বলিয়া মারওয়ান দামেস্ক যাত্রা করিলেন।

নিয়মিত সময়ে মারওয়ান দামেস্কে যাইয়াই– জাএদা ও মায়মুনার বিচার শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কি করিবেন, আর কোন উপায় নাই। সময় মত এজিদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, মদিনার উপস্থিত বিবরণ সমুদয় এজিদের গোচর করিয়া পুনরায় মদিনা-গমনের কথা পাড়িলেন। প্রধানমন্ত্রী হামান যুদ্ধে অমত প্রকাশ করিয়া কয়েকদিন মারওয়ানকে মদিনা গমনে ক্ষান্ত রাখিলেন।

সভামণ্ডপে সকলেই উপস্থিত আছেন। মারওয়ানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিতে লাগিলেন, "মারওয়ান! আমার আশা-লতার কেবলমাত্র বীজবপন হইয়াছে; কতকালে যে প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া মনের আনন্দে নয়নের প্রীতি জন্মিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এখন বিশ্রামের সময় নয়, আমোদ-আহ্লাদেরও সময় নয়, নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার কার্য নয়। অনেক রহিয়াছে;– এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। একটি নরসিংহকে বধ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তত্তুল্য আর ও একটি সিংহ বর্তমান। সিংহশাবকগুলিও বড় ভয়ানক! এ সমুদয়কে শেষ না করিতে পারিলে আমার মনের আশা কখনই পূর্ণ হইবে না। এখন আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল-জ্ঞাত করিতে হইবে। হোসেনের রোষাগ্নি ও কাসেমের ক্রোধ-বহ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে। আলী আকবর, আলী আসগার, আবদুল্লা আকবর, জয়নাল আবেদীন– ইহারা যদিও শিশু, কিন্তু পিতৃব্যবিয়োগজনিত দুঃখে কাতর না হইয়াছে, এমন মনে করিও না। ইহার প্রতিফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জাএদার দ্বারা এই সাংঘাতিক কার্য করাইয়াছে। জাএদা বাঁচিয়া থাকিলেও– হাসান-বংশের ক্রোধানলের কিঞ্চিৎ অংশ হইতে বাঁচিতে পারিত, কিন্তু এখন তাহা মনে করিও না। সে ক্রোধানল সম্যকরূপে এক্ষণে আমাদের শিরে পড়িয়া আমাদিগকে দগ্ধীভূত করিবে।– পূর্ব হইতেই সে আগুন নির্বাণের চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহারা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর কয়দিন থাকিবে? মহাবীর কাসেম চিরবৈরী বিনাশ করিতে, পিতার দাদ উদ্ধার করিতে একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে। তখন কি আর রক্ষা থাকিবে? আর সময় দেওয়া উচিত নহে। যত শীঘ্র হয়, হাসান-হোসেনের বংশবিনাশে যাত্রা কর। উহাদের একটিও যদি জগতে বাঁচিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানিও, এজিদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে– তোমাদের সকলের শোণিতেও হাসানপুত্রের তরবারি রঞ্জিত করিয়া পরমায়ু শেষ করিয়াছে। ঐ সকল সিংহশাবককে যুদ্ধে, কৌশলে, ছলে যে কোন

উপায়ে হউক, জগৎ হইতে অন্তর না করিলে কাহারও অন্তরে আর কোন আশা নাই,– নিশ্চয় জানিবে, কাহারও নিস্তার নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী হামান গাত্রোত্থানপূর্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "রাজাজ্ঞা আমার শিরোধার্য! কিন্তু আমার কয়েকটি কথা আছে। অভয়দান করিলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

এজিদ বলিলেন, "তোমার কথাতেই তো কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াছি। যদি তুমি আমার এই সকল চিরশত্রু বিনাশের আমা অপেক্ষা আর কোন ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, কিংবা আমার বিবেচনার ত্রুটি, চিন্তার ভুল, যুক্তিতে দোষ বিবেচনা কর, অবশ্য বলিতে পার।"

করপুটে হামান বলিলেন, "বাদশাহ-নামদার! অপরাধ মার্জনা হউক। হাসান আপনার মনোবেদনার কারণ– যে হাসান আপনার মনঃকষ্টের মূল, যে হাসান আপনার প্রথম বয়সের প্রণয়সুখ, ভোগের সরল পথের বিষম কন্টক, যে হাসান আপনার নবপ্রণয়ের বাহ্যিক বিরোধের পাত্র, যে হাসান আপনার অন্তরের ভালবাসা-প্রস্ফুটিত জয়নাব-কুসুমের বিধিসঙ্গত অপহারী, যে হাসান আপনার শত্রু–সে তো এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই! আপনার ব্যথিত হৃদয়ে ব্যথা দিয়া জয়নাব-পত্ন-লাভকারী সেই হাসান তো আর ইহজগতে নাই! জয়নাবের হৃদয়ের ধন অমূল্য নিধি, সুখ-পুষ্পের আশালতা, সেই হাসান তো আর বাহ্যজগতে জীবিত নাই! তবে আর কেন? প্রতিশোধের বাকী আছে কি? জয়নাব যেমন আপনার মনে ব্যথা দিয়া হাসানকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেদনা– তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ মনোবেদনা সে ভোগ করিতেছে। তাহার সুখতরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিনা তুফানে আজ কয়েক দিন হইল ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার মনোবাঞ্ছিত– স্বেচ্ছাবরিত পতিধন হইতে সে তো একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে! তবে আর কেন? পূর্বস্বামী হইতে পরিত্যাক্তা হইয়া সে যেমন অনাথিনী হইয়াছিল, আপনাকে স্বামীত্বে বরণ না করিয়া আজিও সেই জয়নাব সেইরূপে পথের কাঙ্গালিনী ও পথের ভিখারিণী! বাদশাহ-নামদার! জগৎ কয় দিনের? সুখ কয় মুহূর্তের? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, – নিরপেক্ষভাবে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, হাসান কি আপনার শত্রু? হাসান আপনার রাজ্য আক্রমণ করে নাই, আপনার প্রাণবধে অগ্রসর হয় নাই, জয়নাবকে কৌশলেও হস্তগত করে নাই, সকলই আপনার বিদিত আছে। হইতে পারে, একটি ভালবাসা জিনিসের দুইটি গ্রাহক হইলে পরস্পর জাতক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে ঘটনায় হাসানের অপরাধ কি? সে মীমাংসা স্বয়ং জয়নাবই করিয়াছে। তাহার শাস্তিও হইল। অধিক হইয়াছে। এক্ষণে হোসেনের প্রাণবধ করা, কি হাসানের পুত্রের প্রাণ হরণ করা মানুষের কর্তব্য নহে। বলুন তো, কি অপরাধে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন? এখন পর্যন্তও হোসেনের ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। পিতৃহীন হইলে যে কি মহাকষ্ট, তাহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। কাসেম এত অল্প সময়ে কি তাহা ভুলিয়াছে? আজ পর্যন্ত উদরে অন্ন যায় নাই, চক্ষের জল নিবারণ হয় নাই, হাসনেবানুর অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, জয়নাবের কথা আর কি বলিব না। মদিনার আবালবৃদ্ধ, এমন কি পশুপক্ষীরাও "হায় হাসান! হায় হাসান! করিয়া কাঁদিতেছে। বোধ হয়, বক্ষে করাঘাতে কাহারও কাহারও বক্ষ ফাটিয়া শোণিতের ধারা বহিতেছে! তথাচ "হায় হাসান! হায় হাসান!" রবে জগৎ কাঁদিতেছে।

যে শুনিতেছে, সেই মুখে বলিতেছে, "হায় হাসান! হায় হাসান!" এ অবস্থায় কি আর যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইতে আছে? এই ঘটনায় কি আর ভ্রাতৃবিয়োগীর প্রতি তরবারি ধরিতে আছে? এই দুঃখের সময় কি অনাথা পতিহীনা স্ত্রীগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আছে? হায়! হায়! সেই পিতৃহীন পিতৃব্যহীন বালকদিগের মুখের প্রতি চাহিয়া কি কেহ কাঁদিবে না? এখন তাহারা শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন, অসীম কাতর; এ সময় আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। শত্রু-বিনাশের পর শত্রু-পরিবার আপন পরিবার মধ্যে পরিগণিত, –ইহাই রাজনীতি এবং ইহাই রাজপদ্ধতি। এই অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী জগতের প্রতি অকিঞ্চিৎরূপে দৃষ্টিপাত করাই কর্তব্য। ঈশ্বরের মহিমা অপার। তিনি বিজন বনে নগর বসাইতেছেন, মনোহর নগরকে বনে পরিণত করিতেছেন, কাহাকে হাসাইতেছেন, কাহাকে কাঁদাইতেছেন, কাহাকে মনের আনন্দে, মনের সুখে রাখিতেছে, মুহূর্ত সময় অতীত হইতে না হইতে আবার তদ্বিপরীতে করিতেছেন, মাতঙ্গ-মস্তকেও পতঙ্গের দ্বারা পদাঘাত করাইতেছেন। আজ যে অতুল ধনের অধিকারী, কাল সে পথের ভিখারী।–সেই–" •

এজিদ নিস্তব্ধভাবে মনোনিবেশপূর্বক শুনিতেছিলেন। দুষ্ট মারওয়ান প্রধানমন্ত্রী হামানের কথা শেষ হইতে না হইতেই রোষভরে বলিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ হইলে মানুষের যে বুদ্ধিশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা সত্য। ইহাতে যে একটু সন্দেহ ছিল, তাহা আজ আমাদের প্রধান উজীরের কথায় একেবারে দূর হইল। মহাশয়! ধন্য আপনার বক্তৃতা! ধন্য আপনার বুদ্ধি! ধন্য আপনার ভবিষ্যৎ-চিন্তা! ধন্য আপনার রাজনীতিজ্ঞতা! ধন্য আপনার বহুদর্শিতা! ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব! এক ভ্রাতা শত্রু দ্বিতীয় ভ্রাতা মিত্র,– ইহা কি কখনও সম্ভব? কোন পাগলে এ- কথা না বুঝিবে? সময় পাইলেই তাহার প্রতিশোধ লইবে। এক্ষণে তাহারা কেবল সময় আর অবসর খুঁজিতেছে। যে জয়নাবের সুখের তরী ডুবিয়া গিয়াছে বলিতেছেন, সে জয়নাবকেও কম মনে করিবেন না। তাহাদের কাহাকেও জানিতে বাকী নাই। জাএদা আমাদের পরামর্শ মত হাসানকে বিষপান করাইয়াছে। এই উপযুক্ত সময়ে যদি উহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করা না যায়, তবে কোন না কোন সময় আমাদিগকে ইহার ফল ভুগিতেই হইবে। আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, না হয় আপনি স্মরণার্থে লিখিয়া রাখুন, হাসানের বিষপানজনিত তাহাদের রোষানল শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া একে একে দামেস্কের সকল লোককে দগ্ধীভূত করিবে। কার সাধ্য হোসেনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়? কার সাধ্য কাসেমের তরবারি হইতে প্রাণরক্ষা করে? এ সিংহাসন কাসেমের উপবেশরনের জন্য পরিস্কৃত থাকিবে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আপনার বুদ্ধির অনেক ভ্রম হইয়াছে। পরকাল ভাবিয়া, জগতের অস্থায়িত্ব বুঝিয়া, নশ্বর মানব-শরীর চিরস্থায়ী নহে স্মরণ করিয়া রাজ্যবিস্তারে বিমুখ, শত্রদমনে শৈথিল্য, পাপভয়ে রাজকার্য ক্ষান্ত হওয়া নিতান্তই মূঢ়তার কার্য। আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া হাসানের বংশের সহিত সভ্যভাব সৃজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; আমি বলিতেছি, তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করাই উচিত এবং কর্তব্য। এমন শুভ অবসর আর পাওয়া যাইবে না। শত্রুকে সময় দিলেই দশ গুণ বলদান করা হয়, এই কথাটি আপনি ভুলিয়াছেন? যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মদিনা হইতে সৈন্যগণ উঠাইয়া আনিলে কত পরিমাণ বলের লাঘব হইবে? নায়কবিহীন হইলে তাহার পশ্চাদ্বর্তী নেতৃদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে কতক্ষণ লাগে?"

হামানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিলেন, "মারওয়ান যাহা বলিতেছেন, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত! আমি আপনার মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। যত বিলম্ব ততই অমঙ্গল। এই যুদ্ধের প্রধান নায়কই মারওয়ান। মারওয়ানের মতই আমার মনোনীত। শক্রকে অবসর দিতে নাই, দিব না। মারওয়ান! আর কোন কথাই নাই; যে পরিমাণ সৈন্য মদিনায় প্রেরিত হইয়াছে, আমি তাহার আর চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এখানে রাখিয়াছি। যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, লইয়া মদিনায় যাত্রা কর; আমি এক্ষণে হোসেনের মস্তক দেখিতেই উৎসুক রহিলাম। প্রথমে হোসেনের মস্তক দামেস্কে পাঠাইবে, তাহার পর জয়নাব ও হাসনেবানু প্রভৃতি সমুদয়কে কারাবদ্ধ করিয়া আনিবে।" এই আজ্ঞা করিয়াই পাষাণে গঠিত নির্দয়হৃদয় এজিদ সভা ভঙ্গ করিলেন। মারওয়ান রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইয়া এজিদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

বিংশ প্রবাহ

মারওয়ান সৈন্যসহ মদিনায় আসিলেন। অলীদের মুখে সবিস্তারিত সমস্ত শুনিলেন। হাসানের মৃত্যুর পর হোসেন অহোরাত্র রওজা শরীফে বাস করিতেছেন, এ কথায় মারওয়ান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পবিত্র রওজায় যুদ্ধ করা নিতান্তই দুর্বুদ্ধিতার কার্য; সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে সাহসও হয় না। যুদ্ধ আহ্বান করিলেও হোসেন কখনই তাঁহার মাতামহের সমাধিস্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবেন না। মারওয়ান বিশেষরূপে এই সকল কথার আন্দোলন করিয়া অলীদকে জিজ্ঞাস করিলেন, ভাই ইহার উপায় কি? আমার প্রথম কার্য হোসেনের মুণ্ড লাভ, শেষ কার্য তাহার পরিবারকে বন্দী করিয়া দামেস্ক নগরে প্রেরণ। হোসেনের মস্তক হস্তগত না করিলে, শেষ কার্যটি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব!– কি উপায়ে হোসেনকে মোহাম্মদের সমাধিক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিবেন, এই চিন্তাই তখন তাঁহাদের প্রবল হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা, বহু কৌশল করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। একদিন মারওয়ান ওতবে অলীদের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া উভয়েই ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে পবিত্র রওজায় উপস্থিত হইলেন। রওজা-মধ্যে প্রবেশের পথ নাই; বিশেষ অনুমতিও নাই। রওজার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানির্দিষ্ট রেল ধরিয়া হোসেনের তত্ত্ব ও সন্ধান জানিতে লাগিলেন। হোসেন ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে ঐ অবস্থাতেই রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপাসনা সমাধা হইবা মাত্রই ছদ্মবেশে মারওয়ান বলিলেন, 'হযরত! আমরা কোন বিশেষ গোপনীয় তত্ত্ব জানাইতে এই নিশীথ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি।"
হোসেন বলিলেন, "হে হিতার্থী ভ্রাতৃদ্বয়! কি গোপনীয় তত্ত্ব দিতে আসিয়াছেন? জগতে ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আমার আর কোন আশা নাই। গোপন তত্ত্বে আমার কি ফল হইবে? আমি কোন গোপনীয় তত্ত্ব জানিতে চাহি না।"
ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, "আপনি সেই তত্ত্বের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে কোনরূপ ফল আছে কিনা।"
হোসেন আগন্তুকদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃদয়! নিশীথ সময়ে অপরিচিত আগন্তুকের রওজার মধ্যে আসিবার নিয়ম নাই, আপনারা বাহিরে থাকিয়াই যাহা বলিতে হয়, বলুন।"

ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, "আপনি আমাদের কথায় যদি প্রত্যয় করেন, তবে মনের কথা অকপটে বলি। আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই আমরা ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে আপনার নিকটে আসিয়াছি। এজিদের চক্রান্তে জাএদা যে কৌশলে ইমাম হাসানকে বিষপান করাইয়াছেন, তাহার কোন অংশই আমাদের অজানা নাই। কি করি, – কর্ণে শুনি, মনের দুঃখ মনেই রাখি, গোপনে চক্ষের জল, অতিকষ্টে সংবরণ করি। হাসানের বিষপান বিষয় মনে হইলেই হৃদয় ফাটিয়া যায়, চতুর্দিক অন্ধকার বোধ হয়! এজিদের হৃদয় লৌহনির্মিত, দেহ পাষাণে গঠিত; তাহার দুঃখ কি! আমরা তাহার চাকর, কিন্তু নূরনবী মোহাম্মদের শিষ্য, আপনার ভক্ত! এই যে নিশীথ সময়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া এত দূরে আসিয়াছি, কোন স্বার্থ নাই, কোন প্রকার লাভের আশা করিয়াও আসি নাই;– এজিদ কৌশলে আপনার প্রাণ লইবে, ইহা আমাদের নিতান্তই অসহ্য। আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।"
হোসেন বলিলেন, "প্রাণের একাংশ, বিশেষ অগ্রগণ্য অংশ সেই ভ্রাতাকে তাঁহারই স্ত্রীর সহায়তায় এজিদ বিষপান করাইয়া কৌশলে মারিয়াছে। ইহার উপর কি কষ্ট আছে? আমার প্রাণের জন্য আমি ভয় করি না।"
মারওয়ান বলিলেন, "প্রাণের জন্য আপনার যে কিছুমাত্র ভয় নাই, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনার প্রাণ গেলে আপনার পুত্র, কন্যা, পরিবার, হাসানের পরিবার, ইহাদের কি অবস্থা ঘটিবে, ভাবুন দেখি। দুরন্ত জালেম এজিদ! সে যে কি করিবে, তাহার মনই তাহা জানে। আর বেশি বিলম্ব করিতে পারি না। আমরা যে গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি, এ কথার অণুমাত্র প্রকাশ হইলে আমাদের দেহ ও মস্তক কখনই একত্র থাকিবে না। আজ ওত্বে অলীদ এবং মারওয়ান এজিদের আদেশ মতে এই স্থির করিয়াছে যে, এই রাত্রেই রওজা মোবারক ঘেরাও করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে। পরিশেষে হাসনেবানু, জয়নাব এবং আপনার পরিবারস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া বিশেষ অপমানের সহিত এজিদ-সমীপে লইয়া যাইবে।"
হোসেন একটু রোষপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন– 'প্রকাশ্যভাবে যদি আমার মস্তক লইতে আইসে, আমি তাহাতে দুঃখিত নাই। আর ভাই, ইহাও জানিও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঈশ্বর-কৃপায় আমার পরিবারের প্রতি– মদিনার কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন নরাধম নাকী জব্‌রাণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"
মারওয়ান বলিলেন, "সেই জন্যই তো আপনার শিরশ্ছেদন অগ্রে করাই এজিদের একান্ত ইচ্ছা। এজিদও জানিয়াছেন যে, হোসেন বাঁচিয়া থাকিতে আর কিছুই হইবে না। আপনি আজ রাত্রে এখানে কখনই থাকিবেন না। হাজার বলবান হাজার ক্ষমতাবান হইলেও পাঁচ হাজার যোদ্ধার মধ্যে একা এক প্রাণী কি করিবেন? আপনি এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। মারওয়ান গুপ্ত সন্ধানে জানিয়াছেন যে, আপনি এই রওজা ছাড়িয়া কোন খানেই গমন করেন না; রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল, আর অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হয়, এখনই তাহারা আক্রমণ করিবে। দেখুন! আপনার পরিবারগণের কুল, মান, মর্যাদা, শেষে প্রাণ পর্যন্ত এক আপনার প্রাণের প্রতি নির্ভর করিতেছে। আর বিলম্ব করিবেন না, আমরাও শিবিরাভিমুখে যাই, আপনি অন্য কোন স্থানে যাইয়া আজিকার যামিনীর মত প্রাণ রক্ষা করুন।"

হাস্য করিয়া হোসেন বলিলেন, "ভাই রে! ব্যস্ত হইও না। তোমাদের এই ব্যবহারে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা এজিদের পক্ষীয় লোক হইয়া গোপনে আমাকে এমন গুপ্ত সন্ধান জানাইলে, – আশির্বাদ করি, পরকালে ঈশ্বর তোমাদিগকে জান্নাতবাসী করিবেন। ভাইরে "আমার মরণের জন্য তোমরা ব্যাকুল হইও না, কোন চিন্তা করিও না। আমি মাতামহের নিকট শুনিয়াছি, দামেস্ক কিংবা মদিনায় কখনই কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না। আমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থান, 'দাস্ত কারবালা' নামক মহাপ্রান্তর। যত দিন পর্যন্ত সর্বপ্রলয়কর্তা সর্বেশ্বর আমাকে কারবালা-প্রান্তরে না লইয়া যাইবেন, তত দিন পর্যন্ত কিছুতেই কোন প্রকারে আমার মরণ নাই।"

মারওয়ান বলিলেন, "দেখুন! আপনার সৈন্যবল, অর্থবল কিছুই নাই; এজিদের সৈন্যগণ আজ নিশ্চয়ই আপনাকে আক্রমণ করিবে। আপনি প্রাণে মারা না যাইতে পারেন, কিন্তু বন্দীভূত হইতেই হইবে! তাহাতে আর কথাটি নাই। দাস্ত কারবালা না হইলে আপনার প্রাণবিয়োগ হইবে না, এ কথা সত্য– কিন্তু এজিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবেন কিসে? আপনার জন্যই মদিনা আক্রান্ত হইবে। মদিনাবাসীরা নানা প্রকারে ক্লেশ পাইবে। যদিও তাহারা এজিদের সৈন্যদিগকে একবার শেষ করিয়াছে, কিন্তু মারওয়ান এবারে চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দামেস্ক হইতে আসিয়াছে। আপনি যদি শত্রুহস্তে বন্দী হন, তাহা হইলে জীয়ন্তে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে হইবে। আর বেশি বিলম্ব করিতে পারি না, প্রণাম করি; আমরা চলিলাম। যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।"

লোকেরা চলিয়া গেল। হোসেন ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আজ পর্যন্ত এজিদের ক্রোধের উপশম হয় নাই। সকলই ঈশ্বরের লীলা। ঐ লোকটি যথার্থই মোমেন। এই নিশীথ সময়ে প্রাণের মায়া বিসর্জন করিয়া পরহিত সাধনে নিঃস্বার্থভাবে এত দূর আসিয়াছে। কি আশ্চর্য! বাস্তবিক ইহারাই যথার্থ পরহিতৈষী। মারওয়ান পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনায় আসিয়াছে। কি করি, আমি যুদ্ধসজ্জা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলে মদিনাবাসীরা কখনই নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না, নিশ্চয়ই প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া আমার পশ্চাদবর্তী হইবে। এখনও তাহারা শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই; দিবারাত্র হাসান বিরহে দুঃখিত মনে হা-হুতাশে সময় অতিবাহিত করিতেছে। এ সময় তাহাদের হৃদয় পূর্ববৎ সমুৎসাহিত, জন্মভূমি রক্ষার সুদৃঢ় পণে শত্রু-নিধনে সমুৎসুক ও সমুত্তেজিত হইবে কি না সন্দেহ হইতেছে। কারণ দুঃখিত মনে দগ্ধীভূত হৃদয়ে কোন প্রকার আশাই স্থায়ী রূপে বদ্ধমূল হয় না। যতদিন তাহারা জীবিত থাকিবে, ততদিন ইমামের শোক ভুলিতে পারিবে না। এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, সেই স্নেহকাতর ভ্রাতৃগণকে কি বলিয়া আমি আবার এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইব। কিছুদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার উচিত। আমি যদি কিছু দিনের জন্য, মদিনা পরিত্যাগ করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এজিদের সৈন্য আজ রাত্রেই রওজা আক্রমণ করিয়া আমার প্রাণবধ করিবে, ইহা বিশ্বাস্যই নহে। এখানে কাহারও দৌরাত্ম্য করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু এজিদের সৈন্য কেন, জগতের সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া আক্রমণ করিলেও এই পবিত্র রওজায় আমার ভয়ের কোন কারণ নাই; তথাপি কিছু দিনের জন্য স্থান পরিত্যাগ করাই সুপরামর্শ। আপাততঃ কুফা নগরে যাইয়া আবদুল্লাহ জেয়াদের নিকট কিছুদিন অবস্থিতি করি, জেয়াদ আমার পরম বন্ধু। আরব দেশে যদি প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে, তবে সেই কুফার অধীশ্বর প্রিয়তম বন্ধুবৎসল জেয়াদ। যদি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উচিত

বিবেচনা হয়, তবে সপরিবারে কিছু দিনের জন্য কুফা নগরে গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। আজ রাত্রের ও' কথা কিছুই নহে।" এইরূপ ভাবিয়া হোসেন পুনরায় ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ওতবে অলীদ এবং মারওয়ান উভয়ে শিবিরে গিয়া বেশ পরিত্যাগ পূর্বক নির্জন স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। অনেক কথার পর মারওয়ান বলিলেন, "মোহাম্মদের রওজায় হোসেনের মৃত্যু নাই। আমরা এমন কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারি নাই যে, তাহাতে নিশ্চয়ই হোসেন রওজা হইতে বহির্গত হইয়া মদিনা পরিত্যাগ করেন। এইটি যাহা হইল; ইহাও মন্দ নহে, ইহার উপরে আরও একটি ছিল, কিন্তু সে আমাদের ক্ষমতার অতীত। তদ্বিস্তারিত কাসেদ গিয়া মুখে প্রকাশ করিবে, তাহার উপায় কৌশল, সমুদয়ই কাসেদকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলাম।" ওতবে অলীদ বলিলেন, 'আর বেশী বিস্তারের আবশ্যক নাই, শীঘ্র পত্র লিখিয়া কাসেদকে প্রেরণ করা কর্তব্য।"

লিখিবার উপকরণ লইয়া মারওয়ান লিখিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ওতবে অলীদ আবার বলিলেন, "একটি কথার যেন ভুল না হয়, অথচ গোপন থাকে এইভাবে পত্র লেখা উচিত।"

মারওয়ান পত্র লিখিতে লাগিলেন। একজন সৈনিক পুরুষের সহিত একজন কাসেদ আসিয়া যথারীতি নমস্কার করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল। মারওয়ান পত্র রাখিয়া কাসেদকে লইয়া গোপনে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। অনন্তর মারওয়ান পত্রখানি শেষ করিতে বসিলেন। কাসেদ করজোড়ে কহিতে লাগিল, "ঈশ্বরপ্রসাদে এই কার্য করিতে করিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, যাহা বলিলেন, অবিকল তাহাই বলিব।"

মারওয়ান রীতিমত পত্র লেখা শেষ করিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "কুফা।""

কাসেদ বিদায় হইল। মারওয়ান এবং অলীদ উভয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

একবিংশ প্রবাহ

কয়েক দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া মারওয়ান-প্রেরিত মদিনার কাসেদ দামেস্ক নগরে পৌঁছিল। এজিদ যথাসময়ে কাসেদের আগমন-সংবাদ পাইলেন;- সভাভঙ্গ করিয়া কাসেদকে নির্জনে লইয়া সমুদয় অবস্থা শুনিলেন। মারওয়ান- পত্রপাঠে অনেক চিন্তা করিয়া মহারাজ এজিদ তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ, জেয়াদকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন– "তিন লক্ষ টাকা, তদুপযোগী বাহন এবং ঐ অর্থ রক্ষার্থে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ এই কাসেদের সমভিব্যাহারে দিয়া এখনই কুফা নগরে পাঠাইতে প্রধান কার্যকারককে আমার আদেশ জানাও।" কোষাধ্যক্ষকে এই কথা বলিয়া কাসেদকে বলিলেন, "তুমি এই উপস্থিত কার্যের উপযুক্ত পাত্র। কুফা নগরে যাইয়া আব্দুল্লাহ জেয়াদকে বলিও, – আশার অতিরিক্ত ফল পাইবে, কুফারাজ্য একচ্ছত্ররূপে আপনারই অধিকার হইবে। দামেস্করাজ আর কখনই আপনাকে অধীন রাজা বলিয়া মনে করিবেন না; মিত্র রাজ বলিয়াই আখ্যা হইবে। সেই মিত্র ব্যবহার জগতে চন্দ্র সূর্য থাকা পর্যন্ত সমভাবে থাকিবে।" দামেস্কপতি এই বলিয়া কাসেদকে বিদায় করিলেন। কাসেদ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত দামেস্কের দূত বিংশতি দিবসে কুফা নগরে উপস্থিত হইল। দামেস্ক হইতে বিস্তর অর্থ সহিত সৈন্যসহচর রাজদূত রাজসমীপে উপস্থিত হইবে, এই কথা আবদুল্লাহ জেয়াদের কর্ণগোচর হইলে তিনি একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। মহারাজ এজিদ আমার নিকট অর্থ, সৈন্য এবং কাসেদকে পাঠাইবেন, একি কথা! আবদুল্লাহ্ জেয়াদ এই ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "দামেস্ক হইতে কয়েকটি লোক কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, কাহারও নিকট কিছু বলে না, তাহাদের ইচ্ছা যে, একেবারে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে। দামেস্করাজের প্রেরিত, কি কাহার প্রেরিত, তাহার তাহারা কিছুই বলিল না। আমরা যাহাকে কাসেদ বলিয়া অনুমান করিতেছি, সে লোকটি বিশেষ চতুর এবং বিশেষ বিচক্ষণ। তাহার সঙ্গে তাহার রক্ষকস্বরূপ কয়েকজন প্রহরী এবং প্রচুর অর্থ আছে।"
আবদুল্লাহ জেয়াদ বলিলেন, "তাহাকেই সমুচিত আদব করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থান দাও। সময় মত আহ্বান করিয়া তাহাদের কথা শুনিব।" যথাযোগ্য প্রাণিপাত করিয়া প্রতিহারী বিদায় হইল। আবদুল্লাহ জেয়াদ অনেক চিন্তা করিলেন। কি কারণে, কে পাঠাইল, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, নানা প্রকার দূর-চিন্তার মনোনিবেশ করিলেন। নিতান্ত উৎসুক হইয়া অনতিবিলম্বেই সেই কাসেদকে আহবান করিলেন। কাসেদ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া এজিদের আদেশ মত সমুদয় বৃত্তান্ত একে একে বর্ণনা করিল। এজিদের স্বহস্তে-লিখিত পত্রখানিও জেয়াদের সম্মুখে রাখিয়া দিল । আবদুল্লাহ জেয়াদ সহস্রবার চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত পত্র পাঠ করিলেন। কাসেদকে বলিলেন, "তোমরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বিশ্রাম কর, অদ্যই বিদায় করিব।"

দ্বাবিংশ প্রবাহ

প্রণয়, স্ত্রী, রাজ্য, ধন, এই কয়েকটি বিষয়ের লোভ বড় ভয়ানক। এই লোভে লোকের ধর্ম, পূণ্য, সাধুতা, পবিত্রতা,- সমস্তই একেবারে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতি কষ্টে উপার্জিত বন্ধুত্ব-রত্নটিও ঐ লোভে অনেকেই অনায়াসে বিসর্জন দেয়। মানুষ ঐ লোভে অনায়াসেই যথেচ্ছা ব্যবহারে অগ্রসর হইতে পারে। এজিদ দামেস্কের রাজা, কুফা তাঁহার অধীন রাজ্য। হোসেনের সহিত আবদুল্লাহ জেয়াদের কেবলমাত্র বন্ধুত্বভাব সম্বন্ধ। উপরিউক্ত চারি প্রকার লোভের নিকট বন্ধুত্বভাব সর্বত্র অকৃত্রিমভাবে থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু আবদুল্লাহ জেয়াদের নিকটে তাহার আশা করাও যাইতে পারে না। কারণ আবদুল্লাহ জেয়াদ মূর্খ ও অর্থলোভী। মূর্খের প্রণয়ে বিশ্বাস নাই, কার্যেও বিশ্বাস নাই, লোভীও তদ্রুপ।
আবদুল্লাহ জেয়াদ সেই রাত্রেই দামেস্কের দূতকে বিদায় করিলেন। শয়নগৃহে শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগলেন, "হোসেন-প্রণয়ে লাভ কি? শুধু মুখের প্রণয়ে কি হইতে পারে?"-এইরূপ অনেক আন্দোলন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।
প্রধান অমাত্য, সভাসদ ও রাজসংক্রান্ত কর্মচারিগণ, কেহই এই নিগূঢ় তত্ত্বের কারণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। কি উদ্দেশ্যে উহারা দামেস্ক হইতে আসিয়াছিল, এক দিবস অতীত না হইতেই কেনই বা পুনরায় ফিরিয়া গেল, এই বিষয় লইয়া সকলে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভাসদগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "গত রজনীতে আমি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। হস্তে কৃষ্ণবর্ণ আশা (যষ্টি), শিরে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ, অঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্র পিরহান! আমার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আবদুল্লাহ জেয়াদ! তোমাকে একটি কার্য করিতে হইবে।" আমি স্বপ্নযোগে সেই পবিত্র পদচুম্বন করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলাম। নূরনবী দুঃখিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হোসেন ভ্রাতৃহীন হইয়া আমার সমাধিক্ষেত্রে পড়িয়া নিঃসহায়রূপে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছে। তুমি তাহার পক্ষ অবলম্বন কর। তোমার সাধ্যানুসারে তাহার সহায়তা কর। সৈন্যসামন্ত, ধন, জন দ্বারা হোসেনের উপকার কর।" এই কথা বলিয়াই পবিত্র মূর্তি অন্তর্হিত হইল। আমারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বর্গীয় সৌরভে সমুদয় ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে আমার মনে যে অনুপম আনন্দ ও ভক্তিভাব উদয় হইল তাহা এক্ষণে মুখে প্রকাশ করিতে সাধ্য হইতেছে না। আর নিদ্রাও হইল না। তখনই কায়মনে হযরত ইমাম হোসেনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম। এই রাজ্য, এই সৈন্য-সামন্ত, এই ভাণ্ডারস্থ ধন-রত্ন, মণিমুক্তা সকলই হোসেনের। এই সিংহাসন আজ হইতে হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়া তাহাকে ইহার যথার্থ অধিকারী করিলাম। আপনারা আজ হইতে মাহমান্য ইমাম হোসেনের অধীন হইলেন। আজ হইতে আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর মাত্র থাকিলাম। অমাত্যগণ! এখনই আপনারা নগরের ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, এ রাজ্য আজ হইতে ইমাম হোসেনের অধিকৃত হইল। আবদুল্লাহ জেয়াদ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। অধীন রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজসংস্রবী, যিনি যেখানে আছেন, কিংবা রাজ্যশাসন করিতেছেন, অদ্যই তাঁহাদের নিকট এই শুভ-সংবাদ অগৌণে জ্ঞাপন করা হউক। আর অদ্যই আমার স্বপ্নবিবরণসহ রাজ্যপরিত্যাগ সংবাদ ইমাম হোসেনের গোচরাকরণ জন্য মদিনায় কাসেদ প্রেরণ করা হউক। রাজা বিহনে রাজ্য শাসন হওয়া নিতান্তই কঠিন, রাজসিংহাসন শূন্য থাকাও অযৌক্তিক। যত শীঘ্র হয়, ইমাম হোসেন কুফা নগরে আসিয়া রাজপাট অধিকার এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইহাও জানাইও– যতদিন ইমাম হোসেন এই রাজসিংহাসনে উপবেশন না করিতেছেন, তত দিন প্রধান উজির রাজকার্য পর্যালোচনা করিবেন। আমার সহিত রাজ্যের কোন সংস্রব রহিল না।"

প্রধান উজীর নতশিরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। সকলেই হোসেনের নামে রাজভক্তির পরিচয় দিয়া শত শত আশীর্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ জেয়াদকেও একবাক্যে সকলে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এমন সাহসী ধর্মপরায়ণ সরলহৃদয় ধার্মিক জগতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। এমন পূর্ণকার্য এ পর্যন্ত কেহ কোন দেশেই করে নাই। এ কথা সত্য যে, যিনি ইহকাল পরকালের রাজা, প্রাণ দিয়া তাঁহার উপকার করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এজিদের চক্রান্ত ভ্রাতৃহারা, রাজ্যহারা– একে একে সর্বহারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন, 'এ সময় যত প্রকারে ইমামের উপকার করিবেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার কোটি কোটি গুণে পূণ্যময় করিয়া পরকালে প্রধান স্বর্গে তাঁহার স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিবেন। আপনি সৈন্যসামন্ত সহিত রাজ্য-ধন ইমামকে দান করিলেন, আমরা চিরকাল হইতে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী দাসানুদাস আছি। আজ হইতে জীবন, ধন, সমস্তই হোসেনের নামে উৎসর্গ করিলাম।"

প্রধান উজীর রাজাজ্ঞানুসারে সমুদয় স্থানে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আবদুল্লাহ জেয়াদের স্বপ্নবৃত্তান্তও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া, রাজ্যদান সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া হোসেন সমীপে কাসেদ প্রেরণ করিলেন।

ক্রমে সর্বত্র প্রকাশ হইল যে, কুফাধিপতি আবদুল্লাহ জেয়াদ তাঁহার সমুদয় রাজ্য হোসেনকে অর্পণ করিয়াছেন। এজিদের স্বপক্ষীয়েরা ব্যতীত সকলেই একবাক্যে আবদুল্লাহ জেয়াদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বর সমীপে হোসেনের দীর্ঘায়ু ও সর্বমঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে মদিনা পর্যন্ত এই সংবাদ রটিয়া গেল।

হোসেন পূর্ব হইতেই মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফা নগরে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ জেয়াদ কর্তৃক আদৃত না হইয়া তথায় গমন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। লোকমুখে জেয়াদের বদান্যতা, বিপদ-সময়ে সাহায্য এবং অকাতরে রাজ্য পর্যন্ত দানের বিষয় শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত উপাসনা করিলেন। কিন্তু জেয়াদ-প্রেরিত নিশ্চয় সংবাদ না পাইয়া অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

মারওয়ান আজ মদিনা আক্রমণ করিবে, রওজা আক্রমণ করিবে, হোসেনের প্রাণ হনন করিবে,– সর্বসাধারণের মুখে এই সকল কথার আন্দোলন। মদিনাবাসীরা সকলেই হোসেনের পক্ষ হইয়া এজিদের সৈন্যের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে, প্রাণ থাকিতে হোসেনের পরিজনদিগকে বন্দী করিয়া দামেস্ক লইয়া যাইতে দিবে না, এ কথাও হইয়াছে। 'আজ যুদ্ধ হয়,' কাল যুদ্ধ হয়', কেবল এই কথারই তর্ক-বিতর্ক। এজিদের সৈন্যগণ মদিনা আক্রমণ না করিলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে কি না, এই বিষয় লইয়াই– এই চিন্তাতেই ইমাম-বংশের চিরহিতৈষী মদিনাবাসীরা সকলেই মহা ব্যতিব্যস্ত। দিবারাত্র কাহারই যেন আর আহার-নিদ্রা নাই।

কয়েক দিন যায়, শেষে সাব্যস্ত হইল যে শত্রুগণ নগরের প্রান্তভাগে প্রান্তরের শেষ সীমায় শিবির নির্মাণ করিয়া যে প্রকার শান্তভাবে রহিয়াছে, তাহাতে আশু বিরোধের সম্ভাবনা কি? কোন বিষয়ে অনৈক্য কোন কার্যের বাধা কিংবা কোন কথার প্রসঙ্গে অযথা উত্তর না করিলে কি প্রকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? এই বিবেচনা করিয়া সকলেই যুদ্ধের অপেক্ষায় বিবাদের সূচনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। একদিন কুফা নগরের কাসেদ মদিনায় দেখা দিল। মদিনাবাসীরা জেয়াদের বদান্যতার বিষয় পূর্বেই শুনিয়াছিলেন; নিশ্চয় সংবাদ না পাইয়া অনেকে অনেক সন্দেহ করিতেছিলেন, আজ সে সন্দেহ দূর হইল। এক মুখে বলিতে শত শত মুখে জিজ্ঞাসিত হইল, "কুফার সংবাদ কি?"

কাসেদ উত্তর করিল, "কুফাধিপতি মাননীয় আবদুল্লাহ জেয়াদ তাঁহার সিংহাসন রাজ্য, ধন, সৈন্যসামন্ত সমস্তই হযরত ইমাম হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাজকার্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইমাম হোসেন কুফা-সিংহাসনে উপবেশন না করা পর্যন্ত প্রধান উজীরের হস্তে রাজকার্যের পর্যালোচনার ভার রহিয়াছে। ইমাম হোসেন কোথায় আছেন, আপনারা বলুন, আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া এ সংবাদ দিব।" একজন বলিতে শত শত লোক কাসেদের অগ্র-পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কেহ আবদুল্লাহ জেয়াদের প্রশংসা, কেহ কেহ হোসেনের কুফাগমনজনিত দুঃখ, কেহ এজিদের দৌরাত্ম্যে হোসেন দেশত্যাগী, এই সকল কথার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া পরস্পর

বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে হযরতের রওজায় উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান লোকেরা কাসেদের বৃত্তান্ত ইমামের নিকট বিবৃত করিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদের পত্র পাঠ করিয়া হোসেন সেই পত্রহস্তে কাসেদ সমভিব্যাহারে নিজ ভবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদিনাবাসীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আপনারা কেন কষ্ট পাইতেছেন? যদি কুফার অন্নজল ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে আপনারা আমার কৃতদোষ মার্জনা করিবেন। সময়ে আমি আপনাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এক্ষণে এত ব্যস্ত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না।"

মদিনাবাসীরা সকলেই একবাক্যে হোসেনকে আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

জেয়াদের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয় বিবি সালেমার হোজরা (নির্জন স্থান) সমীপে গমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া বিবি সালেমা হোজরা হইতে বর্হিগত হইলেন। ইমাম হোসেন মাতামহীর" পদধূলি গ্রহণ করিয়া জেয়াদের পত্রবিবরণ প্রকাশ ও কুফা নগরে গমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রওজা হইতে হোসেনের আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া পরিজন, আত্মীয়, বন্ধু অনেকেই বিবি সালেমার হোজরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হোসেন সকলের নিকটেই কুফা-গমন সঙ্কল্পে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় কেহই কোন উত্তর না করিয়া নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। বিবি সালেমা গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল্লাহ জেয়াদ যাহাই লিখুক, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনই কুফায় গমন করিও না,– হযরতের রওজা ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইও না। হযরত আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, হোসেন আমার রওজা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা। আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনই রওজা হইতে বাহির হইও না। এখানে কাহারও ভয় নাই, কোন প্রকারের শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক।"

হোসেন বলিলেন, "কত কাল এইভাবে বসিয়া থাকিব? কাফেরগণ ক্রমশঃই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মদিনার নিকটে একত্রিত হইতেছে। আমি কি করি, কতদিন এই প্রকারে বসিয়া কাটাইব? একা আমার প্রাণের জন্য কত লোকের জীবন বিনাশ হইবে? তাহা অপেক্ষা আমি কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করিব, তাহাতে দোষ কি? বিশেষ কুফা নগরের সমুদয় লোক মুসলমান-ধর্মপরায়ণ, সেখানে যাইতে আর বাধা কি?"

সালেমা বিবি বিরক্তিভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার কথা তোমার গ্রাহ্য হইবে কেন? যাহা হয় কর।" এই বলিয়া হোজরা-মধ্যে চলিয়া গেলেন। তৎপরে হোসেনের মাতার মহোদরা ভগ্নী ওম্মে কুলসুম হোসেনের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হোসেন! সকলের গুরুজন যিনি, প্রথমেই তিনি নিষেধ করিতেছেন, তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়া নিতান্তই অনুচিত। বিশেষ আমিও বলিতেছি, তুমি কুফার নাম পর্যন্তও করিও না। কুফার নাম শুনিলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে। তোমার কি স্মরণ হয় না যে, তোমার পিতা কুফায় যাইয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন? কুফা নগরবাসীরা তাঁহাকে কতই যন্ত্রণা দিয়াছিল, সে কথা কি, একেবারে ভুলিয়াছ? কুফায় যাইবার বাসনা

অন্তর হইতে একেবারে দূর কর। নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক, আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, জগতে এমন কেহই নাই যে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।"

হোসেন বলিলেন, "আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, তিলার্দ্ধ কালও মদিনায় থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনারা আর আমায় বাধা দিবেন না। মিনতি করিয়া বলিতেছি, অনুমতি করুন, শীঘ্রই কুফায় যাত্রা করিতে পারি।"

ওম্মে কুলসুম বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।"

হোসেনের বন্ধুবান্ধব একবাক্য হইয়া সকলেই কুফা গমনে নিষেধ করিলেন। প্রতিবাসিগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "মদিনার মায়া একেবারে অন্তর হইতে অন্তর করিবেন না। এজিদের ভয়ে মদিনা পরিত্যাগ নিতান্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়। তাহারা প্রকাশ্য যুদ্ধে কি করিবে? মদিনাবাসিগণের একজনেরও প্রাণ দেহে থাকিতে শত্রুগণ কি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে? কাহার সাধ্য? আমাদের স্বাধীনতা, স্বদেশের গৌরব রক্ষা ইহা ত আছেই, তাহা ছাড়া আপনার প্রাণের জন্য এজিদের সৈন্যের সম্মুখীন হইতে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। আমরা শিক্ষিত নহি, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু আপনার প্রাণরক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ শত্রুহস্তে অর্পণ করিতে শিক্ষার আবশ্যক কি? আমরাও যদি শত্রুহস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হই, তথাপি মদিনার একটি স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে এজিদ আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়াই মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিবে না। আপনি কাহার ভয়ে,- কোন শত্রুর শত্রুতায় মদিনা পরিত্যাগ করিবেন? আমাদের জীবন থাকিতে আমরা আপনাকে যাইতে দিব না। আপনার আজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। যদি আপনি মদিনা পরিত্যাগ করিতে নিতান্তই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, করুন; কিন্তু মদিনাবাসীরা আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। যেখানে যাইবেন, তাহারাও আপনার সঙ্গে সেইখানে যাইবে।"

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এজিদের জীবনের প্রথম কার্যই আমাদের বংশ বিনাশ করা। যে উপায়ে হউক, এজিদ আমার প্রাণবিনাশ করিবে। যখন দুই ভ্রাতা ছিলাম, তখন এজিদের সৈন্যেরা সাহস করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই। কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে এবং আপনারাও দেখিয়াছেন। এক্ষণে আমার সাহস, বল, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। কারণ, ভ্রাতৃশোকে আমি যে প্রকার দুঃখিত ও কাতর আছি, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। যে হৃদয় কখনই ভয়ের নাম জানিত না, শত্রুনাশে যে হৃদয় কদাচ আতঙ্কিত হইত না, সেই ভয়শূন্য হৃদয় আজ ভ্রাতৃবিয়োগ- দুঃখে সামান্য যুদ্ধের নামে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার নিজের মনই যদি নিরুৎসাহ থাকিল, শত্রুভয়ে কম্পমান রহিল, তখন কাহার উৎসাহে- কাহার উত্তেজনায় আপনারা সেই দুর্দান্ত শত্রুর অস্ত্রমুখে- অসংখ্য সেনার অসংখ্য অস্ত্রসম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন? বলুন তো, কাহার সাহাসের উপর নির্ভর করিয়া বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতের জন্য বক্ষ বিস্তার করিয়া দিবেন? শিক্ষিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার প্রোৎসাহ বাক্যে প্রতিরোধ করিবেন? আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এক্ষণে মদিনা পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং মদিনাবাসীর পক্ষেও মঙ্গল। আমার জন্য আমি আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে বাসনা করি না। এজিদের হস্তে কিংবা তাহার সৈন্যের হস্তে বিধি যদি আমার জীবন-নাশের বিধি করিয়া থাকেন, তবে তাহা

নিশ্চয়ই ঘটিবে। যেখানেই কেন, যাই না, আমার প্রাণহন্তা সেইখানেই উপস্থিত হইবে। কারণ জগদীশ্বরের কার্য অনিবার্য। আমার স্থানান্তর হওয়ায় মদিনাবাসীরা তো এজিদের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবে। তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

প্রতিবাসিগণের মধ্যে একজন প্রাচীন ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য অনিবার্য, এ কথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু আবদুল্লাহ জেয়াদ হঠাৎ এইভাবে এত বড় রাজ্য আপনাকে অযাচিতে ছাড়িয়া দিল, ইহার কারণ কি? একথাও রাষ্ট্র হইয়াছে, এজিদপক্ষীয় কাসেদ তিন লক্ষ টাকা লইয়া কুফা নগরে জেয়াদের নিকট গিয়াছিল। জেয়াদও দামেস্কের কাসেদকে এবং তৎসমভিব্যাহারী সৈন্যচতুষ্টয়কে বিশেষ পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। তাহার পর দিবসেই স্বপ্নবিবরণ সভায় প্রকাশ করিয়া রাজসিংহাসন ও রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি? যদি এজিদের মন্ত্রণায় সে অসম্মত হইবে, কি এজিদের আদেশ-প্রতিপালনে অনিচ্ছুক হইবে, তবে নিঃস্বার্থ বন্ধুর চিরশত্রু-প্রেরিত কাসেদকে কেন পুরস্কৃত করিবে? কেন তাহার প্রদত্ত অর্থ নিজ ভাণ্ডারে রক্ষা করিবে? যে রাজ্য আপনার পিতা বহু পরিশ্রম করিয়াও নিষ্কন্টকে হস্তগত করিতে পারেন নাই, কয়েকবার তাঁহাকে ঐ নগরবাসীরা যে প্রকারে কষ্টে নিপাতিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। এইক্ষণে কুফাধিপতি জেয়াদ হঠাৎ নূরনবী মোহাম্মদের স্বপ্নাদেশে সেই রাজ্য অকাতরে আপনাকে দান করিল, ইহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।"

হোসেন বলিলেন, 'এমন কথা মুখে আনিবেন না। আবদুল্লাহ জেয়াদের ন্যায় আমার প্রকৃত বন্ধু মদিনা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই নাই। তাঁহার গুণের কথা কত বলিব? তিনি আমার জন্য এজিদের মুণ্ডপাত করিতেও বোধ হয়, কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না। জেয়াদের বাক্যে ও কার্যে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিরেন, 'জেয়াদের বাক্যে ও কার্যে আপনার কোন সংশয় হয় না, অবশ্যই না হইতে পারে। কিন্তু আমি বলি, মানুষের মনের গতি কোন্ সময় কি হয়, তাহা যাহার মন, সেও জানিতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া কার্য করায় ক্ষতি কি? আমার বিবেচনায় অগ্রে জনৈক বিশ্বাসী ও সাহসী লোককে কুফা নগরে প্রেরণ করা হউক, কুফাবাসীরা যদি কোনরূপ চক্রান্ত করিয়া থাকে, তবে অবশ্যই প্রকাশ হইবে। গুপ্ত মন্ত্রণা ক'দিন গোপন থাকিবে? একটু সন্ধান করিলেই সকলই জানা যাইবে। আর জেয়াদের রাজ্যদানসঙ্কল্পও যদি যথার্থ হয়, তবে আপনার গমনে আমি কোন বাধা দিব না।"

হোসেন বলিলেন, "একথা মন্দ নয়, কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট এবং বৃথা বিলম্ব। তাহা যাহাই হউক, আপনার কথা বারবার লংঘন করিব না। অগ্রে কুফায় পাঠাইতে কাহাকে মনস্থ করিয়াছেন? এমন সাহসী বিশ্বাসপাত্র কে আছে?"

দ্বিতীয় মোসলেম নামক জনৈক বীর পুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "হযরত ইমামের যদি অনুমতি হয়, তবে দাসই কুফা নগরে যাইতে প্রস্তুত আছে। আপনি কিছু দিন অপেক্ষা করুন, আমি কুফায় যাইয়া যথার্থ তত্ত্ব জানিয়া আসি; যদি আবদুল্লাহ জেয়াদ সরলভাবে রাজ্যদান করিয়া থাকেন, তবে মোসলেম আনন্দের সহিত শুভ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর যদি ইহার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র থাকে, তবে বুঝিবেন, মোসলেমের এই শেষ বিদায়। আপনার কার্যে, মোসলেমের প্রাণের

মায়া, সংসারের আশা, সুখ-দুঃখের চিন্তা, স্ত্রী-পরিবারের স্নেহবন্ধন, কিছুমাত্র মনে থাকিবে না। আজ মোসলেম আপনার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিল। এই মুহূর্তেই কুফায় যাত্রা করিবে। এখানেই অনেকে আছেন, যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন, মোসলেম সে কথার অন্যথা কিছুতেই করিবে না।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মোসলেম তো যাইতেই প্রস্তুত। মোসলেমের প্রতি আমার তো সম্পূর্ণ বিশ্বাসই হয়, কিন্তু একা মোসলেমকে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষিত হউক, কি অশিক্ষিত হউক, সৈন্যনামধারী কতিপয় লোককে মোসলেমের সঙ্গে দিতে হইবে।" বৃদ্ধের মুখে এ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত আগ্রহের সহিত অনেকে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অতি অল্প সময় মধ্যে এক হাজার লোক মোসলেমের সঙ্গী হইতে সমুৎসুক হইল। কুফার রহস্যভেদ- ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে তাঁহারা প্রাণপণে প্রস্তুত। সমুদয় কথা সাব্যস্ত হইয়া গেল; অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মোসলেম এক হাজার সৈন্য লইয়া কুফা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরবরের দুই পুত্রও পিতার সঙ্গে চলিল।

এয়োবিংশ প্রবাহ

স্বার্থপ্রসবিনী গর্ভবতী আশা যত দিন সন্তান প্রসব না করে, ততদিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকামে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিতে লাগিল। এই রকমে দিবা রজনীর যাতায়াত। জেয়াদের মানসাকাশে ততদিন শান্তি-চন্দ্রের উদয় হয় নাই, সর্বদাই অন্যমনস্ক। সর্বদাই দুশ্চিন্তাতেই চিরনিমগ্ন। ইহা এক প্রকার মোহ। জেয়াদ দিন দিন গণনা করিতেছেন, ক্রমে গণনার দিন পরিপূর্ণ হইল, মদিনা হইতে কাসেদ ফিরিয়া আসিল। কুফা আগমনে হোসেনের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন না আসিবার কারণ কি? দিনের পরদিন যাইতে লাগিল, সূর্যের পর চন্দ্র আসিতে লাগিল। বিনা চন্দ্রে নক্ষত্রের উদয় সম্ভব। সেদিনও ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইল, নিশ্চয় যেদিন আসিবেন সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহাও গত হইয়া গেল, তাহার পর পরিজন লইয়া একত্র আসিবার যে বিলম্ব সম্ভব, তাহাও গণনা করিয়া শেষ করিলেন। কিন্তু হোসেন আসিলেন না। জেয়াদ বড়ই ভাবিত হইলেন। দিবারাত্র চিন্তা। কি কৌশলে হোসেনকে হস্তগত করিয়া বন্দীভাবে এজিদের হস্তে সমর্পণ করিবেন, সেই চিন্তা মহাপ্রবল। পুনরায় সংবাদ পাঠাইতে মনস্থ করিয়া ভাবিলেন, "যে বংশের সন্তান, অন্তর্যামী হইতেই বা আশ্চর্য কি? আমার অব্যক্ত মনোগত ভাব বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন। আবার সংবাদ দিয়া কি নূতন প্রকার বিপদে নিপতিত হইব?" পরামর্শ স্থির হইল না। নানা প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নূতন সংবাদ আসিল, মদিনা হইতে হোসেনের প্রেরিত সহস্র সৈন্যসহ মোসলেম আসিয়া নগরে উপস্থিত; রাজদরবারে আসিতে ইচ্ছুক। পরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া জেয়াদ আরও চিন্তিত হইলেন। হোসেন স্বয়ং না আসিয়া দূত পাঠাইবার কারণ কি? হইতে পারে, এটি আমার প্রথম পরীক্ষা। আমার মনোগত ভাব জানিবার জন্যই হয়তো দূত প্রেরণ। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সাদরে মোসলেমকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাগৃহে আনিতে প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন।

মোসলেম সভায় উপস্থিত হইলে জেয়াদ করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "দূতবর! বোধ হয়, প্রভু হোসেনের আজ্ঞাক্রমেই আপনার আগমন হইয়াছে। প্রভুর না আসিবার কারণ কি? এ সিংহাসন তাঁহার জন্য শূন্য আছে; রাজকার্য বহু দিন হইতে বন্ধ রহিয়াছে। প্রজাগণ, সভাসদগণ প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি যে চিরকিঙ্কর দাসানুদাসেরও অনুপযুক্ত, আমিও সেই পবিত্র পদসেবা করিবার আশায় এত দিন সমুদয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি। কি দোষে প্রভু আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

মোসলেম বলিলেন, "ইমাম হোসেন শীঘ্রই মদিনা পরিত্যাগ করিবেন। মদিনাবাসীরা অনেক প্রতিবন্ধকতা করায় শীঘ্র শীঘ্র আসিতে পারেন নাই। আপনাকে সান্ত্বনা করিয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য অগ্রে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি শীঘ্র আসিবেন।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ পূর্ববৎ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "আপনি প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছেন, আমরা আপনাকে প্রভুর ন্যায় গ্রহণ করিব, প্রভুর ন্যায়ই দেখিব এবং প্রভুর ন্যায়ই মান্য করিব।" এই বলিয়া মোসলেমকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আবদুল্লাহ্ জেয়াদ ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ, সভাসদগণ, রাজকর্মচারিগণ সকলেই আসিয়া রীত্যনুসারে উপঢৌকন সহিত নতশিরে ভক্তিসহকারে রাজদূতকে রাজা বলিয়া মান্য করিলেন। ক্রমে অধীন রাজাগণও মর্যাদা রক্ষা করিয়া ন্যূনতা স্বীকারে নতশিরে প্রণিপাত করিলেন।

মোসলেম কিছু দিন নির্বিঘ্নে রাজকার্য চালাইলেন, অধীন সর্ব-সাধারণ তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারে আশার অতিরিক্ত সুখী হইলেন, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী। আব্দুল্লাহ্ জেয়াদ সদাসর্বদা আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় উপস্থিত থাকিয়া মোসলেমের আদেশ প্রতিপালনে ভক্তির প্রাধান্য দেখাইলেন। মোসলেমের মনে সন্দেহের নামমাত্রও রহিল না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন প্রকারে কপটভাব, লক্ষণ, ষড়যন্ত্রের কূ-অভিসন্ধি, এজিদের সহিত যোগাযোগ, কুমন্ত্রণা, এজিদের পক্ষ হইয়া বাহ্যিক প্রণয়ভাব, অন্তরে তদ্বিপরীত, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। দুই কর্ণ হইলে তো সন্ধানের অঙ্কুর পাইবেন? যাহা আছে, তাহা জেয়াদের অন্তরেই রহিয়াছে। কুফা নগরে জেয়াদের অন্তর ভিন্ন হোসেন-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এমন কি, জেয়াদ অন্তর হইতে সে কথা আপন মুখে আনিতেও কত সতর্কতাভাব অবলম্বন করিয়াছেন, অপরের কর্ণে যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। মোসলেম পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সন্ধান ব্যর্থ হইল, চতুরতা ভাসিয়া গেল। বাধ্য হইয়া কুফার আনুপর্বিক সমস্ত বিবরণ মদিনায় লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই লিখিলেন, 'হযরত! নির্বিঘ্নে আমি কুফায় আসিয়াছি। রাজা জেয়াদ সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কপটতা জানিতে পারি নাই। নগরবাসীরা ইমাম নামে চিরবিশ্বস্ত এবং চিরভক্ত, লক্ষণে তাহাও বুঝিলাম। এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি!

বংশবদ

মোসলেম"

হোসেন পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃবধূদ্বয় প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরের নাম করিয়া কুফায় যাত্রা করিলেন। ষষ্টি সহস্র লোক মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের অনুগামী হইল। ইমাম হোসেন সকলের সহিত একত্রে কুফাভিমুখে আসিতে

লাগিলেন, কিন্তু এজিদের কথা মনে হইলেই তাঁহার মুখ সর্বদা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। হযরতের রওজা আশ্রয়ে থাকায় কোন দিন কোন মুহূর্তে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। এক্ষণে প্রতি মুহূর্তে এই আশঙ্কা যে, এজিদের সৈন্য পশ্চাদ্বর্তী হইয়া আক্রমণ করিলে আর নিস্তার নাই। ক্রমে দিন অতীত হইল, এগার দিনের পর হোসেনের অন্তর হইতে এজিদের ভয় ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। মনে সাহস এই যে, কুফা অতি নিকটে, সেখানে এজিদের ক্ষমতা কি? একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ জেয়াদের গুপ্তচরগণ চতুর্দিকে রহিয়াছে, হোসেন মদিনা পরিত্যাগ করিয়া এ পর্যন্ত যে দিন যে প্রকারে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, যেখানে যাইতেছেন, সকল সংবাদ প্রতিদিন দামেস্কে এবং কুফায় যাইতেছে। কুফা নগরে মোসলেমকে প্রকাশ্য রাজ্যসিংহাসনে জেয়াদ বিশেষ ভক্তিসহকারেই বসাইয়াছেন। মোসলেম কুফায় বন্দী। জেয়াদ এমন কৌশলে তাহাকে রাখিয়াছেন এবং মোসলেমের আদেশানুসারে কার্য করিতেছেন যে, মোসলেম জেয়াদ-চক্রে বাস্তবিক সৈন্যসহ বন্দী, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, কেবল হোসেনের আগমন প্রতীক্ষা।

ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাতে তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে। তুমি আমি সে করুণা হয় তো জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাঁহার লীলাখেলার মাধুর্য্য, কীর্তিকলাপের বৈচিত্র্যে বিশ্বরঙ্গভূমির বিশ্বক্রীড়া একবার পর্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি বিবেচনা হয়। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অণুমাত্রও বুঝিবার ক্ষমতা মানব-বুদ্ধিতে সুদুর্লভ! সেই অব্যর্থ কৌশলীর কৌশলচক্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? ভবিষ্যৎ-গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে? কোন বুদ্ধিমান বলিতে পারেন যে, মুহূর্ত অন্তে কি ঘটাইবেন? কোন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁহার কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া তদ্বিপরীত কার্যে সক্ষম হইতে পারেন? জগতে সকলেই বুদ্ধির আয়ত্তাধীন; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বুদ্ধি অচল, অক্ষম, অস্ফুট এবং অতি তুচ্ছ। ষষ্টি সহস্র লোক হোসেনের সঙ্গে কুফায় যাইতেছে, সূর্যদেব পথ দেখাইতেছেন, তরু পর্বত নির্ঝরিণী পথের চিহ্ন দেখাইয়া যাইতেছে, কুফার পথ পরিচিত কত লোক তন্মধ্যে রহিয়াছে, কত লোক সেই পথে যাইতেছে, চক্ষু বন্ধ করিয়াও তাহারা কুফা নগরে যাইতে অসমর্থ নহে। সেই সর্বশক্তিমান পূর্ণ-কৌশলীর কৌশলে আজ সকলেই অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাঁহার যে আজ্ঞা সেই কার্য; একদিন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার আর বৈলক্ষণ্য নাই, বিপর্যয় নাই, ভ্রম নাই। একবার মনোনিবেশপূর্বক অনন্ত আকাশে অনন্ত জগতে, অনন্ত প্রকৃতিতে বাহ্যিক নয়ন একেবারে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ নয়নে দৃষ্টিপাত কর, সেই মহাশক্তির কিঞ্চিৎ শক্তি বুঝিতে পারিবে। যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি, তাহা দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইতে হয়। তাঁহার আজ্ঞা অলংঘনীয়, বাক্য অব্যর্থ। হোসেন মহানন্দে কুফায় যাইতেছেন,– ভাবিতেছেন, কুফায় যাইতেছি। কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁহাকে ভুলাইয়া-বিজন বন কারবালার পথে লইতেছেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল তিনি কেন, ষষ্টি সহস্র লোক চক্ষু থাকিতেও যেন অন্ধ।

আবদুল্লাহ জেয়াদের সন্ধানী অনুচরগণ গোপনে আবদুল্লাহ জেয়াদের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল যে, ইমাম হোসেন মদিনা হইতে ষষ্টি সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া কুফায়

আসিতেছিলেন, পথ ভুলিয়া ঘোর প্রান্তরে কারবালাভিমুখে যাইতেছেন। আবদুল্লাহ জেয়াদ মহাসন্তুষ্ট হইয়া শুভ-সংবাদবাহী আগন্তুক চরকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিয়া বলিলেন, "তোমাকেই আজ কাসেদপদে বরণ করিয়া দামেস্কে পাঠাইতেছি।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ এজিদের নিকট পত্র লিখিলেন, "বাদশাহর অনুগ্রহে দাসের প্রাণদান হউক! আমি কৌশল করিয়া মোহাম্মদের রওজা হইতে ইমাম হোসেনকে বাহির করিয়াছি। বিশ্বস্ত গুপ্ত সন্ধানী অনুচর-মুখে সন্ধান পাইলাম যে, ইমাম হোসেন কুফা নগরের পথ ভুলিয়া দাস্ত কারবালা অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার পূর্ব প্রেরিত সাহসী মহাবীর মোসলেমকে কৌশলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। এই অবসরে হোসেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি ভাল ভাল সৈন্য প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। ওতবে অলীদকে কুফার দিকে সৈন্যসহ পাঠাইলে প্রথমে মোসলেমকে মারিয়া পরে তাহারাও হোসেনের পশ্চাদবর্তী হইয়া হোসেনকে আক্রমণ করিবে। প্রথমে মোসলেমকে মারিতে পারিলে আর হোসেনের মস্তক দামেস্কে পাঠাইতে কিছুই বিঘ্ন হইবে না, ক্ষণকাল বিলম্ব হইবে না।"

আবদুল্লাহ জেয়াদ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া গুপ্তসন্ধানী অনুচরকে কাসেদ পদে নিযুক্ত করিয়া দামেস্কে পাঠাইলেন। এদিকে মোসলেমের নিকট দিন দিন আরও ন্যূনতা স্বীকার করিয়া তাহার যথোচিত সেবা করিতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে হোসেনের আগমনে বিলম্বজনিত দুঃখে নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিয়া মোসলেমকে নিশ্চিন্তে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ-প্রেরিত কাসেদ পুরস্কার-লোভে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া দামেস্কে পৌঁছিলেন। দামেস্কাধিপতি এজিদ কাসেদের পরিচয় পাইয়া– সমুদয় বৃত্তান্ত নির্জনে অবগত হইয়া মহানন্দে কাসেদকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া, প্রধান প্রধান সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্বক বলিতে লাগিলেন, "এত দিনের পর আমার পরিশ্রমের ফল ফলিয়াছে। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কৌশল করিয়া হোসেনকে মদিনা হইতে বাহির করিয়াছেন, তোমরা এখনই প্রস্তুত হইয়া হোসেনের অনুসরণ কর। মরুস্থলে কারবালার পথে যাইলে পলাতক হোসেনের দেখা পাইবে। যদি পথের মধ্যে আক্রমণ করিবার সুযোগ না হয়, তবে একেবারে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অগ্রে ফোরাত নদীর পূর্বকূল বন্ধ করিবে। মদিনা হইতে কুফা পর্যন্ত গমনোপযোগী আহারীয় এবং পানীয় বস্তুর সুবিধা করিয়া হোসেন মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গেও ষষ্টিসহস্র লোক। ইহাদের পানোপযোগী জল সর্বদা সংগ্রহ করা সহজ কথা নহে। তোমাদের প্রথম কার্য কারবালার ফোরাত নদীর কূল আবদ্ধ করিয়া রাখা। হোসেন- পক্ষীয় একটি প্রাণীও যেন ফোরাতকূলে আসিতে না পারে, ইহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। দিবারাত্র সদা-সর্বদা সতর্কভাবে যে কোন সময়ে, যে কোন সুযোগে এক পাত্র জল হোসেনের কি তৎসঙ্গী কোন লোকের আশু প্রাপ্য না হয়। বারিরোধ করিতে পারিলেই তোমাদের কার্য সিদ্ধ হইবে। হোসেনের মস্তক যে ব্যক্তি এই দামেস্কে আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব এবং বিজয়ী সৈন্যদিনের নিমিত্ত দামেস্কের রাজভাণ্ডার খুলিয়া রাখিব। যাহার যত ইচ্ছা সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।" প্রধান প্রধান সৈন্যগণ, ওমর, সীমার প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! এবারের হোসেনের মস্তক না লইয়া আর দামেস্কে ফিরিব না।"

সীমার অতি দর্পে বলিতে লাগিল, -"আর কেহই পারিবে না, আমিই হোসেনের মাথা কাটিব, কাটিব- নিশ্চয় কাটিব; -পুরস্কার আমিই লইব, আর কেহই পারিবে না। হোসেনের মাথা না লইয়া সীমার এ নগরে আর আসিবে না। এই সীমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

এজিদ বলিলেন, "পুরস্কারও ধরা রহিল।" এই বলিয়া আবদুল্লাহও সীমারকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করিয়া বিদায় করিলেন।

পাঠক! এতদিন আপনাদের সঙ্গে আসিতেছি, কোন দিন মনের কথা বলি নাই। বিষাদ-সিন্ধুতে হাসি-রহস্যের কোন কথা নাই, তন্নিমিত্ত এ পর্যন্ত হাসি নাই। কাঁদিবার অনেক কথা আছে, তথাচ নিজে কাঁদিয়া আপনাদিগকে কাঁদাই নাই। আজ মন কাঁপিয়া উঠিল, সীমার হোসেনের মস্তক না লইয়া আর দামেস্কে ফিরিবে না- প্রতিজ্ঞা করিল। সীমার কে? পরিচয় এখনও প্রকাশ পায় নাই- কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার পরিচয় অপ্রকাশ থাকিবে না। সীমারের নামে কেন যে হৃদয়ে আঘাত লাগিতেছে, জানি না। সীমারের রূপ কোন লেখকই বর্ণনা করেন নাই, আমিও করিব না। কল্পনা-তুলি হস্তে তুলিয়া আজ আমি এখন সেই সীমারের রূপ-বর্ণনে অক্ষম হইলাম। কারণ, বিষাদ-সিন্ধুর সমুদয় অঙ্গই ধর্মকাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ণনায় কোন প্রকার ন্যূনাধিক হইলে প্রথমতঃ পাপের ভয়, দ্বিতীয়তঃ মহাকবিদিগের মূল গ্রন্থের অবমাননা ভয়ে তাঁহাদেরই বর্ণনায় যোগ দিলাম। সীমারের ধবল বিশাল বক্ষে লোমের চিহ্নমাত্র নাই; মুখাকৃতি দেখিলেই নির্দয় পাষাণহৃদয় বলিয়া বোধ হইত- দন্তরাজি দীর্ঘ ও বক্রভাবে জড়িত- প্রাচীন কবির এই মাত্র আভাস এবং আমারও এইমাত্র বলিবার অধিকার, নাম সীমার।

এজিদ সৈন্যদিগকে নগরের বাহির করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবদুল্লাহ জেয়াদের লিখনানুসারে মারওয়ানকে সসৈন্যে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফা নগরে মোসলেমকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সংবাদবাহক সংবাদ লইয়া যাইবার পূর্বেই ওতবে অলীদ ও মারওয়ান সৈন্যসহ হোসেনের অনুসরণ করিতে কুফার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে দামেস্কের কাসেদ-মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অলীদ এবং মারওয়ান অবিশ্রামে কুফাভিমুখে সৈন্যসমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধির অগম্য, চিন্তার বহির্ভূত- অল্প সময়ের মধ্যে কুফার নিকটবর্তী হইলে জেয়াদের অনুচরেরা জেয়াদের নিকট সংবাদ দিল, "মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ মারওয়ান এবং ওতবে অলীদ সৈন্যসহ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,- কি কর্তব্য।"

জেয়াদ এতৎ সংবাদে মহাসন্তুষ্ট হইয়া মোসলেম সমীপে যাইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "বাদশাহ-নামদার! এজিদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর মারওয়ান এবং ওতবে অলীদ কুফার অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। বোধ হয়, অদ্যই নগর আক্রমণ করিবে। প্রভু হোসেনের আশায় এত দিন রহিলাম, তিনি তো আসিলেন না; শত্রুপক্ষ নগরের সীমার নিকটবর্তী, এক্ষণে কি আদেশ হয়?"

মোসলেম বলিলেন, "আমরা এমন কাপুরুষ নহি যে, শত্রুর অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়া নগর রক্ষা করিবে? আমি এখনই আমার সঙ্গীয় সৈন্য লইয়া মারওয়ানের গতিরোধ করিব এবং নগর আক্রমণে বাধা দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিব। আপনি যত শীঘ্র পারেন, কুফার সৈন্য লইয়া আমার পশ্চাদ্বর্তী হউন। সৈন্যসহ আপনি আমার পশ্চাদ-

রক্ষক থাকিলে ঈশ্বর-কৃপায় আমি সহস্র মারওয়ানকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। এই কথা বলিয়া মোসলেম মদিনার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে অনুমতি সঙ্কেত করিলেন। মদিনাবাসীরা এজিদ ও এজিদের সৈন্য-শোণিতে তরবারি রঞ্জিত করিতে সদাসর্বদা প্রস্তুত। মোসলেমের সাঙ্কেতিক অনুমতি, মারওয়ানের সহিত যুদ্ধের অণুমাত্র প্রসঙ্গ পাইয়াই সৈন্যগণ মার মার শব্দে শ্রেণীবদ্ধপূর্বক মোসলেমের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যদিগের উৎসাহ দেখিয়া মোসলেম দ্বিগুণতর উৎসাহে অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং মুহূর্তমধ্যে সৈন্যশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধপূর্বক নগরের বাহির হইলেন। কুফার সৈন্যগণও অত্যল্প সময় মধ্যে সুসজ্জিত পূর্বতন প্রভু জেয়াদের সহিত সমরে চলিলেন। মোসলেম নগরের বাহির হইয়াই দেখিলেন যে, এজিদের চিহ্নিত পতাকাশ্রেণী বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যুদ্ধবাদ্য মহাঘোর রবে বাদিত হইতেছে। মোসলেম সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল! যে এজিদ যে মারওয়ান, যে ওতবে অলীদের ভয়ে হোসেন মদিনাবাসীদের জন্য মদিনাবাসীদিগকে বিপদ-উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্য কুফায় আসিতে মনস্থ করিয়া অগ্রে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, সেই বিধর্মী কাফের তাঁহারই উদ্দেশ্যে, কি আমাদের প্রাণ লইতে, কি আমাদিগকে যে এত সাহায্য করিতেছে সেই জেয়াদের প্রাণ বিনাশ করিতে আসিয়াছে। কুফার সৈন্য আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব। শত্রুকে সময় দিলেই চতুর্গুণ বল বৃদ্ধি হয়। আর অপেক্ষা নাই, কুফার সৈন্য আসিবে, একত্রে যাইব, ইহা বলিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। আমরাই অগ্রে গিয়া শত্রুপক্ষকে বাধা দিয়া আক্রমণ করি।" মোসলেম সহস্র সৈন্য লইয়া একেবারে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জেয়াদ কুফার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোসলেমের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। নগরের অন্তসীমা শেষ তোরণ পর্যন্ত আসিয়া দেখিলেন, নগরের অন্ত সীমার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সৈন্যগণ অবাক হইল। সকলেই পূর্ব প্রভুর আজ্ঞা হঠাৎ লঙ্ঘন করা বিবেচনাসিদ্ধ নহে, এই বলিয়া বিরতভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

আবদুল্লাহ জেয়াদ বলিতে লাগিলেন, 'আমি এতদিন মনের কথা তোমাদিগকে কিছুই বলি নাই, আজ বলিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে বলিতেছি। হোসেনকে রাজ্যদান আমার চাতুরী মাত্র। আমি মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ, অনুগৃহীত, আশ্রিত এবং দামেস্কাধিপতি আমার একমাত্র পূজ্য। কারণ আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা। সেই রাজাদেশে হোসেনকে কৌশল করিয়া বন্দী করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘটনাক্রমে তাহা হইল না। মোসলেমকে যে উদ্দেশ্যে সিংহাসনে বসাইয়াছিলাম, তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ হইল; কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সফল হইল না। মহারাজ এজিদের সৈন্য আসিয়াছে, কৌশলে মোসলেমকেও নগরের বাহির করিয়া মহারাজ এজিদের সৈন্যের সম্মুখীন করিয়া দিলাম, রাজ্যজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। আমাদের নগরের বাহিরে কোন প্রয়োজন নাই, আমরা যুদ্ধে যাইব না, মোসলেমের সহায়তাও করিব না। নগরতোরণ আবদ্ধ কর,– বলবান সাহসী সৈনিক পুরুষ দ্বারা রক্ষা হউক। মোসলেমকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তথাচ যদি মোসলেম যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য নগরে আশ্রয় লইতে নগরদ্বারে উপস্থিত হয়, কিছুতেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণ আবদুল্লাহ জেয়াদের বাক্যে একেবারে অবাক হইয়া রহিল। জেয়াদের মনে এত চাতুরী, এত ছলনা, এত প্রতারণা, তাহাতে আরও আশ্চার্যান্বিত হইল। কি

করিবে, নগর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারের নিকটবর্তী স্থানেই সৈন্য সহিত সকলেই একত্র হইয়া রহিল।

ওতবে অলীদ মোসলেমকে দেখাইয়া সৈন্যগণকে বেগে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। মোসলেম ওতবে অলীদের আক্রমণে বাধা দিয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুসম্মুখে সৈন্যদিগকে দণ্ডায়মান করাইলেন। কিন্তু আক্রমণ করিতে আর সাহসী হইলেন না। আত্মরক্ষাই আবশ্যক মনে করিলেন। কুফার সৈন্য কত নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহা দেখিতে পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে মোসলেমের মস্তক ঘুরিয়া গেল। জনপ্রাণী মাত্র নাই, অথচ নগরতোরণ বদ্ধ– মোসলেম একেবারে হতবুদ্ধির প্রায় হইয়া নগরের দিকে বারংবার চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব প্রকারেই নগরদ্বার বদ্ধ রহিয়াছে। নিশ্চয়ই মনে মনে জানিলেন যে, এ সকল জেয়াদের চাতুরী। চতুরতা করিয়া আমাকে নগরের বাহির করিয়াছে। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম যে, জেয়াদের মনে নানা প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল। হোসেন-বধের জন্যই এ মায়াজাল বিস্তার– তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভালই হইয়াছে, কুফায় আসিলে যে প্রকার বিপদগ্রস্ত হইতেন, তাহা আমার ভাগ্যেই ঘটিল। মোসলেমের প্রাণ যাইয়াও যদি হোসেন প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাও মোসলেমের পক্ষে সার্থক।

মোসলেম হতাশ হইলেন না; কিন্তু তাঁহাকে নূতন প্রকার চিন্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। নিজ সৈন্য এবং কুফার সৈন্যের সাহায্যে যে যে প্রকার যুদ্ধের কল্পনা করিয়াছেলেন, এক্ষণে তাহার পরিবর্তন করিয়া নূতনরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ওদিকে ওতবে অলীদ কি মনে করিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। আপন আয়ত্তাধীনে সম্ভবমত দূরে থাকিয়াই দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে মহাবীর ওতরে অলীদ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মোসলেম!" যদি নিতান্তই যুদ্ধ সাধ হইয়া থাকে, তবে আইস, আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি; জয় পরাজয় আমাদের উভয়ের উপরই নির্ভর। অনর্থক অন্য অন্য প্রাণ বিনষ্ট করিবার আবশ্যক কি?"

মোসলেম সে কথার উত্তর না দিয়া কতক সৈন্য সহিত ওতবে অলীদকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ওতবে অলীদ আবার বলিলেন, "মোসলেম! এই কি যুদ্ধের রীতি, না বীরপুরুষের কর্তব্য কার্য? কে তোমাকে বীর আখ্যা দিয়াছিল? কহ মহারথি! এ কি মহারথি-প্রথা?

মোসলেম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন,– "ভ্রাতৃগণ? বিধর্মীর হস্তে মৃত্যু বড়ই পূণ্য! প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্রগণকে যাহারা, যে পাপাত্মারা, যে নরপিশাচেরা শত্রু মনে করে,– তাঁহাদের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করে, তাহাদের হস্তে প্রাণবিসর্জন করিতে পারিলে, তাহা অপেক্ষা ইহজগতে আর কি অধিকতর সুখ আছে? একদিন মরিব বলিয়াই জন্মিয়াছি। এই মরণে সুখ,– সহস্র সহস্র পাপ থাকিলেও সর্বসুখ ভোগের অধিকার, এমন মরণে কে না সুখী হয়? আমরা যুদ্ধে জয়ী হইব না, আশাও করি না। তবে বিধর্মীর হস্তস্থিত তরবারি ইসলাম-শোণিতের রঞ্জিত হইয়া পরিণামে আমাদিগকে স্বর্গসুখের অধিকারী করিবে, এই আমাদের আশা। জয়ের আশা আর মনে করিও না, আজই যুদ্ধের শেষ, আজই আমাদের জীবনের শেষ।" মোসলেম এই বলিয়া ওতবে অলীদের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মারওয়ান দেখিলেন যে, অলীদের পরমায়ু শেষ হইল, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া মোসলেম আক্রমণ করিয়াছে। ইহাতে

একা এক প্রাণ, কতক্ষণ অলীদ রক্ষা করিবে? ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া মারওয়ান সমুদয় সৈন্যসহ মোসলেমকে আক্রমণ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলেমের জীবনে আশা নাই, তাঁহার সৈন্যগণ বিধর্মীর হস্তে মরিবে, সেই আশায়ে কেবল মারিতেই লাগিলেন; ভবিষ্যৎ জ্ঞান, পশ্চাৎ লক্ষ্য, পার্শ্বে দৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি কিছুই লক্ষ্য রাখিলেন না। মহাবীর মোসলেম দুই হস্তে তরবারি ধরিলেন। অশ্ববল্গা দন্তে আবদ্ধ করিলেন। শত্রুসৈন্য অকাতরে কাটিয়া চলিলেন। মধ্যে মধ্যে "আল্লাহ্ আকবর" নিনাদে দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিলেন। ওতবে অলীদ ও মারওয়ান বহু পরিশ্রম ও বহু চেষ্টা করিয়াও মোসলেমের লঘুহস্তচালিত চপলাবৎ তরবারি- সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল মধ্যে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া দিগ্বিদিকে পালাইতে লাগিল। মোসলেমের সৈন্যগণও ঐ পলায়িত শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দেহ হইতে বিধর্মী মস্তক মৃত্তিকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ নগরতোরণোপরিস্থ অতি উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া উভয় দলের যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। দেখিলেন, মোসলেম-তরবারির সম্মুখ কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! বহুতর সৈন্য মৃত্তিকাশায়ী হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও প্রাণভয়ে দিশাহারা হইয়া পালাইতেছে। জেয়াদ মঞ্চ হইতে নামিয়াই দ্বাররক্ষককে বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া দাও।" সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, "আমার পশ্চাদ্বর্তী হইয়া মোসলেমকে আক্রমণ কর, আমরা সাহায্য না করিলে ওতবে অলীদের প্রাণ কখনই রক্ষা হইবেনা।" রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রই লক্ষাধিক সৈন্য জয়নাদে তুমুল শব্দ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মোসলেমকে আক্রমণ করিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছেন, মোসলেমের সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই, কেবল অশ্ববল্গা দন্তে ধারণ করিয়া দুই হস্তে বিধর্মী নিপাত করিতেছেন। যাহাকে যে অবস্থায় পাইতেছেন, সেই অবস্থাতেই দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন, কাহাকে অশ্ব সহিত এক চোটে দ্বিখণ্ডিত করিয়া জন্মশোধ যুদ্ধের সাধ মিটাইতেছেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ পশ্চাৎদিক হইতে মোসলেমকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেই ওতবে অলীদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মোসলেম! ঈশ্বরের নাম মনে কর; তোমার সাহায্যের জন্য আব্দুল্লাহ জেয়াদ লক্ষ্যধিক সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন।"

মোসলেম জেয়াদের নাম শুনিয়া চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর কিছুই বলিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, "বিধর্মীর কথায় যে বিশ্বাস করিবে, কাফেরের ভক্তিতে যে মুসলমান ভুলিবে, তাহার দশাই এইরূপ ঘটিবে!" মোসলেম ভীত হইলেন না, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াও পরাজয় স্বীকার করিলেন না, পূর্বমত বিধর্মী-শোণিতে মৃত্তিকা রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। চতুর্দিক হইতে অবিশ্রান্তরূপে মোসলেমের শরীরে শর বিদ্ধ হইতে লাগিল; সর্বাঙ্গে শোণিতধারা ছুটিল। অশ্বপদতলে বিধর্মীর রক্তস্রোত বহিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্যদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে, শোণিতসিক্ত মৃত্তিকায় ক্ষিপ্রগামী অশ্বপদ স্খলিত হইতেছে; তত্রাচ মহাবীর মোসলেম শত্রুক্ষয় করিতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। এত মারিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার শেষ হইতেছে না। দিনমণিও সমস্ত দিন এই ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া লোহিতবর্ণ অস্তমিত হইলেন। তৎসঙ্গেই ইসলাম-গৌরব-রবি মহাবীর মোসলেম লোহিত বসনে আবৃত হইয়া জগৎ অন্ধকার করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জনপূর্বক স্বর্গবাসী হইলেন। মদিনার একটি প্রাণীও আর বিধর্মীর অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইল না।

যুদ্ধাবসানে নরপতি জেয়াদ দর্পের সহিত বলিতে লাগিলেন, -"মদিনার শত্রুকূল, -মহারাজ এজিদ-নামদারের নামের বলেই এরূপ নির্মূল হইবে। যেরূপ চিন্তা করিয়া কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহ-নামদারের মহাশত্রু আজ সবংশে বিনষ্ট হইত, দৈববিপাকে তাহা হইল না। মোসলেমের যে দশা ঘটিল, প্রধান শত্রু হোসেনকেই সেই দশায় পতিত হইতে হইত। দামেস্ক ও কুফার সৈন্যের তরবারিধারে হোসেন- মস্তক নিশ্চয় দেহবিচ্ছিন্ন হইত। পরিবার পরিজন সঙ্গীরাও আজ কুফার সিংহদ্বারের সম্মুখ প্রান্তরে রক্তমাখা হইয়া গড়াগড়ি যাইত। ভাগ্যক্রমে হোসেন ষষ্টি সহস্র লোকজনসহ কুফার পথ ভুলিয়া কারবালার পথে গিয়াছে; জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে সর্বাংশে যশ লাভ করিতে পারিলাম না; ইহাই আমার নিদারুণ আক্ষেপ! মদিনার একটি প্রাণীও আজ কুফার সৈন্যগণের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। সমুদয় শেষ হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে। একটি প্রাণীও পালাইতে পারে না। ধন্য কুফার সৈন্য!"

গুপ্ত চর, গুপ্ত সন্ধানিগণ মধ্য হইতে একজন বলিল,-"ধর্মাবতার! মোসলেমের দুই পুত্র মরে নাই, ধরা পড়িয়া বন্দীও হয় নাই। তাহারা যুদ্ধাবসানে, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অতি এস্ত পদে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কি কৌশলে যে তাহারা কুফার সৈন্যগণ-চক্ষে ধূলি দিয়া প্রাণ বাঁচাইল,- আর এ পর্যন্ত জীবিত আছে, -ইহাই আশ্চর্য! মহারাজ! তাহারা দুই ভ্রাতা এই নগরেই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। আমরা বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহারা নগরের বাহিরে যায় নাই; যাইতে পারে নাই।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ অতি ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, -সে কি কথা! মোসলেমের পুত্রদ্বয় জীবিত আছে?" অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আহা! এ কি ভয়ানক কথা? ভুজঙ্গ হইতে ভুজঙ্গশিশুর বিষ যে অত্যধিক মারাত্মক, তাহা কি তোমরা জান না? এখনই ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা প্রচার কর। নগরের প্রতি রাজপথে, ক্ষুদ্র পথে, প্রকাশ্য স্থানে, নগরবাসীর প্রতি দ্বারে ডঙ্কা, দুন্দুভি, ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া দাও, -যে ব্যক্তি মোসলেমের পুত্রদ্বয়কে ধরিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, সহস্র মুদ্রা তৎক্ষণাৎ পারিতোষিক পাইবে। আর যে ব্যক্তি মোসলেমের পুত্রদ্বয়কে আশ্রয় দিয়া গোপনে রাখিবে, প্রকাশ মাত্র, বিচার নাই- কোন কথা জিজ্ঞাসা নাই,- দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই, শূলদণ্ডই তাহার জীবনের সহচর। শূলদণ্ডকেই চির আলিঙ্গন করিয়া- প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া মজ্জাভেদে মরিতে হইবে।"

আদেশমত তখনই ঘোষণা প্রচার হইল- নগরময় ঘোষণা প্রচার হইল। কত লোক অর্থলোভে পিতৃহীন বালকদ্বয়ের অন্বেষণে ছুটিল। নানা স্থানে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, মাঠ, ঘাট চারিদিকে সন্ধান করিয়া ব্যস্ততাসহকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মোসলেমের পুত্রদ্বয় ঘোষণা প্রচারের পূর্বেই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোকটি কুফা নগরের বিচারপতি (কাজী), তিনি বালকদ্বয়ের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আশ্রয় দিয়াছেন, পরিতোষরূপে আহার করাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর মোসলেমের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। ইতোমধ্যে ঘোষণার বিবরণ শুনিয়া কাজী সাহেব নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। কি করেন? কি উপায়ে পিতৃহীন বালক দুইটির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তাহারই সুযোগ-সুবিধা খুঁজিতেছেন, চিন্তা

করিতেছেন। বহু চিন্তার পর সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আসাদ'কে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক পুত্র! দেখ–এই পিতৃহীন বালক দুইটির প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে হইবে। ঘোষণার বিষয় তো শুনিয়াছ। সাবধান সতর্কে নিশীথ সময়ে বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া নগরের প্রবেশদ্বার পার হইবে। কিছুক্ষণ মদিনার পথে দাঁড়াইলেই মদিনার যাত্রীদল অবশ্যই দেখিতে পাইবে। বহু যাত্রীদলই প্রতি রাত্রে গমন করে, অদ্যও করিবে, তাহাদের কোন এক দলের সহিত বালকদ্বয়কে সঙ্গী করিয়া দিলেই কাফেলায়' মিশিয়া নিরাপদে মদিনায় যাইতে পারিবে। বালক দুইটিরও প্রাণ রক্ষা হইবে, আমরাও নরপতি জেয়াদের ঘোষণা হইতে রক্ষা পাইব।"

কাজী সাহেব এই কথা বলিয়াই দুই ভ্রাতার কোমরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মোহর বাঁধিয়া দিলেন এবং খাদ্য-সমাগ্রীও পরিমাণ মত উভয় ভ্রাতার সঙ্গে যাহা তাহারা অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে, তাহা দিয়া দিলেন।

কাজী সাহেবের পুত্র আসাদ, পিতৃহীন বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া নিশীথ-সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সাবধানে সতর্কে নগরের সিংহদ্বার পার হইয়া দেখিলেন, এক দল যাত্রী মদিনাভিমুখে যাইতেছে, কিন্তু তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িয়াছে।

আসাদ বলিলেন,– "ভ্রাতৃগণ! দেখিয়াছ? ঐ মদিনার যাত্রীদল যাইতেছে, এমন সুযোগ-সুবিধা আর নাও পাওয়া যাইতে পারে। ঐ যে যাত্রীদল যাইতেছে, তোমরা খোদার নাম করিয়া ঐ দলে মিশিয়া চলিয়া যাও। ঐ যাত্রীদলে মিশিতে পারিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না। তোমাদিগকে এলাহীর হস্তে সঁপিলাম। যাও ভাই! আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র যাও। ভাই–সালাম।" আসাদ বিদায় হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় এস্তপদে মদিনার যাত্রীদলের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রজনী ঘোর অন্ধকার। বালুকাময় পথ। তদুপরি প্রাণের ভয়, দুই ভাই একত্রে দৌড়িতে লাগিলেন, –অগ্রগামী কাফেলার দিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে লাগিলেন।

জগৎকারণ জগদ্বীশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। ভ্রাতৃদ্বয় দৌড়িতে দৌড়িতে মদিনার পথ ভুলিয়া পুনরায় নগরের দিকে– কুফা নগরের দিকেই আসিতে লাগিলেন। মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, যাত্রীদল বেশি দূর যায় নাই, এখনই তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দলের মিশিতে পারিব। নির্ভয়ে মদিনা যাইয়া দুঃখিনী মায়ের চরণ দু'খানি দেখিতে পারিব। আশা করিলে কি হয়? মানুষের আশা পূর্ণ হয় কৈ? অদৃষ্ট ফেরে পথ ভুলিয়া–মদিনার পথ ভুলিয়া অন্য পথে কুফা নগরের দিকেই যে আসিতেছেন দুই ভাই এ দৈবঘটনার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। ত্রস্তপদে যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিলেন–মশালের আলো। আলো লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। যাইয়া দেখেন যাত্রীদল নহে। রাজকীয় প্রহরীদল–অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, প্রত্যেকের হস্তেই জ্বলন্ত মশাল। প্রহরীদিগের সম্মুখে পড়িতেই তাহারা বালকদ্বয়কে দেখিয়া আকার-প্রকার, তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়াই যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইল। আর কি যাইবার সাধ্য আছে। ধরিয়া ফেলিল। পুরস্কার-লোভে অগ্রে শহর-কোটালের নিকট লইয়া উপস্থিত করিল। নগরপাল কোটাল উভয় ভ্রাতার আকার-প্রকার দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন– এই বালকদ্বয়ই বীরবর মোসলেমের হৃদয়ের সার, প্রিয় আত্মজ। নগরপাল ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপলাবণ্য দেখিয়া যত্নপূর্বক আপন গৃহে রাখিয়া অতি প্রত্যুষে মহারাজ জেয়াদ-দরবারে উপস্থিত করিলেন।

কুফাধিপতি মোসলেম-তনয়দ্বয়ের রূপলাবণ্য, মুখশ্রী, কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ বেশের নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া "শিরচ্ছেদ কর"— এ কথাটা আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। মায়াবশে বশীভূত হইয়া বলিলেন, —"এই বালকদ্বয়কে দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বন্দীখানায় রাখিতে বল। কারাধ্যক্ষকে আদেশ জানাও যে, ইহারা রাজকীয় বন্দী। কোন প্রকারে কষ্ট না পায়। বন্দীগৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারে। কোন প্রকারে অসম্মান, অবমাননা যেন না হয়।"

দুই ভ্রাতা করজোড়ে সবিনয়ে তাঁহাদের মনের কথা মুখে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইতেই এদিকে প্রহরীদল উভয়কে লইয়া কারাগৃহের প্রধান কার্যকারকের নিকটে চলিয়া গেল। তাঁরা আবদুল্লাহ জেয়াদের নিকট একটি কথা বলিতেও সুযোগ পাইলেন না। কারাগৃহে নীত হইলে কারাধ্যক্ষ, নাম মাস্কুর— উভয় ভ্রাতার রূপমাধুরী দেখিয়া এবং ইহারাই বীর-শ্রেষ্ঠ বীর মোসলেমের হৃদয়ের ধন ভাবিয়া আদর ও যত্নের সহিত ভালবাসিলেন। বন্দীগৃহে না রাখিয়া স্বীয় ভবনে উভয় ভ্রাতাকে লইয়া আহারাদি করাইলেন। বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি করি, রাত্রি-প্রভাতেই হউক, কি দু'দিন পরেই হউক, নরপতি নিশ্চয়ই ইহাদের শিরচ্ছেদ আজ্ঞা প্রদান করিবেন। দু'টি ভাইকে রক্ষা করি কি প্রকারে?" অনেক চিন্তার পর অর্ধ নিশা অতীতে হইলে দুই ভ্রাতাকে জাগাইয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আইস, আমার সঙ্গে আইস!" মোসলেম পুত্রদ্বয় কারাধ্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নগর বাহির হইয়া কারাধ্যক্ষ কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গিয়া দুই ভ্রাতাকে বলিলেন, "শুন তোমরা মনোযোগ করিয়া শুন। এই যে পথের উপরে দাঁড়াইয়া আছি— এই পথ ধরিয়া কুদসীয়া নগরে যাইবে। এই পথ ধরিয়া একটু দ্রুতপদে চলিয়া গেলে রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই কুদসীয়া নগর যাইতে পারিবে। ঐ নগরে আমার ভাই আছে,— তাঁহার নাম— এই নামটা মনে করিয়া রাখিও। নাম করিলেই তাঁহার বাসস্থান লোকে দেখাইয়া দিবে। আমি যে তোমাদিগকে পাঠাইতেছি, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ আমার এই অঙ্গুরী দিতেছি। সাবধানে রাখিও। কিছু বলিতে হইবে না। এই অঙ্গুরীয় আমার ভ্রাতাকে দিলেই তিনি তোমাদিগকে তোমাদের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমরা মদিনার নাম করিও। যে উপায়ে হয়— যে কোন কৌশলে হয়— তোমাদিগকে তিনি মদিনায় পাঠাইয়া দিবেন। এই অঙ্গুরী লও। খোদার হাতে তোমাদিগকে সঁপিলাম। শীঘ্রই এই পথ ধরিয়া চলিয়া যাও। কোন ভয়ের কারণ নাই।— সর্ববিপদহর জয় জগদীশ তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অঙ্গুরী লইয়া বিদায় হইলেন।— কুদসীয়ার পথে যাইতে লাগিলেন।

দয়াময় এলাহীর অভিপ্রেত কার্যে বাধা দিতে সাধ্য কার? কার ক্ষমতা তাঁহার বিধানের বিপর্যয় করে? ভ্রাতৃদ্বয় সারা নিশা এস্তপথে হাঁটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইলেন; জ্যেষ্ঠ বলিলেন,— "ভাই, বহু দূরে আসিয়াছি। কুফা হইতে বহু দূরে কুদসীয়া নগর— এই সেই কুদসীয়া।" রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল। একটু স্থির হইয়া বসিতেই উষার আলোকে চতুর্দিক নয়নফলকে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় এখনও নির্ভয়ে বসিয়া আছেন, প্রকৃতির কল্যাণে ঘটনাচক্রে কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে— তাহার কিছুই জানিতে

পারেন নাই। অদৃষ্টলিপি খণ্ডাইতে মানুষের সাধ্য কি? ভ্রাতৃদ্বয় সারাটি রাত্রি এস্তপদে হাঁটিয়াছেন– সত্য; মনে মনে স্থির করিয়াছিল– বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এস্থানে আর আবদুল্লাহ জেয়াদের ভয়ে ভাবিতে হইবে না। হা অদৃষ্ট! তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল! কুদসীয়ার পথ ভুলিয়া সারাটি রাত্র কুফা নগরের মধ্যেই ঘুরিয়াছেন। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল। চক্ষের ধাঁধা ছুটিয়া গেল। প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মুখে বলিলেন– জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "ভাই, আমাদের কপাল মন্দ। হায়! হায়! কি করিলাম! প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সারা রাত হাঁটিলাম, কি কপাল এই ত সেই স্থান, আমাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া কুদসীয়ার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এ ত সেই স্থান।" কনিষ্ঠ ভ্রাতাও চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই! ঠিক কথা! যে স্থান হইতে তিনি বিদায় হইয়াছিলেন, এত সেই পথ– সেই পথপার্শ্বের দৃশ্য।"

ঘটিয়াছেও তাহাই। কারাধ্যক্ষ মাস্কুর যে স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সারা নিশা ঘুরিয়া প্রভাতে আবার সেই স্থানেই আসিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বয় সে সময় আকুল প্রাণে বলিতে লাগিলেন– মোহাম্মদ জ্যেষ্ঠ, এব্রাহিম কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বলিতেছেন,– "ভাই! এখন উপায়? প্রাণের ভাই এব্রাহিম! এবার আর বাঁচিবার উপায় নাই! এখন উপায় কি? একবার নয় দুইবার এইরূপে ভুল! আর আশা কি? ভ্রাতঃ! এইবারে রাজা জেয়াদ আমাদিগকে জীবন্ত ছাড়িবে না।"

এব্রাহিম বলিলেন,– "নিরাশ হইয়া এই স্থানে বসিয়া থাকা কথাই নহে। সূর্যোদয় হইতেই আমরা প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া সম্মুখের ঐ খোরমা প্রভৃতির ফলের বাগান-মধ্যে লুকাইয়া থাকি। কোন প্রকারে দিনটা কাটাইতে পারিলেই বোধ হয় বাঁচিতে পারি। সন্ধ্যা রে হইলে আমরা মদিনার পথ ধরিব।"

মোহাম্মদ বলিলেন, –"ভাই! তবে উঠ, আর বিলম্ব নাই।"

কনিষ্ঠের হস্ত ধরিয়া অতি এস্তপদে নিকটস্থ খোরমার বাগানে যাইয়া দেখিলেন, ছোট বড় বহু বৃক্ষপূরিত বিস্তৃত ফলের বাগান, বাগানের মধ্যে জলের নহর বহিয়া যাইতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় এ গাছ সে গাছ সন্ধান করিয়া নহরের ধারের পুরাতন একটি বৃক্ষের কোটরে দুই দেহ জড়সড়ভাবে এক করিয়া সাধ্যানুসারে আত্মগোপন করিলেন; কিন্তু একদিকে যে ফাঁক রহিল, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল না। সে সকল বৃক্ষের ছায়া নহরের জলে পড়িয়া ভাসিতেছিল; মৃদুমন্দ বায়ু আঘাতে ছায়াসকল যখন কাঁপিতেছে, কখন ও ক্ষুদ্র বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া জলের মধ্যে যেন ছুটিয়া যাইতেছে। জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সহিত বৃক্ষসকলের ছায়াও হেলিয়া দুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় যে বৃক্ষকোটরে গায় গায় মিশিয়া বসিয়াছেন, কোটরে প্রবেশ অংশের স্থান অনাবৃত থাকায় তাহাদের ছায়া জলে পতিত হইয়া বৃক্ষছায়ার সহিত কম্পিত, সঙ্কোচিত, প্রশস্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ আকারে নানা প্রকার আকার ধারণ করিতেছিল।

বাগানের এক পার্শ্বে এক ভদ্রলোকের আবাসস্থান। সেই ভদ্রলোকের বাড়ির পরিচারিকা নহরের জল লইতে আসিয়া জলে ঢেউ দিয়া কলসী পূর্ণ করিতে করিতে হঠাৎ বৃক্ষচ্ছায়ার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। বৃক্ষকোটরের ছায়ার মধ্যে অন্য এ প্রকার ছায়া দেখিয়া পরিচারিকা কলসী জলে ডুবাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। বৃক্ষকোটরে কিসের ছায়া– দিব্য দুইটি জোড়া মানুষের মত বোধ হইতেছে। কান, ঘাড়, পিঠ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে– এ কি ব্যাপার! কিছুই স্থির করিতে পারিল না! জলপূর্ণ কলসী ডাঙ্গায় রাখিয়া

যে বৃক্ষের ছায়ামধ্যে ঐ অপরূপ ছায়া দেখিতেছিল, এক পা দুই পা করিয়া সেই বৃক্ষের নিকট যাইয়া দেখে যে, দুইটি বালক উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া এক দেহ আকারে রহিয়াছে। পরিচারিকা বালকদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হইল। হৃদয়ে ব্যথা লাগিল,– মুখে বলিল, –"আহা! আহা! তোমরা কাহার কোলের ধন, বাছা রে! দুইজনে এইরূপভাবে এই পুরাতন বৃক্ষের কোটরে লুকাইয়া রহিয়াছ কেন বাছা? আমাকে দেখিয়া এত ভয় করিতেছ কেন বাপ? আহা বাছা! তোমাদের কি প্রাণে মায়া নাই? ওরে বাপধন! ঐ কোটরে সাপ-বিচ্ছুর অভাব নাই। কার ভয়ে তোরা এভাবে গলাগলি করিয়া নীরবে কাঁদিতেছিস? বাপধন! বল, আমার নিকট মনের কথা বল, কোন ভয় নাই। বাবা! তোরা কি দুই ভাই? মুখের গড়ন, হাত পিঠের গঠন দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। তোরা দু'টি ভাই, এক মায়ের পেটে জন্মিয়াছিস বাপ? কোন দুঃখিনীর সন্তান তোরা? বল বাবা– শীঘ্র বল। কার ভয়ে তোরা লুকাইয়া আছিস?"

ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে কোন কথা নাই। দুই ভাই আরও হাত আঁটিয়া গলাগলি করিয়া মাথা নিচু করিয়া রহিলেন। পরিচারিকা নিকটে যাইয়া মৃদু মৃদু স্বরে সজল চক্ষে বলিতে লাগিল,–

"হ্যাঁ বাবা! তোরা কি সেই মদিনার মহাবীর মোসলেমের নয়নের পুত্তলি– হৃদয়ের ধন, জোড়া মাণিক? তাই বুঝি হবে। তাহা না হইলে এত রূপ 'কুফায়' কোন ছেলের নাই; আহা! আহা!– যেন দুইটি ননীর পুতুল, সোনার চাঁদ, জোড়া মানিক। বাবা! তোদের কোন ভয় নাই– আমি অতি সাবধানে রাখিব। রাজবাড়ির ঢেঁডরা শুনিয়াছি। সে জন্য কোন ভয় করি না। আমি তোদের কথা কাহার নিকটেও বলিব না। তোরা আমার পেটের সন্তান, আয় বাবা! আমার অঞ্চলের মধ্যে আয়, প্রাণের মাঝে রাখিব।"

ভ্রাতৃদ্বয় কোটর হইতে সজলনয়নে বাহির ইহয়া পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দয়াবতী বালকদ্বয়কে গাত্রবস্ত্রের আবরণে ঢাকিয়া আপন কর্ত্রীর নিকট লইয়া গেল।

বালকদ্বয়ের কথা কুফা নগরে গোপন নাই। দ্বারে দ্বারে ঢেঁডরা দেওয়া হইয়াছে– ধরিয়া দিতে পারিলে সহস্র মোহর পুরস্কার, আশ্রয় দিলে আশ্রয়দাতার প্রাণ তখনই শূলের অগ্রভাগে সংহার,– তাহাতে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই। গৃহকর্ত্রী এ সকল জানা সত্ত্বেও দুই ভায়ের মস্তকে চুমা দিয়া অঞ্চল দ্বারা তাহাদের চক্ষুজল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন,– "বাবা! তোরা 'এতিম'! তোদের প্রতি যে দয়া করিবে, তাহার ভাল ভিন্ন কখনই মন্দ হইবে না। আয় বাবা, আয়! আমি তোদের মা, মায়ের কোল থেকে কেউ নিতে পারিবে না। তোদের এই মায়ের প্রাণ দেহে থাকিতে তোদের দুইজনকে কেহ লইতে পারিবে না। আয়! তোদের খুব নির্জ্জন গৃহে লইয়া রাখি। আর কিছু খা বাবা! খোদা তোদের রক্ষক।" গৃহিণী দুই ভ্রাতাকে বিশেষ যত্নে এক নির্জ্জন গৃহে রাখিলেন। বিছানা পাতিয়া দিয়া কিছু আহার করাইলেন। প্রাণের ভয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিলেও খায় কে? গৃহকর্ত্রী আপন পেটের সন্তানের অনিচ্ছায় যেমন মুখে তুলিয়া তুলিয়া আহার করান, সেইরূপ খাদ্যসামগ্রী হাতে তুলিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে দিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে বলিলেন, "বাবা! তোমরা কথাবার্তা বলিও না। চুপ করিয়া এই বিছানায় শুইয়া ঘুমাও। পুনঃ আহারের সময় উপস্থিত হইলে আমি আসিয়া তোমাদিগকে জাগাইয়া খাওয়াইব। তোমরা ঘুমাও, সারা রাত জাগিয়াছ আর কত হাঁটাই হাঁটিয়াছ– ঘুমাও, কোন চিন্তা করিও না।"

যে বাড়ির কর্ত্রী দয়াবতী, পরিচারিকাগণও তাঁহারই অনুরূপ প্রায় দেখা যায়। বালকদ্বয়ের কথা কর্ত্রী আর পরিচারিকা ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না।

বাড়ির কর্তার নাম হারেস। কর্তা বাড়িতে ছিলেন না। কার্যবশতঃ প্রত্যূষেই নগরমধ্যে গমন করিয়াছিলেন। দিন গত করিয়া রাত্রি এক প্রহর পরে, আধমরার মত হইয়া বাড়িতে আসিলেন। গৃহিণী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্তা বলিলেন, "সে কথা আর কি বলিব! আমার কপাল মন্দ, আমার চক্ষে পড়িবে কেন? সারাটা দিন আর রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত কত গলি-পথ, কত বড় রাস্তায়, দোধারী ঘরের কোণের আড়ালের মধ্যে কত ভাঙ্গা বাড়ির বাহিরে ভিতরে কত স্থানে খুঁজিলাম। আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কেন? আমি হতভাগ্য, চিরকাল দুঃখ-কষ্টের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা,- আমার চক্ষে পড়িবে কেন? অনটন আমার অঙ্গের ভূষণ, অলক্ষী আমার সংসার ঘিরিয়া বসিয়াছে, শয়তান আমার হিতৈষী বন্ধু সাজিয়াছে, আমি দেখা পাইব কেন? আমার চক্ষে পড়িবে কেন? এত পরিশ্রম বৃথা হইল। সারাটি দিন উপবাস, না খেয়ে কত স্থানেই যে ঘুরিয়াছি, দুঃখের কথা কি বলিব? হায় হায়! আমার কপাল! এক জনের চক্ষে অবশ্যই পড়িবে, লালে লাল হইবে।"

গৃহিনী বলিলেন, "আসল কথা ত কিছুই শুনিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এত বিলম্ব হইল কেন? তুমি সাত গ্রাম বেড় দিয়া ভাগ্যলিপি- অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালি কথা তুলিয়া বসিলে! সারাটি দিন আর রাত্রিও প্রায় দেড় প্রহর- এত সময় কোথায় ছিলে? কি করিলে? তাহাই শুনিতে চাই। আর একটি কথা, আজ তুমি যেমন দুঃখের সহিত আক্ষেপ করিতেছে, - অদৃষ্টের দোষ দিতেছ, এরূপ আক্ষেপ, কপালদোষের কথা ত কখনও তোমার মুখে শুনি নাই?"

হারেস দুঃখিতভাবে নাকী সুরে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, -"তোমায় আর কি বলিব। আমাদের বাদশাহ জেয়াদ মদিনার হযরত হোসেনকে প্রাণে মারিবার যোগাড় করিয়া, মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা রাজ্যদান ভাণ করিয়া হযরত হোসেনকে-"

গৃহিনী বলিলেন, "সে সকল কথা আমরা জানি। হযরত হোসেনের অগ্রে মোসলেম আসিল, তাহার পর মোসলেমকে কৌশল করিয়া মারিবার কথাও জানি।"

"তবে ত তুমি সকলই জান। সেই মোসলেমের দুই পুত্র পলাইয়াছে। তাহার জন্য রাজসরকার হইতে গোষণা হইয়াছে, ধরিয়া দিতে পারিলেই একটি হাজার মোহর পুরস্কার পাইবে। প্রথম শহর-কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বাদশাহ-নামদারের দরবারে হাজির করিলে আমাদের বাদশাহ ছেলে দুইটির মুখের ভাব, সুশ্রী সুন্দর মুখ দু'খানি, দেহের গঠন দেখিয়া মাথা কাটার আদেশ দিতে পারিলেন না। বন্দীখানায় কয়েদ করিতে অনুমতি করিলেন। বন্দীখানার প্রধান কর্মচারী মাস্কুর ছেলে দুইটির রূপে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। বাদশাহ নামদার পর্যন্ত সেই খবর হইলে মাস্কুরের শিরচ্ছেদন হইয়াছে। আজ নূতন ঘোষণা জারি হইয়াছে, যে সেই পলায়িত ছেলে দুইটিকে ধরিয়া দিবে, তাহাকে পাঁচ হাজার মোহর পুরস্কার দেয়া হইবে। যে আশ্রয় দিয়া গোপনে রাখিবে, মাস্কুরের ন্যায় তাহার শিরচ্ছেদ সেই দণ্ডেই হইবে। আমি মোসলেমের ছেলে দুইটির জন্য আহার নিদ্রা বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় না সন্ধান করিয়াছি। ধরিয়া বাদশার দরবারে হাজির করিতে পারিলেই পাঁচ হাজার মোহর। যে পাইবে, সে কত কাল বসিয়া খাইতে পারিবে। এত সন্ধান করিলাম, কিছুই করিতে

পারিলাম না। আজ বেশি টাকার লোভে হাজার হাজার লোক পাহাড়, জঙ্গল,– যেখানে সন্দেহ হইতেছে সেই স্থানেই খুঁজিতেছে। আমি বহু দূরে গিয়াছিলাম। কোথাও কিছু না পাইয়া শেষে আমার খোরমার বাগান খুঁজিয়া তন্ন তন্ন করিলাম, প্রতি বৃক্ষের গোড়ার কোটরে খুঁজিলাম, কোথাও কিছু পাইলাম না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? হতভাগার চক্ষে তাহারা পড়িবে কেন?"

গৃহিনী বলিলেন, "হায়! হায়! সেই পিতৃহীন অনাথ বালক দু'টিকে ধরিয়া দূরন্ত জালেম বাদশাহর নিকটে দিলে পাঁচ হাজার মোহর পাইবে তাহা সত্য, কিন্তু আর একটি হৃদয়-বিদারক মর্মান্তিক সাংঘাতিক কথা কি তোমার মনে উদয় হয় নাই? নিরপরাধ দুইটি এতিমকে বাদশাহর হাতে দিলে, সে নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাণ শাহ্ জেয়াদ কি তাহাদিগকে স্নেহ করিয়া যতনে রাখিবে? না তাহাদের চির-দুঃখিনী জননীর নিকট মদিনায় পাঠাইয়া দিবে? হাতে পাইবামাত্র শিরচ্ছেদ– উহু! বালক দুইটির শিরচ্ছেদের হুকুম প্রদান করিবে! তাহা হইলে হইল কি? তুমিই বালক দুইটির বধের উপস্থিত কারণ হইলে। তৎপরিবর্তে কতকগুলি মোহর পাইবে সত্য– আচ্ছা বল ত, সে মোহর তোমার কত দিন থাকিবে? এখন যে অবস্থায় আছে, দয়াময় দাতা অনুগ্রহকারী ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও। তোমার সমশ্রেণীর লোক জগতে কত স্থানে কত প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। তোমা অপেক্ষা কত উচ্চ শ্রেণীর লোক তোমা হইতে মন্দাবস্থায় দিন কাটাইতেছে! তুমি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত– মহাসুখী। ইহার উপরেও তোমার লোভের অন্ত নাই! বিচারকর্তা অদ্বিতীয় এলাহীর প্রতিও তোমার ভক্তি নাই। হায়! হায়! তোমার মত পাষাণপ্রাণ, পাথরের দেহ ত আমি কাহারও দেখি নাই। পিতৃহীন নিরপরাধ বালকদ্বয়ের দেহরক্তের মূল্যই নরপতি জেয়াদ-চক্ষে পাঁচ হাজার মোহর। হইতে পারে– তাঁহার চক্ষে অন্য রূপ। হউক পাঁচ হাজার মোহর। তুমি রক্তমাখা মোহরের জন্য এত লালায়িত কেন? তুমি কি বোঝ নাই যে, ঐ দুই বালকের শরীরের রক্তের মূল্য পাঁচ হাজার মোহর! তুমি রক্তমাখা মোহরের লোভে অমূল্য বালক দুইটির জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের বিষময় অস্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ! আর এক কথা, সে দেয় কি না। পাও কিনা। পঞ্চ হাজার মোহরেই তোমার লক্ষ্য, অন্তরেও ঐ কথাই জাগিতেছে। বালক দুইটিকে যদি ধরিতে পারি, – পাঁচটি হাজার খাঁটি সোনার মোহর। হা অদৃষ্ট! আমার কপালে কি তাহা আছে? মনে মনে এই ভাবের কথাইত ভাবিতেছ? বার বার সেই নররক্তমাখা কদর্য মোহরগুলির প্রতিই অন্তর-চক্ষুতে কল্পনায় 'সাজান' পাত্র দেখিতেছ। মোহরের জন্য প্রকাশ্যে আপেক্ষাও করিতেছ। বালক দুইটির জীবনের মূল্য হইতে মোহরের মূল্যই অধিক স্থির করিয়াছ। জানিলাম, তোমার মনে মায়া-দয়ার একটি পরমাণুও নাই। এক ফোটা রক্তও নাই। তোমার হৃদয়ে সাধারণ রক্তও নাই,– পাথর চোঁয়ান রস থাকিতে পারে। কারণ তোমার হৃদয় পাষাণ, দেহটা পোড়া ম্যাটির, অস্থি-মজ্জা সমুদয় কঙ্করে পূর্ণ। ইহাতে আর আশা কি?"

"তুমি বুঝিবে কি? যাহাদের শরীর কিছুতেই সমানভাবে ডাকে না, হাজার ঢাক, হাজার বেড় দেও– আসমান থাকিবেই তাকিবে, তুমি জগৎ-সংসারের কি বুঝবে? তুমি বোঝ– প্রথম অলঙ্কার, তাহার পর টাকা-পয়সা, তাহার পর স্বামীকে এক হাতে রাখা? আর কি বোঝ? ছেলে হল' মোসলেমের, – মাথা কাটিবে রাজা জেয়াদ। তাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে কেন? পরের ছেলে পরে কাটিবে, আমাদের কি? রাজা জেয়াদ মোসলেমকে

প্রাণে মারিয়াছে, তাহার ছেলে দু'টিকেও মারিয়া ফেলুক, ছেলের মাকে ধরিয়া আনিয়া হয় প্রাণে মারুক– না হয় ভালবাসিয়া রাণী করিয়া অন্তঃপুরে রাখুক, –তোমার আমার কি? মাঝখানে আমার পঞ্চটি হাজার মোহর লাভ হইবে। এ কার্যে চেষ্টা করিব না? তোমার অঞ্চল ধরিয়া– চেনা নাই, জানা নাই, মোসলেমের জন্য– তাহার দুইটি পুত্রের জন্য কাঁদিতে থাকিব। এইরূপ বুদ্ধি আমার হইলে চাই কি?– সংসার টনটনে কসা! একেবারে কাবাব। শুন কথা। ছেলে দুইটি যাহার চক্ষে পড়িবে, সেই ধরিবে! ধরিলেও নিশ্চিত নহে! বিঘ্ন বাধা অনেক। কত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। কত গুন্ডা ঐ খোঁজে বাহির হইয়াছে। কাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বাদশাহর দরবারে দাখিল করিবে– তাহা কে জানে? ধরিতে পারিলেও কৃতকার্যের আশা অতি কম। যাহা হউক, শুন আমার মনের কথা। যদি ছেলে দুইটিকে হাতে পাই– আর নিরাপদে জেয়াদ-দরবারে লইয়া যাইতে পারি– আর তোমার ভাল হউক– যদি পঞ্চ হাজার মোহর পাই, তিন হাজার মোহর ভাঙ্গিয়া মাতা হইতে পা পর্যন্ত, আবার পা হইতে মাথা পর্যন্ত ডবল পেঁচে সোনা দিয়া তোমার এই সুন্দর দেহখানি মোড়াইয়া জড়াইয়া দিব। দেখত এখন লাভ কত?
গৃহিনী অতিশয় বিষাদভাবে স্বামীর মুখ-চক্ষুপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ! আমি তোমার কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিব না। বাধা দিতেও চাহি না। তোমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতাও আমার নাই। আমি তোমার নিকট মিনতি করিয়া বলিতেছি, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি মোসলেমের সেই ছেলে দুইটির সন্ধানে আর যাইও না– ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার নিকট রতি পরিমাণ সোনাও চাহি না। ও রক্তমাখা মোহরের জন্য লালায়িত নই। পিতৃহীন বালকদ্বয়ের শোণিতরঞ্জিত মোহর চক্ষেই দেখিতে ইচ্ছা করি না। ছুঁইতেও পারিব না! জীবন কয় দিনের? ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর করিবে? আমি তোমার দুইখানি হাত ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, আমার মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি লোভের বশীভূত হইয়া এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইও না।"
হারেস স্ত্রীরত্নের কথায় ক্রোধে আগুন হইয়া রক্তলোচনে আঁখি ঘুরাইয়া বলিলেন, –"চুপ! চুপ! নারী জাতির মুখে ধর্মকথা আমি শুনি না। এখন খাইবার কি আছে, শীঘ্র নিয়ে এস। একটু বিশ্রাম করিয়া এই রাত্রেই আবার সন্ধানে বাহির হইব। দেখি কপালে কি আছে? তোর ও মিছরী-মাখা কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।"
হারেসের স্ত্রী আর কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। হারেস মনে মনে নানা চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কে আহার করিলেন। হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া অমনি শয়ন করিলেন। এত পরিশ্রমেও তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই। কোথায় মোসলেম-সন্তান দুইটিকে পাইবেন, কোন পথে কোথায় কোন স্থানে গেলে তাহাদের দেখা পাইবেন, দেখা পাইয়া কি প্রকারে ধরিয়া রাজদরবারে লইয়া যাইবেন, এই চিন্তাই তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। বালক দুইটির দেখা পাওয়া– পাঁচ হাজার সোনার টাকা, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বহু ক্ষণ পর ঘুমাইয়া পড়িলেন।
গৃহিনী দেখিলেন, স্বামী ঘোর নিদ্রায় অচেতন। কি উপায়ে ছেলে দুইটিকে রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিয়া পরামর্শে বসিলেন। এ পর্যন্ত পরিচারিকা ভিন্ন বাড়ির অন্য কাহাকেও বালকদ্বয়ের কথা বলেন নাই। এখন বাধ্য হইয়া স্বামীর এরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া দয়াবতী স্নেহময়ী রমণী অস্থির হইয়াছেন। কি উপায়ে পিতৃহীন বালকদ্বয়কে রক্ষা করিবেন? স্বামীর মনের ভাব–অদ্যকার ভয়ের কারণই

অধিক, আর আশ্রয়ের স্থান কোথা? প্রকাশ হইলে ছেলে দুইটির মাথা যায়! হইতে পারে, নিজের প্রাণের আশাও অতি সঙ্কীর্ণ। স্বামী-পুরস্কার-লোভে স্ত্রীর বিরোধী হইতে পারেন। আর একটা গোলের কথা, স্বামীর সঙ্গে বালক দুইটি লইয়া কথান্তর হইলে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই জানিবে। ভাল করিতে কেহ আগে বাড়িতে চাহে না। মন্দ করিতে কোমর বাঁধিয়া দৌড়িতে থাকে। যাইয়া বলিলেই হইল– অমুকের ঘরে ছিল। অমুখ স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ছিল; আর প্রাণের আশা কি? এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তায় আরও দুইটি লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করাই স্থির করিলেন।

একজন তাঁহার গর্ভজাত পুত্র; বুদ্ধিমান বিচক্ষণ– দয়ার শরীর। সে শরীরে পিতার গুণ অল্প ছিল, মাতার গুণ অধিক– সেই একজন। আর এক পুত্র তাহার গর্ভজাত নহে, –পালিত পুত্র। শৈশবকাল হইতে আপন স্তন্য পান করাইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। সেই পালিত পুত্র তাঁহার সম্পূর্ণ গুণের অধিকারী হইয়াছে। সেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আপন গর্ভজাত পুত্র তাহার পিতা হারেসের কথা অমান্য করিতে পারে না। অন্যায় কার্য হইলেও প্রতিবাদ করে না, চুপ করিয়া নীরব থাকে। পালিত পুত্রটি তাহা নহে। সে তাঁহার অনুগত বাধ্য। হারেসের কথা সে শুনে না। হারেস কোন অন্যায় কথা বলিলে সে অকপটে নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করে।

তাহার মনের ধারণাই এই যে, যাঁহার শরীরের শোণিতে আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, দেহ বৃদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার স্নেহ-মমতা অনুগ্রহে এত বড় হইয়াছি, তিনিই আমার সর্বস্ব। তিনিই আমার পূজনীয়। তিনিই আমার মুক্তিদাত্রী মাতা-মাতাই আমার সম্বল। মাতাই আমার বল।

হারেস জায়া নিশীথ সময়ে দুই পুত্রকেই চুপিচুপি ডাকিয়া অন্য কক্ষে আনিয়া অতি নির্জন স্থানে দুই পুত্রকে সম্মুখে করিয়া বসিলেন।

পালিত পুত্রকে বলিলেন, "বাবা! তুই আমার পেটে না জন্মিলেও আমি তোকে আমার বুকের দুধ দিয়া প্রতিপালন করিয়াছি। কত মল-মূত্র এই হাতে পরিস্কার করিয়া তোকে বাঁচাইয়াছি। বাবা! তুই আমার শরীরের সার অংশ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিস। আমার শরীরের রক্ত অংশে তোর দেহপুষ্টি হইয়াছে।" আপন গর্ভজাত সন্তানের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! তোকে আর এতে ভিন্ন কি? অতি সামান্য! সেই সামান্য অংশটুকু ছাড়িয়া দিলে– তুইও যেমন, (পালিত পুত্রের হস্ত ধরিয়া) – এও তেমনি পরিচারিকাকে যে কথা বলিতে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দুইজনকে একত্র বসাইয়া সে তাহা বলিয়াছে। তোমরা সকলই শুনিয়াছ। এখন সেই বালক দুইটির রক্ষার উপায় কি? আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের পিতা বাড়ি আসিলে ছেলে দুইটির কথা বলিব। তিনি কতই দুঃখ করিবেন, ছেলে দুইটির রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। এখন দেখিতেছি, তিনিই তাহাদের সংহারক, তিনিই তাহাদের প্রাণনাশক প্রধান শত্রু। মোহরের লোভে তিনি ঐ বালক দুইটিকে ধরিবার জন্য বহু চেষ্টা পরিশ্রম করিয়াছেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া এই রাত্রেই পুনরায় তাহাদের অন্বেষণে ছুটিবেন। তিনি যদি বালক দুইটির সন্ধান পান, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কিছুতেই তাহারা দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে রক্ষা পাইবে না, বাঁচিবে না। এইক্ষণে তোমরাই আমার সহায়-সম্বল-বল। তোমরা দুই ভাই যদি আমার সহায়তা কর, তোমরা দুই ভাই যদি আমার পক্ষে থাকিয়া পিতৃহীন বালক দুইটির রক্ষার

জন্য চেষ্টা কর, তবে তাহারা বাঁচিতে পারে। তোমাদের পিতার চক্ষে পড়িলে কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।"

দুই ভাই বলিল, "মাতাঃ আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমরা সকলই শুনিয়াছি, বালকদ্বয়ের অবস্থা সকলই শুনিয়াছি; আমাদের বাড়িতেই আছে, তাহাও জানিয়াছি। আপনি অত উতালা হইবেন না। পিতা গুরুজন, তাঁহার নিন্দা করিব না। আমরা তাঁহার অর্থলালসার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, আক্ষেপ করিয়াছি। কি করি, পিতা গুরুজন, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করাই মহাপাপ। যাহাই হউক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; রাত্রি দু'প্রহর অতীত হইলেই আমরা দুই ভাই বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া মদিনার পথে যাইব। যদি সুবিধা করিতে পারি, ভালই; না করিতে পারি, আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া মদিনায় রাখিয়া আসিব।"

গৃহিনী সন্তুষ্টচিত্তে অথচ চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে দুই পুত্রের দুই হাত দুই হাতে ধরিয়া আপন মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন, "বাবা! তোরা আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া বল যে, আমরা সাধ্যানুসারে বালকদ্বয়কে রক্ষা করিব।"

পুত্রদ্বয় অকপটচিত্রে স্বীকার করিল, আর বলিল, "মাতাঃ, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বালকদ্বয়ের অনিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের পিতার কোন কথা আমরা শুনিব না। বরং তাঁহার বিরোধী হইব। আপনার আদেশে, আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যদি আমাদের প্রাণও যায়, তথাচ আপনার আদেশের অন্যথা করিব না, কি পশ্চাৎপদ হইব না।"

দুই পুত্র লইয়া গৃহিনী অন্য গৃহে পরামর্শ করিতেছেন। অন্য কক্ষে অতি নির্জন স্থানে ভ্রাতৃদ্বয় শুইয়া আছে। ভিন্ন আর এক কক্ষে হারেস শুইয়াছেন। ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। মোহাম্মদ ও এব্রাহিম নির্জন কক্ষে নিদ্রায় ছিলেন, হঠাৎ মোহাম্মদ জাগিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এব্রাহিমকে জাগাইয়া বলিলেন, "ভাই রে! আর ঘুমাইও না। শুন– স্বপ্ন বিবরণ শুন। এখনই পিতাকে স্বপ্নে দেখিলাম। শুন, অতি আশ্চর্য স্বপ্ন! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আকাশের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল। স্বর্গীয় সৌরভে জগৎ আমোদিত ও মোহিত হইল। দেখিলাম, স্বর্গীয় উদ্যানে হযরত মোহাম্মদ রসুল মকবুল (সাঃ), হযরত আলী (রঃ), হযরত বিবি ফাতেমা জোহ্‌রা এবং হযরত হাসান উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন। পিতৃদেব তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন। আমরা দুই ভ্রাতা দূরে দাঁড়াইয়া আছি, ইতোমধ্যে হযরত রসূল মকবুল আমাদের পিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মোসলেম! তুমি চলিয়া আসিলে আর তোমার দুইটি পুত্রকে জালেমের হস্তে রাখিয়া আসিলে?"

"পিতৃদেব করযোড়ে নিবেদন করিলেম, হযরত! এলাহীর কৃপায় তাহারাও ইনশা আল্লাহ আগামীকল্য পবিত্র পদ চুম্বনের জন্য আসিবে।"

এব্রাহিম বলিলেন, "ভাই, আমিও ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছি। আর চিন্তা কি? রাত্রি প্রভাতেই আমরা পিতৃদেবের নিকটে যাইব। এস ভাই, এইক্ষণে দুই ভাই গলাগলি করিয়া একবার শয়ন করি। জগতের নিদ্রার আজ শেষ নিদ্রা, নিশারও শেষ। আমাদের পরমায়ুরও শেষ। এস ভাই এস! গলাগলি করিয়া একবার শয়ন করি।" দুই ভাই এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেই পাপমতি হারেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতি এস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাড়িতে বালকের ক্রন্দন? কাহার ক্রন্দন? কোথায় তাহারা? কোথা হইতে তাহারা আসিয়াছে? কে তাহাদিগকে তোমার নিকটে

আনিয়া দিল? শীঘ্র শীঘ্র প্রদীপ জ্বালিয়া আন; আর যাহারা কাঁদিতেছে, তাহাদিগকেও আমার সম্মুখে শীঘ্র শীঘ্র লইয়া আইস।"

হারেস জায়া নীরব। কারণ দুর্দান্ত স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ। প্রদীপ জ্বালিতে আদেশ। "যাহারা কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর!" এই সকল কথায় সতী সাধ্বী দয়াবতীর প্রাণপাখী যেন দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়ি উড়ি ভাব করিতে লাগিল। কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছুই বোধ নাই, জ্ঞান নাই, নীরব। হারেস গৃহিনীর এইরূপ ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। এ কি? এ এরূপ হইল কেন? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ কি ভাব হইল?" কোন উত্তর নাই। নির্বাকে এক ধ্যানে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। হারেস স্ত্রীর এইরূপ অন্যমনস্ক ভাব দেখিতে পাইয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিয়া যে গৃহ হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছিল, সন্ধান করিয়া প্রদীপহস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, দুইটি বালক গলাগলি করিয়া শুইয়া কাঁদিতেছেন। হারেস দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। অস্ফুটস্বরে বলিল, "এ কাহারা? আমার বাড়ির নির্জন স্থানে পরম রূপবান দুইটি বালক শয়নাবস্থায় কাঁদে কেন? হারেস কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কে? কাঁদিস কেন? শীঘ্র বল, কে তোরা?"

বালকদ্বয় সভয়ে উত্তর করিল, "আমরা হযরত মোসলেমের পুত্র।" হারেস নিকটে যাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "মোসলেমের পুত্র! তোমরাই মোসলেমের পুত্র! আমি কি আহাম্মক– কি পাগল! ঘরে শিকার রাখিয়া জঙ্গলে ঘুরিতেছি! কি পাগলামী! যাক, যাহা হইবার হইয়াছে। আমার অদৃষ্টজোরেই ঘরে আসিয়াছে! পঞ্চ হাজার মোহর পায় হাঁটিয় আমার নির্জন ঘরে আসিয়া রহিয়াছে। এখন কি করি? রাত্রি প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব। আর যাইবে কোথা।" এই বলিয়া দুই ভ্রাতার জোল্‌ফে জো্‌ফে বন্ধন করিলেন। চুলে টান পড়ায় দুই ভাই কাঁদিয়া উঠিতেই হারেস,– নির্দয় হারেস উভয় ভ্রাতার সুললিত কোমল গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "চুপ! চুপ! কাঁদবি তো এখনই মাথা কাটিয়া ফেলিব।

বলিতে বলিতে দুই ভ্রাতার হস্ত বন্ধন করিয়া দ্বারে জিঞ্জির লাগাইয়া দ্বার ঘেঁষিয়া শয্যা পাতিয়া তরবারি- হস্তে বসিয়া রহিলেন। স্বগত বলিতে লাগিলেন, –"আর ঘুমাইব না। আর কি! হোঃ হোঃ! আর কি! প্রভাতেই মোহরের তোড়া, মোহরের ঝনঝনী, এইবার সুখের সীমা কত দূর! দেখিয়া লইব।"

গৃহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পা দু'খানি ধরিয়া বলিলেন, –"ছেলে দুইটির প্রতি দয়া কর।"

হারেস বলিলেন, "দয়া তো করিবই, রাত্রিটা আছে বলিয়া দয়া দেখিতে পাইতেছ না, একটু পরেই দয়া-মায়া সকলই দেখিবে।"

"দেখ তুমি আমার স্বামী। তোমার পায়ের উপর এই মাথা রাখিয়া বলিতেছি, ছেলে দুইটির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিও না। এতিমের উপর কোন রূপ কর্কশ ব্যবহার করিতে নাই। ছেলে দুইটির প্রতি দয়া কর। টাকা কয় দিন থাকিবে?"

হারেস স্ত্রীর মাথায় পদাঘাত করিয়া বলিল, "দূর হ হতভাগিনী, দূর হ! –আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ? তোকে কি করিব– তুই চ'লে যা! – তোর কথাই শুনিব কিনা? পাঁচ হাজার মোহর লক্ষ্মীর কথায়, বুড়ী রূপসীর মায়া-কান্নায় ছাড়িয়া দিব? এত আমার ঘরে তোলা

টাকা। দেখ! ফিরে আমার এই বিছানার নিকটে আসবি কি মাথা মাটিতে গড়াইয়া দিব।"

"তোরা সকলে ভেবেছিস কি? আমার চক্ষেও ঘুম নাই। তোদের চক্ষেও ঘুম নাই। আর তোরা কখনই এ কথা মনে করিস না যে, মোসলেমের দুই পুত্র আমার হাতছাড়া হইয়া মোহরগুলি হাতছাড়া হইবে, তাহা হইবে না। আর তোরা যা ভাবছিস, তাহাও হইবে না। আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, মোসলেমের দুই পুত্রকে জীবন্তভাবে মহারাজ জেয়াদের দরবারে লইয়া যাইতে আমার মত লোকের সাধ্য নাই। পথে বাহির হইলেই চারিদিক হইতে পুরস্কারলোভী গুণ্ডার দল বালক দুইটিকে জোর করিয়া লইয়া যাইবে। কি অন্যায় কথা! ধরিলাম আমি, পুরস্কার পাইব আমি। তাহা না হইয়া যার বল বেশি, সেই বলপূর্বক লইয়া মহারাজ জেয়াদ-দরবারে উপস্থিত করিয়া বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লইবে। টাকার লোভ বড় শক্ত লোভ। আমি সে সকল ভবিষ্যৎ আশঙ্কার মধ্যেই যাইব না। রাত্রি প্রভাত হইলেই মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের শুধু মস্তক লইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত করিব। তাহাতেই আশা পূর্ণ, কার্যসিদ্ধি। মহারাজ অধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইবেন।

স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া হারেস বলিলেন, "তুই স্ত্রীলোক। ওরে তুই কি বুঝবি? এ সকল উপার্জনের অঙ্গ তুই কি বুঝিবি রে? ছেলে দু'টাও দেখছি ওদের পাগলী মায়ের কথায় পাগল হইয়াছে। আমার চক্ষেও ঘুম নাই। তোদের চক্ষেও ঘুম নাই? যা যা, তোরা বিছানায় যা?" এদিকে রাত্রি-প্রভাত-সংবাদ, কুক্কুটদল সপ্তস্বরে কুফা নগরকে জাগ্রত করিতে লাগিল।

হারেস প্রত্যুষে উঠিয়াই মোসলেমের পুত্রদ্বয়কে বন্ধন করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া সু-ধার তরবারি ও ঘোড়ার বাগডোর হস্তে ধরিয়া ফোরাত নদী তীরে যাইতে লাগিল। হারেসের দুই পুত্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। গৃহিনীও কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্বপশ্চাতে মাথায় ঘা মারিতে মারিতে ছুটিলেন। গৃহিনী দুই পুত্রসহ গোপনে পরামর্শ করিয়াছেন, যে উপায়ে হয় তাঁহারা তিন জনে একত্রে বালক দু'টিকে রক্ষা করিবেন, উপস্থিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। পুত্রদ্বয় মাতার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দেহে প্রাণ থাকিতে আমাদের দুই ভ্রাতার শির স্কন্ধে থাকিতে, মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের শির দেহচ্ছিন্ন হইতে দিব না। দৌড়িতে দৌড়িতে সকলেই ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

হারেসের ক্ষণকাল বিলম্ব সহিতেছে না। শীঘ্র শীঘ্র কার্য শেষ করিয়া দুই ভ্রাতার দুইটি মাথা মহারাজ জেয়াদ-দরবারে উপস্থিত করিলেই তাঁহার কার্যের প্রথম পালা শেষ হয়। দ্বিতীয় পালা মোহরগুলি গণিতে যে বিলম্ব! যে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বালকদ্বয়ের মাথা চাপাইয়া রাজদরবারে লইয়া যাইবেন, সেই ঘোড়ার পৃষ্ঠেই মোহরের ছালা তুলিয়া শীঘ্রই বাড়িতে আনিতে পারিবেন। এইরূপ কার্যপ্রণালী মনে মনে স্থির করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বালকদ্বয়ের মাথা কাটিতে আগ্রহ করিতেছেন। বালক দুইটিকে অশ্ব হইতে নামাইয়া সম্মুখে খাড়া করিলেন। তাহারা যদিও পিতা মোসলেমকে স্বপ্নে দেখিয়াই শীঘ্রই পিতার নিকট যাইতে হইবে স্বপ্নযোগে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিল, সে আনন্দ কতক্ষণ? কুহকিনী দুনিয়ার এমনই মায়া যে, তাহাকে ছাড়িবার কথা কর্ণে প্রবেশ করিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মৃত্যুর কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, প্রাণের মায়া কাহার না আছে?

মোসলেম-পুত্রদ্বয় হারেসের সম্মুখে দণ্ডায়মান! উলঙ্গ খরধার অসিহস্তে কালান্তকের ন্যায় রক্তজবাসদৃশ আঁখিতে চাহিয়া বালক দু'টির আপাদমস্তক প্রতি হারেসের দৃষ্টি!

দুই ভাই কাঁদিতে কাঁদিতে হারেসের পদতলে মাথা রাখিয়া বলিতে লাগিল, –দোহাই তোমার! আমাদিগকে প্রাণে মারিও না। তোমার পদতলে মাথা রাখিয়া বলিতেছি, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমাদের চিরদুঃখিনী মায়ের মুখখানি একবার দেখিতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও– মদিনায় যাই। আর কখনও কুফায় আসিব না।"

বালকদ্বয়ের কাতর ক্রন্দনে পাষাণপ্রাণ হারেসের কিছুই হইল না। সে দুরন্ত নরপিশাচ পিতৃহারা বালকদ্বয়ের করুণ ক্রন্দন কর্ণেই করিল না। একটি বর্ণও শুনিল না। হারেস বালকদ্বয়ের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি একবার উত্তোলন করে আবার কে যেন বাধা দেয়, থামিয়া যায়। আবার ক্ষণকাল পরে মুখ চক্ষু লাল করিয়া, আঁখিদ্বয়ের তারা বাহির করিয়া, বালকদ্বয়ের শির লক্ষ্যে তরবারি, উত্তোলন করে, আবার থামিয়া যায়! কি মর্মঘাতী দৃশ্য! হারেসের এই অত্যাচার, অমানুষিক ব্যবহার ও হৃদয়-বিদারক ঘটনার সূত্রপাত মুক্ত আকাশে দিননাথ শত সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া দেখিতেছেন। ফোরাত নদীতীরে ঘটনা, ফোরাত-জলও দেখিয়া যাইতেছে, প্রবাহে প্রবাহে হারেসের এই কু-কীর্তি দেখিয়া বহিয়া চলিয়া যাইতেছে। নদীতীরে পিতৃহারা অনাথ দুইটি বালক, কৃপণধারী যমদূত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে, "ওগো! আমাদিগকে প্রাণে মারিও না।" প্রাণের দায়ে হন্তার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আমরা দুঃখিনীর সন্তান। জনমের মত পিতাকে এই দেশে হারাইয়াছি। মায়ের মুখখানি দেখিব। তোমার নিকটে প্রাণভিক্ষার চাহিতেছি–আমাদের দুই ভাইয়ের প্রাণ এখন তোমারই হাতে। দয়া করিয়া আমাদের প্রাণভিক্ষা দাও। আমরা জীবনে আর কুফায় আসিব না।"

বালক দুইটি কতই অনুনয় বিনয় করিল– হারেসের মন গলিল না। হারেসের সম্মুখে বধ্যভূমে বালকদ্বয় দণ্ডায়মান! বাম পার্শ্বে হারেসের দুই পুত্র, বিষন্নবদনে দণ্ডায়মান! দয়াবতী হারেস–জায়াও পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ। মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীভয়ে নীরবে কাঁদিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেছেন। হারেস এক এক বার তরবারি উত্তোলন করে, আবার থামিয়া যায়। একবার বালকদ্বয়ের মুখের দিকে, তৎপরেই ফোরাতের জলস্রোতের দিকে চাহিয়া উর্ধে দৃষ্টি করে। ক্রমেই বিলম্ব হইতে লাগিল।

হারেস যেন বিরক্ত হইয়া পালিতপুত্রকে বলিল, "পুত্র! ধর ত আমার এই তরবারি। আজ দেখিব, তোমার তরবারির হাত। এক চোটে দুইটি বালকের মাথা মাটিতে গড়াইয়া দাও দেখি।"

পুত্র উত্তর করিল, "পিতা! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উহা পারিব না। নিষ্পাপ, নিরপরাধ, দোষশূন্য দুইটি পিতৃহীন অনাথ বালককে টাকার লোভে বধ করিতে আমি পারিব না– কখনই পারিব না। বরং ঐ বালকদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করিতে যাহা আবশ্যক হয়, তাহা করিব। আমার প্রাণ দিব, অথচ ঐ বালকদ্বয়ের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইতে দিব না। আমি আপনার এ অবৈধ আদেশ কখনই প্রতিপালন করিব না। টাকার লোভে মানুষ খুন, ঐ মানুষের কার্য নহে– ডাকাত ডাকাত।"

হারেস রোষ-কষায়িত-লোচনে রক্তআঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিল, "কি রে পামর! আমার কার্য তোর চক্ষে হ'ল অবৈধ! তোর এত বিচারে কাজ করি? আর এত

লম্বাচওড়া কথা তুই কার কাছে শিখেছিস? তুই আমার হুকুম মানিবি কি না, তাহাই বল? তুই বেটা ভারী বৈধ?"

"আপনি যাহাই বলুন, আমি মানুষ খুন করিতে পারিব না। আর এই দুইটি বালককে আমি রক্ষা করিব। আমি এতক্ষণ কিছুই বলি নাই। দেখি, আপনি পাপের কোন সীমায় গিয়া উপস্থিত হন? জানিবেন– পিতা বলিতে ঘৃণা বোধ হইতেছে, জানিবেন দস্যু মহাশয়! জানিবেন লোভীর লোভ পূর্ণ হয় না। ঈশ্বর তাহার মনের আশা পূর্ণ করেন না। এই দেখুন তাহার দৃষ্টান্ত।"

বালকদ্বয় প্রতি চাহিয়া বলিল, "এস ভাই। তোমরা এস! আমি তোমাদিগকে এখনই মদিনায় লইয়া যাইতেছি।"

বালকদ্বয় মদিনার নাম শুনিয়াই যেন প্রাণের ভয় ভুলিয়া গেল। হারেস-পালিতপুত্র হস্ত বাড়াইয়া বালকদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া ক্রোড়ের দিকে টানিয়া আনিতেই হারেস ক্রোধে এক প্রকার জ্ঞানহারা হইয়া বিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ওরে নিমকহারাম! আমার হাত থেকে বালকদ্বয়কে তুই কাড়িয়া লইবি? তোর এত বড় ক্ষমতা! এত বড় মাথা! তোকেই আগে শিক্ষা দিই।" পালিতপুত্রের দক্ষিণ হস্ত মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের দিকে প্রসারিত, বালকদ্বয়ও ঐ প্রসারিত হস্ত ধরিতে একটু মাথা নোওয়াইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা, এই সময়ে হারেসের তরবারি পালিতপুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে উত্তোলিত হইল। চক্ষের পলক পড়িতেও অবসর হইল না। হারেসের আঘাতে পালিতপুত্রের শির ফোরাতকূলের বালুকা-মিশ্রিত ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। হারেসের রক্তরঞ্জিত তারবারি ঝন ঝন শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। গৃহিনী পালিতপুত্রের অবস্থা দেখিয়া আর ক্রন্দন করিলেন না। স্ত্রী-স্বভাববশতঃ অস্থির হইয়া চতুর্দিক অন্ধকারও দেখিলেন না। আপন গর্ভজাত পুত্র প্রতি আদেশ করিলেন, "বাছা! এই তো সময়, তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। বালক দুইটিকে রক্ষা কর।" মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র পিতৃহীন বালকদ্বয়কে রাক্ষস হারেসের হস্ত হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে এক লম্ফে বালকদ্বয়ের নিকটে পড়িলেন। হারেস পালিতপুত্রের শির দেহ-বিচ্ছিন্ন করিয়া বালকদ্বয়ের প্রতি অসি উত্তোলন করিতেই দয়াবতী গৃহিনীর গর্ভজাত সন্তান প্রতি আদেশ-আদেশ মাত্র বীরপুত্র বালকদ্বয়কে বুকের মধ্যে করিয়া আঘাত ব্যর্থ করি। হারেস ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "ওরে! তুইও তোর মায়ের কথায় আমার বিরোধী হইয়াছিস? আমার লাভে বাধা দিতে পারিবি না। মোসলেম-পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করিতে পারিবি না–পারিবি না। ওরে মূর্খ! তোর জন্যও যমদূত দণ্ডায়মান। ছেড়ে দে ছোঁড়া দু'টাকে।"

পুত্র বলিল, কখনই ছাড়িব না। নরপিশাচ অর্থলোভীর অর্থলাভের জন্য জীবন্ত জীবকে নরব্যাঘ্রের হস্তে দিব না।"

"দিবি না! আচ্ছা যা, তুইও যা– বিরোধী পুত্রকে চাহি না। যা বেটা জাহান্নামে যা।"

তরবারি কম্পিত হইয়া বিজলীবৎ চমকিয়া তরবারি স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের গ্রীবাদেশে বসিয়া, পিতার আঘাতে পুত্রের শির ফোরাতকূলে দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। গৃহিনীর চক্ষের উপর এই সকল হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিতেছে। পালিত পুত্র, গর্ভজাত পুত্র–দুই পুত্রের খণ্ডিত দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। দুইটি মস্তক যেন তাঁহারই মুখের দিকে চক্ষু সহায়ে তাকাইয়া আছে। এখনও চক্ষুর পাতা বন্ধ হয় নাই। চারিটি চক্ষুই একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই আছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৃহিনী পুত্রদ্বয়ের কথা মনেই

করিলেন না, স্বামীর ভয়ানক উগ্রমূর্তি দেখিয়া ভয় করিলেন না। বালকদ্বয় প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য– কি উপায়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই চিন্তাই প্রবল। হারেস রক্তরঞ্জিত তরবারির দ্বারা বালকদিগের মস্তকে আঘাত করিলেন, এমন সময়, গৃহিনী "ওকি কর– কি কর!" বলিয়া তরবারি সমেত স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, আমি এত বিনয় করিতেছি, মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের শিরে অস্ত্র আঘাত করিও না! দেখ! একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ! তোমার কর্মফল দেখ! টাকার লোভে পুত্রসম পালিতপুত্র প্রাণ বিনাশ করিলে! তোমার হৃদয়ের সার, কলেজার অংশ-নয়নের মণি যুবা পুত্রকে টাকার লোভে দুই খণ্ড করিলে! ভালই করিলে! টাকার লোভে আজ তোমার নিকট পিতৃস্নেহ পরাস্ত হইল। ভালই করিলে! তোমার এ কীর্তিগান চিরকাল জগতে লোকে গাহিবে। দুঃখ নাই। তোমার পুত্রের প্রাণ তুমি বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে হতভাগিনীর দুঃখ নাই। তোমার ঔরসজাত নয়, আমার গর্ভেও জন্মে নাই, তবে আমার বুকের দুধ দিয়া উহাকে পালিয়া পুষিয়া এতবড় করিয়াছিলাম। তাহারও জন্য মনটা একটু দমিয়াছে। তাই বলিয়া তোমাকে কিছু বলিব না। এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিও– আমি বাঁচিয়া থাকিতে, আমার প্রাণ দেহে থাকিতে, আমার সম্মুখে মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের মাথা কাটিতে দিব না, কখনই দিব না। আমাকে আগে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর। তাহার পর মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের গায়ে হাত দিও– অস্ত্র বসাইও।"

মানুষের কু-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে আর কি রক্ষা আছে? হারেস বলবান কৌশলী। কৌশলে স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া রক্ত আঁখি ঘুরাইয়া বলিল– "তোকেও তোর ছেলের নিকট পাঠাচ্ছি। যা তোর ছেলে কোলে ক'রে শুয়ে থাক।" বিষম রোষে স্ত্রীর প্রতি আঘাত। "যা শুইয়া পড়। শুইয়া শুইয়া তামসা দেখ।"

হারেস-স্ত্রী মৃত্তিকায় পড়িতেই হারেস উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই মোসলেম পুত্রদ্বয় যায়! কে রক্ষা করিবি আয়!" মোহম্মদ-শিরে তরবারি আঘাত করিতেই এব্রাহিম কাঁদিয়া বলিল, "দেখ হারেস! আগে আমার মাথা কাট।" মাথা নোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি বড় ভাইয়ের মাথা কাটা এই চক্ষে দেখিতে পারিব না। হারেস! তোমার পায়ে ধরি, আগে আমার মাথা কাট।" হারেস মোহাম্মদকে ছাড়িয়া এব্রাহিমের মাথায় তরবারি বসাইতেই মোহাম্মদ কাঁদিয়া বলিল, "হারেস! অমন কার্য করিও না, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মাথা কাটা কোন প্রাণে দেখিব? দোহাই তোমার, দোহাই তোমার ধর্মের, আগে আমার মাথা কাট।"

হারেস মোহাম্মদের কথায় থতমত খাইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়াই মহাসাংঘাতিক মূর্তি ধারণ করিয়া অসি ঘুরাইয়া বলিল, "তোদের কাহারও কথা শুনিব না, আর শুনিব না, বিলম্ব করিব না। ভ্রাতৃমায়া মিটাইয়া দিতেছি?" বলিয়াই অগ্রে মোহাম্মদের মাথা কাটিল। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা এব্রাহিমের মাথা মাটিতে গড়াইয়া দিল। সকলের মৃতদেহ ফোরাত জলে নিক্ষেপ করিয়া মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের মস্তক অতি সাবধানে লইয়া অশ্বে চাপিল। রক্তমাখা তরবারি হস্তেই একেবারে মহারাজ জেয়াদের দরবারে উপস্থিত হইয়াই বলিল,–

"বাদশাহ নামদারের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। তবে আজ্ঞার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়াছে। আপনি যাহা করিতেন, তাহাই করিয়াছি। জীবন্ত আনিতে পারিব না, অপরে কাড়িয়া লইবে সন্দেহে জীবনান্ত করিয়া– এই দুই ভাইয়ের দুটো মাথা আনিয়াছি– এই

দেখুন। আমার পুরস্কার-আপনার আদেশিত পুরস্কার আমাকে দিন, আমি চলিয়া যাই। স্বীকৃত পঞ্চ সহস্র মোহর আনিতে আজ্ঞা করুন। মহারাজ! ছেলে দুইটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে।"

নরপতি আবদুল্লাহ জেয়াদ. রাজদরবারের সভাসদগণ, অমাত্যগণ, দরবারের যাবতীয় লোক হারেসের এই অমানুষিক কার্য দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। সকলেই মোসলেমের পুত্রদ্বয়ের জন্য অন্তরে বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। কাহারো মুখে কোনো কথা সরিল না।

নরপতি আবদুল্লাহ জেয়াদ হারেসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন, "ওহে! সুন্দর বালক দুইটিকে এইরূপভাবে শিরচ্ছেদ করিলে কেন? যাও, শীঘ্র দরবার হইতে বাহির হও। উহাদের ধূলি রক্তজমাযুক্ত মস্তক ধৌত করিয়া পরিস্কার এক পাত্রে করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর!"

তখনই মস্তকদ্বয় ধৌত করিয়া মূল্যবান পাত্রোপরি রাখিয়া নরপতি সম্মুখে উপস্থিত করিল।

জেয়াদ বলিলেন, "ওহে যুগলবালকহন্তা পাষাণপ্রাণ হারেস! তোমার মন কী উপকরণে গঠিত বল শুনি? সত্যই কি মানব-রক্তমাংস তোমার দেহে নাই? অন্য কোনো প্রকারে জীবনীশক্তি থাকিতে পারে? এই বালক দুইটির মুখের লাবণ্য, চক্ষের ভাব, গণ্ডস্থলের স্বাভাবিক ঈষৎ গোলাপি আভা দেখিয়াও কি তোমার মন কিছুই বলে নাই? হাতের তরবারি কী প্রকারে ঊর্ধ্বে উঠিল? ইহাদের বিষাদমাখা মুখভাব দেখিয়াও কি তরবারি নিচে নামিল না? মহারাজ এজিদ নামদার যদি মোসলেম পুত্রদ্বয়কে দামেস্কে পাঠাইতে আদেশ করেন, তখন কী করিব? উপায় কী? অল্পবয়স্ক বালক দুইটিই কি আমার বেশি ভারবোধ হইয়াছিল? ওহে বীর! বালকহন্তা মহাবীর! আমার ঘোষণায় কি বালকদের শিরচ্ছেদ করিয়া মাথা আনিবার কথা ছিল? না ডঙ্কা বাজাইয়া মাথা আনিবার ঘোষণা করা হইয়াছিল?"

হারেস বলিল, "শিরচ্ছেদের কথা ছিল না। ধরিয়া আনিবার আদেশ ছিল। জীবিত অবস্থায় তাহাদিগকে দরবার পর্যন্ত আনা দুঃসাধ্য বলিয়াই মাথা আনিয়াছি। শত শত জন এই বালকদ্বয়ের সন্ধানে ছিল, আমাকে দরবারে আনিতে দেখিলেই কাড়িয়া লইত। তাহারা রাজদরবারে আনিয়া স্বচ্ছন্দে পুরস্কার লাভ করিয়া যাইত। পরিশ্রম আমার-লাভ করিত ডাকাত দল। আমি বাদশাহ নামদারের মঙ্গলকামী হিতৈষী। চিরশত্রুর বংশে কাহাকেও রাখিতে নাই। হয়তো সময়ে এই বালকদ্বয় বীরশ্রেষ্ঠ বীর শত্রুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইত। আমি একেবারে নির্মূল করিয়া দিয়াছি। আমাকে স্বীকৃত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করুন। আজ দুই দিন দুই রাত্রি আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রামের সময় অবসর কিছুই নাই। এই দুইটি বালকের মস্তক গ্রহণ করিতে আমার দুইটি পুত্র এবং স্ত্রীর মাথা কাটিয়াছি।"

দরবারসমেত সকলে মহা দুঃখিত হইলেন। নরপতি জেয়াদ বলিলেন,- "ওহে বীর! সে কী কথা!-"

"কী কথা- আপনার শত্রুকূল নির্মূল করিতে আমার বংশ নিপাত করিলাম, তত্রাচ আপনার নিকট যশোলাভ করিতে পারিলাম না। যাহার জন্যে এত কাণ্ড, তাহা-অর্থাৎ সে মোহরগুলি পাইব কি না, তাহাতেও এখন সন্দেহ হইল।"

মন্ত্রীদলমধ্যে একজন বলিলেন, -"আপনার পুরস্কার ধরা আছে। আর তিনটি খুন কোথায় কী প্রকারে করিলেন, বলুন শুনি।"

"তিনটি খুনই বটে! কেন করিলাম, শুনুন। আমার দুই পুত্র এক স্ত্রী-এই তিনটি। তাহারা কিছুতেই এই শত্রুবালকদের শির কাটিতে দিবে না। বাধা দিতে আরম্ভ করিল। একে একে বাধা দিল। একে একে লাল বসন পরাইয়া ফোরাত নদীর কূলে শয়ন করাইয়া দিলাম। এক স্থানেই সকলের শিরচ্ছেদ-রক্তপড়া-নড়াচড়া- পরে সকলের দেহই ফোরাতজলে ক্ষেপণ-অবগাহন-নিমজ্জন-বিসর্জন।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ বলিলেন, "এ দৃশ্য আমি দেখিতে পারি না। নিরপরাধ বালকদ্বয়ের শির যে আপন হাতে কাটিতে পারে, সেই কার্যে বাধা দিয়াছিল- কাহারা? এই নরপিশাচের সন্তান দুইজন আর সহধর্মিনী স্বয়ং। তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছে। মোহরের এতই লোভ যে দুইটি পুত্র একটি স্ত্রী সকলকেই বিনাশ করিয়াছে এমন নররাক্ষসের শির কিছুতেই স্বস্থানে থাকিতে পারে না। হায়! হায়! একই সময়ে পাঁচটি মানবজীবন শেষ করিয়াছে। আমার আদেশ- মোসলেমের পুত্রদ্বয়হন্তা হারেস, এই দুই বালকের শির সম্মানের সহিত মাথায় করিয়া ফোরাতকূলে লইয়া যাইবে। এই দুই বালকের মস্তক যে স্থানে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই স্থানে, সেই অস্ত্রে, মহাপাপীর মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া, ফোরাতজলে নিক্ষেপ করিয়া জল অপবিত্র করিও না- শৃগাল-কুকুরের ভক্ষণের সুযোগ করিয়া দিও। মোসলেম পুত্রদ্বয়ের দেহখণ্ড ফোরাতজলে ভাসাইয়া দিয়াছে, কী করিব কোনো উপায় নাই। বিশেষ সন্ধান করিয়া দেখিও। যদি এই যুগলভ্রাতার মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে রীতিমতো কাফনদাফন করিয়া যথোচিতভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করিয়া আমার আদেশ সম্পূর্ণ করিও এবং কার্যশেষে আমাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিও।"

ঘাতক প্রহরী কার্যকারক তখনই রাজাদেশমতো কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মোসলেম পুত্রদ্বয়ের খণ্ডিত শির মহামূল্য বস্ত্রে আবরিত করিয়া হারেসশিরে চাপাইয়া ফোরাতকূলে লইয়া চলিল। ফোরতকূলে যাইয়া দেখিল, রক্ত আর বালিতে জমাট বাঁধিয়া একস্থানে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। আরো এক আশ্চর্য ঘটনা দেখিল যে, মোসলেম পুত্রদ্বয়ের শিরশূন্য যুগলদেহ গলাগলি ধরিয়া জলে ভাসিতেছে। কী আশ্চর্য! জলস্রোতে যে মৃহদেহ ভাসাইয়া দিয়াছিল স্রোত-বিপরীতে কে টানিয়া আনিল? আরো আশ্চর্য, সংযোগ করিল কে?

রাজকীয় কার্যকারক এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া তাঁহার মনেও একটি কথা হঠাৎ উদয় হইল। তিনি পাত্রস্থ দুইটি মস্তক ফোরাতজলের নিকটে ধরিতেই জড়িত যুগল-দেহ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আপন আপন মস্তকে সংলগ্ন হইল। রাজকর্মচারী দুই মৃতদেহ উঠাইয়া পৃথক করতে বহু চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই পৃথক করিতে পারিলেন না। সে গলাগলির হস্তবন্ধন ভিন্ন করিতে পারিলেন না। সে অপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহ হস্তবন্ধন বহু যত্নেও ভিন্ন করিতে পারিলেন না। শবদেহের সে আশ্চর্য ভ্রাতৃমায়া-বন্ধন ছাড়াইয়া পৃথক করিতে সক্ষম হইলেন না। বাধ্য হইয়া দুই ভ্রাতার দেহ একত্রে স্নান করাইয়া একত্র কাফন করিয়া এক গোরে দাফন করিলেন।

তাহার পর হারেসের প্রতি রাজাজ্ঞা যাহা ছিল, তাহা সম্পাদন করিতেই হারেস বলিল, "আমার উচিত শাস্তি হইল। অতিরিক্ত লোভের অতিরিক্ত ফলও ভোগ করিলাম। হা-পুত্র-হা-স্ত্রী-হা-লোভ!"
হারেসের খণ্ডিত দেহ বধ্যভূমিতে পড়িয়া রহিল।

চতুর্বিংশ প্রবাহ

হোসেন সপরিবারে ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া নির্বিঘ্নে কুফায় যাইতেছেন। কিন্তু কত দিন যাইতেছেন, কুফার পথের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছেন না। একদিন হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের খুর মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইতে লাগিল। কারণ কি? এইরূপ কেন হইল? কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী হোসেনের মনে পড়িল। নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মহরম মাসের ৮ই তারিখ। তাহাতে আরও ভয়ে ভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। চক্ষুনির্দিষ্ট সীমামধ্যে মানব-প্রকৃতি-জীব-জন্তুর নাম মাত্র নাই। আতপ-তাপ নিবারণোপযোগী কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষও নাই, -কেবলই প্রান্তর- মহাপ্রান্তর। প্রান্তর-সীমা যেন গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধূ ধু করিতেছে। চতুর্দিকে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বরে আক্ষেপ -"হায়! হায়!" শব্দ উত্থিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। জনপ্রাণীর নামমাত্র নাই, কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বোধ হইল, যেন শূন্যপথে শত সহস্র মুখে "হায়! হায়!" শব্দে চতুর্দিক আকুল করিয়া তুলিয়াছে।
হোসেন সকরুণ স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গীগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, হাস্য-পরিহাস দূর কর; সর্বশক্তিমান জগৎ-নিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ভাই রে! মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, !যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই তোমার জীবন বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম দাস্ত-কারবালা।" মাতামহের বাক্য অলংঘনীয়; পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতে পাইতেছ? দৈব শব্দ কিছু শুনিতেছ?" তখন সকলেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন, চতুর্দিকেই "হায়! হায়! রব। ধন্য নূরনবী মোহাম্মদ! হোসেন বলিলেন, "মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, চতুর্দিক হইতে যে স্থানে "হায়! হায়!" শব্দ উত্থিত হইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই কারবালা। ঈশ্বরের লীলা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। কোথায় যাইব? যাইবারই বা সাধ্য কি? কোথায় দামেস্ক, কোথায় মদিনা, কোথায় কুফা, কোথায় কারবালা। আমি কারবালায় আসিয়াছি, আর উপায় কি? ভাই সকল! ঈশ্বরের নাম করিয়া গমনে ক্ষান্ত দাও।" ক্রমে সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইল। হোসেনের মুখে কারবালার বৃত্তান্ত এবং চতুর্দিকে "হায়! হায়!" রব স্বকর্ণে শুনিয়া

সকলেরই মুখে কালিমা-রেখা পড়িয়া গেল। যে যেখান হইতে শুনল, সে সেইখানেই অমনই নীরবে বসিয়া পড়িল।

হোসেন বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ আর চিন্তা কি? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে ভাবনা কি? এই স্থানেই শিবির নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই নামে ভরসা করিয়া থাকিব। সম্মুখে প্রান্তর, পার্শ্বে ভয়ানক বিজন বন, কোথায় যাই? অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে, এক্ষণে চিন্তা বিফল। শিবির নির্মাণের আয়োজন কর। আমি জানি, ফোরাত নদী এই স্থানের নিকট প্রবাহিত হইতেছে। দূর কত এবং কোন দিকে তাহা নির্ণয় করিয়া কেহ জল আহরণে প্রবৃত্ত হও। পিপাসায় অনেকেই কাতর হইয়াছে, আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আপাততঃ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর।"

শিবির নির্মাণ করিবার কাষ্টস্তম্ভ সংগ্রহ করিতে এবং রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শোণিতাক্ত কুঠার-হস্তে অত্যন্ত বিষাদিত চিত্তে বাষ্পাকুললোচনে তাহারা হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "হযরত, এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কোন স্থানে দেখি নাই, কোন দিন কাহারও মুখে শুনিও নাই। কি আশ্চর্য! এমন আশ্চর্য ঘটনা জগতে কোন স্থানে ঘটিয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহ। আমরা বনে নানা প্রকার কাষ্ট সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম; যে বৃক্ষের যে স্থানে কুঠারাঘাত করিলাম, সেই বৃক্ষেই অজস্র শোণিত-চিহ্ন দেখিয়া ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই দেখুন! আমাদের সকলের কুঠারে সদ্য-শোণিত চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।"

হোসেন কুঠারসংযুক্ত শোণিত দর্শনে বলিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই এই কারবালা। তোমরা সকলে এই স্থানে 'শহীদ'-স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, তাহারই লক্ষণ এই শোণিতচিহ্নে দেখাইতেছে। উহাতে আর আশ্চর্যান্বিত হইও না। ঐ বন হইতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর। দারু-রস শোণিতে পরিণত দেখিয়া আর ভীত হইও না।"

ইমামের বাক্যে সকলেই আন্দোৎসাহে শিবির সংস্থাপনে যত্নবান হইলেন। সকলেই আপন আপন স্থানোপযোগী এবং ইমামের পরিজনবর্গের অবস্থান জন্য অতি নির্জন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া সকলেই যথাসম্ভব বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

আরব দেশে দাসের অভাব নাই। যে সকল ক্রীতদাস হোসেনের সঙ্গে ছিল, তাহারা কয়েকজন একত্রিত হইয়া ফোরাতের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া সকাতরে ইমামের নিকট বলিতে লাগিল, "বাদশাহ-নামদার আমরা ফোরাত নদীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম। পূর্ব উত্তর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে পশ্চিম দিকে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ফোরাত নদী কুলকুল রবে দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। জলের নির্মলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জলপানেচ্ছা আরও চর্তুগুণ রূপে বলবতী হইল, কিন্তু নদীর তীরে অসংখ্য সৈন্য সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ-হইয়া অতি সতর্কতার সহিত নদীর জল রক্ষা করিতেছে। যত দূর দৃষ্টির ক্ষমতা হইল পিপাসা নিবৃত্তি করা যায়। আমরা সৈন্যদিগকে কিছু না বলিয়া যেমন নদীতীরে যাইতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারা অমনই অতি কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বলিল, "মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত হইতেছে, এই রক্ষক বীরগণের একটি প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে এক বিন্দু জল কেহ লইতে পারিবে না।

আমাদের মস্তকের শোণিত ভূতলে প্রবাহিত না হইলে ফোরাতপ্রবাহে কাহাকেও হস্ত ক্ষেপ করিতে দিব না। জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা তো অনেক দূরের কথা! এবার ফোরাতকূল চক্ষে দেখিয়াই ইহজীবন সার্থক করিয়া গেলে, যাও; ভবিষ্যতে এদিকে আসিলে আমার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত থাকিতে হইবে। নদীর তীরে এক পদও অগ্রসর হইতে দিব না। এই সুতীক্ষ্ণ শরই তোমাদের পিপাসা শান্তি করিবে। প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া যাও! নিশ্চয়ই জানিও, ফোরাতের সুস্নিগ্ধ বারি তোমাদের কাহারও ভাগ্যে নাই!"

কথা শুনিয়া হোসেন মহাব্যস্ত হইলেন, খাদ্যাদির অভাব না থাকিলেও জলবিহনে কিরূপে বাঁচিবেন, এই চিন্তাই প্রবল হইল। মদিনার বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে রহিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যখন পিপাসায় কাতর হইবে, জিহ্বাকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলিতেও ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কি করিবেন? এই চিন্তায় হোসেন ফোরাত নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি উপায়ে জললাভ করিবেন ভাবিতেছেন, দেখিতে পাইলেন যে, চারিজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ কিছু এস্তে চলিয়া আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, মোসলেম আমার কুফা গমনে বিলম্ব দেখিয়া হয়তো সৈনিকগণকে কোন স্থানে রাখিয়া অগ্রে আমার সন্ধান লইতে আসিয়াছে।

আগন্তুক চতুষ্টয় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কল্পনা যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা প্রমাণ করিয়া দিল। শেষে দেখিলেন যে, তাহারা অপরিচিত; এমন কি কোন স্থানে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন কি না, তাহাও বোধ হইল না। সৈন্যচতুষ্টয় নিকটে আসিয়াই হোসেনের পদচুম্বন করিল। তন্মধ্যে হইতে অপেক্ষাকৃত সজ্জিত পুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন, "হযরত, দুঃখের কথা কি বলিব, আমরা এজিদের সৈন্য, কিন্তু আপনার মাতামহ-উপদিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত। আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবেন না, শত্রুর বেতনভোগী বলিয়াও শত্রু মনে করিবেন না। আমরা কিছুতেই প্রত্যাশী নহি, কেবল আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কয়েকটিমাত্র কথা বলিতে অতি সাবধানে আপনার শিবিরে আসিয়াছি। সময় যখন মন্দ হইয়া উঠে, তখন চতুর্দিক হইতেই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে আপনার চতুর্দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি, মোসলেমের ন্যায় হিতৈষী বন্ধু জগতে আপনার আর কেহ হইবে না। আবদুল্লাহ জেয়াদ আপনার প্রাণ বিনাশ করিবার আশায় ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ভাগ্যগতিকে মোসলেম কুফায় যাইয়া আবদুল্লাহ জেয়াদের হস্তে বন্দী হইলেন। শেষে তাহারই চক্রে ওৎবে অলীদ ও মারওয়ানের সাহায্যে মোসলেম বীরপুরুষের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিয়া সেই শত্রুহস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সহস্র সৈন্য ছিল, তাহারাও ওতবে অলীদ ও জেয়াদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে। এক্ষণে সীমার, ওমর আপনার প্রাণবধের জন্য নানা প্রকার চেষ্টায় আছে। মারওয়ান, ওতবে অলীদ এ পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এজিদের আজ্ঞাক্রমে আমরাই ফোরাত নদীকূল একেবারে বন্ধ করিয়াছি। মনুষ্য দূরে থাকুক, পশু-পক্ষীকেও না ছাড়িয়া দিলে নদীতীরে যাইতে কাহারও সাধ্য নাই। সংক্ষেপে সকলই বলিলাম, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।" এই বলিয়াই আগন্তুক হোসেনের পদচুম্বন করিয়া গেল।

মোসলেম দেহত্যাগের সংবাদে হোসেন মহা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হা ভ্রাতঃ মোসলেম, যাহা বলিয়া গিয়াছিলে, তাহাই ঘটিল। হোসেনের

প্রাণবিনাশ করিতেই যদি আবদুল্লাহ জেয়াদ কোন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, তবে যে যন্ত্রে আমিই পড়িব, হোসেনের প্রাণ তো রক্ষা পাইবে! ভাই, নিজ প্রাণ দিয়া হোসেনকে জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে। তুমি তো মহা অক্ষয় স্বর্গসুখে সুখী হইয়া জগৎ-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলে। আমি দুরন্ত কারবালা প্রান্তরে অসহায় হইয়া বিন্দুমাত্র জীবন-প্রত্যাশায় বোধ হয় সপরিবারে জীবন হারাইলাম। রে দূরন্ত পাপিষ্ঠ জেয়াদ, তোর চক্রে মোসলেমকে হারাইলাম। তোর চক্রেই আজ সপরিবারে জল বিহনে মারা পড়িলাম!" মোসলেমের জন্য হোসেন অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। ওদিকে জলাভাবে তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল।

ক্রমে সকলেই পিপাসাক্রান্ত হইয়া হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জলাভাবে এত লোক মরে! পিপাসায় সকলেই শুষ্ককণ্ঠ, এক্ষণে আর তো সহ্য হয় না।"

সকাতরে হোসেন বলিলেন, "কি করি! বিন্দুমাত্র জলও পাইবার প্রত্যাশা আর নাই। ঈশ্বরের নামামৃত পান ভিন্ন পিপাসা-নিবৃত্তির আর এখন কি উপায় আছে? বিনা জলে যদি প্রাণ যায়, সকলেই সেই করুণাময় বিশ্বনাথের নাম করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি কর। সকলেই আপন আপন স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ কর।" সকলেই পরমেশ্বরের মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ৯ই তারিখ কাটিয়া গেল, দশ দিবসের প্রাতে হোসেনের শিবিরে মহাকোলাহল। "প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না।" এই প্রকার গগনভেদী শব্দ উঠিতে লাগিল। পরিবারস্থ সকলের আর্তনাদে এবং কাতরস্বরে হোসেন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উপাসনায় ক্ষান্ত দিয়া হাসনেবানু ও জয়নাবের বস্ত্রাবাসে যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কন্যা, পুত্র এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা আসিয়া এক বিন্দু জলের জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শাহরেবানু দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ সাত রাত নয় দিনের মধ্যে এক বিন্দু জলও স্পর্শ করিলাম না, পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু স্তনের দুগ্ধপর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সময়ে এক বিন্দু জল কোন উপায়ে ইহার কণ্ঠে প্রবেশ করাইতে পারিলেও বোধ হয় বাঁচিতে পারিত।"

হোসেন বলিলেন, "জল কোথায় পাইব? এজিদের সৈন্যগণ ফোরাত নদীর কূল আবদ্ধ করিয়াছে, জল আনিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

শাহরেবানু বলিলেন, "এই শিশুসন্তানটির জীবন রক্ষার্থে যদি আপনি নিজে গিয়াও কিঞ্চিৎ জল উহাকে পান করাইতে পারেন, তাহাতেই বা হানি কি? একটি প্রাণ তো রক্ষা হইবে। আমাদের জন্য আপনাকে যাইতে বলিতেছি না।"

হোসেন বলিলেন, "জীবনে কোন দিন শত্রুর নিকট, কি বিধর্মীর নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হই নাই। কাফেরের নিকট কোনকালে কিছু প্রার্থনা করি নাই, জল চাহিলে কিছুতেই পাইব না। আর আমি এই শিশুর প্রাণ রক্ষার কারণেই যদি তাহাদের নিকট জলভিক্ষা করি, তবে আমি চাহিলে তাহারা জল দিবে কেন? আমার মনোকষ্ট

মনোবেদনা দিতেই তো তাহারা কারবালায় আসিয়াছে, আমার জীবন বিনাশ করিবার জন্যই তো তাহারা ফোরাতকূল আবদ্ধ করিয়াছে।"

শাহরেবানু বলিলেন, "তাহা যাহাই বলুন, বাঁচিয়া থাকিতে কি বলিয়া এই দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুগ্ধ-পিপাসায়, —শেষে জল-পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, ইহা কিরূপে স্বচক্ষে দেখিব?"

হোসেন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্বর উঠিয়া গিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিয়া বলিলেন, "দাও, আমার ক্রোড়ে দাও! দেখি আমার সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া দেখি।"—এই বলিয়া হোসেন অশ্বে উঠিলেন। শাহরেবানু সন্তানটি হস্তে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন। হোসেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদীতীরস্থ সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, তবে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ জলদান কর। পিপাসায় ইহার কণ্ঠ-তালূ শুকাইয়া একেবারে নীরস কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছে। এ সময় কিঞ্চিৎ জলপান করাইতে পারিলেও বোধ হয় বাঁচিতে পারে! তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই, এই শিশু সন্তানটির জীবন রক্ষার্থে ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া কিছু জলদান কর। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

কেহই উত্তর করিল না। সকলেই একদৃষ্টে হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুনরায় হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, এ দিন চিরদিন তোমাদের সুদিন থাকিবে না; কোন দিন ইহার সন্ধ্যা হইবেই হইবে। ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; তাঁহাকে একটু ভয় কর। ভ্রাতৃগণ, পিপাসার জলদান মহাপূণ্য, তাহাতে আবার অল্পবয়স্ক শিশু। ভ্রাতৃগণ, ইহার জীবন আপনাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি সামান্য সৈনিক পুরুষ নহি; আমার পিতা মহামান্য হযরত আলী, মাতামহ নূরনবী হযরত মোহাম্মদ, মাতা ফাতেমা জোহরা খাতুনে জান্নাত! এই সকল পূণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়াই এই শিশু সন্তানটির প্রতি অনুগ্রহ কর। মনে কর, যদি আমি তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী থাকি, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য বালক তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই, তোমাদের নিকট কোন অপরাধেও অপরাধী হয় নাই। ইহার প্রতি দয়া করিয়াই ইহার জীবন রক্ষা কর!"

সৈন্যগণ মধ্য হইতে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম; তুমি হোসেন। তুমি সহস্র অনুনয় বিনয় বলিলেও তোমাকে জল দিব না। তোমার পুত্র জল-পিপাসায় জীবন হারাইবে, তাহাতে তোমার দুঃখ কি? তোমার জীবনই তো এখনই যাইবে; সন্তানের দুঃখে না কাঁদিয়া তোমার নিজের প্রাণের জন্য একবার কাঁদ— অসময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া কারবালায় প্রাণ হারাইবে, সেই দুঃখে একবার ক্রন্দন কর, শিশুসন্তানের জন্য আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই তোমার সকল জ্বালাযন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি হোসেনের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিল! ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণ হোসেনের বক্ষে না লাগিয়া কোড়স্থ শিশুসন্তানের বক্ষঃ বিদারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল! হোসেনের ক্রোড় রক্তে ভাসিতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণহৃদয়! ওরে শরনিক্ষেপকারি, কি কার্য করিলি! এই শিশুসন্তান বধে তোর কি লাভ হইল? হায় হায়! হোসেন মহাখেদে এই কথা কয়েকটি বলিয়াই সরোষে অশ্বচালনা করিলেন। শিবিরসম্মুখে আসিয়া মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়াই লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। শাহরেবানুর নিকটে গিয়া বলিলেন, "ধর, তোমার পুত্র ক্রোড়ে লও! আজ বাছাকে স্বর্গের সুশীতল জলপান করাইয়া আনিলাম।" শাহরেবানু সন্তানের বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বলিলেন, "ওরে, কোন নির্দয় নিষ্ঠুর এমন কার্য করিল! কোন পাষাণহৃদয় এমন কোমল শরীরে লৌহশর নিক্ষেপ করিল! ঈশ্বর! সকলই তোমার খেলা। যে দিন মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই দিনই দুঃখের ভার মাথায় ধরিয়াছি।" শিবিরস্থ পরিজনেরা সকলেই শাহরেবানুর শিশুসন্তানের জন্য কাঁদিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হইল না। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে আব্দুল ওহাব নামক একজন বীরপুরুষ হোসেনের সঙ্গী লোকমধ্যে ছিলেন। আব্দুল ওহাবের মাতা এবং স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হোসেনের এবং তাঁহার পরিজনগণের দুঃখ দেখিয়া আব্দূল ওহাবের মাতা সরোষে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "আব্দুল ওহাব, তোমাকে কি জন্য গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? হোসেনের এই দুঃখ দেখিয়া তুমি এখনও বসিয়া আছ? এখনও তোমাকে অস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিতেছি না? এখনও তুমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইতেছ না? জল বিহনে সকলেই মরিবে, আর কতক্ষণ বাঁচিবে? ধিক্ তোমার জীবনে! কেবল কি বন্য পশুবধের জন্যই শরীর পুষিয়াছিলে? এখনও স্থির হইয়া আছে? ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার বীরত্বে! হায়! হায়! হোসেনের দুগ্ধপোষ্য সন্তানটির প্রতি যে হাতে তীর মারিয়াছে, আমি কি সেই পাপীর সেই হাতখানা দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইব, তাহা মনে করিও না। তোমার শরসন্ধানে সেই বিধর্মী নারকীয় তীরবিদ্ধ মস্তক আজ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হায়! হায়! এমন কোমল শরীরে যে নরাধম তীর বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার শরীরে মানুষী রক্ত, মানুষী ভাব কিছুই নাই। আব্দুল ওহাব! তুমি স্বচক্ষে শাহরেবানুর ক্রোড়স্থ সন্তানের সাংঘাতিক মৃত্যু দেখিয়াও নিশ্চিন্তভাবে আছ? শিশুশোকে শুদ্ধ নয়নজলই ফেলিতেছ! নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! বিপদে দুঃখে তোমরাই যদি কাঁদিয়া অনর্থ করিলে, তবে আমরা কি করিব? অবলা নিঃসহায়া স্ত্রীজাতির জন্যই বিধাতা কান্নার সৃষ্টি করিয়াছেন, বীরপুরুষের জন্য নহে।

মাতার উৎসাহসূচক ভৎর্সনায় আব্দুল ওহাব তখনই সজ্জিত হইয়া আসিলেন। মাতার চরণ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আব্দুল ওহাব আর কাঁদিবে না! তাহার চক্ষের জল আর দেখিবে না; ফোরাত নদীর কূল হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া মোহাম্মদের আত্মীয়-স্বজন পরিবারদিগের জলপিপাসা নিবারণ করাইবে, আর না হয় কারবালাভূমি আব্দুল ওহাবের শোণিতে আজ অগ্রেই রঞ্জিত হইবে। কিন্তু মা এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণাশয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন সময়ে আমার সহধর্মিণীর মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।" মাতা বলিলেন, "ছি" ছি! বড় ঘৃণার কথা! যুদ্ধযাত্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা রমণীর নয়নতৃপ্তির জন্য নহে। বীর বেশ বীরপুরুষেরই চক্ষুরঞ্জন; বিশেষ এই সময়ে যাহাতে মায়ার উদ্যেক হয়, জীবনাশা বৃদ্ধি হয়, এমন কোন স্নেহ-পাত্রের মুখ দেখিতেও নাই,

দেখাইতেও নাই! ঈশ্বর-প্রসাদে ফেরাতকূল উদ্ধার করিয়া অগ্রে হোসেন-পরিবারের জীবন রক্ষা কর, মদিনাবাসীদিগের প্রাণ বাঁচাও, তাহার পর বিশ্রাম। বিশ্রামসময়ে বিশ্রামের উপকরণ যাহা যাহা, তাহা সকলই পাইবে। বীরপুরুষের মায়া-মমতা কি? বীরধর্মে অনুগ্রহ কি! একদিন জন্মিয়াছ, একদিন মরিবে, –শত্রু সম্মুখীন হইবার অগ্রে স্ত্রীমুখ দেখিবার অভিলাষ কি জন্য? তুমি যদি মনে মনে স্থির করিয়া থাক, যে, এই শেষ যাত্রা, আর ফিরিব না, জন্মশোধ স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া যাই, তবে তুমি কাপুরুষ, বীরকূলের কন্টক, বীরবংশের গ্লানি বীরকূলের কুলাঙ্গার।"

আব্দুল ওহাব আর একটি কথাও না বলিয়া জননীর চরণচুম্বন পূর্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফোরাতকূলে যাইয়া বিপক্ষগণকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণহৃদয় বিধর্মীগণ! যদি প্রাণের মমতা থাকে, যদি আর কিছু দিন জগতে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র নদীকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর। দেখ, আব্দুল ওহাব নদীকূল উদ্ধার করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুহত্যার মস্তক নিপাত জন্য আসিয়াছে। তোদের বুদ্ধিজ্ঞান একেবারেই দূর হইয়াছে, তোরা কি এই অকিঞ্চিতকর জীবনকে চিরজীবন মনে করিয়া রহিয়াছিস? এ জীবনের কি আর অন্ত নাই? ইহার কি শেষ হইবে না। শেষ দিনের কথা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিস? যে দিন স্বর্গাসনের বিচারপতি স্বয়ং বিচারসনে বসিয়া জীবমাত্রের পাপপুণ্যের বিচার করিবেন, বল তো কাফের, সে দিন আর তোদের কে রক্ষা করিবে? সেই সহস্র সহস্র সূর্যকিরণের অগ্নিময় উত্তাপ হইতে কে বাঁচাইবে? সে বিষম দুর্দিনে অনুগ্রহবারি সিঞ্চনে কে আর তোদের পিপাসা নিবারণ করিয়া শান্তি দান করিবে? বল তো কাফের! কাহার নাম করিয়া সেই দুঃসহ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবি? অর্থের দাস হইলে কি আর ধর্মাধর্মে জ্ঞান থাকে না? যদি যুদ্ধের সাধ থাকে, সে সাধ আজ অবশ্য মিটাইব। এখনও বলিতেছি, ফোরাতকূল ছাড়িয়া দিয়া সেই বিপদকাণ্ডারি প্রভু হযরত মোহাম্মদের পরিজনগণের প্রাণ রক্ষা কর। অবলা অসহায়দিগকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া মারিতে পারিলেই কি বীরত্ব প্রকাশ হয়? এই কি বীরধর্মের নীতি? দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে দূর হইতে চোরের ন্যায় বধ করাই কি তোদের বীরত্ব? যদি যথার্থ যুদ্ধের সাধ থাকে, যদি যথার্থই বীরত্ব দেখাইয়া মরিতে ইচ্ছা থাকে, আব্দুল ওহাবের সম্মুখে আয়! যদি মরিতে ভয় হয়, তবে ফোরাতকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর। ন্যূনতা স্বীকার কিংবা যাত্রা করিলে আব্দুল ওহাব পরম শত্রুকেও তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়া থাকে। মদিনাবাসীরা তোদের ন্যায় যুদ্ধে শিক্ষিত নহে– এই অহঙ্কারেই তোরা মাতিয়া আছিস। কিন্তু ঈশ্বরপ্রাসাদে তাহারা যথার্থই বীর ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী।"

আব্দুল ওহাব অশ্বে কশাঘাত করিয়া শত্রুদলসম্মুখে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না; নদীকূল ছাড়িয়া দিল না। আব্দুল ওহাব পুনরায় অক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "যোদ্ধাই হউক বীরেন্দ্রই হউক, উদ্যোগ পুরুষ হউক, সেই ধন্য যে সময়কে অতি মূল্যবান জ্ঞান করে। তোদের সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে দেখিতেছি। যদি সাহস থাকে, যদি আব্দুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র আয়। আব্দুল ওহাব আজ বিধর্মীর রক্তাপাতে ফোরাত-জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দ্বিগুণ রঞ্জন বৃদ্ধি করিবে, এই আশাতেই তোদের

সম্মুখে আসিয়াছে। শক্রসম্মুখীন হইতে এত বিলম্ব? শত্রু যুদ্ধপ্রার্থী, তোরা বিশ্রাম-প্রার্থী ধিক তোদের বীরত্বে! ধিক তোদের সাহসে! আজি সাত রাত নয় দিন আব্দুল ওহাব জলস্পর্শ করে নাই; ফোরাত নদীতীরে তোরা মহানন্দে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া রহিয়াছিস্। ইহাতেও এত বিলম্ব, এত ভয়! শীঘ্র আয়। একে একে তোদের সকলকেই নরকে প্রেরণ করিতেছি।"

বিপক্ষগণ হইতে এক দীর্ঘকায় বীরপুরুষ বর্হিগত হইয়া অতি উচ্চ লোহিতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বিশেষ দক্ষতার সহিত অসিচালনা করিতে করিতে আব্দুল ওহাবের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মূর্খেরাই দর্প করে। কাপুরুষেরাই অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া থাকে। শৃগাল, বাকচাতুরী ছাড়িয়া পুনরায় শিবিরে প্রস্থান কর– তোকে মারিয়া কি হইবে? আবদুল ওহাব, তুই কাহার সন্তান, তোর জননী কাহার কন্যা সেই সকল পরিচয় লইয়া আসিতেই আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। তুই কেন এই নব যৌবনে পরের জন্য আপন প্রাণ হারাইবি? তোকে বধ করিলে এজিদের নিকট যশোলাভ হইবে না। তোদের হোসেনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিতে বল। তুই যদি কিছু দিন সংসারে বাস করিতে বাসনা করিস, ফিরিয়া যা, তোকে চাহি না।"

আব্দুল ওহাব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "বিধর্মী কাফের! এত বড় আর্স্পর্দ্ধা তোর! অগ্রে তুই হোসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিস? আব্দুল ওহাবের পদাঘাতে– কিছুমাত্র বল নাই? রে ক্ষুদ্র কীট, চিরশরণাগত দাস বাঁচিয়া থাকিতে প্রভুকে আহবান কেন? অগ্রে আব্দুল ওহাবের পদাঘাত সহ্য কর, তাহার পর অন্য কথা" –সদর্পে এই কথা বলিয়া আবদুল ওহাব অশ্ব ঘুরাইয়া বিধর্মী নিকটে যাইয়া এমনই জোরে তরবারি আঘাত করিলেন যে, এক আঘাতে অশ্ব সহিত তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বচক্র দিয়া শত্রু-বিনাশী আব্দুল ওহাব প্রত্যেক চক্র পরিবর্তনে বিপক্ষগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। একে একে সত্তর জন বিধর্মীকে নরকে প্রেরণ করিয়া পুনরায় পরিক্রমণের জন্য শত্রুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখে আর অগ্রসর হইল না। দূর হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবদুল ওহাব ভীত হইলেন না-দুই হস্তে অসি চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত শর খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শত্রু নিক্ষিপ্ত শর আবদুল ওহাবের গাত্রে বিদ্ধ হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সে দিকে আবদুল ওহাবের দৃষ্টি নাই, কেবল শত্রু বিনাশে কৃতসঙ্কল্প।

বহু পরিশ্রম করিয়া আবদুল ওহাব পিপাসায় আরও কাতর হইলেন। কি করেন, কোন উপায় না পাইয়া বেগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হোসেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হযরত, বড়; পিপাসা! এই সময় ওহাবকে যদি এক বিন্দু জলদান করিতে পারেন, তাহা হইলে শত্রুকূল–"

"জল? –জল আমি কোথা পাইব ভাই?" অধিকতর কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, যদি সেই ক্ষমতাই থাকিত, তবে তোমার আর এমন দুর্দশা হইবে কেন?"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহা উত্তেজিত কণ্ঠে আবদুল ওহাবের জননী বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কি ফিরিতে আছে? তুমি যদি ইচ্ছা করিয়াও না ফিরিয়া থাক, কাহারও আদেশে যদি ফিরিয়া থাক, তাহা হইলেও কি

শত্রু হাসিবে না! কি ঘৃণা! কি লজ্জা! কেন তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলে! তোমার ও কলঙ্কিত মুখ আমি আর দেখিব না। আমি তোমাকে জীবিত ফিরিয়া আসিবার জন্য যুদ্ধে পাঠাই নাই। হয় ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া হোসেনের পুত্র পরিজনকে রক্ষা করিতে দেখিব, না হয় রণক্ষেত্র প্রত্যাগত তোমার মস্তক শূন্য দেহ দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন শীতল করিব, এই আমার আশা ছিল। তুমি বীরকূলকলঙ্ক, আমার আশা ফলবতী হইতে দিলে না।"

সভয়ে কম্পিত হইয়া আবদুল ওহাব কহিলেন, "জননী, আবার আমি যাইতেছি, আর ফিরিব না-হয় নদীকূল উদ্ধার, নয় আবদুল ওহাবের মস্তক দান। কিন্তু জননী, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! পিপাসা নিবারণ করিবার আর উপায় নাই। একটি মাত্র নিবেদন, চরণদর্শনে পিপাসা শান্তি। আর-একবার আমার স্ত্রীর মুখখানি–"

"হ্যাঁ, বুঝিয়াছি। সেই মুখখানি!– মুখখানি দেখিতে পার, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিতে পারিবে না।" মাতার আজ্ঞানুযায়ী সেই অবস্থাতেই আবদুল ওহাব আপন স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "জীবিতেশ্বরি, আমি যুদ্ধযাত্রী। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার কথা মনে পড়িল, পিপাসাতেও প্রাণ আকুল। ভাবিলাম, তোমাকে দেখিলে বোধ হয়, কিছু শ্রান্তি দূর হইবে, পিপাসাও নিবারণ হইবে। এই মনে করিয়াই আসিয়াছি, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিবার আদেশ নাই। মাতার আজ্ঞা,– অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই সাক্ষাৎ।"

পরিপরায়ণা পবিত্রতা সতী পতির নিকটে যাইয়া অশ্ববল্গা ধারণপূর্বক মিনতি বচনে কহিতে লাগিলেন, "জীবিতেশ্বর, সমরাঙ্গনে অঙ্গনার কথা মনে করিতে নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তঃপুরের কথা যাহার মনে পড়ে, সে আবার কেমন বীর? শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া যে যোদ্ধা স্ত্রীর মুখ দেখিতে আসে, সেই বা কেমন বীর? প্রাণেশ্বর! আমি নারী, আমি তো ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের বিপদ সময়ে সাহায্য করিতে স্ত্রীর পরিবার সন্তানসন্ততির কথা যে যোদ্ধা পুরুষ মনে করে, তাকে আমি বীরপুরুষ বলি না। যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয় করেন, তবে আমরাই– এই আমরাই এলোচুলে রণরঙিণী রণবেশে সমরাঙ্গনে অসিহস্তে নৃত্য করিব; রণরঞ্জিত বস্ত্রে আমরাও রণসাজে সাজিতে কুণ্ঠিত হইব না। দেখি, কোন বিপক্ষ যোদ্ধা আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে? দেখার দিন, কথার দিন, বিশ্রামের দিন, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি পাই, তবে মনের আনন্দে আপনার সেবা করিব। হোসেনের বিপদ চিরকাল থাকিবে না। এমন দিন পাইয়া আপনি আর খোয়াইবেন না; এমন দিন আপনি আর পাইবে না। এমন সময় কি বিলম্ব করা উচিত? ছি! ছি! বীরপুরুষ! তোমারে ছি! ছি! শত্রু যুদ্ধার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তুমি কিনা কাপুরুষের মত অবরোধপুরে আসিয়া অবরোধবাসিনী কুলবালার মুখ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছ! ছি তোমাকে!"

অশ্ব হইতে নতশিরে সাধ্বী সতীর কপোল চুম্বন করিয়া আব্দুল ওহাব আর তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। সতীর মিষ্ট ভৎর্সনায় অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হইয়া সজোরে অশ্বে কশাঘাত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শত্রুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিধর্মী কাফেরগণ! ভাবিয়াছিলি যে, আবদুল ওহাব পালাইয়াছে। আবদুল ওহাব পালায় নাই। ঈশ্বরের নামে অতি অল্প সময় এই জগৎ দেখিতে আমি

তোমাদেরকে অবসর দিয়াছিলাম। আর দেখি, কত জনে আবদুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবি, আয়?"

আবদুল ওহাবের মাতা তাহার অজ্ঞাতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যাইয়া আবদুল ওহাবের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। পূর্বেই সেনাপতি ওমর সকলকেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আবদুল ওহাব কোন কারণবশতঃ ফিরিয়া গিয়াছে, এখনই আবার আসিবে। এবার সকলে একত্র হইয়া আবদুল ওহাবকে আক্রমণ করিতে হইবে। যাহার যে অস্ত্র আয়ত্তে আছে, সে সেই অস্ত্র আবদুল ওহাবের প্রতি নিক্ষেপ করিবে।

রণক্ষেত্রে একবার একযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য মণ্ডলাকারে চর্তুদিকে ঘিরিয়া একেশ্বর আবদুল ওহাবের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর আবদুল ওহাব শত্রুবেষ্টিত হইয়া দুই হস্তে অসি চালনা করিতে লাগিলেন। এজিদের সৈন্যের অন্ত নাই; কত মারিবেন! শেষে শত্রুপক্ষের অস্ত্রঘাতে আবদুল ওহাবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল। সেই ছিন্ন মস্তক আবদুল ওহাবের মাতার সম্মুখে গিয়া পড়িল। বীরজননী পুত্রশির ক্রোড়ে লইয়া এস্তে শিবিরে আসিয়া নির্জলচক্ষে হোসেনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এই অবসরে আবদুল ওহাবের শিক্ষিত অশ্ব শিরশূন্য দেহ লইয়া অতি বেগে শিবিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিরশূন্য দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সকলের সম্মুখে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। আবদুল ওহাবের মাতা শোণিতাক্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন এবং আবদুল ওহাবের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ করিলেন, "আবদুল ওহাব! তুমি ঈশ্বরকৃপায় স্বর্গীয় সুখভোগে সুখী হও, হোসেনের বিপদ সময়ে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিলে, প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের পিপাসার শান্তি হেতু কাফের-হস্তে জীবন বিসর্জন করিলে, তোমায় শত শত আশীর্বাদ! তুমি যে জননীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাঁহারও সার্থক জীবন। তোমার মস্তক দেহ হইতে কে বিচ্ছিন্ন করিল?" আবদুল ওহাবের মাতা আবদুল ওহাবের মস্তক লইয়া পতিত দেহে সংলগ্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! বৎস! প্রাণাধিক! অশ্ব সজ্জিত আছে, তোমার হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়াছে, বিধর্মীর রক্তে অস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছ, তবে আর ধূলায় পড়িয়া কেন? বাছা! দুঃখিনীর জীবনসর্বস্ব! উঠিয়া অশ্বে আরোহণ কর। প্রাণাধিক! এইবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে আর আমি তোমাকে যুদ্ধে পাঠাইব না। ঐ দেখ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী বণিতা তোমার যুদ্ধ বিজয় সংবাদ শুনিবার জন্য সতৃষ্ণ শ্রবণে সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিতেছে।"

আবদুল ওহাবের বিয়োগে হোসেন কাঁদিলেন। হোসেনের পরিজনবর্গ ডাক ফুকরাইয়া কাঁদিলেন। আবদুল ওহাবের মাতা অশ্রুনয়নে রোষভরে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! এত ডাকিলাম উঠিলে না? তোমার মায়ের কথা আর শুনিলে না?" শোকাবেগে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় পুত্রমস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার পুত্রহন্তা কে? আবদুল ওহাব কাহার হস্তে জীবন বিসর্জন করিল? কে আমার আবদুল ওহাবের মস্তক আমার ক্রোড়ে আনিয়া নিক্ষেপ করিল? দেখি দেখি, দেখিব দেখিব!" বলিয়া আবদুল ওহাব-জননী তখন ত্বরিত পদে আবদুল ওহাবের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হোসেন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিষেধ করিলেন, কিছুতেই শুনিলেন না– পুত্রমস্তক কোলে করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চঃস্বরে বলিতে

লাগিলেন, "কোন কাফের, কোন পাপাত্মা, কোন শৃগাল আমার পুত্রের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে? ঈশ্বরের দোহাই, এই যুদ্ধক্ষেত্রে একবার আসিয়া সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচ, সেই কাফের আমার সম্মুখে দেখা দিক।"

ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া আবদুল ওহাব হন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দর্পসহকারে বলিতে লাগিল, আমারই এই শাণিত অস্ত্রে আবদুল ওহাবের মস্তক সেই পাপদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।" আর কোন কথা হইল না। আবদুল ওহাব-জননী পুত্রঘাতকে দেখিয়া সক্রোধে আবদুল ওহাবের মস্তক এমন জোরে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলেন যে, ঐ আঘাতেই কাফেরের মস্তক ভগ্ন হইয়া মজ্জা নির্গত হইতে লাগিল। তখনই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

এই ঘটনা দেখিয়া ওমর মহারোষে আবদুল ওহাবের জননীর চতুর্দিকে সৈন্য-বেষ্টন করিলেন। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার জীবনের মায়া নাই পুত্রশোক নিবারণ করিবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে নিপাত কর। যে পথে আমার আবদুল ওহাব গিয়াছে, আমিও সেই পথেই যাই। কিন্তু আকাশে যদি কেহ বিচারকর্তা থাকেন, তিনি তোমাদের বিচার করিবেন।" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবদুল ওহাব-জননী শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন।

আবদুল ওহাবের মাতা প্রাণত্যাগ করিলে গাজী রহমান হোসেনের পদচুম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক বিধর্মীকে জাহান্নামে পাঠাইয়া শত্রুহস্তে শহীদ হইলেন। ক্রমে জাফর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ হোসেনের সাহায্যের জন্য শত্রুসম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কেহই জয়লাভে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। প্রায় দেড় লক্ষ বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিয়া মদিনার প্রধান প্রধান যোদ্ধা মাত্রই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বর্গধামে মহাপ্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

সূর্যদেব যতই উর্ধ্বে উঠিতেছে, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি হইতেছে। হোসেনের পরিজনেরা বিন্দুমাত্র জলের জন্য লালায়িত হইতেছেন, শত শত বীরপুরুষ শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভ্রাতা, পুত্র, স্বামীর শোণিতাক্ত কলেবর, দেখিয়া কামিনীরা সময়ে সময়ে পিপাসায় কাতর হইতেছে, চক্ষুতে জলের নাম মাত্রও নাই, সেই যেন এক প্রকার বিকৃতভাব, কাঁদিবারও বেশী শক্তি নাই। হোসেন চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বন্ধুবান্ধব মধ্যে আর কেহই নাই। রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া জয়লাভের জন্য শত্রুসম্মুখীন হইতে আদেশের অপেক্ষায় তাঁহার সম্মুখে আজ কেহই আসিতেছেন না। হোসেন এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়! এক পাত্র বারি প্রত্যাশায় এত আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব হারাইলাম, তথাচ পরিবারগণের পিপাসা নিবারণ করিতে পারিলাম না। কারবালা ভূমিতে রক্তস্রোত বহিতেছে, তথাচ স্রোতস্বতী ফোরাত শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আর বাঁচিবার ভরসা নাই, আশাও নাই, আকাঙ্খাও নাই।"

হাসানপুর কাসেম পিতৃব্যের এই কথা শুনিয়া সুসজ্জিত বেশে সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাত, কাসেম এখনও জীবিত আছে। আপনার আজ্ঞাবহ চিরদাস আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। অনুমতি করুন, শত্রুকুল নির্মূল করি।"

হোসেন বলিলেন, "কাসেম! তুমি পিতৃহীন, তোমার মাতার তুমিই একমাত্র সন্তান; তোমায় এই ভয়ানক শত্রুদল মধ্যে কোন প্রাণে পাঠাইব?"

কাসেম বলিলেন, "ভয়ানক!– আপনি কাহাকে ভয়ানক শত্রুজ্ঞান করেন? পথের ক্ষুদ্র মক্ষিকা, পথের ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে আমি যেমন ক্ষুদ্র জ্ঞান করি, আপনার অনুমতি পাইলে এজিদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সৈন্যাধ্যক্ষগণকেও সেইরূপ তৃণজ্ঞান করিতে পারি। কাসেম যদি বিপক্ষ-ভয়ে ভয়ার্তচিত্ত হয়, হাসানের নাম ডুবিবে, আপনারও নাম ডুবিবে। অনুমতি করুন, একা আমি সশস্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ রিপুবিনাশে সমর্থ।"

হোসেন বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমার বংশে তুমি সকলের প্রধান, তুমি ইমাম বংশের বহুমূল্য রত্ন, তুমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি সৈয়দ বংশের অমূল্য নিধি! তুমি তোমার মাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে এবং সমুদয় পরিজনকে সান্ত্বনা কর। আমি নিজেই যুদ্ধ করিয়া ফোরাতকূল উদ্ধার করিতেছি।"

কাসেম বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন, কাসেমের প্রাণ দেহে থাকিতে আপনার অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে না। কাসেম এজিদের সৈন্য দেখিয়া কখনই ভীত হইবে না। যদি ফোরাতকূল উদ্ধার করিতে না পারি, তবে ফোরাত নদী আজ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এজিদের সৈন্য শোণিত যোগ দিয়া মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হইবে।"

হোসেন বলিলেন, "বৎস! আমার মুখে এ কথার উত্তর নাই। তোমার মাতার আদেশ লইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।"

হাসনেবানুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মহাবীর কাসেম যুদ্ধযাত্রা প্রার্থনা জানাইলে হাসনেবানু কাসেমকে মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্বচন প্রয়োগ পূর্বক বলিলেন, "যাও বাছা, যুদ্ধে যাও! তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ কর। পিতৃশত্রু এজিদের সৈন্যগণের মস্তক চূর্ণ কর, যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফোরাতকূল উদ্ধার কর, তোমার পিতৃব্যকে রক্ষা কর। তোমার আর আর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তোমারই মুখাপেক্ষা করিয়া রহিল। যাও বাপ, তোমায় আজ ঈশ্বরের পদতলে সমর্পণ করিলাম।"

হাসনেবানুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পিতৃব্যের পদচুম্বনপূর্বক কাসেম অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন, এমন সময় হোসেন বলিলেন, "কাসেম একটু বিলম্ব কর।" অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র অশ্ববল্গা ছাড়িয়া কাসেম তৎক্ষণাৎ পিতৃব্যসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "কাসেম, তোমার পিতার নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, আমাকে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়া যুদ্ধে গমন কর। যুদ্ধে যাইতে আমার আর কোন আপত্তি নাই। তোমার পিতা প্রাণবিয়োগের কিছু পূর্বে আমাকে করারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমার কন্যা সখিনার সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি সখিনাকে বিবাহ না করিয়া যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন, আমাকেও প্রতিজ্ঞা হইতে রক্ষা করা, উভয়ই তোমার সমতুল্য কার্য।"

কাসেম মহা বিপদে পড়িলেন। এতাদৃশ মহাবিপদসময়ে বিবাহ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই অস্থির চিত্ত। কি করেন, কোন উত্তর না করিয়া মাতার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন।

হাসনেবানু বলিলেন, "কাসেম, আমিও জানি, আমার সম্মুখে তোমার পিতা তোমার পিতৃব্যের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাহাকে করারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শোক, তাপ এবং উপস্থিত বিপদে আমি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার পিতৃব্যের স্মরণ ছিল বলিয়াই তোমার পিতার উপদেশ প্রতিপালিত হইবে বোধ হইতেছে। ইহাতে আর কোনও আপত্তি উত্থাপন করিও না। এখনই বিবাহ হউক। প্রাণাধিক! এই বিষাদ-সমুদ্র মধ্যে ক্ষণকালের জন্য একবার আনন্দস্রোত বহিয়া যাউক।"

কাসেম বলিলেন, "জননী, পিতা মৃত্যুকালে আমাকে একখানি কবচ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সময় তুমি কোন বিপদে পড়িবে নিজ বুদ্ধির দ্বারা যখন কোন উপায় স্থির করিতে না পারিবে, সেই সময়ে এই কবচের অপর পৃষ্ঠ দেখিয়া তদুপদেশ মত কার্য করিও। আমার দক্ষিণ হস্তে যে কবচ দেখিতেছেন, ইহাই সেই কবচ। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আজ এই মহাঘোর বিপদ সময়ে কবচের অপর পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া দেখি, কি লেখা আছে।"

হাসনেবানু বলিলেন, "এখনই দেখ! তোমার আজিকার বিপদের ন্যায় আর কোন বিপদই হইবে না। কবচের অপর পৃষ্ঠ দেখিবার উপযুক্ত সময় এই।" এই কথা বলিয়াই হাসনেবানু কাসেমের হস্ত হইতে কবচ খুলিয়া কাসেমের হস্তে দিলেন। কাসেম সম্মানের সহিত কবচ চুম্বন করিয়া অপর পৃষ্ঠ দেখিয়াই বলিলেন, "মা, আমার আর কোন আপত্তি নাই। এই দেখুন, কবচে কি লেখা আছে।" পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন, কবচে লেখা আছে,–"এখনই সখিনাকে বিবাহ কর।" কাসেম বলিলেন, 'আর আমার কোন আপত্তি নাই। এই বেশেই বিবাহ করিয়া পিতার আজ্ঞা পালন এবং পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

প্রিয় পাঠকগণ! ঈশ্বরানুগ্রহে লেখনী সহায়ে আপনাদের সহিত আমি অনেক দূর আসিয়াছি। কোন দিন ভাবি নাই, একটু চিন্তাও করি নাই, লেখনীর অবিশ্রান্ত গতিক্রমেই আপনাদের সঙ্গে বিষাদ-সিন্ধুর পঞ্চবিংশ প্রবাহ পর্যন্ত আসিয়াছি। আজ কাসেমের বিবাহ-প্রবাহে মহাবিপদে পড়িলাম। কি লিখি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। হাসনেবানু বলিয়াছেন, "বিষাদ-সমুদ্রে আনন্দস্রোত।" এমন কঠিন বিষয় বর্ণনা করিতে মস্তক ঘুরিতেছে, লেখনী অসাড় হইতেছে, চিন্তার গতিরোধ হইতেছে, কল্পনা-শক্তি শিথিল হইতেছে। যে শিবিরে স্ত্রী-পুরুষেরা, বালক-বালিকারা দিবারাত্র মাথা ফাটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, পুত্র-মিত্রশোকে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে, প্রাণপতির চিরবিরহে সতী নারীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, ভ্রাতার বিয়োগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রিয় ভ্রাতা বক্ষঃ বিদারণ করিতেছে, শোকে তাপে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে দিবানিশি "হায় হায়" রবে কাঁদিতেছে, জগৎকেও কাঁদাইতেছে; আবার মুহূর্ত পরেই পিপাসা, সেই পিপাসারও শান্তি হইল না; –সেই শিবিরেই আজ বিবাহ! সেই পরিজন-মধ্যেই এখন বিবাহ-উৎসব! বিষাদ-সিন্ধুতে হাসিবার কোন কথা নাই, রহস্যের নামমাত্র নাই, আমোদ-আহ্লাদের

বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কও নাই, আদ্যন্ত কেবল বিষাদ, ছত্রে ছত্রে বিষাদ, বিষাদেই আরম্ভ এবং বিষাদেই সম্পূর্ণ। কাসেমের ঘটনা বড় ভয়ানক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহাবীর কাসেমের ঘটনা বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রধান তরঙ্গ।

কাহারও মুখে হাসি নাই, কাহারও মুখে সন্তোষের চিহ্ন নাই; বিবাহ অথচ বিষাদ! পুরবাসিগন সখিনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রণবাদ্য তখন সাদীয়ানা বাদ্যের কার্য করিতে লাগিল। অঙ্গরাগাদি সুগন্ধি দ্রব্যের কথা কাহারও স্মরণ হইল না; –কেবল কষ্টবিনির্গত নেত্রজলেই সখিনার অঙ্গ ধৌত করিয়া পুরবাসিনীরা পরিস্কৃত বসনে সখিনাকে সজ্জিত করিলেন। কেশগুচ্ছ পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। সভ্যপ্রদেশ-প্রচলিত বিবাহের চিহ্নস্বরূপ দুই একখানি অলঙ্কার সখিনার অঙ্গে ধারণ করাইলেন। সখিনা পূর্ণবয়স্কা, সকলই বুঝিতেছেন। কাসেম অপরিচিত নহে। প্রণয়, ভালবাসা উভয়েরই রহিয়াছে! ভ্রাতাভগ্নী মধ্যে যেরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় হইয়া থাকে, তাহা কাসেম ও সখিনার বাল্যকাল হইতেই রহিয়াছে। কাহারও স্বভাব কাহারও অজানা নাই, বাল্যকাল হইতেই এই উপস্থিত যৌবনকাল পর্যন্ত একত্রে ক্রীড়া, একত্র ভ্রমণ, একত্র বাসনিবন্ধন উভয়েরই মনে সবিশেষ সরল প্রণয় জন্মিয়াছে। উভয়েই এক পরিবার, এক বংশদ্ভুত পিতা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং লজ্জা, মান, অভিমান অপর স্বামী-স্ত্রীতে যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা ইহাদের নাই। লগ্ন সুস্থির হইল। ওদিকে এজিদের সৈন্যমধ্যে ঘোর রবে যুদ্ধবাজনা বাজিতে লাগিল। ফোরাত নদীর কূল উদ্ধার করিতে আর কোন বীরপুরুষই হোসেনের পক্ষ হইতে আসিতেছেন না দেখিয়া আজিকার যুদ্ধ জয় সম্ভব বিবেচনায় তুমুল শব্দে বাজনা বাজিতে লাগিল। সেই শব্দে ফোরাতকূল হইতে কারবালার অন্তসীমা পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হোসেনের শিবিরে পতিপুত্র শোকাতুরা অবলাগণের কাতর নিনাদে সপ্ততল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। সেই কাতরধ্বনি ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত যাইতে লাগিল। হোসেন বাহির হইয়া এই নিদারুণ দুঃখের সময়ে কাসেমের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতা সখিনাকে সমর্পণ করিলেন। বিধিমত বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। শুভ কার্যের পর আনন্দাশ্রু অনেকের চক্ষে দেখা যায়, কিন্তু হোসেনের শিবিরস্থ পরিজনগণের চক্ষে কোন প্রকার অশ্রুই দেখা যায় নাই। কিন্তু কাসেমের বিবাহ বিষাদ-সিন্ধুর সর্বাপেক্ষা প্রধান তরঙ্গ! সেই ভীষণ তরঙ্গে সকলেই অন্তর ভাসিয়া যাইতেছিল। বরকন্যা উভয়েই সমবয়স্ক! স্বামী-স্ত্রীতেই দুই দণ্ড নির্জ্জনে কথাবার্তা কহিতেও আর সময় হইল না। বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিয়াই গুরুজনগণের চরণ বন্দনা করিয়া মহাবীর কাসেম অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এখন কাসেম শত্রুনিপাতে চলিল।"

হাসনেবানু কাসেমের মুখে শত শত চুম্বন দিয়া আর আর সকলের সহিত দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে করুণাময় জগদীশ্বর! কাসেমকে রক্ষা করিও। আজ কাসে বিবাহ-সজ্জা, –বাসরসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চিরশত্রুসৈন্য সম্মুখে যুদ্ধসজ্জায় চলিল। পরমেশ্বর, তুমিই রক্ষাকর্তা; তুমিই রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক হইয়া পিতৃহীন কাসেমকে এ বিপদে রক্ষা কর।"

কাসেম যাইতে অগ্রসর হইলেন; হাসনেবানু বলিতে লাগিলেন, "কাসেম, একটু অপেক্ষা কর। চিরমনঃসাধ আমি পূর্ণ করি। তোমাদের দুইজনকে একত্র নির্জনে বসাইয়া আমি একটু দেখিয়া লই। উভয়কে একত্র দেখিতে আমার নিতান্তই সাধ হইয়াছে।" এই

বলিয়া সখিনা ও কাসেমকে বস্ত্রাবাস-মধ্যে একত্র বসাইয়া বলিলেন, "কাসেম, তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লও।" হাসনেবানু শিরে করাঘাত করিতে করিতে তথা হইতে বাহির হইয়া কাসেমের গম্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাসেম সখিনার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কেবল সখিনার মুখপানে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাসেম বলিলেন, "সখিনা! প্রণয়, –পরিচয়ের ভিখারী আমরা নহি; এক্ষণে নূতন সম্বন্ধ পূর্বে প্রণয় নূতন ভাবে আজীবনকাল সমভাবে রক্ষার জন্যই বিধাতা এই নতুন সম্বন্ধ সৃষ্টি করাইলেন। তুমি বীর-কন্যা-বীরজায়া; এ সময় তোমার মৌনী হইয়া থাকা আমার অধিকতর দুঃখের কারণ! পবিত্র প্রণয় তো পূর্ব হইতেই ছিল, এক্ষণে তাহার উপরে পরিণয়সূত্রে বন্ধন হইল, আর আশা কি? অস্থায়ী জগতের আর কি সুখ আছে বল তো?"

সখিনা বলিলেন, "কাসেম, তুমি আমাকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। তবে এই মাত্র বলি, যেখানে শত্রুর নাম নাই, এজিদের ভয় নাই, কারবালা প্রান্তরও নাই, ফোরাত-জলের পিপাসাও যেখানে নাই, সেই স্থানে আমি তোমাকে পাই; এই আমার প্রার্থনা। প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর কি আশা!" – কাসেমের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখিনা পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "কাসেম! প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর কি আশা!"

প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অতি স্নেহ-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাসেম বলিতে লাগিলেন, "আমি যুদ্ধার্থী, শত্রু-শোণিত-পিপাসু, আজ সপ্ত দিবস এক বিন্দু মাত্র জল গ্রহণ করি নাই, কিন্তু এখন আমার ক্ষুধা-পিপাসা কিছুই নাই। তবে সে পিপাসায় কাতর হইয়া চলিলাম, বোধ হয় এ জীবনে তাহার তৃপ্তি নাই, হইবেও না। তুমি কাঁদিও না, মনের আনন্দে আমাকে বিদায় কর। একবার কান পাতিয়া শুন দেখি, শত্রুদলের রণবাদ্য কেমন ঘোর রবে বাদিত হইতেছে! তোমার স্বামী, মহাবীর হাসানের পুত্র, হযরত আলীর পৌত্র কাসেম– তোমার স্বামী, এই কাসেম কি ঐ বাদ্য শুনিয়া নববিবাহিতা স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? সখিনা! আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সখিনা বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে ঈশ্বরে সঁপিলাম। যাও কাসেম– যুদ্ধে যাও! প্রথম মিলন-রজনীর সমাগম আশায় অস্তমিত সূর্য্যের মলিন ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হওয়া সখিনার ভাগ্যে নাই। যাও কাসেম!– যুদ্ধে যাও!"

কাসেম আর সখিনার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। আয়ত-লোচনে বিষাদিতভাবে চক্ষে দেখিতে আর ক্ষমতা হইল না। কোমলপ্রাণা সখিনার সুকোমল হস্ত ধরিয়া বারংবার চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন। সখিনার আশা ভরসা যে মুহূর্তে অঙ্কুরিত হইল, সেই মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল। কাসেম দ্রুতপদে শিবির হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ পূর্বক সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে দৌড়িয়া চলিল– সখিনা চমকিয়া উঠিলেন– হৃদয়ে বেদনা লাগিল।

কাসেম সমরক্ষেত্রে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ-সাধ যদি কাহার থাকে, যৌবনে যদি কাহারও অমূল্য জীবন বিড়ম্বনা জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে কাসেমের সম্মুখে অগ্রসর হও।"

সেনাপতি ওমর পূর্ব হইতেই কাসেমকে বিশেষরূপে জানিতেন। কাসেমের তরবারি-সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমন বলবান বীর তাহার সৈন্যমধ্যে এক বর্জ্জক ভিন্ন আর

কেহই ছিল না। বৰ্জ্জককে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই বৰ্জ্জক, হাসান-পুত্র কাসেমের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের সৈন্যদল-মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। ভাই, কাসেমের বলবীর্য, কাসেমের বলবিক্রম, কাসেমের বীরত্ব প্রতাপ সকলই আমার জানা আছে। তাহার সম্মুখে যাহাকে পাঠাইব, সে আর শিবিরে ফিরিয়া আসিবে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, কোনক্রমেই কাসেমের হস্ত হইতে সে আর রক্ষা পাইবে না। নিরর্থক সৈন্যক্ষয় করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমার বিবেচনায় তুমিই কাসেম অপেক্ষা মহাবীর। তুমিই কাসেমের জীবন-প্রদীপ নির্বাণ করিয়া আইস।"

বৰ্জ্জক বলিলেন, "বড় ঘৃণার কথা! শাম দেশে মহা মহা বীরের সম্মুখে আমি দাঁড়াইয়াছি, মিসরে প্রধান প্রধান মহারথীরা বৰ্জ্জকের বীরত্ববীর্য অবগত আছে, আজ পর্যন্ত কেহই সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই; এখন কিনা, এই সামান্য বালকের সহিত ওমর আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, বড়ই ঘৃণার কথা! হোসেনের সম্মুখে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে বরং কিঞ্চিৎ শোভা পায়; আর এ কিনা, কাসেমের সহিত যুদ্ধ! বালকের সহিত সংগ্রাম! কখনই না, কখনই না। কখনই আমি কাসেমের সহিত যুদ্ধ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিব না।"

ওমর বলিলেন, "তুমি কাসেমকে জান না। তাহাকে অবহেলা করিও না; তাহার তুল্য মহাবীর মদিনায় আর নাই। ভাই বৰ্জ্জক! তুমি ভিন্ন কাসেমের অস্ত্রাঘাত সহ্য করে, এমন বীর আমাদের দলে আর কে আছে?"

হাসিতে হাসিতে বৰ্জ্জক বলিলেন, "কাহাকে তুমি কি কথা বল? ক্ষুদ্র কীট, ক্ষুদ্র পতঙ্গ কাসেম, তাহার মাথা কাটিয়া আমি কি বিশ্ব-বিজয়ী বীর-হস্ত কলঙ্কিত করিব? কখনই না– কখনই না! সিংহের সহিত সিংহের যুদ্ধ হয়, শৃগালের সহিত সিংহ কোন কালে যুদ্ধ করে, ওমর? সিংহ– শৃগাল! তুলনা করিলে তাহাও নহে। বৰ্জ্জক সিংহ, কাসেম একটা পতঙ্গ মাত্র। কি বিবেচনায়, ওমর! কি বিবেচনায় তুমি সেই তুচ্ছ পতঙ্গ কাসেমের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে পাঠাও? আচ্ছা, তোমার যদি বিশ্বাস হইয়া থাকে, কাসেম মহাবীর, আচ্ছা আমি যাইব না, আমার অমিততেজা চারি পুত্র বর্তমান, তাহারা রণক্ষেত্রে গমণ করুক, এখনই কাসেমের মাথা কাটিয়া আনিবে।"

তাহাই, ওমরের তথাস্তু আদেশমতে বৰ্জ্জকের প্রথম পুত্র যুদ্ধে গমন করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বর্শা চালাইতে আরম্ভ করিল। বিপক্ষ পরাস্ত হইল না। অবশেষে অসিযুদ্ধ। সম্মুখে কাসেম। উভয়ে মুখোমুখি হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বৰ্জ্জকের পুত্র অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, কাসেম হাস্য করিতেছেন! বৰ্জ্জকের পুত্রের তরবারি-সংযুক্ত বহুমূল্য মণিমুক্তা দেখিয়া হাস্যহাস্য কাসেম কহিলেন, "কি চমৎকার শোভা, মণিময় অস্ত্র প্রদর্শন করিলেই যদি মহারথী হয়, তবে বল দেখি, মণিমস্তক কালসর্প কেন মহারথী না হইবে?"

কথা না শুনিয়াই বৰ্জ্জকের পুত্র কাসেমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। পুনর্বার আঘাত। কাসেমের বর্মবিদ্ধ হইয়া বাম হস্ত হইতে শোণিতের ধারা ছুটিল। এস্তহস্তে শিরস্ত্রাণ ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান বন্ধনপূর্বক ক্ষতযোদ্ধা পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিলেন। বৰ্জ্জকের পুত্র বর্শা ধারণ করিয়া বলিলেন, "কাসেম, তলোয়ার রাখ। তোমার বাম হস্তে আঘাত লাগিয়াছে। বর্মধারণে তুমি অক্ষম। অসিযুদ্ধেও তুমি এখন অক্ষম। বর্শা ধারণ কর, বর্শাযুদ্ধই এখন শ্রেয়ঃ।"

বক্তার কথা মুখে থাকিতে থাকিতে কাসেমের বর্শা প্রতিযোদ্ধার বক্ষঃ নিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠ পার হইল। বর্জ্জকের পুত্র শোণিতাক্ত শরীরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহার কটিবন্ধনের মতামূল্য অসি সজোরে আকর্ষণ করিয়া কাসেম বলিলেন, "কাফের, মূল্যবান, অস্ত্রের ব্যবহার দেখ।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বর্জ্জকপুত্রের মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইল। কাসেম বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্মী কাফেরগণ! আর কাহাকে রণক্ষেত্রে কাসেমের সম্মুখে পাঠাইবি, পাঠা?"

পাঠাইবার বেশী অবসর হইল না! দেখিতে দেখিতে মহাবীর কাসেম বর্জ্জকের অপর তিন পুত্রকে শীঘ্র শীঘ্র শমনসদনে পাঠাইলেন। পুত্র-শোকাতুর বর্জ্জক সেনাপতির আদেশের অপেক্ষা না করিয়া ভীমগর্জ্জনে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, 'কাসেম, তুমি ধন্য! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। তুমি আমার চারিটি পুত্র নিধন করিয়াছ। তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কাসেম, তুমি বালক। এত যুদ্ধ করিয়া অবশ্যই ক্লান্ত হইয়াছ। সপ্তাহকাল তোমার উদরে অন্ন নাই, কণ্ঠে জলবিন্দু নাই, এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

কাসেম বলিলেন, "বর্জ্জক, সে ভাবনা তোমার ভাবিতে হইবে না। তুমি পুত্রশোকে যে প্রকার বিহ্বল হইয়াছে, দেখিতেছি, তাহাতে তোমার পক্ষে এ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াই বিড়ম্বনা।"

বর্জ্জক বলিলেন, "কাসেম, আমি তোমার কথা স্বীকার করি, পুত্রশোকে অতি কঠিন হৃদয়ও বিহ্বল হয়, কিন্তু পুত্রহন্তার মস্তক লাভের আশা থাকিলে– এখনই পুত্রমস্তকের পরিশোধ হইবে, নিশ্চয় জানিতে পারিলে, বীরহৃদয়ের বিহ্বলতাই বা কি? দুঃখই বা কি? কাসেম! বল তো তুমি, ঐ তরবারিখানি কোথায় পাইলে? ও তরবারি আমার, আমি বহু যত্নে, বহু ব্যয়ে মণিমুক্তা সংযোগে সুসজ্জিত করিয়াছি।"

কাসেম বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।– তাহাতে দুঃখ কি? তোমার মণিমুক্তাসজ্জিত তরবারি দ্বারা তোমারই চারি পুত্র বিনাশ করিয়াছি। নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিও এই মূল্যবান তরবারির আঘাত হইতে বঞ্চিত হইবে না। নিশ্চয় জানিও, অন্য তরবারিতে, অন্যের হস্তে তোমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে না, আক্ষেপ করিও না; তোমার এই মহামূল্য অসি তোমারই জীবন বিনাশের নির্ধারিত অস্ত্র মনে করিও।"

বর্জ্জক মহাক্রোধে বর্শা ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কাসেম, তোমার বাকচাতুরী এই মুহূর্তেই শেষ করিতেছি। তুমিও নিশ্চয় জানিও, বর্জ্জকের হস্ত হইতে আজ তোমার আর রক্ষা নাই।" এই বলিয়া সজোরে বর্শা আঘাত করিলেন। কাসেম বর্ম দ্বারা বর্শাঘাত ফিরাইয়া বর্জ্জকের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া বর্শা উত্তোলন করিতেই বর্জ্জক লঘহস্ততা প্রভাবে কাসেমকে পুনরায় বর্শাঘাত করিলেন! বীরবর কাসেম বিশেষ চতুরতার সহিত বর্জ্জকের বর্শা ফিরাইয়া আপন বর্শা দ্বারা বর্জ্জককে আঘাত করিলেন। উভয় বীর বহুক্ষণ বর্শাযুদ্ধ করিয়া শেষে উভয়েই তরবারি ধারণ করিলেন। তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের বর্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কাসেমকে ধন্যবাদ দিয়া বর্জ্জক বলিতে লাগিলেন, 'কাসেম, আমি রোম, শাম, মিশর, আরব প্রভৃতি বহু দেশে বহু যোদ্ধার তরবারিযুদ্ধ দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় তরবারিধারী বীর কুত্রাপি কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ধন্য তোমার বাহুবল! ধন্য তোমার শিক্ষাকৌশল! যাহা হউক,

কাসেম! এই আমার শেষ আঘাত। হয় তোমার জীবন, না হয় আমার জীবন।" এই শেষ বলিয়া বর্জ্জক কাসেমের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি আঘাত করিলেন। কাসেম যে আঘাত তাচ্ছিল্য ভাবে বর্মে উড়াইয়া বর্জ্জক সরিতে না সরিতেই তাহার গ্রীবাদেশে অসি প্রহার করিলেন। বীরবর কাসেমের আঘাতে বর্জ্জকের শির রণক্ষেত্রে গড়াইয়া পড়িল। এই ভয়াবহ ঘটনা দৃষ্টে এজিদের সৈন্যমধ্যে মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

বর্জ্জকের নিপাত দর্শনে এজিদের সৈন্যমধ্যে কেহই আর সমরাঙ্গনে আসিতে সাহসী হইল না। কাসেম অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিপক্ষদিগকে দেখিতে না পাইয়া একেবারে ফোরাত-তীরে উপস্থিত হইলেন। নদী-রক্ষকেরা কাসেমের অশ্বপদাধ্বনি শ্রবণে মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া মহাসঙ্কিত হইল। কাসেম কাহাকে কিছু বলিলেন না। তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম, যাহা দ্বারা যাহাকে মারিতে সুবিধা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফোরাতকূল উদ্ধারের উপক্রম করিলেন। ওমর, সীমার ও আব্দুল্লাহ প্রভৃতি দেখিলেন, নদীকূল-রক্ষীরা কাসেমের অস্ত্র-সম্মুখে কেহই টিকিতেছে না। ইহারা কয়েকজন একত্র হইয়া সমর-প্রাঙ্গনের সমুদয় সৈন্যসহ কাসেমকে পশ্চাৎদিক হইতে ফিরিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনবরত তীর কাসেমের অঙ্গে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে; কাসেমের সে দিকে দৃকপাত নাই; কেবল ফোরাতকূল উদ্ধার করিবেন, এই আশাতেই সম্মুখস্থ শত্রুগণের সংহার করিতেছেন। কাসেমের শ্বেতবর্ণ অশ্ব তীরাঘাতে রক্তধারায় লোহিতবর্ণ হইয়াছে! শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া মৃত্তিকা রঞ্জিত করিতেছে। ক্রমেই কাসেম নিস্তেজ হইতেছে;– শোণিতপ্রবাহে চতুর্দিকেই অন্ধকার দেখিতেছেন। শেষে নিরূপায় হইয়া অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত অশ্ব কাসেমের শরীরের অবসন্নতা বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে শিবির-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; হাসনেবানু ও সখিনা শিবির মধ্য হইতে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কাসেমের পরিহিত শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া পড়িতেছে। কাসেম অশ্ব হইতে নামিয়া সখিনাকে বলিলেন, "সখিনা! দেখ, তোমার স্বামীর শাহানা* পোশাক দেখ! আজ বিবাহ-সময়ে উপযুক্ত পরিচ্ছদে তোমাকে বিবাহ করি নাই, কাসেমের দেহ-বিনির্গত শোণিতধারে শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে পরিণত হইয়া বিবাহবেশ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এই বেশ তোমাকে দেখাইবার জন্যই বহু কষ্টে শত্রুদল ভেদ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আইস, এই বেশে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ শীতল করি। সখিনা! আইস, এই বেশেই আমার মানসের চিরপিপাসা নিবারণ করি।"

কাসেম এই কথা বলিয়াই সখিনাকে আলিঙ্গন করিবার নিমত্তি হস্ত প্রসারণ করিলেন। সখিনাও অগ্রবর্তিনী হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। কাসেমের দেহবিনির্গত শোণিত-প্রবাহে সখিনার পরিহিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হইল। কাসেম সখিনার গলদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, নিজ বশে আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। শরাঘাতে সমুদয় অঙ্গ জরজর হইয়া সহস্র পথে শোণিতধারা শরীর বহিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। সজ্জিত মস্তক ক্রমশঃই সখিনার স্কন্ধদেশে নত হইয়া আসিতে লাগিল। সখিনার বিষাদিত বদন

---

* লাল পোশাক।

নিরীক্ষণ করা কাসেমের অসহ্য হইল বলিয়াই চক্ষু দু'টি নীল বর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে সময়ও কাসেম বলিলেন,

"সখিনা! নব অনুরাগে পরিণয়-সূত্রে তোমারি প্রণয়-পুষ্পহার কাসেম আজ গলায় পরিয়াছিল; বিধাতা আজই সে হার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। জগতে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি; দৈহিক সম্বন্ধ-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল; কিন্তু সখিনা! সে জন্য তুমি ভাবিও না– কেয়ামতে অবশ্যই দেখা হইবে। সখিনা! নিশ্চয় জানিও, ইহা আর কিছু নহে, কেবল অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। ঐ দেখ, পিতা আমার অমরপুরীর সুবাসিত শীতল জল-পরিপূরিত মণিময় সোরাহী-হস্তে আমার পিপাসার শান্তিও জন্য দাঁড়াইয়া আছেন! আমি চলিলাম।"

কাসেমের চক্ষু একেবারে বন্ধ হইল!– প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল। শূন্যদেহ সখিনার দেহযষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। পুরবাসীরা সকলেই কাসেমের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সখিনা স্বামীর মৃতদেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার সখিনা এখনও সেই বিবাহ-বেশ পরিয়া রহিয়াছে। কেশগুচ্ছ যেভাবে দেখিয়াছিলে, এখনও সেইভাবে রহিয়াছে। তাহার এক গাছিও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। লোহিত বসন পরিধান করিয়া বিবাহ হয় নাই; প্রাণেশ্বর! "তাই আপন শরীরের রক্তধারে সেই বসন রঞ্জিত করিয়া দেখাইলে! আমি আর কি করিব? জীবতেশ্বর! জগতে সখিনা বাঁচিয়া থাকিতে তোমার দেহ-বিনিগৃত শোণিত-বিন্দু মৃত্তিকা–সংলগ্ন হইতে দিবে না! এই বলিয়া কাসেমের দেহ বিনিগৃত শোণিত বিন্দু সখিনা সমুদয় অঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। মাখিতে মাখিতে কহিতে লাগিলেন, "বিবাহ-সময়ে এই হস্তদ্বয় মেহেদী দ্বারা সুরঞ্জিত হয় নাই–একবার চাহিয়া দেখ কাসেম! একবার চাহিয়া দেখ। তোমার সখিনার হস্ত তোমারি রক্ত-ধারে কেমন শোভিত হইয়াছে! জীবিতেশ্বর! তোমারি এই পবিত্র রক্তমাখিয়া সখিনা চিরজীবন এই বেশেই থাকিবে। যুদ্ধজয়ী হইয়া আজই বাসর-শয্যায় শয়ন করিবে বলিয়াছিলে, সে সময় প্রায় আগত;–তবে ধূলিশয্যায় শয়ন কেন হৃদয়েশ? বিধাতা! আজই সংসার ধর্মের মুখ দেখাইলে, আজই সংসারী করিলে, আবার আজই সমস্ত সুখ মিটাইলে!–দিন এখনও রহিয়াছে। সে দিন অবসান না হইতেই সখিনার এই দশা করিলে! যে সূর্য সখিনার বিবাহ দেখিল, সেই সূর্যই সখিনার বৈধবা-দশা দেখিয়া চলিল। সূর্যদেব! যাও, সখিনার দুর্দশা দেখিয়া যাও! সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন তুমি কত ঘটনা, কত কার্য, কত সুখ, কত দুঃখ দেখিয়াছ; কিন্তু দিনকর! এমন হরিষে-বিষাদ কখনও কি দর্শন করিয়াছ?–সখিনার তুল্য দুঃখিনী কখনও কি তোমার চক্ষে পড়িয়াছে? যাও সূর্যদেব! সখিনার সদ্যবৈধব্য দেখিয়া যাও।"

সখিনা এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন; কাসেমের অবস্থা দর্শনে হোসেন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিঞ্চিৎ পরে সংজ্ঞা পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! তুমি আমার কূল-প্রদীপ, তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, তুমিই আমার মদিনার ভাবী রাজা,–আমি অভাবে তোমার শিরেই রাজমুকুট শোভা পাইত। বৎস! তোমার বীরত্বে– তোমার অস্ত্র-প্রভাবে মদিনাবাসীরা সকলেই

বিমুগ্ধ। আরবের মহা মহা যোদ্ধাগণ তোমার নিকট পরাস্ত; তুমি আর কাহার ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোহিত বসনে নিস্পন্দভাবে ধরাশায়ী হইয়া রহিলে! প্রাণাধিক!–বীরেন্দ্র! ঐ শুন, শত্রুদল মহানন্দে রণবাদ্য বাজাইতেছে। তুমি সমরাঙ্গণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ বলিয়া তোমাকে তাহারা ধিক্কার দিতেছে। কাসেম! গাত্রোত্থান কর,– তরবারি ধারণ কর! ঐ দেখ, তোমার প্রিয় অশ্ব ক্ষত-বিক্ষত শরীরে শোণিতাক্ত কলেরবে তোমাকে শরাশায়ী দেখিয়ো অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে! শরাঘাতে তাহার শ্বেতকান্তি পরিবর্তিত হইয়া শোণিত ধারায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তথাপি রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য উৎসাহের সহিত তোমারি দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সম্মুখস্থ পদ দ্বারা মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে! কাসেম! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার প্রিয়তম অশ্বের অবস্থা একবার চাহিয়া দেখ! কাসেম! আজি আমি তোমার বিবাহ দিয়াছি। যাহার সঙ্গে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ছিল না, পরিচয় ছিল না, প্রণয় ছিল না, এমন কোন কন্যা আনিয়া তোমাকে সমর্পণ করি নাই; আমার হৃদয়ের ধনকেই তোমার হস্তে দিয়াছি। তোমারই পিতৃ-আদেশে সখিনাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

হাসানকে উদ্দেশ্য করিয়া হোসেন অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতাঃ! জগৎ পরিত্যাগের দিন ভাল উপদেশ দিয়া গিয়াছিলে, যে দিন বিবাহ, সেই দিনই সর্বনাশ! যদি ইহাই জানিয়াছিলে, যদি সখিনার অদৃষ্টলিপি মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলে, তবে কাসেমের সঙ্গে সখিনার বিবাহের উপদেশ কেন দিয়াছিলে ভাই?–তুমি তো স্বর্গসুখে রহিয়াছ, এ সর্বনাশ একবারও চক্ষেও দেখিলে না–এই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই অগ্রে চলিয়া গেলে! ভাই! মৃত্যুসময় তোমার যত্নের রত্ন, হৃদয়ের অমূল্য মণি কাসেমকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলে; আমি এমনই হতভাগ্য যে, সেই অমূল্য নিধিটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর কি বলিব! তোমার প্রাণাধিক পুত্র কাসেম এক বিন্দু জলের প্রত্যাশায় শত্রুহস্তে প্রান হারাইল! কাসেম বিন্দুমাত্র জল পাইলে এজিদের সৈন্যের নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিত না; দেহ-সমষ্টি শোণিত-প্রবাহের সহিত ফোরাত-প্রবাহে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, তাহার সন্ধানও রহিত না। আর সহ্য হয় না। সখিনার মুখের দিকে আর চাহিতে পারি না। কৈ, আমার অস্ত্র-শস্ত্র কোথায়? কাসেমের শোকাগ্নি আরজ শত্রুশোণিতে নির্বাপিত হউক! সখিনার বৈধব্যসূচক চির শুভ্র বসন শত্রুশোণিতে রঞ্জিত করিয়া চিরকাল সধবার চিহ্নে রাখিব;–কৈ আমার বর্ম কোথায়? কৈ, আমার শিরস্ত্রাণ কোথায়? (জোরে উঠিয়া) কৈ, আমার অশ্ব কোথায়? এখনই অন্তর-জ্বালা নিবারণ করি।–শত্রু বধ করিয়া কাসেমের শোক ভুলিয়া যাই" পাগলের মত এই সকল কথা বলিয়া হোসেন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন।

হোসেন পুত্র আলী আকবর করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পিতাঃ! এখনও আমরা চারি ভ্রাতা বর্তমান। যদিও শিশু, তথাপিও মরণে ভয় করি না। আমরা বর্তমান থাকিতে আপনি অস্ত্র ধারণ করিবেন? বাঁচিবার আশা তো একরূপ শেষ হইয়াছে। পিপাসায় আত্মীয়স্বজনের শোকাগ্নি-উত্তাপে জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষ, উদর সকলই তো শুষ্ক হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় আর কয় দিন বাঁচিব? নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। বীর পুরুষের ন্যায় মরাই শ্রেয়ঃ। স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া মরিব না।" এই কথা বলিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া আলী আকবর অশ্বে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে কাহাকেও

আহ্বান না করিয়া একেবারে ফোরাতকূল-রক্ষণদিগের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রক্ষীরা ফোরাতকূল ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। এজিদের সৈন্যমধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। আলী আকবর যেমন বলবান, তেমনই রূপবান ছিলেন। তাঁহার সুদৃশ্য রূপলাবণ্যের প্রতি যাহার চক্ষু পড়িল, তাহার, হস্ত আর আলী আকবরের প্রতি আঘাত করিতে উঠিল না। যে দেখিল, সেই আকবরের রূপে মোহিত হইয়া তৎপতি অস্ত্রচালনায় বিরত হইল। অস্ত্রচালনা দূরে থাকুক, পিপাসায় আক্রান্ত, শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, এই ভাবিয়াই অনেক বিধর্মী অনেক দুঃখ করিতে লাগিল। আলী আকবর বীরত্বের সহিত নদীকূল রক্ষকদিগকে তাড়াইয়া অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই ভাবিতেছেন, কি করি! সমুদয় শত্রু শেষ করিতে পারিলাম না, যাহারা পলাইত অবসর পাইল না, তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইল; ঐশ্বরী মায়ায় তাহাদের পরমায়ু তো শেষ হইল। কিন্তু অধিকাংশ রক্ষীই প্রাণ–ভয়ে নদীকূল ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইল। আমি এখন কি করি!

ঈশ্বরের মায়া বুঝিতে মানুষের সাধ্যমাত্র নাই। আবদুল্লাহ জেয়াদ তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া সেই সময়েই ফোরাত-তীরে আসিয়া আলী আকবরকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জোয়াদের সৈন্য আলী আকবরের তরবারি সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধরূপে পড়িয়া যাইতে লাগিল। এ পর্যন্ত আলী আকবরের অঙ্গে শত্রুপক্ষেরা কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারে নাই; কিন্তু আলী আকবর সাধ্যানুসারে বিধর্মীমস্তক নিপাত করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না। যাহারা পালাইয়াছিল, তাহারা জেয়াদের সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া আলী আকবরের বিরুদ্ধে দাড়াইল। আকবর সৈন্যচক্র ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে শিবিরে আসিলেন। পিতার সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ফোরাতকূল উদ্ধার হইত; কিন্তু কুফা হইতে আবদুল্লাহ জেয়াদ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া এজিদের সৈন্যের সাহায্যার্থে পুনরায় নদীতীরে বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে উপায়ে হয়, আমাকে এক পাত্র জল দিন, আমি এখনই জেয়াদকে সৈন্যসহ শমনভবনে প্রেরণ করিয়া আসি। এই দেখুন, আমার তরবারি কাফের-শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় ও আপনার আশীর্বাদ আমার অঙ্গে-কেহ এ পর্যন্ত একটিও আঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু পিপাসায় প্রাণ যায়।"

হোসেন বলিলেন, "আকবর! আজ দশ দিন কেবল চক্ষের জল ব্যতীত এক বিন্দু জল চক্ষে দেখি নাই! সেই চক্ষের জলও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জল কোথায়া পাইব বাপ?"

আলী আকবর বলিলেন, "আমার প্রান যায়, আর বাঁচি না।"–এই বলিয়া পিপাসার্ত আলী আকবর ভূমিতলে শয়ন করিলে। হোসেন বলিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর! জীবনে মানব-জীবন রক্ষা হইবে বলিয়া জলের নাম তুমি জীবন দিয়াছ।– জগদীশ্বর! সেই জীবন আজ দুর্লভ। জগৎজীবন! সেই জীবনের জন্য মানব-জীবন আজ লালায়িত। কার কাছে জীবন ভিক্ষা করি দয়াময়!–আশুতোষ! তোমার জগৎ-জীবন নামের কৃপায় শিশু কেন বঞ্চিত হইবে জগদীশ?–করুনাময়! তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। ভূগোলে বলে, স্থলভাগের অপেক্ষা জলের ভাগই অধিক। আমরা এমনই পাপী যে, জগতের অধিকাংশ পরিমাণ যে জল, যাহা পশু-পক্ষীরাও অনায়াসে লাভ করিতেছে, তাহা হইতেও আমরা বঞ্চিত হইলাম। ষষ্টি সহস্র লোকের প্রাণ বোধ হয়, এই জলের জন্যই বিনাশ হইল! দয়াময়! সকলই তোমার মায়া!"

আলী আকবরের নিকটে যাইয়া হোসেন বলিলেন, "আকবর! তুমি আমার এই জিহ্বা আপন মুখের মধ্যে একটু শান্তিলাভ কর। জিহ্বাতে যে রস আছে, উহাতে যদি তোমার পিপাসার কিছু শান্তি হয়, দেখ। বাপ! অন্য জলের আশা করিও না।"
আলী আকবর পিতার জিহ্বা মুখের মধ্যে রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরেই বলিলেন, "প্রাণ শীতল হইল, পিপাসা দূর হইল। ঈশ্বরের নাম করিয়া আবার চলিলাম।"
এই বলিয়াই আলী আকবর পুনরায় অশ্বে আরোহণ পূর্বক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অতি অল্প সময়েই বহু শত্রু নিপাত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে জেয়াদ এবং ওমর প্রভৃতি পরামর্শ করিলেন, "আলী আকবর ক্ষণকাল এইরূপ যুদ্ধ করিলেই আমাদিগকে এক প্রকার শেষ করিবে। আলী আকবরকে যে গতিকেই হইক, বিনাশ করিতে হইবে। সম্মুখ-যুদ্ধে আকবরের নিকট অগ্রসর হইয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিবে না: দূর হইতে গুপ্তভাবে আমরা কয়েকজন উহাকে লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত শর সন্ধান করিতে থাকি, অবশ্যই কাহারও শর আকবরের বক্ষভেদ করিবেই করিবে।"
এই বলিয়াই প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষেরা বহুদূর হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আলী আকবর কাফেরবধে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতিয়া গিয়াছেন। শরসন্ধানীরা শর নিক্ষেপ করিতেছে। একটি বিষাক্ত শর আলী আকবরের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্টদেশ পার হইয়া গেল। আলী আকবর সমুদয় জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পিপাসাও অধিকতর বৃদ্ধি হইল। জলের জন্য কাতর স্বরে বারবার পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, যেন তাঁহার পিতৃব্য জলপাত্র হস্তে করিয়া বলিতেছেন, "আকবর! শীগ্র আইস! আমি তোমার জন্য সুশীতল পবিত্র বারি লইয়া দণ্ডায়মান আছি।" আলী আকবর জলপান করিতে যাইতেছিলেন, পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল; কিন্তু তত দূর পর্যন্ত যাইতে হইল না, জলপিপাসার শান্তি করিতেও হইল না, জন্মের মত জীবন-পিপাসা ফুরাইয়া গেল। আলী আকবর অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। প্রাণবায়ু বর্হিগত–শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব শিবিরাভিমুখে দৌড়িল। অশ্বপৃষ্ট শুন্য দেখিয়া আলী আকবরের ভ্রাতা আলী আসগর ও আবদুল্লাহ ভ্রাতৃশোকে শোকাকুল।–তিলার্দ্ধকালও বিলম্ব না করিয়া, জিজ্ঞাসা কি অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহারা দুই ভ্রাতা দুই অশ্বারোহণে শত্রু সম্মুখীন হইলেন। ক্ষণকাল মহাপরাক্রমে বহু শত্রু বিনাশ করিয়া রণস্থলে বিধর্মীহস্তে শহীদ হইলেন। যুগল অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। অশ্বপৃষ্ঠে পুত্রদ্বয়কে না দেখিয়া হোসেন আঘাতিত সিংহের ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখনও কি আমি বসিয়া থাকিব? এ সময়েও কি শত্রুনিপাতেঅস্ত্রধারণ করিব না? পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র সকলেই শেষ হইল, আমি বসিয়া দেখিতেছি; আমার মত কঠিন প্রাণ জগতে কি আর কাহারও আছে?"
হোসেনের কণিষ্ঠ সন্তান জয়নাল আবেদীন ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবির হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইলেন। হোসেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন; অনেক প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। মুখে শত শত চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইয়া শাহরেবানুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "জয়নাল যদি শত্রু-হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে মাতামহের বংশ জগৎ হইতে একেবারে নির্মূল হইবে, সৈয়দ বংশের নাম আর ইহজগতে থাকিবে না। কেয়ামতের দিন পিতা এবং মাতামহের নিকট কি উত্তর

করিব? তোমারা জয়নালকে সাবধানে রক্ষা কর; সর্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখ। কোন ক্রমেই ইহাকে শিবিরের বাহির হইতে দিও না।"

হোসেন কাহারও জন্য আর দুঃখ করিলেন না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আকাশ পানে তাকাইয়া দুই হস্ত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! তুমি অগতির গতি, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি বিপদের কাণ্ডারী, তুমি অনুগ্রাহক, তুমিসর্বরক্ষক। প্রভু! তোমার মহিমায় অনন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, তৃণ, কীটাণু এবং পরমাণু পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত চরাচর তোমার গুণগান করিতেছে। তুমি মহান, তুমি সর্বব্যাপী, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই সর্বকর্তা, তুমিই সর্বপালক, তুমিই সর্বসংহারক। দয়াময়! জগতে যে দিকেই নেত্রপাত করি, সেই দিকেই তোমার করুণ এবং দয়ার আদর্শ দেখিতে পাই। কি কারণে–কি অপরাধে আমার এ দুর্দশা হইল বুঝিতে পারি না। বিদর্মী এজিদ আমায় সর্বস্বান্ত করিয়া একেবারে নিঃশেষ করিলে, একবারে বংশ নাশ করিল। দয়াময়! তুমি কি ইহার বিচার করিবে না।?"

হোসেন শূন্যপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অমনি চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলে– আর কোন কথাই বলিলেন না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত উপাসনা করিলেন। উপাসনা শেষ করিয়া সমর-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মণিময় হীরক-খচিত স্বর্ণমণ্ডিত বহুমূল্য সুসজ্জায় যে সজ্জা নহে। হোসেন যে সাজ আজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, তাহা পবিত্র ও অমূল্য। যাহা ঈশ্বর-প্রসাদাৎ হস্তগত না হইলে জগতের সমুদয় ধনেও হস্তগত হইবার উপায় নাই, জীবনান্ত পর্যন্ত চেষ্টা ও যত্ন করিলেও যে সকল অমূল্য পবিত্র পরিচ্ছদ লাভের কাহারও ক্ষমতা নাই, হোসেন আজ সেই সকল বন-ভূষণ পরিধান করিলেন। প্রভু মোহাম্মদের শিরস্ত্রাণ, হযরত আলীর কবচ, হযরত দাউদ পয়গম্বরের কোমরবন্ধ, মহাত্মা সোয়েব পয়গম্বরের মোজা, এই সকল পবিত্র পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া যুদ্ধের আর আর উপরণে সজ্জিত হইলেন।

রণবেশেসুসজ্জিত হইয়া ইমাম হোসেন শিবিরের বাহিরে দাঁড়াইলে স্ত্রী-কণ্যা, পরিজন সকলেই নির্বাকে কাঁদিয়া তাঁহার পদলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। উচ্চরবে কাঁদিবার কাহারও শক্তি নাই। কত কাঁদিতেছেন, কত কাঁদিতেছেন, কত দুঃখ করিতেছেন, এক্ষণে প্রায় সকলেই কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইমাম হোসেন সকলকেই সবিনয় মিষ্টবাক্যে একটু আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পরিজনেরা ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। হোসেন বলিলেন, "মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফায় আগমন সঙ্কল্প তোমাদের অজানা কিছুই নাই। তোমরা আমার শরীরের এক এক অংশ। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ এতক্ষণ যে কেন আছে, তাহা আমি জানি না।"

সকলেই সেই এক প্রকার অব্যক্ত হু হু করে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইমাম পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা আমার দ্বারা সাধিত হইবে, মাতামহের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে আমি বাধ্য। সেই কার্য সাধনে আমি সন্তোষের সহিত সম্মত। মানুষ জন্মিলেই মরণ আছে, তবে সেই দয়াময় কি অবস্থায় কখন কাহাকে কালের করাল গ্রাসে প্রেরণ করেন, তাহা তিনি জানেন। ইহাও সত্য যে, এজিদের আদেশ-ক্রমে তাহার সৈন্যগণ আমাদের পিপাসাশান্তির আশাপথ একেবারে বন্ধ করিয়াছে। জীবন বিহনে জীবনশক্তি

কয়দিন জীবনে থাকে? জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন। এই অবস্থাতে শিবিরে বসিয়া কাঁদিলে আর কি হইবে?–পুত্রগণ, মিত্রগণ এবং অন্যান্য হৃদয়ের বন্ধুগণ যাঁহারা আজ প্রভাত হইতে এই সময়ের মধ্যে বিধর্মীহস্তে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য নীরবে বসিয়া কাঁদিলে আর কি হইবে? আজ না হয় কাল এই পিপাসাতেই মরিতে হইবে।"

আবার সকলে নীরবে হু হু শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। ইমাম আবার বলিতে লাগিলেন, "যদি নিশ্চয়ই মরিতে হইল, তবে বীরপুরুষের ন্যায় মরিব। আমি হযরত আলীর পুত্র, মহাবীর হাসানের ভ্রাতা; আমি কি স্ত্রীলোকের সঙ্গী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মরিব? তাহা কখনই হইবে না। পুত্রমিত্রগণের অকালমৃত্যুজনিত শোকের যাতনা শত্রুবিনাশে নিবারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আজ কারবালা প্রান্তরে মহানদী–মহানদীকেন–ঐ শোকে মহাসমুদ্রস্রোত মহা রক্তস্রোত বহাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। জগৎ দেখিবে, বৃক্ষপত্র দেখিবে, আকাশ দেখিবে, আকাশের চন্দ্র সূর্য দেখিবে, হোসেনের ধৈর্য, শান্তি ও বীরপ্রতাপ কত দূর! আজ এই সূর্যকেই আদি মধ্য শেষ–তাহার পরেও যদি কিছু থাকে, তাহাও দেখাইব! তোমরা আমার জন্য কেহ কাঁদিও না। যদি এই যাত্রাই এ জীবনের শেষ যাত্রা হয়, বারবার বলিতেছি, আর যুদ্ধ করিও না; আর কোন প্রাণীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইও না, জয়নালকে মুহূর্তের জন্য হাতছাড়া করিও না। আমি তোমাদিগকে সেই দয়াময় বিপত্তারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলাম,– তিনি রক্ষা করিবেন। আমিও প্রার্থনা করিতেছি, তোমরাও কায়মনে সেই জগৎপিতার সমীপে প্রার্থনা কর, শত্রু বিনাশ করিয়াও তোমাদিগকে যেন উদ্ধার করিতে পারি।"

পৌরজনমাত্রেই দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে করুণাময়! হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশর! আমাদিগকে আজ এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার কর। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! আমাদিগকে দুরন্ত এজিদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর।"

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "যদি তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা হয়, তবে তোমরা কেহই আমার জন্য দুঃখ করিও না–ঈশ্বরের নিন্দা করিও না। আমার মরণই তোমাদের মঙ্গল। আমি মরিলে অবশ্যই তোমরা সুখী হইবে, আমি তোমাদের কষ্টের এবং দুঃখের কারণ ছিলাম।"

পরিজনকে এই পর্যন্ত বলিয়া জয়নালকে ক্রোড়ে লইয়া হোসেন বলিতে লাগিলেন, "আমি বিদায় হইলাম, আমার জন্য কাঁদিও না। কেয়ামতে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হইবে। তুমি তোমার মায়ের নিকট থাকিও; কখনই শিবিরে বাহির হইও না, এজিদ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।"

জয়নালের মুখচুম্বন পূর্বক শাহরেবানুর ক্রোড়ে দিয়া সখিনাকে সম্বোধন পূর্বক হোসেন বলিলেন, "মা, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। কাসেমের সংবাদ আনিতে যাই। আর দুঃখ করিও না, ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। আর একটি বীরপুরুষ হানুফা নগরে এখনও বর্তমান আছেন?। যদি কোন প্রকারে এই লোমহর্ষক সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়, প্রাণান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তোমাদের কষ্টের প্রতিশোধ লইতে কখনই পরাঙ্মুক হইবেন না;–কখনই এজিদকে ছাড়িবেন না; হয় তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, নয় এজিদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন।"

সখিনাকে এইরূপে প্রবোধ প্রদানপূর্বক অবশেষে শাহরেবানুর হস্ত ধরিয়া রণবেশী রণযাত্রী পুনরায় বলিলেন, "বোধ হয়, আমার সঙ্গে এই তোমার শেষ দেখা। শাহরেবানু! মায়াময় সংসারের দশাই এরূপ, তবে অগ্রপশ্চাৎ–এইমাত্র প্রভেদ;–ঈশ্বরের নির্ভর করিয়া জয়নালকে সাবধানে রাখিও। আমার আর কোন কথা নাই–চলিলাম।"
শিবিরের বাহিরে আসিয়া ইমাম হোসেন অশ্বে আরোহণ করিলেন। ওদিকে শিবিরের মধ্যে পরিজনেরা এক প্রকার বিকৃত স্বরে হায় হায় রবে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ প্রবাহ

ইমাম হোসেনের অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া এজিদের সৈন্যগণ চমকিত হইল। সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সকলেই দেখিতে লাগিল, হোসেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলকে মহাবীর হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ওরে বিধর্মী পাপাত্মা এজিদ! তুই কোথায়? তুই নিজে দামেস্কে থাকিয়া নিরীহ সৈন্যদিগকে কেন রণস্থলে পাঠাইয়াছিস? আজ তোকে পাইলে জ্ঞাতি-বধ-বেদনা, ভ্রাতৃপুত্র কাসেমের বিচ্ছেদবেদনা এবং স্বকীয় পুত্রগণের বিয়োগ-বেদনা সমস্তই তোর পাপশোণিতে শীতল করিতাম–তোর প্রতি লোমকূপ হইতে হলাহল বাহির করিয়া লোমে লোমে প্রতিশোধ লইতাম। জানিলাম, কাফেরমাত্রেই চতুর। রে নৃশংস! অর্থলোভী পিশাচেরা, ধর্মভয় বিসর্জন দিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিস; আয় দেখ, কে সাহস করিয়া আমার অস্ত্রের সম্মুখে আসিবি, আয়! আর বিলম্ব কেন? যাহার পক্ষে ইহজগত ভার বোধ হইয়া থাকে, যে হতভাগ্য আপন মাতাকে অকালে পুত্রশোকে কাঁদাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, যৌবনে কুলস্ত্রীর বৈধব্য কামনা যাহার অন্তরে উদয় হইয়া থাকে, শীঘ্র আয়! আর আমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।"
এজিদ-পক্ষীয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আব্দুর রহমান; হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার চিরসাধ। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই আব্দুর রহমান অসি চালনা করিতে করিতে হোসেনের সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "হোসেন! তুমি আজ শোকে তাপে মহাকাতর; বোধ হয়, আজ দশ দিন তোমার পেটে অন্ন নাই, পিপাসায় কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, এই কয়েক দিন কেন বাঁচিয়া আছ বলিতে পারি না। আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না, শীঘ্রই তোমার মনের দুঃখ নিবারণ করিতেছি। বড় দর্পে অশ্বচালনা করিয়া বেড়াইতেছ; এই আব্দুর রহমান তোমার সম্মুখে দাঁড়াইল; যত বল থাকে, অগ্রে তুমিই আমাকে আঘাত কর। লোকে বলিবে যে, ক্ষুৎপিপাসাকুল, শোকতাপবিদগ্ধ পরিজনদুঃখকাতর উৎসাহহীন বীরের সহিত কে না যুদ্ধ করিতে পারে? এ দুর্নাম আমি সহ্য করিব না–তুমিই অগ্রে আঘাত কর। তোমার বল বুঝিয়া দেখি; যদি আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিবার উপযুক্ত হও, আমি প্রতিঘাত করিব; নতুবা ফিরিয়া যাইয়া তোমার ন্যায় হীন, ক্ষীণ, দুর্বল, যোদ্ধাকে খুঁজিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিব।"
হোসেন বলিলেন, "এত কথার প্রয়োজন নাই। আমার বংশমধ্যে কিংবা জ্ঞাতিমধ্যে অগ্রে অস্ত্র নিক্ষেপের রীতি থাকিলে তুমি এত কথা কহিবার সময় পাইতে না।

হারামজাদা! বেঈমান! কাফের! শীঘ্র যে কোন অস্ত্র হয়, আমার প্রতি নিক্ষেপ কর। সমরক্ষেত্রে আসিয়া বাকবিতণ্ডায় দরকার কি? অস্ত্রই বল-পরীক্ষার প্রধান উপকরণ। কেন বিলম্ব করিতেছিস? যে কোন অস্ত্র হউক, একবার নিক্ষেপ করিলেই তোর যুদ্ধ সাধ মিটাইতেছি। বিলম্বে তোর মঙ্গল বটে, কিন্তু আমার অসহ্য।"

হোসেনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্বক "তোমার মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা" এই বলিয়াই আব্দুর রহমান ভীম তরবারি আঘাত করিলেন। হোসেনের বর্মোপরী আব্দুর রহমান তরবারি সংলগ্ন হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্হিগত হইল। রহমান লজ্জিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন। হোসেন বলিলেন, "অগ্রে সহ্য কর, শেষে পলায়ন করিস।" এই বলিয়াই এক আঘাতে অশ্ব-সহিত রহমানের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া এজিদের সৈন্যগণ মহাভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। কেহই আর হোসেনের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। বলিতে লাগিল, "যদি হোসেন আজ এ সময় পিপাসা-নিবারণ করিতে বিন্দুমাত্র জল পায়, তাহা হইলে আমাদের একটি প্রাণীও ইহার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। যুদ্ধ যতই হোক, বিশেষ সতর্ক হইয়া দ্বিগুণ সৈন্য দ্বারা ফোরাতকূল এখন ঘিরিয়া রাখাই কর্তব্য। যে মহাবীর এক আঘাতে মহাবীর আব্দুর রহমানকে নিপাত করিল, তাঁহার সম্মুখে কে সাহস করিয়া দাঁড়াইবে? আমরা রহমানের গৌরবেই চিরকাল গৌরব করিয়া বেড়াই, তাহারই পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া সকলেই একমতে দ্বিগুণ সৈন্য দ্বারা বিশেষ সুদৃঢ়রূপে ফোরাতকূল বন্ধ করিল।

হোসেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমরপ্রাঙ্গণে কাহাকেও না পাইয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে অস্ত্রাচালনা করিলেন। তদ্দর্শনে অনেকেরই প্রাণ উড়িয়া গেল। কেহ অশ্ব-পদাঘাতে নরকে গমন করিল, কেহ কেহ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া হোসেনের সম্মুখে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল, মস্তকগুলো দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল।

মহাবীর হোসেন বিধর্মীদিগকে যেখানে পাইলেন, যে অস্ত্রে সে সুযোগ যাহাকে মারিতে পারিলেন, সেই অস্ত্রের দ্বারাই তাহাকে মারিয়া নরক পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। শিবিরস্থ অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে যাহারা যে দিকে সুবিধা উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িয়া প্রান রক্ষা করিল। যাহারা তাঁহার সম্মুখে দৌড়িয়া আসিল, তাহারা কেহই প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না। সকলেই হোসেনের অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পাপময় দেহ পাপরক্তে ভাসাইয়া নরকগামী হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ কারবালাপার্শ্বস্থ বিজন বনমধ্যে পালাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। ওমর, সীমার, আবদুল্লাহ্ জেয়াদ প্রভৃতি সকলেই হোসেনের ভয়ে লুকাইলেন।

শত্রুপক্ষের শিবিরস্থ সৈন্য একেবারে নিঃশেষিত করিয়া হোসেন ফোরাতকুলের দিকে অস্ত্র চালাইলেন। ফোরাত-রক্ষীরা হঠাৎ পালাইল না, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ হোসেনের অসির আঘাত সহ্য করিয়া আর তিষ্ঠিবার সাধ্য হইল না। কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ জঙ্গলে লুকাইল, কেহ কেহ অন্য দিকে পালাইল, কিন্তু বহুতর সৈন্যই হোসেনের অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত ফোরাত স্রোতে ভাসিয়া চলিল। কোন স্থানে শত্রুসৈন্যের নাম মাত্রও নাই, রক্তস্রোত–মধ্যে শরীরের কোন কোন ভাগ লক্ষিত

হইতেছে মাত্র। যে এজিদের সৈন্যকোলাহলে প্রচণ্ড কারবালা প্রান্তর, সুপ্রশস্ত ফোরাতকূল ঘন ঘন বিকম্পিত হইত, এক্ষণে হোসেনের অস্ত্রাঘাতে সেই কারবালা একেবারে জলশূন্য নীরব প্রান্তর; হোসেন ব্যতীত প্রাণিশূন্য ফোরাত-তীর প্রকৃতি দেবীর বক্ষক্ষেত্রস্থ স্বাভাবিক শোভা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নিম্নভূমিতে রক্তস্রোত কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। রক্তমাখা খণ্ডিত দেহ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হোসেন জল-পিপাসায় এমনই কাতর হইয়াছেন যে, আর কথা কহিবার শক্তি নাই। এতক্ষণ কেবল শত্রু-বিনাশের উৎসাহে উৎসাহিত ছিলেন, বিধর্মীর রক্তস্রোত বহাইয়া পিপাসার অনেক শান্তি হইয়াছিল, এখন শত্রু শেষ হইল, পিপাসাও অসহ্য হইয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্র ফোরাতকূলে যাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক একেবারে জলে নামিলেন। জলের পরিষ্কার স্নিগ্ধভাব দেখিয়া ইচ্ছা করিলেন যে, এক কালে নদীর সমুদয় জল পান করিয়া ফেলেন। অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া মুখে দিবেন, এমন সময় সমুদয় কথা মনে পড়িল। আত্মীয় বন্ধুর কথা মনে পড়িল, কাসেমের কথা মনে পড়িল, আলী আকবর প্রভৃতির কথা মনে পড়িল, পিপাসার্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা মনে পড়িল, এক বিন্দু জলের জন্য ইহারা কত লালায়িত হইয়াছে, কত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে, কত কষ্টভোগ করিয়াছে, "এই জলের নিমিত্তই আমার পরিজনেরা পুত্রহারা, ভ্রাতৃহারা হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মরিতেছে, আমি এখন শত্রুহস্ত হইতে ফোরাতকুল উদ্ধার করিয়া সর্বাগ্রেই নিজে সেই জল পান করিব। নিজের প্রাণ পরিতৃপ্ত করিব–আমার প্রাণের জন্য আলী আকবর আমার জিহবা পর্যন্ত চুষিয়াছে! একপাত্র জল পাইলে আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, মহাবীর কাসেম আজ শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিত না! এখনও যাহারা জীবিত আছে, তাহারা তো শোকতাপে কাতর হইয়া পিপাসায় মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে।–এ জল আমি কখনই পান করিব না,– ইহজীবনেও আর পান করিব না।" এই কথা বলিয়া হস্তস্থিত জল নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া তীরে উঠিলেন। কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। একবার আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র শিরস্ত্রাণ শির হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই কোমর হইতে কোমরবন্ধ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। সেই পবিত্র মোজা আর পায় রাখিলেন না। ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক, সকল শোক একত্র আসিয়া তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। কি মনে হইল, তাহাতেই বোধ হয়, পরিহিত পায়জামা মাত্র অঙ্গে রাখিয়া আর সমুদয় বসন খুলিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফোরাত স্রোতের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। হোসেনের অশ্বপ্রভুর হস্তপদ ও মস্তক শূন্য দেখিয়াই যেন মহাকষ্টে চক্ষু হইতে অনবরত বাষ্পজল নির্গত করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ জেয়াদ, ওমর, সীমার আর কয়েকজন সৈনিক, যাহারা জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, তাহারা দূর হইতে দেখিল যে, ইমাম হোসেন জলে নামিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া পুনরায় ফেলিয়া দিলেন, পান করিলেন না। তদন্তর তীরে উঠিয়া সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, অবশেষে অঙ্গের বসন পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্য শিরে শূন্যশরীরে অশ্বের নিকট দণ্ডায়মান আছেন, এতদর্শনে ঐ কয়েকজন একত্রে ধনুর্বাণ হস্তে হোসেনকে ঘিরিয়া ফেলিল। হোসেন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, কাহাকেও কিছুই বলিতেছেন না। স্থিরভাবে স্থিরনেত্রে ধনুর্দ্ধারী শত্রুদিগকে দেখিতেছেন, মুখে কোন কথা নাই। এমন

নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মনে কোন প্রকার শঙ্কাও নাই। অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছেন, তাহা ঈশ্বর জানেন, আর তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ফোরাতকূল হইতে অরণ্যাভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুগণ চতুস্পার্শ্বে দূরে দূরে তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে জেয়াদ পশ্চাদদিক হইতে তাঁহার পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া এক বিষাক্ত লৌহশর নিক্ষেপ করিল। ভাবিয়াছিল যে, এক শরে পৃষ্ট বিদ্ধ করিয়া বক্ষঃস্থ ভেদ করিবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে শর হোসেনের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, গাত্রে লাগিল না। শব্দ হইল, সে শব্দেও হোসেনের ধ্যানভঙ্গ হইল না। তাহার পর ক্রমাগতই শর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু একটিও ইমামের অঙ্গে বিদ্ধ হইল না। সীমার শরসন্ধানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়াই খঞ্জর হস্তে করিয়া যাইতেছিলেন। এত তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একটিও হোসেনের অঙ্গে লাগিতেছে না। কি আশ্চর্য! সীমার এই ভাবিয়া জেয়াদের হস্ত হইতে তীরধনু গ্রহণ পূর্বক হোসেনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। তীর পৃষ্টে লাগিয়া গ্রীবাদেহের এক পার্শ্বে ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সে দিকে হোসেনের ভ্রুক্ষেপ নাই। এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আছেন যে, শরীরের বেদনা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। যাইতে যাইতে অন্যমনস্কে একবার গ্রীবাদেশের বিদ্ধস্থান হস্ত দিয়া ঘর্ষণ করিলেন। জলের ন্যায় বোধ হইল,–করতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জল নহে, গ্রীবানিঃসৃত সদ্যোরক্ত! রক্তদর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মানসে ভয়ের সঞ্চার হইল। সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আবদুল্লাহ জেয়াদ, অলীদ, ওমর, সীমার এবং আর কয়েজন সেনা চতুর্দিকে ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হস্তেই তীরধনু। ইহা দেখিয়াই চমকিত।–যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে নির্ভয়হৃদয়ে ছিলেন–তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন; তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম, বর্ম, খঞ্জর কিছুই সঙ্গে নই, কেবল দুইখানি হাত মাত্র। অন্যমনস্কভাবে দুই এক পদ করিয়া চলিলেন; শত্রুরাও পূর্ববৎ ঘিরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিছু দূরে যাইয়া হোসেন আকাশ পানে দুই তিন বার চাহিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বিষাক্ত তীরবিদ্ধ ক্ষতস্থানের জ্বালা, পিপাসার জ্বালা, শোকতাপ, বিয়োগদুঃখ,–নানা প্রকার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন, জেয়াদ ও ওমর প্রভৃতি ভাবিল যে, হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে হস্তপদ সঞ্চালনের ক্রিয়া দেখিয়া হোসেনের নিশ্চয় মৃত্যু মনে করিল না; মৃত্যু নিকটবর্তী জ্ঞান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। হোসেন ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। সীমারের সামান্য শরাঘাতে তাদৃশ মহাবীরের প্রাণবিয়োগ হইবে, অসম্ভব ভাবিয়া কেহই হোসেনের নিকট যাইতে সাহসী হইল না। কেহ কেহ নিশ্চয় মৃত্যু অনুমান করিতেছে; মুখেও বলিতেছে যে, "হোসেন আর নাই! চল, হোসেনের মস্তক কাটিয়া আনি।" দুই এক পদ যাইয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ এজিদের নিকট লইয়া গেলে কোন লাভ নাই। এজিদ সে সংবাদ বিশ্বাস করিয়া কখনই পুরস্কার দান করিবে না। মস্তক চাই। ভাবিয়া ভাবিয়া সীমার বলিল, "জেয়াদ! তুমি তো খুব সাহসী; তুমিই মৃত হোসেনের মাথা কাটিয়া আন।"

জেয়াদ বলিল, "হোসেনের মাথা কাটিতে আমার হস্ত স্থির থাকিবে না, সাহসও হইবে না। আমি উহা পারিব না। যদি দুর্বলতা বশতঃ হোসেন ধরাশায়ী হইয়া থাকে, কিংবা

অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া মরার ন্যায় মাটিতে পড়িয়া থাকে, আমাকে হাতে পাইলে বল তো আমার কি দশা ঘটিবে? যাহার ভয়ে জঙ্গলে পালাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া তাহার হাতে পড়িব? আমি তো কখনই যাইব না! মাথা কাটিয়া আনা তো শেষের কথা, নিকটেও যাইতে পারিব না।"

অলীদকে সম্বোধন করিয়া সীমার বলিল, "ভাই অলীদ! তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি হোসেনের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে না কি?"

অলীদ উত্তর করিল, "আমি হোসেনের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এজিদের বেতনভোগী হইয়া আজ কারবালা প্রান্তরে যাহা আমি করিলাম, জগৎ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত মানবহৃদয়ে সমভাবে, তাহা পাষানাঙ্কবৎ খোদিত থাকিবে। ইহার পরিণাম-ফল কি আছে, তাহা,-ভবিতব্য কি আছে, তাহা কে জানে ভাই?-ভাই! তোমরা আমায় মার্জনা কর, আমি পারিব না।- হোসেনের মাথাও আমি কাটিতে চাহি না, লক্ষ টাকা পুরস্কারেরও আশা করি না। যাহার হৃদয়ে রক্তমাংশের লেশমাত্র নাই, লক্ষ টাকার লোভে সেই এই নিষ্ঠুর কার্য করুক।"

সদর্পে সীমার বলিয়া উঠিল, "দেখিলাম তোমাদের বীরত্ব- দেখিলাম তোমাদের সাহস-বুঝিলাম তোমাদের ক্ষমতা!-এই দেখ, আমি এখনই হোসেনের মাথা কাটিয়া আনি।"-এই কথা বলিয়াই সীমার খঞ্জর-হস্তে এক লম্ফে হোসেনের বক্ষের উপর গিয়া বসিল।

যে সীমারের নামে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে সীমারের নাম হৃদয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক! এই সেই সীমার! সু-ধার খঞ্জর-হস্তে সেই সীমার ঐ হোসেনের বক্ষের উপর বসিয়া গলা কাটিতে উদ্যত হইল!

হোসেন জীবিত আছেন। উঠিবার শক্তি নাই। অন্যমনস্কে কি চিন্তায় অভিভূত ছিলেন, তিনিই জানেন। চক্ষু মেলিয়া বক্ষের উপর খঞ্জর-হস্তে সীমারকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব- তুমি আমার বক্ষের উপর বসিলে। নূরনবী মোহাম্মদের মতাবলম্বী হইয়া ইমাম হোসেনের বক্ষের উপর পা রাখিয়া বসিলে! তোমার কি পরকাল বলিয়া কিছুই মনে নাই? এমন গুরুতর পাপের জন্য তুমি কি একটুও ভয় করিতেছ না।"

সীমার বলিল, "আমি কাহাকেও ভয় করি না- আমি পরকাল মানি না। নূরনবী মোহাম্মদ কে? আমি তাহাকে চিনি না। তোমার বুকের উপর বসিয়াছি বলিয়া পাপের ভয় দেখাইতেছ, সে ভয় আমার নাই। কারণ, আমি এখনই খঞ্জরে তোমার মাথা কাটিয়া লইব। যাহার মাথা কাটিয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইব, তাহার বুকের উপর বসিতে আবার পাপ কি? সীমার পাপের ভয় করে না।"

"সীমার! আমি এখনই মরিব। বিষাক্ত তীরের আঘাতে আমি অস্থির হইয়াছি। বক্ষের উপর হইতে নামিয়া আমায় নিশ্বাস ফেলিতে দাও। একটু বিলম্ব কর। একটু বিলম্বের জন্য কেন আমাকে কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে মাথা কাটিয়া লইও। দেহ যত খণ্ড করিতে ইচ্ছা হয়, করিও। একবার নিশ্বাস ফেলিতে দাও। আজ নিশ্চয় আমার মৃত্যু। এই কারবালা-প্রান্তরে হোসেনের জীবনের শেষ কার্য সমাপ্ত। জীবনের শেষ এই কারবালায়। ভাই সীমার! তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথা কাটিয়া লইতে পারিবে।

আমি আশীর্বাদ করিতেছি, এই কার্য করিয়া তুমি জগতে বিখ্যাত হইবে। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।"

অতি কর্কশস্বরে "আমি তোমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছি, মাথা না কাটিয়া উঠিব না। যদি অন্য কোন কথা থাকে, বল। বুকের উপর হইতে একটু সরিয়া বসিব না।"– এই বলিয়া সীমার আরও দৃঢ়রূপে চাপিয়া বসিয়া হোসেনের গলায় খঞ্জর চালাইতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "সীমার, আমার প্রাণ এখনই বাহির হইবে; একটু বিলম্ব কর।– এই কষ্টের উপর আর কষ্ট দিয়া আমাকে মারিও না।"

সীমার তীক্ষ্নধার খঞ্জর হোসেনের গলায় সজোরে চালাইতে লাগিল, কিন্তু চুল পরিমাণ স্থানও কাটিতে পারিল না। বারবার খঞ্জরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হস্ত দ্বারা বারংবার খঞ্জরের ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পুনরায় অধিক জোরে খঞ্জর চালাইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। তিলমাত্র চর্মও কাটিল না। সীমার প্রস্তুত হইল। আবার খঞ্জরের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আবার ভাল করিয়া খঞ্জরের ধার পরীক্ষা করিল।

হোসেন বলিলেন, "সীমার! কেন বার বার এ সময় আমাকে কষ্ট দিতেছ? শীঘ্র মাথা কাটিয়া ফেল। আর সহ্য হয় না। অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া তোমার কি লাভ হইতেছে? বন্ধুর কার্য কর।–শীঘ্রই আমার মাথা কাটিয়া ফেল।"

"আমি তো কাটিতেই বসিয়াছি। সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতেছি। খঞ্জরে না কাটিলে আমি আর কি করিব? এমন সুতীক্ষ্ন খঞ্জর তোমার গলায় বসিতেছে না, আমার অপরাধ কি– আমি কি করিব?"

হোসেন বলিলেন, "সীমার! তোমার বক্ষের বসন খোল দেখি?"

"কেন?"

"কারণ আছে; তোমার বক্ষ দেখিলেই জানিতে পারিব যে, তুমি আমার 'কাতেল' (হন্তা) কিনা?"

"তাহার অর্থ কি?"

"অর্থ আছে। অর্থ না থাকিলে বৃথা তোমাকে এমন অনুরোধ করিব কি জন্য?– তোমারা সকলেই জান,–অন্ততঃ শুনিয়া থাকিবে, হোসেন কখনও বৃথা বাক্য ব্যয় করে না।– মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, রক্ত-মাংসে ঘটিত হইলেও যে বক্ষ লোমশূন্য, সে বক্ষ পাষাণময়, সেই লোমশূন্য বক্ষই তোমার কাতেল; যাহার বক্ষ লোমশূন্য তাহার হস্তেই তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু; মাতামহের বাক্য অলংঘনীয়। সীমার, তোমার বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া ফেল।– আমি দেখি, যদি তাহা না হয়, তবে তুমি বৃথা চেষ্টা করিবে কেন? তোমার জীবনকাল পর্যন্ত আমাকে এ প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া,– সহস্র চেষ্টা করিলেও দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিব না।"

সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল। নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষ আবরণ করিলেন। সীমার সজোরে হোসেনের গলায় খঞ্জর দাবাইয়া ধরিল! এবারেও কাটিল না! বারবার খঞ্জর ঘর্ষণে হোসেন বড়ই কাতর হইলেন। পুনরায় সীমারকে বলিতে লাগিলেন, "সীমার!

আর একটি কথা আমার মনে হইয়াছে বুঝি তাহাতেই খঞ্জরের ধার ফিরিয়া গিয়াছে, তোমারও পরিশ্রম বৃথা হইতেছে, আমিও যারপরনাই কষ্টভোগ করিতেছি। সীমার মাতামহ জীবিতাবস্থায় অনেক অনেক সময় স্নেহ করিয়া আমার গলদেশ চুম্বন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন মহাত্ম্যেই তীক্ষ্ণধার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমার মস্তক কাটিতে আমি তোমাকে বারণ করিতেছি না; আমার প্রার্থনা এই যে, আমার কণ্ঠের পশ্চাদভাগে, যেখানের তীরের আঘাতে শোনিত প্রবাহিত হইতেছে, সেইখানে খঞ্জর বসাও, অবশ্যই দেহ হইতে মস্ত বিচ্ছিন্ন হইবে।"

"না, তাহা কখনই হইবে না। আমি অবশ্যই এই প্রকারে তোমার মাথা কাটিব।"

"সীমার! আমাকে এ প্রকার কষ্ট দিয়া তোমার কি লাভ? এরূপে কিছুতেই কার্যসিদ্ধি হইবে না। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার গলার সম্মুখ দিকে আর খঞ্জর চালাইও না। তোমার যত্ন নিস্ফল হইবে, আমিও কষ্ট পাইব, অথচ মাথা কাটিতে পরিবে না। দেখ, নিশ্বাস ফেলিতে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! শীঘ্র শীঘ্র তোমার কার্য শেষ করিলে তোমারও লাভ আমারও কষ্ট নিবারণ। এ জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। তুমি ঐ তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর বসাও, এখনই ফল দেখিতে পাইবে। আমাকে এ প্রকার কষ্ট দিলে এজিদের অঙ্গীকৃত লক্ষ টাকা অপেক্ষা তোমার আর অধিক কি লাভ হইবে?"

তোমার কথা শুনিলে আমার কি লাভ হইবে? "অনেক লাভ হইবে। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া এই অনুগ্রহ কর যে, আমার গলার এদিকে আর খঞ্জর চালাইও না; তীরবিদ্ধ স্থানে অস্ত্র বসাইয়া আমার মস্তক কাটিয়া লও।– আমি ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরকালে তোমাকে আমি অবশ্যই মুক্ত করাইব!– বিনা বিচারে তোমাকে স্বর্গসুখে সুখী করাইব। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নাম করিয়া আমি ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে আমি কখনই স্বর্গের দ্বারে পদনিক্ষেপ করিব না! ইহা অপেক্ষা তুমি আর কি লাভ চাও ভাই?"

হোসেনের বক্ষ পরিবর্তন করিয়া সীমার তাঁহার পৃষ্ঠোপরি বসিল। ইমামের দুইখানি হস্ত দুই দিকে পড়িয়া গেল,– দেখাইতে লাগিল, "জগৎ দেখুক, আমি কি অবস্থায় চলিলাম!– নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র,–মদিনার রাজা,–মহাবীর আলীর পুত্র হইয়া শূন্যহস্তে সীমারের অস্ত্রাঘাতে কিভাবে আমি ইহসংসার হইতে বিদায় হইলাম! জগৎ দেখুক।"

সীমার যেমন তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর স্পর্শ করাইল, অমনি হোসেনের শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। আকাশ, পাতাল, অন্তরিক্ষ, অরণ্য, সাগর, পর্বত, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দিক হইতে রব হইতে লাগিল "হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!

সীমার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হোসেনের শির লইয়া প্রস্থান করিল। রক্তমাখা খঞ্জর ইমামের দেহের নিকট পড়িয়া রহিল।

উদ্ধার পর্ব

অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চীৎকার করিতে করিতে সীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল! আবদুল্লাহ জেয়াদ অলীদ প্রভৃতি অশ্বলক্ষ্যে অবিশ্রান্ত শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ তীর অশ্ব-শরীর ভেদ করিয়া পার হইল না, কিন্তু শোণিতের ধারা ছুটিল। কে বলে পশু-হৃদয়ে বেদনা নাই? কে বলে মানুষের জন্য পশুর প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয় না? মানুষের ন্যায় পশুর প্রাণ ফাটিয়া যায় না?– বাহির হয় না? অশ্ব ফিরিল। কিছু দূর যাইয়া শরসংযুক্ত শরীরে হোসেনের দুলদুল* সীমারের পশ্চাদ গমন হইতে ফিরিল। তীর চলিতেছে। এখন অশ্বের বক্ষে, গ্রীবাদেশে তীক্ষ্ণতর তীর ক্রমাগত বিধিতেছে; কিন্তু অশ্বের গতি মুহূর্তের জন্য থামিতেছে না। মহাবেগে প্রভু হোসেনের শিরশূন্য দেহ সন্নিধানে আসিয়া পদ হইতে স্বন্ধ, স্কন্ধ হইতে পদ পর্যন্ত নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া আবার মস্তকলক্ষ্যে ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণ নানা কৌশলে অশ্বকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্বশ্রেষ্ঠ দুলদুল সকলই দেখিতেছে, বোধ হয়, অনেক বুঝিতে পারিতেছে; ধরা পড়িলে তাহার পরিণাম দশা যে কি হইবে, তাহাও বোধ হয় ভাবিতেছে; প্রভু হোসেন যে পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, সেই পৃষ্ঠে প্রভুহন্তা কাফেরগণকে লইয়া আজীবন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে, এ কথা কি সেই প্রভুভক্ত বাকশক্তিবিহীন পশু-অন্তরে উদয় হইয়াছিল? সীমারের দিকে আর ছুটিল না। হোসেনের মৃত শরীরের নিকটও আর রহিল না। বাধা, কৌশল অতিক্রম করিয়া মহাবেগে হোসেনের শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সকলেই দেখিল, দুলদুলের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ।

আবদুল্লাহ জেয়াদ, মারওয়ান, ওমর এবং আর যোদ্ধাগণ অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হোসেন-শিবিরাভিমুখে বেগে ছুটিলেন। শিবির মধ্যে বীর বলতে আর কেহ নাই। একমাত্র জয়নাল আবেদীন। হোসেনের উপদেশক্রমে পরিজনেরা জয়নালকে বিশেষ সাবধানে গোপনভাবে রাখিয়াছেন। হাসনেবানু কাসেম-দেহ বক্ষে ধারণা করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জ্বলন্ত হুতাশনে শোণিতের আহূতি দিতেছেন। সখিনা মৃত পতির পদপ্রান্তে ধূলায় লুটাইয়া অচেতনভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। যিনি যেখানে যেভাবে ছিলেন, তিনি সেইখানে সেই ভাবেই আছেন। কাহারও মুখে কোন কথাই নাই। নীরব, চতুর্দিক নীরব। কিন্তু আকাশ পাতাল বায়ু ভেদ করিয়া যে একটি রব হইতেছে, বোধ হয়, শোকতাপ-পিপাসায় কাতরতাপ্রযুক্ত এতক্ষণ কেহই সে রব শুনিতে পান নাই। শাহরেবানু মন, চক্ষু, কর্ণ, চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিণ্ন দিকে। হঠাৎ শুনিলেন– অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আবার শুনিলেন–স্পষ্ট শুনিলেন। বন, উপবন, গগন, বায়ু, পর্বত, প্রান্তর ভেদ করিয়া রব হইতেছে, "হায় হোসেন! হায় হোসেন!!!"

শাহরেবানুর মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! কি হইল? কি ঘটিল? কি বলিতেছে? চতুর্দিকে হইতে কেন রব হইতেছে? ও রব কেন হইতেছে? 'নাম উচ্চারণে কেন হায় হায় করিতেছে? হায় হায়! কি নিদারুণ কথা! হায় রে! আবার সেই রব! আবার সেই অন্তরভেদী হায়–হায় রব!

"এ কি কথা! যে সকল পবিত্র বসন, পবিত্র অস্ত্র, পবিত্রভাবে ভক্তি সহকারে অঙ্গেধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? ঐ যে অশ্বপদ শব্দ! কে শিবিরাভিমুখে আসিতেছে? কাহার অশ্ব? হায় রে! কাহার অশ্ব? শাহরেবানু শিবিরদ্বারদেশে যাইতেই রক্তমাখা শরীরে হোসেনের অশ্ব শিবিরে প্রবেশ করিল। ভগ্নি! কপাল পুড়িয়াছে–আমাদের কপাল পুড়িয়াছে! দেখ, অশ্ব দেখ, দুলদুলের তীর-সংযুক্ত শরীর দেখ, রক্তের প্রবাহ দেখ।" বলিতে বলিতে শাহরেবানু অচেতনভাবে অতলে পড়িয়া গেলেন। আর পরিজনেরা শূন্যপৃষ্ঠ দুলদুল–সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত, আঘাতের জরজর এবং শোণিতের ধারা দেখিয়া, মর্মভেদী আর্তনাদ–কেহ বা হতচেতন অবস্থায় বিকট চীৎকার করিয়া অচেতনভাবে ধরাশায়ী হইলেন, দুলদুল কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হোসেনের প্রিয়তম অশ্বপ্রাণ বায়ুর সহিত মিশিয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া গেল।

এদিকে মারওয়ান, ওমর, অলীদ, জেয়াদ প্রভৃতি যোধগণ উগ্রমূর্তিতে বিকট শব্দে "কৈ জয়নাল? কোথায় সখিনা?" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহাদের শরীর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, বীরহৃদয় কাঁপিয়া গেল। ভয়ের সঞ্চার হইল–কি মর্মভেদী দৃশ্য!

বীরবর আবদুল ওহাবের খণ্ডিত দেহ, কাসমের মৃত্যুশয্যা, হোসেনের অশ্ব, পতিপ্রাণা সখিনার পতিভক্তির চিহ্ন দেখিয়া বীরগণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মন্ত্রিপ্রবর মারওয়ান একদৃষ্টে সখিনার প্রতি অনেক্ষণ পর্যন্ত চাহিয়া মৃত কি জীবিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইা দেখিলেন, সখিনা বিবি স্বামীর পদ দু'খানি বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া মনঃপ্রাণ যেন ঈশ্বরে ঢালিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পতি-দেহ-বিনির্গত পবিত্র-শোণিতে পবিত্র দেহ রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মৃতদেহে চন্দন আতর কর্পূরের ব্যবস্থা আছে। সখিনার অঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া জীবন্তভাবে যেন দয়াময়ের নিকট স্বামীর মঙ্গল-কামনায় আত্ম-বিসর্জন করিয়া রহিয়াছে।

মারওয়ান আর একটু অগ্রসর হইলেন। সখিনাকে ধরিয়া তুলিবেন আশা করিয়া হস্ত বিস্ত ার করিতেই যেন মৃত শরীরে হঠাৎ জীবাত্মার সঞ্চার হইল। যেন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল মর্ত্যে আসিয়া সখিনার কানে কানে বলিয়া গেলেন, "সখিনা! তুমি না সাধ্বী সতী? পরপুরুষ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত, এখনও স্বামী-চিন্তা! এখনও স্বামী-শোক! অবলা-অবয়ব পরপুরুষের চক্ষে পড়িলে মহাপাপ! নিজে ইচ্ছা করিয়া দেখাইলে আরও পাপ! তুমি বীর-দুহিতা বীর-জায়া। ছি, ছি, সখিনা! তোমার এত ভ্রম! ছি ছি! সাবধান হও!"

সখিনা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন, অপরিচিত যোধসকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে যাহা পাইতেছে, লইতেছে। হঠাৎ দুলদুল প্রতি দৃষ্টি পড়িল। হযরত ইমাম হোসেন প্রিয় অশ্ব দুলদুল মৃত্তিকায় শায়িত, সমুদয় অঙ্গে তীক্ষ্নতর তীরবিদ্ধ, তীর সকল অশ্বশরীর বিদ্ধ করিয়া কতক মৃত্তিকাসংলগ্ন, কতক কতক শরীরোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি শরের মুখ হইতে শোণিত-ধারা ছুটিয়া,– শ্বেত অশ্ব ঘোর লোহিতে রঞ্জিত হইয়াছে। সখিনা একদৃষ্টে অশ্ব প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূর্বকথা

স্মরণ হইল। চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল, মুখভাব ভিন্নভাব ধারণ করিল। সজোরে কাসেমের কটিদেশ হইতে খঞ্জর লইয়া মহারোষে বলিতে লাগিলেন,-

"ওরে কাফেরগণ! বুঝিয়াছি, সেই সাহসে শিবিরে আসিয়াছিস? সেই সাহসে অত্যাচার করিতে আসিয়াছিস? ওরে! আমরা অসহায়া হইয়াছি, সেই সাহসে? আমরা নিরাশ্রয়া, ওরে! সেই সাহসে? পুরুষ বীর আর কেহ নাই, নরাধমেরা! সেই সাহসে! ভুলিলাম, ভুলিলাম! এখন প্রাণসখা কাসেমকে ভুলিলাম! ভুলিলাম কাসেম! ভুলিলাম কাসেম, তোমায় এখন ভুলিলাম! নারী-জীবনের উদ্দেশ্য দেখাইতে তোমাকে এখন ভুলিলাম কাসেম। ঐ পিতার অশ্ব, সমুদয় অঙ্গে তীরবিদ্ধ, রক্তে রঞ্জিত, মৃত্তিকায় শায়িত। আর কথা কি? আর আশা কি? এখন সখিনার আর আশা কি? কাসেম চাহিয়া দেখ! প্রাণাধিক কাসেম! দেখ চাহিয়া, এই দেখ সখিনার হাতে তোমার খঞ্জর!"

মারওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্মী কাফের! তুই এখানে কেন? দূর হ! সখিনার সম্মুখ হইতে দূর হ! তুই কি আশায় এখানে আসিয়াছিস? দূর হ কাফের, দূর হ! এ পবিত্র শিবির হইতে দূর হ! ঐ দেখ! যদি চক্ষু থাকে, তবে ঐ দেখ! শূন্যে চাহিয়া দেখ-শাহানা বেশ! সেই নয়নমুগ্ধকারী শাহানা বেশ! লোহিতরঞ্জিত সেই শাহানা বেশ! সেই শাহানা বেশ! শত্রু-অস্ত্রে আহত হইয়া শাহানা বেশ! ওরে নরাধম বর্বর! চণ্ডালের অমৃত আশা? শয়তানের বেহেশতে আশা? ঘোর নারকীয় জান্নাতে আশা? মহাপাতকীর হুরে আশা! দেখ! এই দেখ- যার প্রাণ, তার নিকটে,- যেখানে কাসেম, সেইখানে সখিনা-রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর-কাসেমের হস্তের খঞ্জর"-এই বলিয়া, হস্তস্থিত খঞ্জর সুকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়া পৃষ্ঠ পার করিয়া দিলেন। হায় রে রুধির-ধারা! খঞ্জরের অগ্রভাগ বহিয়া বহিয়া শোণিতের ধারা ছুটিল। সখিনা কাসেমের মৃতদেহ পার্শ্বের অর্দ্ধমুকুলিত ছিন্নলতার ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন!*

মারওয়ান নিস্তব্ধ। অন্য অন্য যোধগণ, যাঁহারা সখিনার-সাধ্বী-সতী সখিনার কীর্তি স্বচক্ষে দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই নিস্তব্ধ এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। পদপরিমাণ ভূমিও অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইলেন না।

মারওয়ান বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! হোসেন-পরিবারের প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিও না। সাবধান! তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কোন কথা মুখে আনিও না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বচক্ষেই তো দেখিলে? কি অসীম সাহস! কি অসীম ক্ষমতা! কি আশ্চর্য! বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখ, ইহাদের এখনকার ভাবভঙ্গী-মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক! সাবধানে কথাবার্তা কহিবে। দেখ, ভাবটি সহজ ভাব নহে, দেখিলেই বোধ হয়, ইঁহারা সন্তোষসহকারে কোথায় যেন যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন। দুঃখের চিহ্নমাত্র মুখে নাই। বিয়োগ, শোক, বেদনা, যন্ত্রণা, ইহাদের অন্তরের বিন্দুপরিমাণ স্থানও যেন অধিকার করিতে পারে নাই। সকলের হাতেই এক-একখানি শাণিত অস্ত্র। তরবারি, খঞ্জর, কাটারী, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে, লইয়াছে। ধন্য রে আরবীয় নারী। তোমরাই ধন্য! পতি-পুত্র-বিয়োগ-বেদনা ভুলিয়া সমরসাজে শত্রু-সম্মুখীন! ধন্য তোমরা! ভ্রাতৃগণ! আমাদের বীরত্বের ধিক! অস্ত্রে ধিক! নারীহস্তে অস্ত্র দেখিয়া কি আর এ সকল অস্ত্র ধরিতে ইচ্ছা করে? ইহারা আমাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন বা না করুন, আমরা কিছুই বলিব না। ছি! ছি! অবলা কুলস্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি

নাই। ভ্রাতৃগণ! তোমরা আর কোন কথা বলিও না, সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র কোষে আবদ্ধ কর। যাহা বলিবার আমিই বলিতেছি।"

মারওয়ান অবনতমস্তকে বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী-সতী দেবিগণ! আমরা মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ এবং চিরানুগত দাস। মহারাজ-আদেশে আমরা কারবালা ক্ষেত্রে হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসিয়াছিলাম। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আমরা জয়লাভ করিয়াছি। আমরাই আপনাদের সুখতরী আজ মহারাজ এজিদের আদেশাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবাইয়াছি। আজিকার অস্ত্রের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা-সূর্য একেবারে চিরঅস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনারা মহারাজ এজিদ-সৈন্য-হস্তে চিরবন্দী। বন্দীর প্রতি অত্যাচার অবিচার কাপুরুষের কার্য। বরং আপনাদের জীবনরক্ষা প্রতি সর্বদা আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণহেতু যদি কোন দ্রব্যের অভাব হইয়া থাকে, বলুন, আমি এ অভাব মোচন করিতে প্রস্তুত আছি।"

সকলেই নীরব। কাষ্টপুত্তলিকাবৎ নীরব! স্পন্দনহীন জড়বৎ নীরব! অনিমেষে নীরব। কেবল অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জল! জল! জল! আমরা তোমাদের নিকট জল চাহি; দয়া করিয়া এক পাত্র জল দাও!"

মারওয়ান অতি অল্প সময় মধ্যে ফোরাত-জলে অনেকের তৃষ্ণা-নিবারণ করিলেন! কিন্তু যাহাদের অন্তরে পতি-পুত্র-ভ্রাতা-বিয়োগ-জনিত শোকাগ্নি প্রচণ্ডবেগে হু হু শব্দে জ্বলিতেছে–শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে সেই মহা অগ্নির জ্বলন্ত শিখা মহাতেজে নিগৃত হইয়া জীয়ন্ত জীবন জ্বালাইতেছিল, তাহাদের নিকট জলের আদর হইল না। ফোরাত-জলে সে জ্বলন্ত আগুন নির্বাণ হইল না; বরং আরও সহস্রগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

মারওয়ান একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বন্দিগণ! শিবিরস্থ বন্দিগণ! প্রস্তুত হও। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত পক্ষকে রাখিবার বিধিনাই। প্রস্তুত হও– তোমরা মহারাজ এজিদের বন্দী,–মারওয়ানের হস্তে। শীঘ্রই প্রস্তুত হও। এখনই দামেস্ক যাইতে হইবে।"

দ্বিতীয় প্রবাহ

রে পথিক! রে পাষাণ হৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিতশির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ খণ্ডিতশিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? তুমি তো আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না? জয়নাব ইমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা শির লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়িতেছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? সীমার! একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাঁধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিতশিরে প্রয়োজন কি? অর্থ? হায় রে অর্থ? হায় রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজা বৈরীভাব, বন্ধুবান্ধবে বিচ্ছেদ। বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাশ, এ সকলই তোমার জন্য! সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি! তোমার

কি মোহিনী শক্তি! কি মধুমাখা বিষংযুক্ত প্রেম, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত,-মহাব্যস্ত-প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমারই জন্য-কেবলমাত্র তোমারই কারণে- কতজনে তীর, তরবারী, বন্দুক, বর্শা গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে। রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর, ছলনে! তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া! কি মোহিনী শক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও? তুমি দূর হও? কবির কল্পনার পথ হইতে একেবার দূর হও! কবির চিন্ত ।ধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও! তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে! তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমার-হস্তে খণ্ডিত।- রাক্ষসি! তোমারই জন্য খন্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ!

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচলগমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্ত রে নানা ভাব; তন্মধ্যে অর্থচিন্তাই প্রবল; চির অভাবগুলি আশু মোচন করারই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই ছাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত- যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশাযাপন করি। এতো সকলই মহারাজ এজিদ-নামদার রাজ্যভুক্ত, অধীর, অন্তর্গত। সৈনিক বেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে? কার সাধ্য-কে কি করিবে?

সীমার এক গৃহীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশাযাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শা-বিদ্ধ খণ্ডিতশির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি জয়সংক্রান্ত কেহ বা হয় মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া ভক্তি সহকারে অতিথি-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন, তাবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার বলিলেন,-

কি কথা?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্শা-বিদ্ধ শির কোন মহাপুরুষের?"

"ইহার অনেক কথা। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাহার পিতা আলী এবং মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যাহার জননী, এ তাহারই শির। কারবালা-প্রান্তরে, মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্য-সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মোহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিবার না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।"

"হ্যাঁ, এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের

প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শা-বিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ-সময়ে কৌশলে কি বল-প্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির, -আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা-যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে, আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যুষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিতভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রেই সম্মত হইলেন। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়ন বিলম্ব; যেমনই শয়ন; অমনই অচেতন।

গৃহ-স্বামী বাস্তবিক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী। নাম 'আজর'।*

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনার পশু পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলামধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন? পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষমাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদও সেও সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। যে দুঃখের কথায় কোন চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইলে, আর না হউক, জাতি ও জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্মিক, বিশেষ ঈশ্বরভক্ত, মহাপুরুষ মোহাম্মদের হৃদয়ের অংশ-ইঁহাদের এই দশা? হায়! হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়- বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে না? ধর্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্মই কেন হউক না, পবিত্রতা রক্ষা করিতে তৎকার্যে যোগ দিতে কে নিবারণ করিবে? মহাপুরুষ মোহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র; সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা! যুদ্ধে হত হইয়াছেন বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য? জগৎ কয় দিনের এজিদ! তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস? জীবনশূন্য দেহের সদগতির সংবাদ শুনিয়া কি তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাণ হইত না? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ শুনিয়া মিটিত না? হোসেন-পরিবারের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্ত

ধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে।- তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস না! তোকে কোন ঈশ্বর গড়িয়াছিল, জানি না; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত, তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন–কতকাল ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণহরণ করিয়াছিস, কিন্তু তোর পিতা ইমাম বংশের ভিন্ন নহেন; তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব? রক্ত-মাংস-বীর্য-গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব-শরীরে অস্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা-জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না, যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তরে কারবালায় লইয়া যাইয়া শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদগতির উপায় করিবে; প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে না!"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসেন বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলী ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা! এ জীবন থাক্ বা যাক্, প্রভাত না হইতে হইতে আমরা এ পবিত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে।"

পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিকহস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।"

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন,-"ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর-ভক্তের মন এক, আত্মা এক। ধর্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে রক্তে রক্তে লেশমাত্র যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর-প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। পরোপকারব্রতে জীবনপণ কথাটা শুনিয়াও কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না।"

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগৎকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে জগৎ-লোচন রবিদেবকে পূর্ব গগনপ্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্দ্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ কল্য দেখিয়াছে, আজ আবার দেখুন-নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক-পবিত্র-জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক-সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক-ধর্মে দ্বেষ, ধর্মে হিংসা, মানুষের শরীরে আছে কিনা তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক। ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, জায়া, পরিজন বিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিয়া থাকে, জীবনে অতি তুচ্ছ জ্ঞানে জীবন থাকিতেই জীবনলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে? মানুষের পরিচয় কি? মহাশক্তিসম্পন্ন হৃদয়ে ক্ষমতা কি? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি, আজ ভাল করিয়া দেখুক!

জগৎ জাগিল। পূর্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।" আজর বর্হিভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি, শুনিতে চাই। আর তুমি কোন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না; ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি-বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু ও অসভ্য জাতিরাই গতজীবন শত্রুশরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছণা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ! তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয়ও দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি; সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক! ভাই সাহেব! বিড়াল-তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী, জগতে অনেক আছে, অনেক দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। তোমার ধর্মকাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, কারণ, বিধি-ব্যবস্থা সমুদয় তুলিয়া রাখ; ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকী নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে,হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই, আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি; আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখ-কাতরতা, এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?"

'ওহে ধার্মিকবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি। টাকা যে জিনিস, তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমনই ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে বল তো জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই; কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না, জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে ও টাকা, জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিও নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি?- ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?"

"রাজ বিদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদবিসংবাদ করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই! তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা। সাধ্য কি রাজকর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত-শির আনিয়া দিতেছি, মস্তক পাইলেই তো ভাই তুমি ক্ষান্ত হও?

"হ্যাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি-মহারাজের নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব! আমাকে আদর-আহলাদে স্থান দিয়াছ; অভ্যর্থনা করিয়াছ; সকলই বলিব। হয় তো ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দাও।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণ নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাত্রা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপপঙ্কে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজকর্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ? আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক হস্তে কখনই দিব না! তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্ত ক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত-শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধকালও এখানে থাকিবে না, বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরে জ্যৈষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতা! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে! এ কি কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় না? আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব! ধিক আমাদের জীবনে! ধিক আমাদের মনুষ্যত্বে ! যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষ পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সেই পিতার শির যে কারণে দেহ-বিছিন্ন হইবে, সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতাঃ! আর বিলম্ব করিবে না, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ। তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক! যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক! প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য–বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য–আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যৈষ্ঠ পুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিবেন। কবির কল্পনা

আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

উঃ! কি সাহস! কি সহ্য গুণ! দেখ রে! পাষন্ড হৃদয় এজিদ! দেখ! পরোপকারব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ! দেখ রে সীমার? তুই দেখ! মনুষ্যজীবনের ব্যবহার দেখ! খড়গ কম্পিত হইল, রঞ্জিত হইল, পরোপকার আর মৃত শিরের সৎকারহেতু প্রাণাধিক পুত্রশোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল, লৌহ-নির্মিত খড়গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন ঝন রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু আজরের রক্ত মাংসের শরীর হেলিল না, শিহরিল না–মুখমণ্ডল মলিন হইল না। ধন্যরে পরোপকার! ধন্য রে হৃদয়!!

এ দিকে সীমার বর্শাহস্তে বর্হিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিতশির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তার মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তক লইয়া যাইব।"

আজর খন্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সীমার মহাহর্ষে শির বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সদ্যকর্তিত রক্ত ধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? অতি উন্মাদ হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা-প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক লইয়া গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী তো আমি কখনও দেখি নাই। আহা! এই বুঝি তোমারহিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! আরে নরাধম! এই বুঝি তোর সাধুতা? কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ, আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস?

"ভ্রাতঃ আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি তো বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইব। এখন এ কি কথা–এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু! টাকার লোভে কাহার কি সর্বনাশ করিবে, কে জানে?"

"তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তকের কাটিয়াছিলেন ভাই? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম; এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।"

"কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তক জন্য কারবালা-প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, সে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তক জন্য চতুর্দিকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' রব হইতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্তে এ কি?– ইহাতে আমার কি লাভ? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

"ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহা আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম নহে।"

সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এইখানে রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবার হোসেনশির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি?"

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যম পুত্র বলিলেন, "পিতা চিন্তা কি? আপনার সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিক প্রবর চলিয়া যাইবেন। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়গ হস্তে করুন, আমার বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির

দামেস্ক রাজ্যের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।" আজর পুনরায় খড়গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকটে আসিলে সীমার আরও আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উন্মাদ কি করিতেছ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে পাগল! তোমার এ পাগলামী কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কি কথা? ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই! ধিক তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখি কি করিবে? এক মস্তকের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে। বল তো ইহারা তোমার কে?"

"এই দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে তো তুমি বড় ধূর্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ! ছি! ছি! তোমার ন্যায় অর্থ-পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি, লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটিই চাহিতেছি; সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীগ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা লেখনরীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয়, বুঝিয়া থাকিবেন। এবার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণে অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি?" তাহা কখনই পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাহি না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক দিয়াছি ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সংবরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্যে রাখিয়াছিস? তোর সকলই কপটতা! শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এ মস্তকের পরিবর্তে তিনটি দিয়াছি, আর দিব না,– তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি, এই যা–একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা! সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন-গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়গহস্তে তাহা রক্ষা করিতেছে। সীমার একলম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ববৎ বর্শা বিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোমাকে মারিব না, ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল। এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম–আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না–হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাই না।"

"কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? সীমার অনুগ্রহ চাহিস না? ওরে পাপীয়সি! তুই স্বচক্ষে তো দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস না?"

এই বলিয়া বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই আজরের স্ত্রী খড়গহস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস্! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খগড় রঞ্জিত করিয়াছি, পরপর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিল, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব? আমার বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবন-সর্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস।" এই কথা বলিতে বলিতে আজরের স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খগড়াঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শা-বিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজরের স্ত্রী মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বাম-হস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়গ দ্বারা আত্ম-বিসর্জন করিলেন,–সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় প্রবাহ

সময়ে সকলই সহ্য হয়। কোন বিষয় অনভ্যাস থাকিলে বিপদকালে তাহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, মহাসুখের শরীরেও মহা কষ্ট সহ্য হইয়া থাকে,–এ কথার মর্ম হঠাৎ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পরাধীন জীবনের সুখের আশা করাই বৃথা। বন্দী অবস্থায় ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বিবেচনা করাও নিস্ফল; চতুর্দিকে নিষ্কোষিত অসি, ত্বরিতগতি বিদ্যুতের ন্যায় বর্শাফলক সময়ে সময়ে চক্ষে ধাঁধা দিতেছে। বন্দিগণ মলিনমুখ হইয়া দামেস্কে যাইতেছে, কাহার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিতে পারে! সকলেরই একমাত্র চিন্তা জয়নাল আবেদীন। এজিদ সকলের মস্তক লইয়াও যদি জয়নালের প্রতি দয়া করে, তাহা হইলেও সহস্র লাভ। দামেস্ক নগরের নিকটবর্তী হইলে সকলেই এজিদ-ভবনে আনন্দ-বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সীমার হোসেনের শির লইয়া পূর্বেই আসিয়াছে, কাজেই আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, নগরবাসীরা উৎসবে মাতিয়াছে। মহারাজ এজিদের জয়, দামেস্ক-রাজের জয়-ঘোষণা মুহূর্তে মুহূর্তে ঘোষিত হইতেছে। নানা বর্ণের রঞ্জিত পতাকারাজি উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড্ডীয়মান হইয়া মহাসংগ্রামের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। আজ এজিদ আনন্দ-সাগরে সন্তোষ-তরঙ্গে সভাসদ সহিত মনঃপ্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছেন। বন্দিগণ রাজ-প্রাসাদে আনীত হইলে

দ্বিগুণরূপে আনন্দবাজনা বাজিয়া উঠিল। এজিদ যুদ্ধবিজয়ী সৈন্যদিগকে আশার অতিরিক্ত পুরস্কৃত করিলেন। শেষে মনের উল্লাসে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। অবারিত দ্বার,–যাহার যত ইচ্ছা লইয়া মনের উল্লাসে রাজাদেশে আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল; অনেকেই আমোদে মাতিল।

হাসনেবানু, শাহরেবানু, জয়নাব, বিবি ফাতেমা (হোসেনের অল্প বয়স্কা কন্যা) এবং বিবি ওম্মে সালেমা* প্রভৃতিকে দেখিয়া এজিদ মহাহর্ষে হাসি হাসি মুখে বলিতে লাগিলেন, "বিবি জয়নাব! এখন আর কার বল, বলুন? বিধবা হইয়াও হোসেনের বলে এজিদকে ঘৃণারচক্ষে দেখিয়াছেন! এখন সে হোসেন কোথা? আর হাসানই বা কোথা? আজি পর্যন্ত ও কি আপনার অন্তরের গরিমা–চক্ষের ঘৃণা অপরিসীম ভাবেই রহিয়াছে? আজ কার হাতে পরিলেন, ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি, চেষ্টায় কি না হয়! ধন, রাজ্য, রূপ, তুচ্ছ করিয়াছিলেন; একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, রাজ্যে কিনা হইল? বিবি জয়নাব! মনে আছে সেই আপনার গৃহনিকটস্থ রাজপথ? মনে করুন, যে দিন আমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছিলাম, আপনি আমাক দেখিয়াই গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন! কে না জানিল যে, দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুইটি চক্ষু তখনই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্দ্ধান হইল। সে দিনের সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথা! সে কেশ-শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিতপ্রবাহ কাহার জন্য? কি কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা?"

জয়নাব আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আরক্তিম লোচনে বলিতে লাগিলেন, "কাফের! তোর মুখের শাস্তি ঈশ্বর করিবেন। সর্বস্ব হরণ করিয়া একেবারে নিঃসহায়া, নিরাশ্রয়া করিয়া বন্দীভাবে দামেস্কে আনিয়াছিস, তাই বলিয়াই কি গৌরব? তোর মুখের শাস্তি, তোর চক্ষের বিধান, যিনি করিবার তিনিই করিবেন। তোর হাতে পড়িয়াছি, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিস। কিন্তু কাফের! ইহার প্রতিশোধ অবশ্য আছে। তুই সাবধানে কথা কহিস, জয়নাব নামে মাত্র জীবিতা,–এই দেখ, (বস্ত্রমধ্যস্থ খঞ্জর দর্শাইয়া) এমন প্রিয়বস্তু সহায় থাকিতে বল তো কাফের, তোকে কিসের ভয়?"

এজিদ আর কথা কহিলেন না। জয়নাবের নিকট কত কথা কহিবেন, ক্রমে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইবেন, শেষে সজল নয়নে দুঃখের কান্না কাঁদিবেন– তাহা আর সাহস হইল না। কৌশলে হোসেন পরিবারদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রাদি অপহরণ করিবার মানসে সে সময়ে আর বেশি বাক্যব্যয় করিলেন না। কেবল জয়নাল আবেদীনকে বলিলেন, "কৈ সৈয়দজাদা, তুমি কি করিবে?"

জয়নাল আবেদীন সক্রোধে বলিলেন, "তোমার প্রাণবধ করিয়া দামেস্ক নগরের রাজা হইব।"

এজিদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার আছে কি? তুমি মাত্র একা, অথচ বন্দী, তোমার জীবন আমার হস্তে। মনে করিলে মুহূর্ত মধ্যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুকুরের উদরে দিতে পারি, এ অবস্থাতেও আমাকে মারিয়া দামেস্কের রাজা হইবার সাধ আছে?"

"আমার মনে যাহা উদয় হইল বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। ইহা পার, উহা পার বলিয়া আমার নিকট গরিমা দেখাইয়া ফল কি?"

"ফল যাহা তো দেখিয়াই আসিতেছ। এখানেও কিছু দেখ। একটি ভাল জিনিস তোমাদিগকে দেখাইতেছি, দেখ।"

হোসেন-মস্তক পূর্বেই এক সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া এজিদ তদুপরি মূল্যবান বস্ত্রের আবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন; হোসেনের অল্পবয়স্কা কন্যা ফাতেমাকে এজিদ নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন, "বিবি! তোমার তো খর্জ্জুর-প্রিয়, এইক্ষণে যদি মদিনার খর্জ্জুর পাও, তাহা হইলে কি কর?"

"কোথা খর্জ্জুর? দিন, আমি খাইব?"

এজিদ বলিলেন, "ঐ পাত্রে খর্জ্জুর রাখিয়াছি, আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখিতে পাইবে। খুব ভাল খর্জ্জুর উহাতে আছে। তুমি একা খাইও না, সকলকেই কিছু কিছু দিও।"

ফাতেমা বড় আশা করিয়া খর্জ্জুর-লোভে পাত্রের উপরিস্থিত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "এ কি, এ মানুষের কাটা মাথা! এ যে আমারই পিতার।"– এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরিজনেরা হোসেনের ছিন্নমস্তক দেখিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর! তোমার মহিমা অসীম, তুমি সকলই করিতে পার। দোহাই ঈশ্বর, বিলম্ব সহে না, দোহাই ভগবান, আর সহ্য হয় না, একেবারে সপ্ততল ভগ্ন করিয়া আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। দয়াময়! আমাদের চক্ষের জ্যোতিঃ হরণ কর, বজ্রাস্ত্র আর কোন সময় ব্যবহার করিবে? দয়াময়! আর সহ্য হয় না; এজিদের দৌরাত্ম আর সহিতে পারি না। দয়াময়! সকল অবস্থাতেই তোমাকে ধন্যবাদ দিয়াছি, এখনও দিতেছি। সকল সময় তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এখনও করিতেছি;– কিন্তু দয়াময়! এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। আমাদের চক্ষু অন্ধ হউক, কর্ণ বধির হউক, এজিদের অমানুষিক কথা যেন আর শুনতে না হয়, দয়াময়! আর কাঁদিব না। তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।"

কি আশ্চর্য, সেই মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকৌশলীর লীলা অবক্তব্য। পাত্রস্থ শির ক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল! এজিদ স্বচক্ষে দেখিতেছেন, অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। কে যেন তাঁহার বাকশক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন, হোসেনের মস্তক হইতে পবিত্র জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া যেন আকাশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। খণ্ডিতশির ক্রমে সেই জ্যোতিঃর আকর্ষণে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইল।

এজিদের সভয়ে গৃহের উর্দ্ধভাগে বারবার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেখিলেন কোথাও কিছু নাই। পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে। যে মস্তক লইয়া কত খেলা করিবেন, হোসেন পরিবারের সম্মুখে কত প্রকার বিদ্রুপ করিয়া হাসি-তামাসা করিবেন, তাহা আর হইল না। কে লইল, কেন উর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে অন্তর্দ্ধান হইল, এত জ্যোতিঃ, এত তেজ, তেজের এত আকর্ষণ-শক্তি কোথা হইতে আসিল?– এজিদ ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন। কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল একটি অপূর্ব সৌরভে কতক্ষণ পর্যন্ত রাজভবন অমোদিত করিয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারিলেন।

এজিদ মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প রচনা করিয়াছিলেন, দুরাশা-সূত্রে আকাশ-কুসুমে যে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার কিছুই থাকিল না। অতি অল্প সময়

মধ্যে আশাতে আশা, কুসুমে কুসুম মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল। ঐশ্বরিক ঘটনায় ধার্মিকের আনন্দ, চিত্তের বিনোদন-পাপীর ভয়, মনে অস্থিরতা। এজিদ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অস্ফুটস্বরে এইমাত্র বলিলেন, "বন্দিগণকে কারাগারে লইয়া যাও।"

চতুর্থ প্রবাহ

কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানা দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার তিমির সদজ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্যন্ত যাইতে মনের গতি রোধ, তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়; কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাসেই যথেষ্ট, আর বেশি দূর যাইব না। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খ দল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং ইমামদিগের নামের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দের সম্বোধন করা হইয়াছে; মহাপাপের কার্যই করিয়াছি। আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বর জানেন। কারণ মর্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে।

স্বর্গীয় প্রধান দূত জিব্রাইল অতি ব্যস্ততা সহকারে ঘোষণা করিতেছে,- "দ্বার খুলিয়া দাও, প্রহরিগণ! আজ স্বর্গের দ্বার, সপ্ততল আকাশের দ্বরা খুলিয়া দাও। পুণ্যাত্মা, তপস্বী, সিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরপ্রণয়ী প্রাণিগণের অমরাত্মার বন্দিগৃহের দ্বার খুলিয়া দাও। স্বর্গীয় দূতগণ! অমর-পুরবাসী নরনারীগণ! প্রস্তুত হও। হোসেনের এবং অন্যান্য মহারথিগণের দৈহিক সৎক্রিয়া সম্পাদন জন্য মর্তলোকে যাইবার আদেশ হইয়াছে। দ্বার খুলিয়া দাও, প্রস্তুত হও।"

মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। "অল্পক্ষণের জন্য আবার মর্ত্যলোকে?" অমরাত্মা এই বলিয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলেন। এদিকে হযরত জিব্রাইল আপন দলবলসহ সকলের পূর্বেই কারবালা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সকলের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জনমানবশূন্য প্রান্তর পুন্যাত্মাদিগের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া স্বার্গীয় সৌরভে চতুর্দিক মোহিত ও আমোদিত করিয়া তুলিল।

স্বর্গীয় দূতগণ, স্বর্গসংস্রবী দেবগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত আদম-যিনি আদি পুরুষ, যাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রধান ফেরেশতা আজাজীল শয়তানে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় দূতগণ পূজিত হযরত আদম-হোসেন-শোকে কাতর-স্নেহপরবশে প্রথমেই তাঁহার সমাগম হইল। পরে মহাপুরুষ মুসা-স্বয়ং ঈশ্বর তুর পর্বতে যাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, মুসা সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি

দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে কিঞ্চিৎ আভামাত্র যাহা মুসার নয়নগোচর হইয়াছিল তাহাতেই মুসা স্বীয় শিষ্যসহ সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া তখনই অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, শিষ্যগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল, আবার করুণাময় জগদীশ্বর, মুসার প্রার্থনায় শিষ্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া মুসার অন্তরে অটল ভক্তির নব ভাব আবির্ভাব করিয়াছিলেন– সে মহামতি সত্য-তার্কিক মুসাও আজি হোসেন-শোকে কাতর– কারবালায় সমাসীন। প্রভু সোলেমান–যাঁর হিতোপদেশ আজ পর্যন্ত সর্বধর্মাবলম্বীর নিকট সমভাব আদৃত,–সেই নর-কিন্নর-দানবদল-ভূপতি মহামতিও আজ কারবালা-প্রান্তরে উপস্থিত। যে দায়ুদের গীতে জগৎ মোহিত, পশু-পক্ষী উন্মত্ত, স্রোতস্বতীর স্রোত স্থির-ভাবাপন্ন, সে দায়ুদও আজ কারবালায়।

ঈশ্বর-প্রণয়ী ইব্রাহিম–যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরুদ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁধা দিয়াছিল,–দয়াময়ের কৃপায় সে প্রজ্জ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি ইব্রাহিম-চক্ষে বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবন, অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপমালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল,– সে সত্য-বিশ্বাসী মহাঋষি আজ কারবালা-ক্ষেত্রে সমাগত। ইসমাইল–যিনি নিজ প্রাণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া 'দুম্বার' পরিবর্তে নিজে বলি হইয়াছেন,–সে ঈশ্বরভক্ত ইসমাইল আজ কারবালা-প্রান্তরে। ঈসা-যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী, জগদ্বেষী মহাঋষি তাপস, ঈশ্বরের মহিমা দেখাইতে যে মহাত্মা চিরকুমারী মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,– তিনিও আজ মর্ত্যধামে কারবালার মহাক্ষেত্রে। ইউনুস–যিনি মৎস্যগর্ভে থাকিয়া ভগবানের অপরিসীম ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন– তিনিও কারবালায়। মহামতি হযরত ইউসুফ–বৈমাত্রেয় ভ্রাতার চক্রে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঈশ্বরকৃপায় জীবিত ছিলেন এবং দাস-পরিচয়ে বিক্রীত হইয়া মিসর-রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সে মহাসুশ্রীর অগ্রগণ্য পূর্ণজ্যোতির আকর হযরত ইউসুফও আজ কারবালার মহা-প্রান্তরে। হযরত জার্জিসকে বিধর্মিগণ শতবার শত প্রকারে বধ করিয়াছে, তিনিও পুনঃ পুনঃ জীবনপ্রাপ্ত হইয়া দয়াময়ের মহিমার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সেই ভুক্তভোগী হযরত জার্জিস আজ কারবালা-ক্ষেত্রে। এই প্রকার হযরত ইয়াকুব, আসহাব, ইসহাক, ইদ্রীস, আয়ুব, ইলিয়াস হরকেল, শামাউন, লুত, এহিয়া, জেকরিয়া প্রভৃতি মহা মহা মহাত্মাগণের আত্মা অদৃশ্য শরীরে কারবালায় হোসেনের দৈহিক শেষ-ক্রিয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন।

সকলেই যেন কাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে সকলেই একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে বারবার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আর সকলেই আরব্য ভাষায় "ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া হাবীব সালাম আলায়কা, ইয়া রাসূল সালাম আলায়কা, সালওয়াতোল্লাহ আলায়কা" সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, মুখে মহাঋষি প্রভু হযরত মোহাম্মদের গুণানুবাদ হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে মৃদুমন্দভাবে শূন্য হইতে "হায় হোসেন! হায় হোসেন! রব করিতে করিতে হযরত মোহাম্মদ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পবিত্র পদ ভূ-পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। এতদিন প্রকৃত শরীরী জীবের মুখে "হায় হোসেন–হায় হোসেন!" রব শুনিয়াছিল; আজ দেবগণ, স্বর্গের হুর-গেলমানগণ, মহাঋষি, যোগী, তপস্বী, অমরাত্মার মুখে শুনিতে লাগিল, "হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!"

এই গোলযোগ না যাইতে যাইতেই সকলে যেমন মহাদুঃখ নির্বাক দণ্ডায়মান হইলেন। হায় হায়! পুত্রের কি স্নেহ! রক্ত, মাংস, ধমনী, অস্থি শরীরবহীন আত্মাও অপত্য-স্নেহে ফাটিয়া যাইতেছে, যেমন মেঘ-গর্জনের সহিত শব্দ হইতেছে—"হোসেন! হায় হোসেন!!" মোরতাজা আলী "শেরে খোদা" (ঈশ্বরের শার্দুল) স্বীয় পত্নী বিবি ফাতেমাসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈহিকের জন্য শোক অমূলক, খেদ বৃথা। দৈহিক জীবনের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই,—তথাপি পুত্রের এমনই মায়া যে, সে সকল মূলতত্ত্ব জ্ঞাত থাকিয়াও মহাত্মা আলী মহা খেদ করিতে লাগিলেন। জাগতিক বায়ু প্রকৃত আত্মার বহমান হইয়া ভ্রমময় মহাশোকে উদ্রেক করিয়া দিল। কুহকিনী দুনিয়ার কুহকজালের ছায়া দেখিয়া হযরত আলী অনেক ভ্রমাত্মক কথা বলিতে লাগিলেন। "আন অশ্ব, আন তরবারি, এজিদের মস্তক এখনই সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিব।" হায়! সন্তানের স্নেহের নিকট তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান সকলই পরাস্ত!

সকল আত্মাই হযরত আলীকে প্রবোধ দিলেন। হযরত জিব্রাইল আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালিত হউক। শহীদগণের দৈহিক সৎকারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। অগ্রে শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; বিধর্মী, ধর্মী, স্বর্গীয়, নারকীয় একত্র মিশ্রিত হইয়া সমরাঙ্গনে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া রহিয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে।" সকলেই শহীদগণের দেহ অন্বেষণে ছুটিলেন।

ঐ যে শিরশূন্য মহারথি-দেহ ধূলায় পড়িয়া আছে, খরতর তীরাঘাতে অঙ্গে সহস্র সহস্র ছিদ্র দৃষ্ট হইতেছে, পৃষ্ঠে একটি মাত্র আঘাত নাই,— সমুদয় আঘাতই বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়াছে, এ কোন বীর? কবচ, কটি-বন্ধ, বর্ম, চর্ম, অসি, বীর-সাজের সমুদয় সাজ, সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে, বয়সে কেবল নবীন যুবা। কি চমৎকার গঠন! হায়! হায়! তুমি কি আব্দুল ওহাব? হে বীরবর! তোমার মস্তক কি হইল! তুমি কি সেই আব্দুল ওহাব? যিনি চিরপ্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখখানি একবার দেখিতে বৃদ্ধ মায়ের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই যিনি বীররমণী বীরবালার বঙ্কিম আঁখির ভাব দেখিয়া ও রণোত্তেজক কথা শুনিয়া অসংখ্য বিধর্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন,—তুমি কি সেই আব্দুল ওহাব?

বীরবরের পদপ্রান্তে এ আবার কে? এ বিশাল অক্ষি দুইটি ঊর্ধ্বে উঠিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুল ওহাবের সজ্জিত-শরীর-শোভা দেখিতেছে। এক বিন্দু জল!—ওহো, এক বিন্দু জলের জন্য আব্দুল ওহাব-পত্নী হত পতির পদপ্রান্তে শুষ্ককণ্ঠা হইয়া আত্মবিসর্জন করিতেছেন।

এ রমণী-হৃদয়ে কে আঘাত করিল? এ কোমল শরীরে কোন পাষাণ-হস্ত অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জীবলীলা শেষ করিল? রে কাফেরগণ! হোসেনের সহিত শত্রুতা করিয়া রমনী-বধেও পাপ মনে কর নাই। বীরধর্ম, বীর-নীতি, বীর-শাস্ত্রে কি বলে? যে হস্ত রমণীদেহে আঘাত করিতে উত্তোলিত হয়, সে হস্ত বীর-অঙ্গের শোভনীয় নহে, সে বাহু বীর-বাহু বলিয়া গণনীয় নহে। নরাকার পিশাচের বাহু!

সে বীরকেশরী, সে বীরকুল-গৌরব, সে মদিনার ভাবী রাজা কোথায়? মহা মহা রথী যাঁহার অশ্ব-চালনায়, তীরের লক্ষ্যে, তরবারি তেজে, বর্শার ভাঁজে মুগ্ধ, সে বীরবর কৈ? সে অমিততেজা রণকৌশলী কৈ? সে নব পরিণয়ের নূতন পাত্র কৈ? এই তো শাহানা বেশ। এই তো বিবাহ-সময়ের জাতিগত পরিচ্ছদ। এই কি সেই সখিনার প্রণয়ানুরাগ

নব পুষ্পহার পরিণয়সূত্রে গলায় পরিয়াছিল! এই কি সেই কাসেম! হায়! হায়! রুধিরের কি অন্ত নাই!

সখিনা সমুদয় অঙ্গে, পরিধেয় বসনে রুধির মাখিয়া বীর-জায়ার পরিচয়-বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন, তবু রুধিরের ধারা বহিতেছে, মণিময় বসন-ভূষণ তরবারি অঙ্গে শোভা পাইতেছে। তূণীর, তীর, বর্শা দেহপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাম পার্শ্বে এ মহাদেবী কে? এ নবকমলদলগঠনা নব যুবতী সতী কে? চক্ষু দুইটি কাসেমের মুখ দেখিতে দেখিতে যেন বদ্ধ হইয়াছে, জানিত কি অজানিতভাবে বাম হস্তখানি কাসেমের বক্ষের উপর রহিয়াছে। সতী! তুমি কে? তোমার দক্ষিণ হস্তে এ কি? এ কি ব্যাপার– কমলকরে লৌহ অস্ত্র! সে অস্ত্রের অগ্রভাগ কৈ? উহু! কি মর্মঘাতী দৃশ্য! বদ্ধমুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করাইয়াছে। তুমি সখিনা? তাহা না হইলে এত দুঃখ কার? স্বামীর বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছ? না–না–বীর-জায়া, বীর দুহিতা কি কখন স্বামী-বিরহে কি বিয়োগে আত্মবিসর্জন করে? কি ভ্রম! তাহা হইলে এ বদনে হাসির আভা কেন থাকিত? জ্যোতির্ময় কমলাননে জ্বলন্ত প্রদীপ্ত শোভা কেন রহিবে? বুঝিলাম–বিরহ কি বিয়োগ-দুঃখে এ তীক্ষ্ণ খঞ্জরের হৃদয়-শোণিত, স্বামীদেহ বিনির্গত শোণিত মিশ্রিত হয় নাই। স্বামী-বিয়োগে অধীরা হইয়া দুঃখভার হ্রাস করিতেও খঞ্জরের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই! ধন্য সতী! ধন্য সতী সখিনা! তুমি জগতে ধন্য, তোমার সুকীর্তি জগতে অদ্বিতীয় কীর্তি। কি মধুময় কথা বলিয়া খঞ্জর হস্তে করিয়াছিল? জগৎ দেখুন। জগতে নরনারীকূল তোমায় দেখুক। এত প্রণয়, এত ভালবাসা, এত মমতা, এত স্নেহ, এক শোণিতে গঠিত সে কাসেম, সেই আবার পরিণয়ে আবদ্ধ, নব প্রেমে দীক্ষিত–যে ঘটনায় নিতান্ত অপরিচিত হইলেও মুহূর্ত মধ্যে প্রণয়ের প্রেমের সঞ্চার হয়,–সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সেই কাসেমকে মুক্তকণ্ঠে বলিলে, "ভুলিলাম কাসেম, এখন তোমায় ভুলিলাম।" এই চিরস্মরণীয় মহামূল্য কথা বলিয়া যাহা করিলে, তাহাতে অপরের কথা দূরে থাকুক,–নির্দয়হৃদয় মারওয়ানের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। ধন্য ধন্য সখিনা! সহস্র ধন্যবাদ তোমারে!

এ প্রান্তরে এ রূপরাশি কাহার? এ অমূল্য রত্ন ধরাসনে কেন? ঈশ্বর, তুমি কি না করিতে পার? একাধারে এত রূপ প্রদান করিয়া কি শেষে ভ্রম হইয়াছিল? সেই আজানুলম্বিত বাহু,,সেই বিস্তারিত বক্ষঃ, সেই আকর্ণবিস্তারিত অক্ষিদ্বয়, কি চমৎকার ভ্রূযুগল, ঈষৎ গোঁফের রেখা! হায়! হায়! হায় ভগবান! এত রূপবান করিয়া কি শেষে তোমারই ঈর্ষা হইয়াছিল? তাহাতেই কি এই প্রকার কিশোর বয়সে আলী আকবর আজ চির ধরাশায়ী?

এ যুগলমূর্তি এ স্থানে পড়িয়া কেন? এ ননীর পুতুল রক্তমাখা অঙ্গ মহাপ্রান্তরে পড়িয়া কেন? বুঝিলাম ইহাও এজিদের কার্য। রে পাষণ্ড পিশাচ! হোসেনের ক্রীড়ার পুত্তলি দুইটিও ভগ্ন করিয়াছিস? হায়! হায়! এই তো সেই ফোরাত নদী, ইহার ভয়ানক প্রবাহ মৃত শরীরর সকল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে লোহিত, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ লোহিত, কোন স্থানে ঘোর পীত, কোন স্থানে নীল বর্ণের আভা-সংযুক্ত স্রোত বহিয়া নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতেছে, হোসেন-শোকে ফোরাতের প্রতি রঙ্গ মস্তক নত করিয়া রঞ্জিত জলে মিশিয়া যাইতেছে।

শব্দ হইল, "এ যে আমার কোমরবন্ধ, এ যে আমার শিরস্ত্রাণ; এ যে আমারই তরবারি, এ সকল এখানে পড়িয়া কেন?" আবার শব্দ হইল, "এ সকলই তো হোসেনের আয়ত্বাধীনে ছিল?"

"এই তো মহাপুরুষ–মদিনার রাজা" এ প্রান্তরে বৃক্ষতলে পড়িয়া কেন? রক্তমাখা খঞ্জর কাহার? এতো হোসেনের অস্ত্র নহে। অঙ্গের বসন, শিরস্ত্রাণ, কবচ স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, কারণ কি? তাহাতেই কি এই দশা? এ কি আত্ম-বিকারে চিহ্ন; না ইচ্ছামৃত্যুর লক্ষণ? বাম হস্তের অর্দ্ধ পরিমাণ খণ্ডিত হইয়াও দুই হস্ত দুই দিকে পড়িয়া যে উপদেশ দিতেছে, তাহার অর্থ কি জগতে কেহ বুঝিয়াছে? বাম হস্তে আবার কে আঘাত করিল? মস্তক খণ্ডিত হইয়াও জন্মভূমি মদিনার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে? হায় রে জন্মভূমি!!

সীমার মস্তক লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়াছিল, আজর সেই মস্তক এই দেহে সংযুক্ত করিবার আশায় পুত্রগণের মস্তক কাটিয়া দিয়াও কৃতার্য হইতে পারে নাই। এজিদ কত খেলা খেলিবে, কত অপমান করিবে, আশা করিয়া মস্তক দামেস্কে লইয়া গিয়াছিল। ধন্য রে কারিগরি! ধন্য রে ক্ষমতা! জগদীশ! তোমার মহিমা অপার। তুমি যাহা সংঘটন করিয়া একত্র করিতে ইচ্ছা কর, তাহা অত্যুচ্চ পর্বতশিখরে থাক, ঘোর অরণ্যে থাক, অতল জলধিতলে থাক, অনন্ত আকাশে থাক, বায়ু-অভ্যন্তরে থাক, তাহা সংগ্রহ করিয়া একত্র করিবেই করিবে। এ লীলা বুঝা মানবের সাধ্য নহে, এ কীর্তির কণামাত্র বুঝাও ক্ষুদ্র নরমস্তকের কার্য নহে! প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি, তুমি সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় প্রভু! তোমার মহিমা অপার!! জগদীশ।

স্বর্গীয় দূতগণ, পবিত্র আত্মাগণ শহীদগণের দৈহিক ক্রিয়ায় যোগ দিলেন; স্বর্গীয় সুগন্ধে সমাধি স্থান আমোদিত হইতে লাগিল।

শহীদগণের শেষ-ক্রিয়া "জানাজা" করিতে অন্যান্য মৃত শরীরের ন্যায় জলে স্নান করাইতে হয় না, অন্য বসন দ্বারা শরীর আবৃত করিতে হয় না, ঐ রক্তমাখা শরীরে সজ্জিত বেশে, ঐ বীর-সাজে মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়। ধর্মযুদ্ধের কি অসীম বল, কি অসীম পরিণাম-ফল!

দৈহিক কার্য শেষ হইলে শহীদগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরের আদর্শে স্বর্গে নীত হইলেন।

পঞ্চম প্রবাহ

স্বাধীনতা– কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়! স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান! স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরা পর্যন্ত আনন্দোচ্ছাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন, পরাধীনতা স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্ট বোধকরে, আবার অন্যকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। এক পক্ষের দুঃখ, অপর পক্ষের সুখ।

এজিদ স্বরাজ্যে স্বাধীন! সকলেই তাঁহার আদেশের অধীন। জয়নালকে হাসি-রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুই কি করিবি? জয়নালের মুখে তাহার উত্তরও শুনিয়াছেন।

ক্রমে বশে আনিয়া, ক্রমে শান্তভাব ধরাইয়া, কার্যসিদ্ধির উপায় না করিলে এইক্ষণে কিছুই হইবে না! জয়নালকে প্রাণে মারিয়া মদিনার সিংহাসনে বসিলে কোন লাভ নাই। জয়নাল নিয়মিতরূপে মদিনার কর দামেস্কে যোগাইলে দামেস্ক সিংহাসনের সহস্র প্রকারে গৌরব। কিন্তু সিংহ-শাবককে বশে আনা সহজ কথা নহে। কিছু দিন চেষ্টা করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রথমেই নিরাশ হইয়া হোসেন বংশ একেবারে বিনাশ করিলে বাহাদুরী কি? এই সকল আশার কুহকে পড়িয়া এজিদ বন্দিগণ প্রতি সুব্যবস্থার অনুমতি করিয়াছিলেন।

জয়নাল কিসে বশ্যতা স্বীকার করে, কিসে প্রভু বলিয়া মান্য করে, কি উপায় করিলে নির্বিঘ্নে মদিনা রাজ্য করতলস্থ হয়, অধীন দাসত্ব কলংকরেখা জয়নালের সুপ্রশস্ত ললাটে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়, এজিদ এই সকল মহাচিন্তার ভার নিজ মস্তকে লইয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বিনাযুদ্ধে মদীনার সম্রাট হওয়া সহজ কথা নহে। এজিদের মস্তক কেন–লোকমান, আফলাতুন প্রভৃতি মহাচিন্তাশীল মহজ্জনের মস্তিষ্ক ও এ চিন্তায় ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এজিদের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মারওয়ান চেষ্টা করিলে অবশ্যই ইহার কোন এক প্রকারের সদুপায় বাহির করিবে। মনের ব্যগ্রতায় দামেস্কের বহু লোক প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল, কিন্তু মারওয়ান ভিন্ন ইহার স্থির সিদ্ধান্ত কারা উপযুক্ত পাত্র মানস-চক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

মারওয়ান উপস্থিত হইলে এজিদ ঐ সকল গুপ্ত বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে কহিলেই মারওয়ান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আগামী জুম্মাবারে (শুক্রবারে) জয়নাল দ্বারা মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করাইব। এক্ষণে সমগ্র প্রদেশে হোসেনের নামে খোৎবা হইতেছে। কারণ হোসেনের পর এ পর্যন্ত মদিনার রাজা কেহ হয় নাই। জয়নাল যদি আপন পিতার নাম পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করে, তবেই কার্যসিদ্ধি–তবেই দামেস্কের জয়- তবেই বিনা যুদ্ধে মদিনা করতলে। যাঁহার নামে খোৎবা, তিনি মক্কা-মদিনার রাজা। এখনই রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে, আগামী জুম্মাবারে শেষ ইমাম জয়নাল আবেদীন–দামেস্ক-সম্রাট মহারাজাধিরাজ এজিদ নামদারের নামে খোৎবা পাঠ করিবেন। নগরের যাবতীয় ঈশ্বরভক্ত লোককেই উপাসনা-মন্দিরে খোৎবা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি রাজা-আজ্ঞা অবহেলা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরচ্ছেদ করা যাইবে।"

এজিদ মহাতুষ্ঠ হইয়া মারওয়ানকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে রাজ ঘোষণা দামেস্ক নগরের ঘরে ঘরে প্রকাশ হইল। ঘোষণার মর্মে অনেকেই সুখী হইলেন, আবার অনেকে মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। তাহাদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই–রাজদ্রোহী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণ যায়। গোপনে গোপনে বলিতে লাগিল, "এতদিন পরে নূরনবী মোহাম্মদের ঘোষণা! হায় হায়! ইসলাম ধর্মের এত অবমাননা! কাফেরের নামে খোৎবা! বিধর্মী নারকী ঈশ্বরদ্রোহীর নামে খোৎবা! হা ইসলাম ধর্ম! দুরন্ত জালেমের হস্তে পড়িয়া তোমার এই দুদ্দর্শা! হায় হায়! পুণ্যভূমি মদিনার সিংহাসন যাঁহার আসন, সেই ইমাম জয়নাল আবেদীন কাফেরের নামে খোৎবা পড়িবে? সে খোৎবা শুনিবে কে? সে উপাসনাগৃহে যাইবে কে? আমারা অধীন প্রজা, না যাইয়া নিস্তার নাই। জগদীশ! আমাদের কর্ণ বধির কর, চক্ষুর জ্যোতিঃহরণ কর, চলচ্ছক্তি রহিত কর!"

মোহাম্মদীয়গণ নানা প্রকার অনুতাপ করতে লাগিলেন। এজিদপক্ষীয় বিধর্মীরা দর্প করিয়া বলিতে লাগিল, "মোহাম্মদ-বংশের বংশ মর্যাদার চিরগৌরব এখন কোথায় রহিল? ধন্য মন্ত্রী মারওয়ান!"

এ সকল সংবাদ বন্দীরা পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। এজিদ মনে করিয়াছেন, উহাদের জীবন আমার হস্তে, মুহূর্তে প্রাণ রাখিতে পারি, মুহূর্তে বিনাশ করিতে পারি। জুম্মার দিন জয়নালকে ধরিয়া আনিয়া মসজিদে পাঠাইয়া দিব। যদি আমার নামে খোৎবা পড়িতে অস্বীকার করে, রাজাজ্ঞা অমান্য করা অপরাধে তখনই উহার প্রাণবিনাশ করিব।

জুম্মাবার উপস্থিত, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মোহাম্মদীয়গণ প্রাণের ভয়ে উপাসনা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়নাল আবেদীনের নিকটে যাইয়া মারওয়ান বলিলেন, "আজ তোমাকে মসজিদে খোৎবা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। ইমামদিগের কার্যই উপাসনায় অগ্রবর্তী হওয়া, খোৎবা পাঠ, ধর্মের আলোচনা, শিষ্যদিগকে উপদেশ দান;– সুতরাং ঐ সকল আমার কর্তব্য কার্য। তুমি অপেক্ষা কর, আমি আমার মায়ের অনুমতি লইয়া আসিতেছি।"

"তোমার মা'র অনুমতি লইতেই যদি চলিলে, তবে আর একটি কথা শুনিয়া যাও।"

"কি কথা?"

"খোৎবা পড়িতে হইবে বটে, কিন্তু তোমার নাম পড়িতে পারিবে না!"

জয়নাল চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "কেন পারিব না?"

"কেন-র উত্তর নাই–রাজার আজ্ঞা।"

"ধর্মচর্চায় বিধর্মী রাজার আজ্ঞা কি? আমার ধর্মকর্ম আমি করিব, তাহাতে তোমাদের কথা কি? আমি যতদিন মদিনার সিংহাসনে না বসিব, ততদিন পিতার নামেই খোৎবা পাঠ করিব; এই তো রাজার আজ্ঞা। তুমি কোন রাজার কথা বল?"

"তুমি নিতান্তই অবোধ, কিছুই বুঝিতেছ না। তোমার মা'র নিকট বলিলে তিনি সকলই বুঝিতে পারিবেন।"

"আমি অবোধ না হইলে তোমার বন্দীখানায় কেন আসিব? আর কি কথা আছে বল। আমি মা'র নিকট যাইতেছি।"

"যিনি দামেস্কের রাজা, তিনিই এক্ষণে মদিনার রাজা। মক্কা ও মদিনা একই রাজার রাজ্য হইয়াছে। এখন ভাব দেখি, কাহার নামে খোৎবা পাঠ করা কর্তব্য?"

"আমি ও প্রকারের কথা বুঝিতে পারি না। যাহা বলিবার হয়, স্পষ্টভাবে বল।"

"তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কেবল থাকিবার মধ্যে আছে রাগ আর নিজের অহঙ্কার। বাদশাহ-নামদার এজিদের নামে খোৎবা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল আবেদীন রোষে ও দুঃখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের নামে আমি খোৎবা পড়িব? এজিদ কোন দেশের রাজা? আর সে কোন রাজার পুত্র?"

মারওয়ান অতি ব্যস্তে জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "সাবধান! সাবধান!! ও কথা মুখে আনিও না। ও কথা মুখে আনিলে নিশ্চয়ই তোমার মাথা কাটা যাইবে।"

"আমি মাথা কাটাইতে ভয় করি না। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও– আমি খোৎবা পড়িতে যাইব না।"

মারওয়ান মনে করিয়াছিলেন যে, জয়নালকে বলিবামাত্র সে খোৎবা পড়িতে আসিবে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। এদিকেও উপাসনার সময় অতি নিকট। মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ সিংহ-শাবকের নিকট চাতুরী চলিবে না, বলপ্রকাশ করিলেও কার্য উদ্ধার হইবে না। সালেমা বিবির নিকটে যাইয়া বলি– তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, বয়সেরও প্রবীণা, অবশ্যই ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া জয়নালকে সম্মত করাইয়া দিবেন। সকলেই এক বন্দীগৃহে।

মারওয়ান সালেমা বিবির নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনাদের কপালের এমনই গুণ, ভাল করিতে গেলেও মন্দ হইয়া যায়। আমার ইচ্ছা–যে কোন প্রকারে এই বিপদ হইতে আপনারা উদ্ধার পান।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "কি প্রকারে ভাল করিতে ইচ্ছা করেন?"

"মহারাজ এজিদ-নামদার আজ্ঞা করিয়াছেন, জয়নাল আবেদীনের দ্বারা আজিকার জুম্মার খোৎবা পড়াইয়া তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দাও।"

"ভাল কথা। জয়নাল কৈ? তাহাকে এ কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি এবং তাহার উত্তর শুনিয়াছি।"

"সে কি উত্তর করিল? তার বুদ্ধি কি?"

"বুদ্ধি ও খুব আছে, ক্রোধ ও খুব আছে।"

"ক্রোধের কথা বলিও না। বাপু! তাহারা ধর্মের দাস, ধর্মই তাহাদের জীবন; বোধ হয়, ধর্মসংক্রান্ত কোন কথা বলিয়া থাকিবে। ধর্মবিরোধী কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলে কখনই সে শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না।"

"মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন, আজ হোসেনের নাম পরিবর্তন করিয়া মক্কা ও মদিনা এইক্ষণে যাঁহার করতলে, জয়নাল আবেদীন তাঁহারই নামে খোৎবা পাঠ করুক। আমি আজই তাঁহাদিগকে বন্দীগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া মদিনায় পাঠাইয়া দিব। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করুন,–কিন্তু তাঁহাকে দামেস্ক রাজ্যের অধীনে থাকিতে হইবে।"

"এ কি কথা! বন্দী হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই কি তিনি ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন? আমাদের প্রতি যে এত অত্যাচার করিতেছে, তাহাকে যথার্থ ধার্মিক বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব? হযরত মোহাম্মদ রাসূলাল্লাহ্‌র প্রচারিত ধর্মে যে দীক্ষিত নহে, মদিনার সিংহাসনের যে অধীশ্বর নহে, তাহার নামে কি প্রকারে খোৎবা পাঠ হইতে পারে? তাও আবার পাঠ করিবে–জয়নাল আবেদীন! এ কি কথা?"

"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু শান্ত হউন। বন্দীভাবে থাকিয়া এত দূর বলা নিতান্তই অন্যায়। যাহা হউক, আমি বলি, যদি খোৎবাটা পড়িলেই মুক্তি লাভ হয়, তাহাতে হানি কি? জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিলে কি আর তাঁহার উপর দামেস্করাজ্যের কোন ক্ষমতা থাকিবে? তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন, ইহাতে আর আপনাদের ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছুই নাই;–কিন্তু–"

"আর 'কিন্তু' কথা মুখে আনিবেন না, প্রাণ বাঁচাইতে অনেক–"

"জয়নালকে একবার ডাকিতে বল।"

"জয়নাল আবেদীন আড়ালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিলেন, সালেমা বিবির কথার আভাসেই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারোষের চিহ্ন এবং ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া সালেমা বিবি অনুমানেই অনেক বুঝিলেন। সস্নেহে জয়নালের কপোলদেশ চুম্বন করিয়া অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "এজিদের নামে খোৎবা পড়ায় দোষ কি? যদি ভগবান কখনও তোমায় সুখ-সূর্যের মুখ দেখান, তোমার নামেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক খোৎবা পাঠ করিবে। এখন মারওয়ানের কথা শুনিলে বোধ হয়, ঈশ্বর ভালই করিবেন।"

জয়নাল বলিলেন, "আপনিও কি এজিদের নামে খোৎবা পড়িতে অনুমতি করেন?"

"আমি অনুমতি করি না; তবে ইহা বলিতে পারি যে; তোমার মুক্তির জন্য আমরা সকলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। একদিন খোৎবা পড়িলেই যদি তুমি সপরিবারে বন্দীগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, মদিনার সিংহাসনে নির্বিবাদে বসিতে পার, তবে তাহাতে ক্ষতি কি ভাই? আরও কথা, তুমি ইচ্ছা করিয়া এই কুকার্যে রত হইতেছ না। এ পাপ তোমাকে স্পর্শিবে না।"

"সামান্য কারামুক্তি আর মদিনার রাজ্যলাভ জন্য আমি এজিদের নামে খোৎবা পড়িব? এ বন্দীগৃহ হইতে মুক্তির জন্য ভয় কি? শক্তি থাকিলেই মুক্তি হইবে। যদি কেহ রাজ্য কাড়িয়া লইয়া থাকে, তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করা অপেক্ষা অস্ত্রে তাহার মস্তক নিপাত করাই আমার কথা।"

সালেমা বিবি জয়নালের মুখে শত শত চুম্বন পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

মারওয়ান বলিতে লাগিলেন 'আপনারা এরূপ গোলযোগ করিলে কোন কার্যই সিদ্ধ হইবে না। আর সময় নাই; যদি মদিনা যাইবার ইচ্ছা থাকে, এজিদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা থাকে, জয়নালকে খোৎবা পাঠ করিতে প্রেরণ করুন। ইহাতে সম্মত না হন, আমার অপরাধ নাই, আমি নাচার।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "জয়নাল! তুমি ঈশ্বরের নাম করিয়া মসজিদে যাও! তোমার ভাল হইবে।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "আপনি যাইতে আজ্ঞা করিলেন?"

"হ্যাঁ, আমি যাইতে আজ্ঞা করিলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই। আরও একটি কথা বলিতেছি, শুন। শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেই ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে। একদা তোমার পিতামহ হযরত আলী কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আম্বাজ নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, এ দেশে পুরুষাধিকার নহে, একজন রাজ্ঞীর অধিকারভুক্ত। আরও আশ্চর্য কথা,—রাজ্ঞী এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই; তাঁহার পণ এই, বাহুযুদ্ধে যে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, আর রাজ্ঞী জয়ী হইলে পরাজিত পক্ষকে আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দাসভাবে থাকিতে হইবে। মহাবীর আলী স্ত্রীলোকের এই পণের কথা শুনিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। বিবি হানুফাও কম ছিলেন না। আরবীয় যাবতীয় বীরকে তিনি জানিতেন। তাঁহাও মনে ইচ্ছা ছিল যে, আলীকে পরাস্ত করিয়া একজন মহাবীর দাস লাভ করিবেন। ঘটনাক্রমে সুযোগ ও সময় উপস্থিত— দিন নির্ণয় হইল। রূপের গরিমায়— যৌবনের জ্বলন্ত প্রতিভায় বিবি হানুফা আরবের সুবিখ্যাত বীরকেও তুচ্ছজ্ঞানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মোহাম্মদীয় ধর্ম গ্রহণপূর্বক মহাবীর

আলীকে স্বামীত্বে বরণ করিলেন। হযরত আলী বিবি ফাতেমার ভয়ে একথা মদিনায় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সময়ে বিবি হানুফার গর্ভে এক পুত্র সন্তান হয়। আলী সে সময় মহা চিন্তিত হইয়া কি করেন–কথাও গোপন থাকে না। বিবি ফাতেমার ভয়ও কম নহে। পুত্রকে গোপনে আনাইয়া একদা প্রভু মোহাম্মদের পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়া জোড়হস্তে দন্ডায়মান হইলেন। প্রভু মোহাম্মদ পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুমা দিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানি। আমি ইহার নাম, ইহার মাতার নামের সহিত আমার নামের সহিত যোগ দিয়া রাখিলাম।" বিবি ফাতেমা দেখিলেন যে, একটি অপিরিচিত সন্তানকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়া বারবার মুখে চুমা দিতেছেন। বিবি ফাতেমা সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করায় সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে বিবি ফাতেমা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পিতাকে এক প্রকার ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "আমার সপত্নীপুত্রকে আপনি স্নেহ করিতেছেন? আর কোন বিবেচনায় আপনার নামের সহিত যোগ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন?"

প্রভু বলিলেন,– "ফাতেমা, শান্ত হও! এই মোহাম্মদ হানিফা তোমার কি কি উপকার করিবে, শুন। যে সময় প্রিয় পুত্র হোসেন কারবালার মহাপ্রান্তরে এজিদের আজ্ঞায় সীমার-হস্তে শহীদ হইবে, তৎকালে তোমার বংশে এক জয়নাল আবেদীন ভিন্ন পুরুষপক্ষে আর কেহ থাকিবে না; তোমার আত্মীয়স্বজন ভগিনী, পুত্রবধূরা এজিদের সৈন্যহস্তে কারবালা হইতে দামেস্কে বন্দীভাবে আসিবে, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন সময়ে এই মোহাম্মদ হানিফা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, জয়নাল আবেদীনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে।" বিবি ফাতেমা পিতৃ মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মোহাম্মদ হানিফাকে আহ্লাদে ক্রোড়ে করিয়া হানিফার আপাদমস্তকে চুমা দিয়া আশীর্বাদ পূর্বক বলিলেন, "প্রাণাধিক? তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, মস্তকের মণি। আমার চুম্বিত স্থানে কোনরূপ অস্ত্র প্রবেশ করিবে না? তুমি সর্বদা সর্বজয়ী হইয়া জগতে মহার্কীর্তি স্থাপন করিবে। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও।" যে সময়ে কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সূচনা হয়, সেই সময় আমি গোপনে একজন কাসেদকে মোহাম্মদ হানিফার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া পাঠাইয়াছি। মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্কে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। এই তো শাস্ত্রের কথা; এখন সকলই ঈশ্বরের হাত। আরও একটি কথা,–হোসেন যুদ্ধকালে কি বলিয়া গিয়াছিলেন, মনে হয়? তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভাবিও না, এমন একটি লোক আছে, যদি তাহার কর্ণে এইসকল ঘটনার অণুমাত্রও প্রবেশ করে, তবে ইহার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে। সে কে? এই মোহাম্মদ হানিফা।"

জয়নাল আবেদীন এই পর্যন্ত শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। খোৎবা পাঠ করিবেন স্বীকার করিয়া উপাসনার সমুচিত পরিধেয় লইয়া বহির্গত হইলেন, মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলে। নগরে হুলস্থূল পড়িয়াছে–আজ জয়নাল আবেদীন এজিদের নামে খোৎবা পাঠ করিবে। মারওয়ানের আনন্দের সীমা নাই। আজ এজিদের আশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। জয়নাল আবেদীন এজিদের নামে খোৎবা পাঠ করিবে। জয়নাল উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনান্তর খোৎবা পাঠ আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদীয়গণের অন্তরে খোৎবার শব্দগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। কোন মুখে জয়নাল আবেদীন মদিনার ইমামের নাম অর্থাৎ হোসেনের নামের স্থানে

এজিদের নাম উচ্চারণ করিবেন? হায়! হায়! এ কি হইল? কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে মদিনার সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী যিনি, তাঁহারই নামে খোৎবা পাঠ হইল। খতিবের* মুখে কেহ এজিদের নাম শুনিল না। পূর্বেও যে নাম, এখনও সেই হোসেনের নাম স্পষ্ট শুনিল।

মোহাম্মদীয়গণ মনের আবেগে আনন্দ-উল্লাসে জয় জয় করিয়া উঠি। এজিদ পক্ষীয়গণ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া জয়নাল আবেদীনকে নানা প্রকার কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিতে করিতে ভজনালয় হইতে বহির্গত হইল।

নিষ্কোষিত অসিহস্তে এজিদ ক্রোধে অধীর। কম্পিত-কলেবরে কর্কশ স্বরে অসি ঝনঝনি সহিত রসনা সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "এখনই জয়নালের শিরচ্ছেদ করিব! এত চাতুরী আমার সঙ্গে?"

মারওয়ান বলিতে লাগিলেন, "বাদশাহ-নামদার! আশাসিন্ধু এখনও পার হই নাই। বহু দূর আসিয়াছি বলিয়া ভরসা হইয়াছে;–অচিরেই তীরে উঠিবে। কিন্তু মহারাজ, আজ যে একটি গোপনীয় কথা শুনিয়াছি, তাহাতে জয়নাল আবেদীনের জীবন শেষ করিলে ইমামবংশ সমূলে বিনাশ হইবে না, বরং সমরানল সতেজে জ্বলিয়া উঠিবে। সে দুর্দান্ত প্রমত্ত বারণকে মারওয়ান যতদিন কৌশলাঙ্কুশে হোসেনের দাদ উদ্ধার পর্যবেক্ষণ হইতে নিবারণ করিতে না পারিবে, তত দিন মাওয়ানের মনে শান্তি নাই, আপনার জীবনে আশা নাই।"

এজিদ মৃত্তিকায় তরবারি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা? হোসেন বংশে এখনও প্রমত্ত কুঞ্জরসম বীরশ্রেষ্ঠ বীর আছে? আমি তো আর কাহাকেও দেখিতে পাই না?"

মারওয়ান বলিলেন, "জয়নালকে নির্দিষ্ট বন্দীগৃহে প্রেরণ করিবার আদেশ হউক। আমি সে গুপ্ত কথা-নিগূঢ় তত্ত্ব এখনই বলিতেছি।"

ষষ্ঠ প্রবাহ

যে নগরের সুখসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, মহানন্দে স্রোত বহিতেছিল, রাজপ্রসাদ, রাজপথ, প্রধান প্রধান সৌধ আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে নৃত্য, গীত বাজনার ধুম পড়িয়াছিল, রঞ্জিত পতাকাসকল হেলিয়া দুলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল;–হঠাৎ সমুদয় বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে মহানন্দ-বায়ু থামিয়া বিষাদ-ঝটিকা-বেগ রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল। মাঙ্গলিক পতাকারাজি নতশিরে হেলিতে দুলিতে পড়িয়া গেল। রাজপ্রসাদের বাদ্যধ্বনি, নূপুরের ঝনঝনি, সুমধুর কণ্ঠস্বর আর কাহারও কর্ণে প্রবশে করিল না। সুহাস্য আস্যসকল বিষাদ-কালিমা-রেখার মিলন হইয়া গেল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইতেছে না। রাজভবনের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন দেখিয়া কত জনে কত কথার আলোচনায় বসিয়া গেল। শেষে সাব্যস্ত হইল, গুরুতর মনঃপীড়া হঠাৎ পরিবর্তন, নিশ্চয়ই হঠাৎ শ্রবণ। দুঃখের কথা বটে! কারবালার সংবাদ–বিবি সালেমার প্রেরিত কাসেদের আগমন।

এ প্রদেশের নাম আম্বাজ। রাজধানী হনুফা নগর। এই সমৃদ্ধশালী মহানগরীর দণ্ডধর মোহাম্মদ হানিফা। সম্রাট স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদে মাতিয়াছিলেন, শুভ সময়ে শুভ কার্য সুসম্পন্ন করিবেন আশা ছিল, এমন সময় কাসেদ আসিয়া হর্ষে সম্পূর্ণ বিষাদ ঘটাইয়া মোহাম্মদ হানিফাকে নিতান্তই দুঃখিত করিয়াছে।

হাসানের সাংঘাতিক মৃত্যু, জেয়াদের সখ্যতা, মারওয়ানের আচরণ, কুফার পথ ভুলিয়া হোসেনের কারবালায় গমন ও ফোরাত নদীর তীরে শত্রুপক্ষ হইতে বেষ্টন, এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে বিষাদে নরপাল মহা অস্থির। কাসেদ সম্মুখে অবনত শিরে দণ্ডায়মান।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "হ্যাঁ"! জীবিত থাকিতেই ভ্রাতা হাসানের মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে হইল! ভ্রাতা হোসেনও কারবালা-প্রান্তরে সপরিবারে কষ্টে পড়িয়া আছেন! হায়! এত দিন না জানি, কি ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে। জগদীশ আমার এই প্রার্থনা, দাসের এই প্রার্থনা, কারবালা প্রান্তরে যাইয়া যেন ভ্রাতার পবিত্র চরণ দেখিতে পাই, পিতৃহীন কাসেমের মুখখানি যেন দেখিতে পাই। দয়াময়! আমার পরিজনকে রক্ষা করিও, দুরন্ত কারবালা-প্রান্তরে তুমি ভিন্ন তাহাদের সহায় আর কেহ নাই। দয়াময়! দয়াময়!! আমার মনে শান্তি দান কর। আমি স্থির মনে অটলভাবে যেন কারবালায় গমন করিতে পারি– পূজ্যপাদ ভ্রাতার সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি? দয়াময়? আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, তোমার এ চিরকিঙ্করের চক্ষু কারবালায় প্রান্তসীমা রেখা দেখা পর্যন্ত হোসেন-শিবির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিও।"

এই প্রকার উপাসনা করিয়া মোহাম্মদ হানিফা সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। আরও বলিলেন, "আমার সঙ্গে কারবালায় যাইতে হইবে। আমি এ নগরে আর ক্ষণকালের জন্যও থাকিব না। রাজকার্য প্রাধানমন্ত্রী হস্তে ন্যস্ত থাকিল।"

মোহাম্মদ হানিফা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীরসাজে সজ্জিত হইলেন। যুদ্ধ-বিদ্যা বিশারদ গাজী রহমানকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে বরণ করিয়া কারবালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম প্রবাহ

তোমার এ দুর্দশা কেন? কোন কুক্রিয়ার ফলে তোমার এ দশা ঘটিয়াছে? যখন পাপ করিয়াছিলে, তখন কি তোমার মনে কোন কথা উদয় হয় নাই? এখন লোকালয়ে মুখ দেখাইতে এত লজ্জা কেন? খোল, খোল, মুখের আবরণ খোল; দেখি কি হইয়াছে চির-পাপী পাপ-পথে দণ্ডায়মান হইলে হিতাহিত জ্ঞান অণুমাত্রও তাহার অন্তরে উদয় হয় না। যেন তেন প্রকারের পাপ-কূপে ডুবিতে পারিলেই এক প্রকার রক্ষা পায়,– কিন্তু পরক্ষণে অবশ্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

পাঠক! লেখনীয় গতি বড় চমৎকার! ষষ্ঠ প্রবাহে কোথায় লইয়া গিয়াছি, আবার সপ্তম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি। সম্মুখে পবিত্র রওজা–পুণ্যভূমি মদিনার সেই রওজা। পবিত্র রওজার মধ্যে অন্য লোকের গমন নিষেধ, একথা আপনারা পূর্ব হইতেই অবগত আছেন। আর যাহার জন্য উপরে কয়েকটি কথা বলা হইল, সে আগন্তুক কি করিতেছে,

দেখিতেছেন? সে পাপী পাপ-মোচন জন্য এখন কি কি করিতেছে, দেখিতেছেন? রওজার বহির্ভাগস্থ মৃত্তিকার ধূলি অবনতমুখে মস্তকে মর্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রভু রক্ষা কর। হে হাবিবে খোদা, আমায় রক্ষা কর! হে নূরনবী হযরত মোহাম্মদ! আমায় রক্ষা কর। তুমি ঈশ্বরের প্রিয় বন্ধু। তোমার নামের গুণে নরকাগ্নি নরদেহ-নিকটে আসিতে পারে না। তোমার রওজার পবিত্র ধূলিতে শত শত জরাগ্রস্থ মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সুকান্তি লাভ করিতেছে, তাহাদের সাংঘাতিক বিষের বিষাক্ত গুণ হ্রাস হইতেছে সেই বিশ্বাসে এই নরাধম পাপী বহু কষ্টে পবিত্র ভূমি মদিনায় আসিয়াছে। যদিও আমি প্রভু হোসেনের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি,– দয়াময়! হে দয়াময় জগদীশ! তোমার করুণা-বারি পাত্রভেদে নিপতিত হয় না। দয়াময়! তোমার নিকট সকলই সমান। জগদীশ! এই পবিত্র রওজার ধূলির মাহাত্মে আমাকে রক্ষা কর।

ক্রমে এক দুই করিয়া জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আগন্তুকের আত্মগ্লানি ও মুক্তি কামনার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই সমুৎসুক হইয়া কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আগমন, কি সকল প্রশ্ন করিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, "আমার দুর্দশার কথা বলি। ভাই রে! আমি ইমাম হোসেনের দাস। প্রভু যখন সপরিবারে কুফায় গমনের জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। দৈব-নিবন্ধনে কুফার পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় যাই।"

সকলে মহাব্যস্ত–"তার পর? তার পর?"

"তার পর কারবালায় যাইয়া দেখি যে, এজিদ-সৈন্য পূর্বেই আসিয়া ফেরাত নদীকূল ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এক বিন্দু জল লাভের আর আশা নাই। আমার দেহ-মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সমুদয় বৃত্তান্ত আমি একটু সুস্থ না হইলে বলিতে পারিব না। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম।"

মদিনাবাসীরা আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর কি হইল, বল; জল না পাইয়া কি হইল?"

"আর কি বলিব–রক্তারক্তি, মার, মার, কাট, কাট, আরম্ভ হইল; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল তরবারি চলিল; কারবালার মাঠে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল, মদিনার কেহ বাঁচিল না।"

"ইমাম হোসেন, ইমাম হোসেন?"

"ইমাম হোসেন সীমার-হস্তে শহীদ হইলেন।"

সমস্বরে আর্তনাদ ও সজোরে বক্ষে করাঘাত হইতে লগিল। মুখে 'হায় হোসেন! হায় হোসেন!"

কেহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা তখনই বারণ করিয়াছিলাম যে, হযরত মদিনা পরিত্যাগ করিবেন না। নূরনবী হযরত মোহাম্মদের পবিত্র রওজা পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইবেন না।"

কেহ কেহ আর কোন কথা না শুনিয়া ইমাম-শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পথ বাহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ ঐ স্থানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, যুদ্ধ-অবসানের পর কি হইল?"

"যুদ্ধ-অবসানের পর কে কোথায় গেল, কে খুঁজিয়া দেখে? স্ত্রীলোক মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিল, ধরিয়া ধরিয়া উটে চড়াইয়া দামেস্কে লইয়া গেল। জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে

যায় নাই, মারাও পড়ে নাই। আমি জঙ্গলে পলাইয়াছিলাম। যুদ্ধ-শেষে ইমামের সন্ধান করিতে রণক্ষেত্রে, শেষে ফোরাত-নদী তীরে গিয়া দেখি যে, এক বৃক্ষ-মূলে হোসেনের দেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু মস্তক নাই; রক্তমাখা খঞ্জরখানিও ইমামের দেহের নিকট পড়িয়া আছে। আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম যে, ইমামের পায়জামার বন্ধ-মধ্যে বহুমূল্যের একটি মুক্তা থাকিত। সেই মুক্তা-লোভে দেহের নিকট গিয়া যেমন খুলিতেছি, অমনি ইমামের বাম হস্ত আসিয়া সজোরে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। আমি মহাভীত হইলাম, সে হাত কিছুতেই ছাড়ে না। মুক্তাহরণ করা দূরে থাকুক, আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি। সাত পাঁচ ভাবিয়া নিকটস্থ খঞ্জর বাম হস্তে উঠাইয়া সেই পবিত্র হস্তে আঘাত করিতেই হাত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু কর্ণে শুনিলাম,-"তুই অনুগত দাস হইয়া আপন প্রভুর সহিত এই ব্যবহার করিলি! সামান্য মুক্তা-লোভে ইমামের হস্তে আঘাত করিলি! তোর শাস্তি-তোর মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের মুখে পরিণত হউক, জগতেই নরকাগ্নির তাপে তোর অন্তর, মর্ম, দেহ সর্বদা জ্বলিতে থাকুক।"

"এই আমার দুর্দশা, এই আমার মুখের আকৃতি দেখুন! আমি আর বাঁচিব না, সমুদয় অঙ্গে যেন আগুন জ্বলিতেছে! আমি পূর্ব হইতেই জানি যে, হযরতের রওজার ধূলি গায়ে মাখিলে মহারোগ ও আরোগ্য হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই কমিয়া জল হইয়া যায় সেই ভরসাতেই মহাকষ্টে কারবালা হইতে এই পবিত্র রওজায় আসিয়াছি।"

মদিনাবাসীগণ এই পর্যন্ত শুনিয়াই আর কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। সকলেই ইমাম-শোকে কাতর হইলেন। নগরের প্রধান প্রধান এবং রাজসিংহাসন-সংস্রবী মহোদয়গণ সেই সময়ে নগর-মধ্যে ঘোষণা করিয়া কি কর্তব্য স্থির করিবার জন্য রওজার নিকটস্থ উপাসনামন্দির সম্মুখে মহাসভা আহ্বান করিয়া একত্রিত হইলেন।

কেহ বলিলেন, 'এজিদকে বাঁধিয়া আনি।"

কেহ বলিলেন, "দামেস্ক নগর ছারখার করিয়া দিই।"

বহু তর্ক-বিতর্কের পর শেষে সুস্থির হইল, নায়ক-বিহনে সবাই প্রধান; এ অবস্থায় ইহার কোন প্রতীকারই হইবে না। আমরা মদিনার সিংহাসনে একজন উপযুক্ত লোককে বসাইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করি। প্রবল-তরঙ্গ-মধ্যে শিক্ষিত কর্ণধার বিহনে যেমন তরী রক্ষা কঠিন, রাজ বিপ্লবে, বিপদে একজন ক্ষমতাশালী অধিনায়ক না হইলে রাজ্য রক্ষা করাও সেইরূপ মহা কঠিন। স্ব স্ব প্রাধান্যে কোন কার্যেরই প্রতুল নাই।"

সমাগত দল-মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কাহার অধীনতা স্বীকার করিব? পথের লোক ধরিয়া মদিনার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন? মদিনাবাসীরা কোন অপরিচিত নীচ বংশীয়ের নিকট নতশিরে দণ্ডায়মান হইবে? প্রভু মোহাম্মদের বংশে তো এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিব।"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, মোহাম্মদ হানিফা এখনও বর্তমানে আছেন। হোসেনের পর তিনি আমাদের পূজ্য, তিনিই রাজা। ইহার পর হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনেক আছেন। কারবালার এই লোমহর্ষক ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা কি স্ব স্ব সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন? ইহার পর নূরনবী মোহাম্মদের ভক্ত অনেক রাজা আছেন; এই সকল ঘটনা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারাই কি নিশ্চিন্তভাবে থাকিবেন? এজিদ ভাবিয়াছে কি? মনে করিয়াছে যে, হোসেনবংশ নির্বংশ করিয়াছে- নিশ্চিন্তে থাকিবে; তাহা কখনই ঘটিবে না, চতুর্দিক হইতে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। আমরা এখনই

উপযুক্ত একজন কাসেদ হনুফা নগরে প্রেরণ করি। আপাততঃ মোহাম্মদ হানিফাকে সিংহাসনে বসাইয়া যদি জয়নাল আবেদীন প্রাণে বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় করি। সঙ্গে সঙ্গে এজিদের দর্প চূর্ণ করিতেও সকলে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তখনই হনুফা নগরে কাসেদ প্রেরিত হইল। প্রথম বক্তা পুনরায় বলিলেন, "মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই করিব না। শোক-বস্ত্র যাহা এক্ষণে ধারণ করিয়াছি, রহিল। জয়নাল আবেদীনের উদ্ধার, এজিদের সমুচিত শাস্তি বিধান না করিয়া আর এ শোক-সিন্দুর প্রবল তরঙ্গ প্রতি কখনই দৃষ্টি করিব না। আঘাত লাগুক; প্রতিঘাতে অন্তর ফাটিয়া যাউক, মুখে কিছুই বলিব না। কিন্তু সকলেই ঘরে ঘরে যুদ্ধ-সাজের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও।"

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন। হোসেনশোকে সকলেই অন্তরে কাতর; কিন্তু নিতান্ত উৎসাহে যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। নগরবাসীগণের অঙ্গে, দ্বিতল ত্রিতল গৃহদ্বারে এবং গবাক্ষে শোক-চিহ্ন। নগরের প্রান্তসীমার শোকসূচক ঘোর নীলবর্ণ নিশান উড্ডীয়মান হইয়া জগৎ কাঁদাইতে লাগিল।

এদিকে দামেস্ক নগরে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদের লক্ষাধিক সৈন্য সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। হানিফার মদিনা আগমনের পূর্বেই সৈন্যগণ মদিনা-প্রবেশ-পথে অবস্থিতি করিয়া হানিফার গমনে বাধা দিবে, ইহাই মারওয়ানের মন্ত্রণা। মোহাম্মদ হানিফা প্রথমে কারবালায় গমন করিবেন, তৎপরে মদিনায় না যাইয়া মদিনাবাসীদের অভিমত না লইয়া হযরতের রওজা পরিদর্শন না করিয়া কখনই দামেস্ক আক্রমণ করিবেন না– ইহাই মারওয়ানের অনুমান। সুতরাং মদিনা-প্রবেশ-পথে সৈন্য সমবেত করিয়া রাখাই আবশ্যক এবং সেই প্রবেশ-পথে হানিফার দর্প চূর্ণ করিয়া জীবন শেষ করাই যুক্তি। এই সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করিয়া এজিদ মারওয়ানের অভিমতে মত দিলেন;–তাই আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ওতবে অলীদ দামেস্ক হইতে আবার মদিনাভিমুখে সৈন্যসহ চলিলেন। হানিফার প্রাণ বিনাশ, কি বন্দী করিয়া দামেস্কে প্রেরণ না করা পর্যন্ত মদিনা আক্রমণ করিবে না। কারণ মোহাম্মদ হানিফাকে পরাস্ত না করিয়া মদিনার সিংহাসন লাভ করিলে কোন লাভ নাই, বরং নানা বিঘ্ন, নানা আশঙ্কা; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ওতবে অলীদ মদিনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ওতবে অলীদ নির্বিঘ্নে যাইতে থাকুন, আমরা একবার হানিফার গম্য পথ দেখিয়া আসি।

অষ্টম প্রবাহ

কি চমৎকার দৃশ্য! মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা সজোরে টানিয়া অশ্ব-গতি রোধ করিয়াছেন। গ্রীবা বক্র, দৃষ্টি পশ্চাৎ– কারণ সৈন্যগণ কত দূরে তাহাই লক্ষ্য। অশ্ব সম্মুখস্থ পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এক পার্শ্বে মদিনার কাসেদ। হানিফার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্র এবং পূর্ণতারকাসংযুক্ত নিশান হেলিয়া দুলিয়া ক্রমেই নিকটবর্তী হইল। গাজী রহমান উপস্থিত; প্রভুর সজল

চক্ষু, মুখভাব মলিন, নিকটে অপরিচিত কাসেদ, বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ, নিশ্চয়ই বিপদ! মহাবিপদ! বুঝি হোসেন ইহজগতে নাই।

গাজী রহমান! আপনার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত! মোহাম্মদ হানিফা ভ্রাতৃহারা জ্ঞাতিহারা হইয়া এক্ষণে জ্ঞানহারা উপক্রম হইয়াছেন। রক্ষার উপায় দেখুন। ভ্রাতৃশোক মহাশোক!

মোহাম্মদ হানিফা গদ গদ স্বরে বলিলেন, "গাজী রহমান, আর কারবালায় যাইতে হইল না, বিধির নির্বন্ধে ভ্রাতৃবর হোসেন শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। ইমাম বংশ সমূলে বিনাশ হইয়াছে। পরিজন মধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারাও দামেস্ক নগরে এজিদ-কারাগারে বন্দী। এইক্ষণ কি করি? আমার বিবেচনায় অগ্রের মদিনায় যাইয়া প্রভু মোহাম্মদের রওজা পরিদর্শন করি। পরে অন্য বিবেচনা।"

গাজী রহমান বলিলেন, "এই অবস্থায় মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। রাজা বিহনে সেখানেও নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। ইমাম বংশে কেহই নাই–একথা যথার্থ হইলে পুণ্যভূমি মদিনা যে এতদিন এজিদ-পদভরে দলিত হয় নাই–ইহারই বা বিশ্বাস কি? তবে অনিশ্চিতে অন্য চিন্তা নিরর্থক! মদিনাভিমুখে যাওয়াই কর্তব্য।"

পুনরায় মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতের লেখা খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। মদিনাভিমুখে গমনই যখন স্থির হইল; তখন বিশ্রামের কথা যেন অন্তরে আর উদয় না হয়। সৈন্যগণসহ আমার পশ্চাদগামী হাও।"

দিবারাত্রি গমন। বিশ্রামের কথা কাহারও মুখে নাই। এই প্রকার কয়েক দিন অবিশ্রান্ত গমন করিলে দ্বিতীয় কাসেমের সহিত দেখা হইল। দ্বিতীয় নিশান দেখিয়াই মোহাম্মদ হানিফা গমনে ক্ষান্ত দিলেন।

কাসেদ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া জোড়করে বলিল,–"বাদশাহ নামদার! দাসের অপরাধ মার্জনা হউক। আমি মদিনার কাসেদ।"

মোহাম্মদ হানিফা বিশেষ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

পূর্ব সংবাদ বাদশাহ-নামদারের অবিদিত নাই। তৎপরে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আর আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, বলিতেছে।–

"বাদশাহ-নামদার! আপনার ভ্রাতৃবংশে পুরুষ-পক্ষে কেবল মাত্র একজন জয়নাল আবেদীন জীবিত আছে। তিনি, তাঁহার মাতা, ভগ্নী, পিতৃব্য-পত্নী দামেস্ক নগরে বন্দী। দিনান্তে এক টুকরা শুষ্ক রুটি, এক পাত্র জল ভিন্ন আর কোন প্রকার খাদ্যের মুখ দেখিতে তাঁহাদের ভাগ্যে নাই। এজিদ এইক্ষণে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছে– সে কেবল আপনার সংবাদে। আপনার প্রাণ বিনাশ করাই এক্ষণে তাহার প্রথম কার্য। ওতবে অলীদকে লক্ষাধিক সৈন্যসহ সাজাইয়া মদিনার সীমায় পাঠাইয়া দিয়াছে। ওতবে অলীদ মদিনা আক্রমণ না করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় মদিনা-প্রবেশ-পথ রোধ করিয়া সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুতভাবে রহিয়াছে। অলীদ আপনার শিরচ্ছেদ করিয়া পরে মদিনার সিংহ াসনে এজিদ-পক্ষ হইতে বসিবে, ইহাই ঘোষণা করিয়াছে। এক্ষণে যাহা ভাল হয়, করুন।"

মোহাম্মদ হানিফা এবার এক নূতন চিন্তায় নিপতিত হইলেন। সহজে মদিনায় যাইবার আর সাধ্য নাই–প্রথমে যুদ্ধ, পরে প্রবেশ, তার পর মদিনাবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ।

গাজী রহমান বলিলেন, "তবে যুদ্ধ অনিবার্য। যেখানে বাধা সেই খানেই সমর, এত বিষম ব্যাপার! অলীদ চতুরতা করিয়া এমন কোন স্থানে যদি শিবির নির্মাণ করিয়া থাকে যে, সম্মুখে সুপ্রশস্ত সমতল-ক্ষেত্র নাই, শিবির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান নাই, জলের সুযোগ নাই সৈনিকদিগের দৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গন নাই, তবে তো মহা বিপদ! অগ্রেই গুপ্ত চর, চিত্রকর এবং কুঠারধারিগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "আমার মতি স্থির নাই, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করুন। তবে একমাত্র কথা যে, বিপদে, সম্পদে, শোকে, দুঃখে সর্বদা সকল সময়ে যে ভগবান–তাহারই নাম করিয়া চলিতে থাকুন। যাহা অদৃষ্টে আছে, ঘটিবে। আর এখান হইতে আমার আর আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ যাঁহারা যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে ইমামের অবস্থা, ইমাম-পরিবারের অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া কাসেদ পাঠাও। এ কথাও লিখিয়া দাও, যে পদাতিক, অশ্বারোহী, ধানুকী প্রভৃতি যত প্রকার যোধ যাঁহার অধীনে যত আছে, তাহাদের আহার সংগ্রহ করিয়া মদিনা-প্রান্তরে আসিয়া আমার সঙ্গে যোগদান করুন। ইরাক নগরে মসহাব কাক্কা, আম্ভাম নগরে ইব্রাহিম ওয়াদী, তোগান রাজ্যে অলিওয়াদের নিকটে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। আর আর মুসলমান রাজা যিনি যে প্রদেশে, যে নগরে রাজ্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাদের নিকটেও এই সমাচার লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। শেষে এই কয়েকটি কথা লিখিও যে, ভ্রাতৃগণ! যদি জাতীয় ধর্ম-রক্ষার বাসনা থাকে, জগতে মোহাম্মদীয় ধর্মের স্থায়িত্ব রাখিতে ইচ্ছা থাকে, কাফেরের রক্তে ইসলাম অস্ত্র রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা থাকে, আর প্রভু মোহাম্মদের প্রতি যদি অটল ভক্তি থাকে, তবে এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র আপন আপন সৈন্যসহ মদিনা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হও। প্রভু-পরিবারের প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইতেছে, সে বিষয় আলোচনা করিয়া এখন কেহ দুঃখিত হইও না। এখন ধর্মরক্ষা, মদিনার সিংহাসন রক্ষা, এজিদের বধ, হোসেন-পরিজনের উদ্ধার, এই সকল কথাই যেন জপমালার মন্ত্র হয়। এইক্ষণে কেহ চক্ষের জল ফেলিও না। কাঁদিবার দিনে সকলে একত্র হইয়া কাঁদিবে। শুধু আমরা কয়েক জনেই যে কাঁদিব, তাহা নহে; জগৎ কাঁদিবে। এ জগৎ চিরদিন কাঁদিবে। স্বর্গীয় দূত ইসরাফিল জীবনের জীবন-লীলা শেষ করিতে যে দিন ঘোর রোলে শিঙ্গা বাজাইয়া জগৎ সংহার করিবেন, সেই দিন পর্যন্ত জগৎ কাঁদিবে। দুঃখ করিবার দিন ধরা রহিল; এখন অস্ত্র ধর, শত্রু বিনাশ কর, মোহাম্মদীয় দিন ঐ শিক্ষাবাদন দিন পর্যন্ত অক্ষয়রূপে স্থায়িত্বের উপায় বিধান কর। আব্দুর রহমান! এ সকল কথা লিখিতে কখনও ভুলিও না।"

গাজী রহমান প্রভুর আদেশ মত 'শাহীনামা' পত্র, যাহা যাহার নিকট উপযুক্ত, তখনই লিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ক্রমে আসিয়া জুটিল। মন্ত্রিপ্রবর রাজাদেশে সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান অধ্যক্ষগণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে কাসেদ সকল প্রেরিত হইল। আবার গমনে অগ্রসর হইলেন। একদিন প্রেরিত গুপ্তচর ও সন্ধানী লোকদিগের সহিত দেখা হইল। সবিস্তার অবগত হইয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট স্থান অতি নিকট; উৎসাহে গমনবেগ বৃদ্ধি করা হইল।

ওততে অলীদ সৈন্যসহ মদিনা-প্রবেশ-পথের প্রান্তরে হানিফার অপেক্ষায় রহিয়াছে। একদা সায়াহ্নকারে একজন অনুচরসহ নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ু-সেবন-আশায় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইলেন। পাঠক! যেখানে মায়মুনার সহিত মারওয়ান নিশীথ সময়ে কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই পর্বত। হোসেনের তরবারির চাকচিক্য দেখিয়া যে পর্বতের গুহায় অলীদ লুকাইয়াছিলেন, এ সেই পর্বত! শৈলশিখরে বিহার করিবেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবেন, এই আশাতেই এখানে অলীদের আগমন। আশার অভ্যন্তরে যে একটু স্বার্থ না আছে, তাহাও নহে। স্বাভাবিক দৃষ্টির বহির্ভূত যদি কোন ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ অনুমান হয়, প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূর-দর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন। অশ্বতরীসকল সমতল-ক্ষেত্রে রাখিয়া কয়েকজন অনুচরসহ পর্বতে আরোহণ করিলেন। প্রথমে মদিনা নগরের দিকে যন্ত্রাশ্রয়ে ঈক্ষণ করিয়া দেখিলেন, নীলবর্ণ পতাকা-সকল উচ্চ মঞ্চে উড়িয়া হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। অন্যদিকে দেখিলেন, খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখাসকল বাত্যাঘাতে উন্মত্ত ভাব ধারণ করিয়া হোসেনের শোকে মহাশোক প্রকাশ করিতেছে। তাহার পর সম্মুখ দিকে ঈক্ষ করিতেই হস্ত কাঁপিয়া গেল। যন্ত্রটি সুবিধা মত ধরিয়া দেখিলেন, সন্দেহ ঘুচিল না। আবার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন, সন্দেহ ঘুচিয়া নিশ্চিত সাব্যস্ত হইল। এখন কথা, এ কাহার সৈন্য? এমন সুসাজে সুসজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে আসিতেছে,– ঐ সৈন্যশ্রেণী কাহার? তুরগগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে; অশ্বারোহীদের অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিবারই কি পরিপক্কতা, অস্ত্র ধরিবার বা কি পারিপাট্য, বেশভূষা, কান্তি, গঠন অতি চমৎকার মনোহর এবং নয়নের তৃপ্তিকর। ইহারা কে? শত্রু না মিত্র? আবার দূর-দর্শন যন্ত্রে চক্ষু দিয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন, "তোমরা একজন শীঘ্র শিবিরে যাইয়া শ্রেণীবিভাগের অধ্যক্ষগণকে সংবাদ দাও যে, অর্দ্ধচন্দ্র বা পূর্ণতারাসংযুক্ত পতাকা গগনে দেখা গিয়াছে, প্রস্তুত হও।"

আজ্ঞামাত্র একজন সহচর দ্রুতগতি তুরগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অলীদ আবার দূর-দর্শনে মনোনিবেশ করিলেন। আগন্তুক সৈন্যগণ আর অগ্রগামী হইতেছে না,–শ্রেণীবদ্ধমত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আরও দেখিলেন যে, একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তূণীর হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে টঙ্কারে দিলেন। অশ্বারাহী প্রতি লক্ষ্য করিতেই দেখিলেন, সে জাতীয় চিহ্নযুক্ত শুভ্র নিশান উড়াইয়া সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। সামরিক বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া দূতবরের বক্ষ লক্ষ্যে শির নিক্ষেপ করিবেন, কি উত্তোলন হস্ত ধনুর্বাণসহ সঙ্কুচিত করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে দূতবর পর্বত-পার্শ্ব হইতে চক্ষের নিমিষে তাঁহার শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। অলীদ চক্ষু ফিরাইয়া কেবল ধাবিত অশ্বের পুচ্ছসঞ্চালন আর নিশানের অগ্রভাগ মাত্র দেখিলেন।

কি করিবেন, এখনও কিছু সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাঁহার হিংসাপূর্ণ হৃদয় স্থির করিল যে, যে কৌশলেই হউক, মোহাম্মদীয়গণকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। নিশ্চয়ই মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় আসিতেছেন। হানিফার দূতকে গুপ্তভাবে বধ করিলে

কে জানিবে? কে জানিবে যে, এ কার্য একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে? যে শুনিবে, সেই বলিবে, কোন দস্যু কর্তৃক এরূপ বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া পুনরায় আপন আয়ত্তমত ধনুর্বাণ ধারণ করিলেন। মনে মনে বলিরেন, "পুনঃ এই পথে আসিলেই একবার দেখিব, দেখিব, দেখিব!" কিন্তু এই বলিতে বলিতেই তাঁহার কর্ণে দ্রুতগতি অশ্ব-পদ-প্রতিশব্দ প্রবেশ করিল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই অশ্ব, সেই নিশান, সেই দূত। দূতবরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিবেন, অলীদের এই উদ্যোগেই দূতবর তাঁহার লক্ষ্য ছাড়াইয়া বহু দূরে সরিয়া পড়িলেন, অলীদের হাতের তীর হাতেই রহিয়া গেল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, দূতবর আগন্তুক সৈন্যমধ্যে যাইয়া মিশিলেন। ওতবে অলীদ পর্বত-বিহার পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণসহ শিবিরে আসিবার জন্য শিখর হইতে অবরোহণ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফার প্রেরিত দূত অলীদ-শিবিরে অল্প সময় মধ্যে যাহা যাহা জানিয়া গিয়াছেন,সমুদয় মোহাম্মদ হানিফার গোচর করিয়া বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে মদিনায় যাওয়ার সাধ্য নাই। সৈন্যগণ বীরসাজে সজ্জিত–প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ওতবে অলীদ মহোদয় এক্ষণে শিবিরে নাই।"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে বিপক্ষ দূত শিবির-দ্বারা আসিয়া উপস্থিত। মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞার বিপক্ষ-দূত সমাদরে আহূত হইয়া শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া দূতবব বলিল, "বাদশাহ-নামদার! মহারাজ এজিদের আজ্ঞা এই যে, সংস্রবশূন্য নগরে প্রবেশ করিতে, বিশেষ সৈন্যসামন্ত সহ পর-রাজ্যে আসিতে স্থানীয় রাজার অনুমতি আবশ্যক। আপনি সে অনুমতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং আর অগ্রসর হইবেন না। আর এক পাদভূমি অগ্রসর হইলেই রাজপ্রতিনিধি মহাবীর অলীদ আপনার গমনে বাধা দিতে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন। আর আপনি যদি হোসেন পরিবারের সাহায্যের জন্য আসিয়া থাকেন, তবে ন্যূনতা স্বীকারপূর্বক স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেও যাইতে পারিবেন না; বন্দীভাবে দামেস্কে যাইতে হইবে।"

দূতবর নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া নতশিরে পুনরায় অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে গাজী রহমান বলিতে লাগিলেন,–"দূতবর! তোমার রাজ-প্রতিনিধি বীরবল অলীদ মহোদয়কে গিয়া বল, আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে না; হোসেনের পরিজনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হাসান-হোসেনের প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা সমুচিত প্রতিবিধান করিতে আমরা কখনই ভুলিব না। পৈতৃক দামেস্ক রাজ্য, মাবিয়ার এজিদ যাহা নিজ রাজ্য বলিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের অবমাননা করিয়াছে, তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব। মদিনায় প্রবেশ করিয়া আমাদের গতি ক্ষান্ত হইবে না। অলীদের লক্ষাধিক সৈন্যশোণিতে আমাদের চিরপিপাসু তরবারির শোণিতাপিপাসা মিটিবে না, এজিদের এক একটি সৈন্য-শরীর শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেও আমাদের তরবারির তেজ কমিবে না, ক্রোধ-নিবৃত্তি হইবে না। বন্দীভাবে আমাদিগকে দামেস্কে পাঠাইতে হইবে না–এই সজ্জিত বেশে, এই বীরবেশে বিজয়-নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় শত্রুবধ করিতে করিতে আমরা দামেস্ক নগরে প্রবেশ করিব।

আমাদের বিশ্রাম ক্লান্তি কিছুই নাই। এখন মদিনার প্রবেশ করিব। তুমি শিবিরে যাইতে না যাইতে দেখিবে—যুদ্ধনিশান উড়িয়াছে, আমরাও শিবিরের নিকটবর্তী।"

দূতবর নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার শিবির হইতে বহির্গত হওয়া মাত্রই সুনীল আকাশে মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে লোহিত ধ্বজা উড়িতে লাগিল। ঘোররবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কাড়া-নাকাড়া ডঙ্কা-ঝাঁঝরী শারদীয় ঘনঘটাকে পরাজয় করিয়া চতুর্দিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। তুরঙ্গসকল কর্ণ উচ্চ করিয়া পুচ্ছ গুচ্ছ স্বাভাবিক ঈষৎ বক্রভঙ্গীতে হ্রেষারবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যেরাও বীরদর্পে পদক্ষেপণ করিতে লাগিল। বহু দূর ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক, পরিজনের কারারোধ-বেদনা বা জয়নালের উদ্ধার-চিন্তার নাম এখন নাই। এখন একমাত্র চিন্তা—মদিনা প্রবেশ ও হযরত নূরনবী মোহাম্মদের রওজা 'জেয়ারত' (ভক্তির-দর্শন)। কিন্তু মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি নিশ্চিন্তভাবে সৈন্যশ্রেণীকে উৎসাহের দৃষ্টান্ত, সাহসের আদর্শ, বীরজীবনের উপমা দর্শন করাইয়া মহানন্দে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছেন। এজিদপক্ষেও সমর-প্রাঙ্গণ-সীমার নির্দিষ্ট লোহিত নিশান নীলাকাশে দেখা দিয়াছে। সৈন্যশ্রেণী সপ্তশ্রেণীতে পঞ্চ প্রকার ব্যূহ নির্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন ব্যূহ চতুষ্কোণে স্থাপিত, কোনব্যূহ পশু-পক্ষীর শরীরের আদর্শে গঠিত। আক্রমণ এবং বাধা উভয়ভাবেই অটল।

গাজী রহমান বলিলেন—"অলীদ যে প্রকার ব্যূহ নির্মাণ করিয়া আক্রমণ ও বাধা দিতে দণ্ডায়মান, এ সময় একটু বিবেচনা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষসৈন্য অধিক—তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মুখ-যুদ্ধে আমাদের আম্বাজী সৈন্যগণ সুদক্ষ। এত অধিক বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ব্যূহ ভেদ করিলেও আমাদের বিস্তর সৈন্যক্ষয় হইবে। কিছুক্ষণের জন্য শত্রুদিগকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করাই যুক্তিসঙ্গত। যদি অলীদের আর সৈন্য না থাকে, তবে অবশ্যই তাঁহাকে রচিত ব্যূহ ভগ্ন করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাইতে হইবে। একজন আম্বাজী সৈন্য যদি দশ জন কাফেরকে নরকে প্রেরণ করিয়া শহীদ হয়, সেও সৌভাগ্য"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানের বাক্যে অশ্ব-গতি রোধ করিলেন। ক্রমে সৈন্যগণও প্রভুকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া দণ্ডায়মান হইল।

গাজী রহমান বলিলেন, "কে দ্বৈরথ-যুদ্ধপ্রিয়? কা'র অস্ত্র অগ্রে শত্রুশোণিতপানে সমুৎসুক।"

অশ্বারোহী সৈন্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি অগ্রে যাইব।" মোহাম্মদ হানিফা সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, "প্রথম যুদ্ধ জাফরের?"

জাফর প্রভুর আদেশে নিস্কোষিত অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আহ্বানের শব্দ অলীদ-শিবিরে প্রবেশমাত্র মুহূর্তমাত্র বায়ুবেগে বিপক্ষদল হইতে একজন্য সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে! মদিনা-প্রবেশের আশা এই পরিশুষ্ক বালুকারাশিতে বিসর্জন দিয়া পলায়ন কর। ওরে! তোরা কি সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? হাসান, হোসেন, কাসেম যখন আমাদের হাতে বিনাশ হইয়াছে, তখন তোরা কোন সাহসে তরবারি ধরিয়াছিস? তোদের সৌভাগ্য-সূর্য কারবালা প্রান্তরে লোহিত বসন পরিয়া ইহকালের তরে একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। এখনও তোদের

অক্ষে নীল বসনই শোভা পায়; আর্তনাদ এবং বক্ষে করাঘাত করাই তোদের এখনকার কর্তব্য; রণভেরী বাজাইয়া আবার কি সাথে তরবারি ধরিয়াছিস? দুঃসময়ে লোকে যে বুদ্ধিহারা হইয়া আত্মহারা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তোরাই আজ দেখাইলে, জগৎ হাসাইলি! পিপীলিকার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহাই তোদের ভাগ্যে আছে। আর অধিক কি?"

আশ্বাজী বীর বলিলেন, "কথায় উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় আমাদের এখন নাই; সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যমদূত অস্থির হইতেছেন; আমার হস্তস্থিত অস্ত্র প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"যমদূর কোথায় রে বর্বর- দেখ যমদূত কে?" বলিয়াই অসির আঘাত! আঘাতে আঘাতে উড়িয়া গেল। এজিদ-সেনা লজ্জিত, মহা-লজ্জিত হইলেন। অশ্ব ফিরাইয়া পুনরায় আঘাত করিবার ইচ্ছায় যেমন তরবারি উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি তাঁহার বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া জাফরের সুতীক্ষ্ণ অসি চঞ্চলা চপলা সর্দৃশ চাকচিক্য দেখাইয়া চলিয়া গেল। অলীদ জাফরের তরবারির হাত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এদিকে দ্বিতীয় যোধ সময়ে আগত। সে আর টিকিল না, -যে তেজে আগত, সেই তেজেই খণ্ডিত। তৃতীয় সৈন্য উপস্থিত- সে আর তরবারি ধরিল না, -বর্শা ঘুরাইয়া জাফরের প্রতি নিক্ষেপ করিল। জাফর সে আঘাত বর্মে উড়াইয়া পদাঘাতে বিপক্ষকে অশ্ব হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ বীর গদাহস্তে আসিয়া জাফরকে বলিলেন, "কেবল তরবারি খেলা আর বর্শা ভাঁজাই শিখিয়াছ, বল তো ইহাকে কি বলে?" গদা বজ্রবৎ জাফরের মস্তকে পড়িল। জাফর বাম হস্তে বর্ম ধরিয়া গদার আঘাত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোষে তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। মহাক্রোধে তরবারি আঘাত করিয়া বলিলেন, "যা কাফের, তোর গদা লইয়া নরকে যা" উভয় দলের লোকই দেখিল যে, গদাধারী যোধ-শরীর দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্বের দুই দিকে পড়িয়া গেল।

ক্রমে দামেস্কের সত্তরজন সেনাকে একা জাফর শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এখনও ব্যূহ পূর্ববৎ রহিয়াছে। কিন্তু আর কেহই দ্বৈরথযুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না। জাফর চক্রাকারে অশ্ব চালাইতেছেন,- অশ্ব গলদঘর্ম হইয়া ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে।

ওতবে অলীদ মহাক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "একটি লোক সত্তর জনের প্রাণ বিনাশ করিল আর তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! দ্বৈরথযুদ্ধ তোমাদের কার্য নহে! প্রথম ব্যূহের সমুদয় সৈন্য যাইয়া হানিফার সৈন্যের মস্তক আনয়ন কর।"

আজ্ঞামাত্র জাফরকে সৈন্যদল ঘিরিয়া ফেরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফার আশাও পূর্ণ হইল; গাজী রহমানকে বলিলেন, "এই সময়- এই উপযুক্ত সময়!" সিংহগর্জনে মোহাম্মদ হানিফা আসিয়া জাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, অশ্বের দাপটে দামেস্ক-সৈন্যগণ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

অলীদ দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফা স্বয়ং জাফরের পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় ব্যূহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "উভয়কে ঘিরিয়া কেবল তীর নিক্ষেপ কর। তরবারির আয়ত্তের মধ্যে কেহই যাইও না।"

আজ হানিফার মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক-চিহ্ন বিপক্ষশোণিতে শীতল করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া কি করিবে। তরবারির আঘাতে,

দুলদুলের* পদাঘাতে, জাফরের বর্শায় দামেস্ক-সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া যাইতে লাগিল, –মরুভূমিতে রক্তের স্রোত চলিল। জগৎ-লোচন রবি সেই রক্তস্রোতের প্রতিবিম্ব আরক্তিম দেহে পশ্চিম গগনে লুক্কায়িত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা এবং জাফর শত্রু-বিনাশে বিরত হইয়া বেষ্টনকারী সৈন্যের এক পার্শ্ব হইতে কয়েক জনকে লোহিত বসন পরাইয়া সেই পথে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য সম্মুখে দাঁড়ায়? কত তীর, কত বর্শা, মোহাম্মদ হানিফার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, –কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ওতবে অলীদ প্রথম যুদ্ধ-বিবরণ, হানিফার বাহুবলের পরিচয়, তাঁহার তরবারি-চালনের ক্ষমতা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া দামেস্ক নগরে এজিদের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন।

দশম প্রবাহ

বিশ্রামদায়িনী নিশার দ্বিযাম অতীত। অনেকেই নিদ্রায় ক্রোড়ে অচেতন। এ সময় কিন্তু আশা, নিরাশা, প্রেম, হিংসা, শোক, বিয়োগ, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিকার এবং অভিমানযুক্ত হৃদয়ের বড়ই কঠিন সময়। সে হৃদয়ে শান্তি নাই– চক্ষে নিদ্রা নাই। ঐ এজিদের মন্ত্রণাগৃহে দীপ জ্বলিতেছে, প্রাঙ্গণে, দ্বারে শাণিত কৃপাণহস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত, সন্ধানে গুপ্তচর সম্মুখে উপস্থিত।

মারওয়ান আগন্তুক গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দিকে যাইতে দেখিলে? আর সন্ধানেই বা কি জানিতে পারিলে?"

"আমি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছি, তাহারা হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছে।"

"মোহাম্মদ হানিফা যে মদিনায় গিয়াছে, একথা তোমাকে কে বলিল?"

"তাঁহাদের মুখেই শুনিলাম। মোহাম্মদ হানিফা প্রথমতঃ কারবালাভিমুখে যাত্রা করেন; পরে কি কারণ কারবালায় না যাইয়া মদিনায় গিয়াছেন, সে কথা অপ্রকাশ।"

"তবে কি যুদ্ধ বাধিয়াছে?"

"যুদ্ধ না বাঁধিলে সাহায্যে কিসের?"

"আচ্ছা, কত পরিমাণ সৈন্য?"

"অনুমান নিশ্চয় করিতে পারি নাই; তবে তুরস্ক ও তোগান প্রদেশেরই বিস্তর সৈন্য। এই দুই রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ও আছেন।"

এজিদ বলিলেন, "কি আশ্চর্য! ওতবে অলীদ কি করিতেছেন? ভিন্ন দেশ হইতে হানিফার সাহায্যে সৈন্য যাইতেছে, সৈন্য-সামন্তের আহারীয় পর্যন্ত যাইতেছে, ইহার কি কোন সংবাদ অলীদ প্রাপ্ত হন নাই? মোহাম্মদ হানিফ স্বয়ং মহাবীর, তাহার উপরেও এত সাহায্য! শেষ যাহাই হউক, ঐ সকল সৈন্য যাহাতে মদিনায় যাইতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ঐ সকল সৈন্য ও আহারীয় সামগ্রী যদি মদিনায় না যায়, তাহা হইলেও অনেক লাভ। এমন কোন বীরপুরুষই কি দামেস্ক রাজধানীতে নাই যে উপযুক্ত সৈন্য লইয়া এই রাত্রেই উহাদিগকে আক্রমণ করে, আর না হয় গমনে বাধা দেয়!"

---

* হানিফার অশ্বের নাম।

সীমার করজোড়ে বলিলেন, "বাদশাহ-নামদার! চির আজ্ঞাবহ দাস উপস্থিত, কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা। যে হস্তে হোসেন-শির কারবালা-প্রান্তর হইতে দামেস্কে আনিয়াছি, সে হস্তে তোগানের ভূপতি ও তুরস্কের সম্রাটকে পরাস্ত করা কতক্ষণের কার্য?"
এজিদের চিন্তিত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। মলিনমুখে ঈষৎ হাসির আভা প্রকাশ পাইল। তখনই সৈন্য-শ্রেণীর অধিনায়ককে সীমারের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলেন।
সীমার হানিফার সাহায্যকারীদিগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্য গুপ্তচরসহ ঐ নিশীথ সময়েই যাত্রা করিলেন।
এজিদ বলিলেন, "মারওয়ান! মোহাম্মদ হানিফা একাদিক্রমে শত বর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমার সৈন্যবল ক্ষয় করিতে পারিবে না। যে পরিমাণ সৈন্য নগর হইতে বাহির হইবে, তাহার দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পূর্বেই আদেশ করিয়াছি। ওদিকে যুদ্ধ হউক, এদিকে আমরা জয়নাল আবেদীনকে শেষ করিয়া ফেলি। জয়নাল আবেদীনের মৃত্যু ঘোষণা হইলে হানিফা কখনই দামেস্কে আসিবে না। কারণ জয়নাল-উদ্ধারই হানিফার কর্তব্য কার্য, সেই জয়নালই যদি জীবিত না থাকিল, তবে হানিফার যুদ্ধ বৃথা। দ্বিতীয় কথা, হানিফার বন্দী অথবা মৃত্যু আমাদের পক্ষে উভয়ই মঙ্গল। কিন্তু যদি জয়নাল জীবিত থাকে, আর হানিফাও জয়লাভ করে, তাহা হইলে মহা সঙ্কট ও বিপদ। এ অবস্থায় আর জয়নালকে রাখা উচিত নহে। আজ রাত্রেই হউক, কি কাল প্রত্যুষেই হউক, জয়নালের শিরচ্ছেদ করিতেই হইবে।"
"আমি ইহাতে অসম্মত নহি, কিন্তু ওতবে অলীদের সংবাদ না পাইয়া জয়নাল বধে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ, তা আজ আমি স্থির বলিতে পারিলাম না। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া দামেস্ক সিংহাসনের অধীনতা স্বীকারপূর্বক কিছু কিছু কর যোগাইলে দামেস্ক রাজ্যের যত গৌরব, হোসেন-বংশ একেবারে শেষ করিয়া একচ্ছত্ররূপে মক্কা মদিনার রাজত্ব করিলে কখনও তত গৌরব হইবে না।
"সে কথা যথার্থ, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ অনেক। কারণ জয়নাল প্রাণরক্ষার জন্য আপাততঃ আমার অধীনতা স্বীকার করিলেও করিতে পারে, কিন্তু সে যে বংশের সন্তান, তাহাতে কালে তাহার পিতা, পিতৃব্য এবং ভ্রাতৃগণের দাদ উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আমার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধঘোষণা করিবে না, ইহা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।"
"যাহা হউক, মহারাজ! জয়নাল-বধ বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ আগামী কল্য প্রাতে যাহা হয়, করিব।"

একাদশ প্রবাহ

এজিদের গুপ্তচরের অনুসন্ধান যথার্থ। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয় সসৈন্য মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনাভিমুখে যাইতেছেন এবং দিনমণি অস্তাচলে গমন করায় গমনে ক্ষান্ত দিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রহরিগণ ধনুহস্তে শিবির রক্ষার্থে দণ্ডায়মান। শিবিরের চতুর্দিকে আলোকমালা সজ্জিত। ভূপতিগণ স্ব স্ব নিরুপিত স্থানে অবস্থিত। শিবির-মধ্যে বিশ্রাম, আয়োজন, রন্ধন, কথোপকথন, স্বদেশ-বিদেশের

প্রভেদ, জলবায়ুর গুণাগুণ, দ্রব্যাদির মূল্য, আচার-ব্যবহারের আলোচনা, নানা প্রকার কথা এবং আলাপের স্রোত চলিতেছে।

ওদিকে সীমার সসৈন্য মহাবেগে আসিতেছেন। সীমারের মনে আশা অনেক। হোসেনের মস্তক দামেস্কে আনিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন, আবার এই বৃহৎ কার্যে কৃতকার্য হইতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবেন। ক্রমে মানমর্যাদা বৃদ্ধির সহিত পদবৃদ্ধির নিতান্ত ই সম্ভাবনা। যদি বিপক্ষদলের সহিত দেখা হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিবেন কি নিশাচর নরপিশাচের ন্যায় গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবেন, এ চিন্তাও অন্তরে উদয় হইয়াছে। কি করিবেন, আজ মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ পরিচয়ে দণ্ডায়মান হইবেন, কি দুস্যনামে জগৎ কাঁপাইবেন, এ পর্যন্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যাইতে যাইতে আগন্তুক রাজগণের শিবির-বহির্দ্বারস্থ আলোকমালা দেখিতে পাইলেন। স্থায়ী গৃহ নহে, চিরস্থায়ী রাজপুরী নহে, – নিশোপযোগী বস্ত্রাবাস মাত্র। তাহারই সম্মুখস্থ আলোকমালার পরিপাট্য দেখিয়া সীমার আশ্চর্যান্বিত হইলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নয়নের তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। শিবিরে চতুষ্পার্শ্বেই প্রহরী, হস্তে তীরধনু, বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রহরীরা আপন আপন কার্য করিতেছে। সাবধানের মার নাই। সীমারের পদপ্রদর্শক, গুপ্তচরদিগের হস্তস্থিত দীপশিখা শিবির রক্ষীদিগের চক্ষে পড়িয়া মাত্র তাহারা পরস্পর কি কথা বলিয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিল। সীমার-দলের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব দিয়া সমযোগে দুইটি শর বজ্রশব্দে চলিয়া গেল। পাষাণ-হৃদয় সীমারের অঙ্গ শিহরিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমেই সুতীক্ষ্ণ বাণ উপর্যুপরি সীমার-সৈন্য-মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। শিবির-মধ্যে সংবাদ রটিয়া গেল যে, দস্যুদল অগ্নি জ্বালিয়া শিবির লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। তাহাদের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, অল্প সময়-মধ্যে শিবির আক্রমণ করিবে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের প্রজ্জ্বলিত আলোকাভায় অস্ত্রের চাকচিক্য, অশ্বের অবয়ব, সৈন্যের সজ্জিত বেশ সকলই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তমোময়ী নিশার প্রতিবন্ধকতায় নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারিলেন না– দস্যু কি রাজসৈন্য। গুপ্তসন্ধাণীরাও সন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।– মহাসঙ্কট! সীমারের দুইটি চিন্তার একটি নিষ্ফল হইল। দস্যুভাবে আক্রমণ করিতে আর সাহস হইল না। প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া রণবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

আর সন্দেহ কি? আগন্তুক সৈন্যদল জনৈক দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর অভিমত হইলে, কাহারও কাহারও অমত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "এই দল প্রথম দস্যুভাবে, শেষে প্রকাশ্যে রণবাদ্য বাজাইয়া আসিয়াছে, ইহাদিগকে বিশ্বাস নাই। সমর-পদ্ধতির চিরপ্রচলিত বিধি, এই আগন্তুক শত্রুর নিকট আশা করা যাইতে পারে না। এই দলের অধিনায়ক খ্যাতনামা বীর হইলেও এইক্ষণে তিনি নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, অতএব কখনই উহার নিকট দূত পাঠান কর্তব্য নহে।"

শিবিরস্থ প্রায় সমস্ত লোকই দেখিলেন যে, আগন্তুক দল ক্রমে তিন দলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ ও বামে দুই দল চলিয়া গেল, এক দল স্থিরভাবে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। নিশীথ সময়ে যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর! শিবিরস্থ মন্ত্রিদল মন্ত্রণায় বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে কেবল আত্মরক্ষা, নিশাবসান হইলে চক্ষে দেখিয়া যাহা বিবেচনা হয়, যুক্তি

করিব। তবে রক্ষীরা আত্মরক্ষা ও শত্রুগণের আক্রমণে বাধা জন্মাইতে কেবল তীর ধনুকে যাহা করিতে পারে, তাহাই করুক; নিশাবসান না হইলে অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে না। যতক্ষণ প্রভাত-বায়ু বহিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিতে থাকুক। ইহারা কে, কেন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ধান না লইয়া শত্রুদল না বুঝিয়া আক্রমণ বৃথা। অনিশ্চিত অপরিচিত আগন্তুক শত্রুর সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নহে।

সীমার-প্রেরিত সৈন্যদল দুই পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইতে পুনঃ একত্র মিশিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রমেই অগ্রসর, ক্রমেই আক্রমণের উদ্যোগ।

এ যুদ্ধ দেখে কে? এ বীরগণের প্রশংসা করে কে? সীমারের বাহাদুরীর যশোগান মুক্তকণ্ঠে গায় কে? জাগে নক্ষত্র, জাগে নিশা, জাগে উভয় দলের সৈন্যদল। কিন্তু দেখে কে?

সীমার-দল এবং তাহার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দল অগ্রসর ক্ষান্ত হইল। আর পদবিক্ষেপে সাহস হইল না। শিবিরের চতুর্দিকে হইতে অনবরত তীর আসিতে লাগিল। সীমার-পক্ষীয় বিস্তার সৈন্য তীরাঘাতে হত আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। উভয় দলই হস্তে নিশাদেবীকে তাড়াইয়া উষার প্রতীক্ষা করিতেছেন। গগণের চিহ্নিত নক্ষত্র প্রতিও বার বার চক্ষু পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে শুকতারা দেখা দিল, শিবির-রক্ষীদিগের তীরও তূণীরে উঠেল। কারণ প্রভাতীয় উপাসনার সময় প্রায় সমাগত; এ সময় অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিপক্ষদল তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেও সীমার-সৈন্য এক পদ অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। সীমারের জ্বলন্ত উত্তেজনা- বাণীতেও তাহাদের হস্তপদ আর উঠিল না, সকলেরই প্রভাতের প্রতীক্ষা।

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল দেখিতেছেন, শিবিরের চতুর্দিকেই বিপক্ষ সৈন্য, আপনারা এক প্রকার বন্দী! এ আগন্তুক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে মদিনা যাওয়া কঠিন। উভয় দলই উষা-দেবীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপ-শিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল- ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাত বায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী উষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া পূর্বদিক হইতে রজনী দেবীকে সরাইয়া দিনমণির আগমন-পথ পরিস্কার করিয়া দিলেন; উভয় দলই পরস্পরের চক্ষে পড়িল।

সীমার-পক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে শিবিরের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা যে উদ্দেশ্যে যেখানে যাইতেছ, ক্ষান্ত হও! যদি প্রাণের আশা থাকে, গমনে ক্ষান্ত হও- আর যাইতে পারিবে না। যদি প্রাণের আশা থাকে, গমণে ক্ষান্ত হও- আর যাইতে পারিবে না। যদি চক্ষু থাকে, তবে চাহিয়া দেখ, তোমরা মহারাজ এজিদের প্রধান বীর সীমারের কৌশলে এক্ষণে বন্দী! পরের জন্য কেন প্রাণ হারাইবে? তোমাদের সহিত মহারাজ এজিদের কোন প্রকারের বাদ-বিসংবাদ নাই। তোমাদের কোন বিষয়ে অভাব কি অনটন হইয়া থাকে, বল- আমরা পূরণ করিতে বাধ্য আছি। মনে মনে প্রাণ লইয়া স্ব স্ব রাজ্যে গমন কর। মদিনাভিমুখে যাইবার কথা আর মুখে আনিও না। যদি

এই সকল কথা অবহেলা করিয়া মদিনাভিমুখে যাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও, তবে জানিও মরণ অতি নিকটে। এখন তোমাদের ভাল-মন্দের ভার তোমাদের হস্তে।"

শিবিরবাসীদের পক্ষ হইতে কেহ তাহার নিকট আসিল না; কেহ তাহার উত্তর করিল না। কিন্তু কথা শেষের সহিত লাখে লাখে ঝাঁক ঝাঁক তীরসকল গগণ আচ্ছন্ন করিয়া স্বাভাবিক শন শন শব্দে আসিতে লাগিল। আক্রমণ এবং বাধার আশা অতি অল্প সময় মধ্যেই সীমারের অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া গেল। সীমারের সৈন্যগণ আর তিষ্টিতে পারিল না। আঘাত সহ্য করিতেছে, মরিতেছে, কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে, রক্তে বমন করিতেছে, বক্ষ হইতে রক্তের ধারা ছুটিতেছে, চক্ষু উলটাইয়া পড়িতেছে, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মহা অস্থির হইয়া পলাইতেছে, আবার কেহ ধরাশায়ী হইয়া নাকে মুখে শোণিত উদ্বগিরণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

সীমারের চাতুরী বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন! সন্ধির প্রস্তাবে দূরত প্রেরণ করিলেন। শিবিরস্থ সৈন্যগণের সুতীক্ষ্ণ তীরে তৃণীরে প্রবেশ করিল, ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

সীমার-প্রেরিত দূতবরের প্রার্থনা এই যে, "আমরা বহু দূর হইতে আপনাদের অনুসরণে আসিয়া মহাক্লান্ত হইয়াছি। আজিকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক, –আগামী প্রভাতে আমরা প্রস্তুত হইব। যদি বিবেচনা হয়, তবে বিনা যুদ্ধে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিব। আমরা মহাক্লান্ত।"

"শিবিরস্থ মন্ত্রিদলমধ্যে তুর্কীর মন্ত্রী বলিলেন, "আমরা সম্মত হইলাম, ক্লান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিলে অস্ত্রের অবমাননা করা হয়। আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তোমরা পথশ্রান্তি দূর কর।"

সীমার-দূত যথাবিধি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

সীমার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে সীমারের কথা ফুটিল– প্রকাশ্য যুদ্ধে পারিব না। কখনই পারিব না। এই তীরের মুখে আমরা টিকিতে পারিব না। কৌশলে না হয় অর্থে কার্যসিদ্ধি হইবে, বাহুবলের আশা বৃথা, সীমার উঠিলেন। পরিচালকগণকে বলিলেন, "আমরা এই সকল যুদ্ধসজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, বেশভূষা রাখিয়া দাও, যদি কখনও অস্ত্র হস্তে লইবার উপযুক্ত হই, তবে লইব। নতুবা এই রাখিলাম। সীমার আর উহা স্পর্শ করিবে না। যুদ্ধসাজ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের উপযুক্ত নহে, তুরস্ক ও তোগানের সৈন্যগণই উহার যথার্থ অধিকারী।"

দ্বাদশ প্রাবহ

তুমি না সেনাপতি! ছি ছি সীমার! তুমি যে এক্ষণে এজিদের সেনাপতি! কি অভিমানে বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছ? উচ্চ পদ লাভ করিয়াও কি তোমার চির নীচ স্বভাব যায় নাই? ছি ছি! সেনাপতির এই কার্য? বল তো? আজ কোন কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত কমলগুচ্ছসকল গোপন হরণ করিতে ছদ্মবেশী হইলে? কি অভিপ্রাণে অঙ্গে মলিন বসন, –স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, –শিরে জীর্ণ আস্তরণ? এত কপটতা

কাহার জন্য? তোমার অন্তরের কপাট তুমি খুলিয়া দেখ, দেখ তো বাহ্যিক বেশের সহিত কাহার কোন বর্ণের সম্মিলন আছে কি না? মনের কথা খুলিয়া বল তো, তোমার পূর্ব কথার সহিত কোন কথার সমতা আছে কি না? ও হস্তে আর অস্ত্র ধরিবে না, তাহাই কি সত্য? সেই অভিমানেই কি এই বেশ? আজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ বলিয়াই কি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী? কিন্তু সীমার, একটি কথা! সূর্যদের অস্তাচল গমন করিয়া দশ দিনের মধ্যে আর জগতে আসিবে না, –বহু পরিশ্রমের পর কিছু বিশ্রাম করিবেন। বৎসর কাল আর বিধুর উদয় হইবে না, তাঁহার ক্রোড়স্থ মৃগ শিশুটি হঠাৎ ক্রোড়স্থলিত হইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে তিনি মহাকাতর! এ সকল অকথা, স্বভাবের বিপরীত কথাও বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু সীমার, তোমার বাহ্যিক বৈরাগ্যভাব দেখিয়া অন্তরে বিরাগ, সংসারে ঘৃনা, ধর্মে আস্থা জন্মিয়াছে, ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। সূর্যদের মধ্যগগনে– উত্তাপ প্রখর! তুমি একাকী কোথায় যাইতেছ? ওদিকে তোমার প্রয়োজন কি? ওরা যে তোমার শত্রু, শত্রু-শিবিরের দিকে এ বেশ কেন?

সীমার অতি গম্ভীরভাবে যাইতেছেন। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেই প্রহরিগণ বলিল, "কোন শ্রেণীর প্রবেশের অনুমতি নাই– তফাৎ।" সে দ্বার হইতে বিফলমনোরথ হইয়া অন্য দ্বারে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত তাড়াইয়া দিল। নিরাশ হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত। সে দ্বারের প্রহরিগণ নানা প্রকার কথার তরঙ্গ উঠাইয়া আলাপে মন দিয়াছিল। সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে প্রহরি তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কো অধ্যক্ষ মহামতি বারণ করিলেন এবং বলিলেন, "ফকির কি চাহে জিজ্ঞাসা কর।"

এ দ্বার তুর্কীদিগের তত্ত্বাবধানে। জিজ্ঞাসা করিলে সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া বলিলেন, "আমি সংসারত্যাগী ফকির। আমার কোন আশা নাই, কিছুই চাহি না। আপনারা কে–কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, জানিতে বাসনা, আর অন্য কোন রূপ আশা আমার নাই।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি মহাধার্মিক। আশীর্বাদ করুন, আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য হইয়া হাসিমুখে যেন স্বদেশে ফিরিয়া যাই, এই মাত্র বলিলাম। আর কোন কথা বলিব না, তবে আপনি অনুমানে যত দূর বুঝিতে পারেন।

"আমি অনুমানের কি বুঝিব, আমি তো অন্তর্যামী নহি।"

"হযরত! কি করিব! প্রভুর আদেশ অগ্রে প্রতিপাল্য, ইহা আপনি জানেন।"

"তাহা জানি, –কিন্তু যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই নিজ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কুচিত।"

"আপনি যাহা বলেন, আমি বলিব না, –এ সম্বন্ধে আপনার কথার আর উত্তর করিব না, অন্য আলাপ করুন।"

"অন্য আলাপ কি করিব? ঈশ্বর–নিয়োজিত-কার্যে কেহ বাধা দিতে পারে না।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ।"

"আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র; ইচ্ছা হয় বলিবেন, ইচ্ছা না হয়, বলিবেন না; আর আমি ইহাও বলি, যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন সাহায্য হয়– আমি প্রস্তুত আছি। পরোপকার করিতে করিতেই জীবন শেষ করিয়াছি। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেরই আমি

ভক্ত। সামান্য উপকার করিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সুখী হইব। পরোপকার- পরকার্য করাই আমার স্বভাব এবং ধর্ম। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? পরোপকারের ন্যায় পূণ্য আর কি আছে? ভাবিতে পারেন, আমি পথের ভিখারী–এক মুষ্টি অন্নের জন্য সর্বদা লালায়িত। কিন্তু সে ভাব অজ্ঞ লোকের হৃদয়ে উদয় হওয়াই সম্ভব। আপনার ন্যায় মহান হৃদয়ে কি সে ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে?"

"তবে আপনি কিছু বলিলেন, আমার দ্বারাও কিছু বলাইবেন?"

"আপনি কিছু বলুন আর না বলুন, আমি দুই একটি কথা বলিব।"

"বলুন আপনার কথা।"

"তবে কি গোপনে বলিবেন?"

"ইচ্ছা তো তাহাই। আমার মঙ্গলের জন্য আমি ভাবি না, চিন্তাও করি না। পরহিত-সাধনই আমর কর্তব্য কার্য, নিত্য নিয়মিত ব্রত।"

"আচ্ছা চলুন, আমি আমিই আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি যাইবার সময় সঙ্গীদিগকে সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন, "আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আমরা ঐ বৃক্ষের আড়ালে কথাবার্তা কহিব। তোমরা আমাদের অদৃশ্যভাবে বিশেষ সতর্কে সজ্জিতভাবে দূরে থাকিবে।"

সৈন্যাধ্যক্ষ সীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পূর্বকথিত বৃক্ষ-আড়ালে দণ্ডায়মান হইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু কথাগুলি বড়ই মৃদু মৃদু ভাবে চলিল। অপরের শুনিবার ক্ষমতা রহিল না। হস্ত-চালনা, মুখ-ভঙ্গী, মস্তক-হেলন, হাঁ–না–মোহাম্মদ হানিফা, এজিদ মহারাজ, অসংখ্য ধন, লাভের জন্য চাকুরী, –আত্মীয় নয়, –ভ্রাতা নয়– লাভ কি? আপন লাভ ইত্যাদি। অনেক বাদানুবাদের পর সৈন্যাধ্যক্ষ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বিশ্বাস কি?"

সীমার বলিলেন, "অগ্রে হস্তগত, পরে ধৃত, শেষে শিবির ত্যাগ, –আবার ত্যাগ, পরেই পদলাভ। আপনার কথাও শুনিলাম। আমার চিরব্রত হিত কথাও শুনাইলাম! এখন ভাবিয়া দেখুন, লাভালাভ কি?"

"তাহা তো বটে, কিন্তু শেষে একূল ওকূল দু'কূল না যায়।"

"না–না, দুই কূল যাইবার কথা কি? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বিশ্বাস না হয়, আমিই অগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করি। সন্ধ্যার পর একটু ঘোর অন্ধকার হইলে আপনি এই নির্দিষ্ট স্থানে আসিবেন। যে কথা সেই কার্য, হস্তগত হইলেও কি মনের সন্দেহ দূর হইবে না?"

"সে তো বটে, সে কথা তো বটে; কিন্তু শেষে কি ঘটে বলিতে পারি না।"

"আর কি ঘটিবে? আপনারাই সব, আপনরাই বাহুবল।"

"তা যাহা হউক, আপনি কৌশল করিয়া আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন না।"

"যদি তাহাই বিবেচনা করেন, তবে আপনিই ঠকিবেন। আমি এখন আর কিছুতেই কিছূ বলিব না। কেবল এই বলিব যে, সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা টানিয়া জগৎ অন্ধকার করিলেই আপনাকে যেন এখানে পাই। আমি বিদায় হইলাম। – নমস্কার।"

"আপনি বিদায় হইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে অশান্তির বীজ রোপণ করিয়া গেলেন।"

সীমার এস্তপদে আর এক পথে স্বসৈন্য মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি মহোদয়ও অতি মৃদু মৃদুভাবে পদ বিক্ষেপ করিতে করিতে শিবিরে। আসিলেন; প্রহরীদ্বয়ও কিঞ্চিৎ পরে শিবির আসিল। ধিক রে তুর্কী সেনাপতি! ধিক রে অর্থ!

এয়োদশ প্রবাহ

কে জানে, কাহার মনে কি আছে? এই অস্থি, চর্ম, মাংসপেশী-জড়িত দেহের অন্তরস্থ হৃদয়খণ্ডে কি আছে– তা কে জানে? ভূপালদ্বয় শিবির-মধ্যে শয়ন করিয়া আছে–রজনী ঘোর অন্ধকার, শিবিরস্থ প্রহরিগণ জাগরিত, –হঠাৎ চতুর্থ দ্বারে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ঘোর আর্তনাদ 'মার' 'ধর' 'কাট' 'জ্বালাও' ইত্যাদি রব উঠিল। যাহারা জাগিবার তাহারা জাগিয়াছিল; তাহারা ঐ সকল শব্দ ও গোলযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহারা ঘোর নিদ্রার ভাগেই পড়িয়া রহিল। যাহারা যথার্থ নিদ্রায় অচেতন ছিল, তাহারা ব্যস্তসমস্তে জাগিয়া উঠিল, তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল; কোথায় অস্ত্র, কোথায় অশ্ব, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অগ্নিশিখা সহস্য প্রকারে ধুম উদিগরণ করিতে করিতে উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। মহাবিপদ! কার কথা কে শুনে, কেই বা ভূপতির অন্বেষণ করে।

ভূপতিগণের মধ্যে যিনি সৈন্যগণের কোলাহল, অগ্নির দাহিকাশক্তির আরাবে জাগরিত হইয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই মরণ জানিয়া মনে মনে ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ করিলেন। স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই– কঠিনভাবে বস্ত্রে মুখ বন্ধ। শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি নাই– হস্ত পদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যাহারা বাঁধিল, তাহারা সকলেই পরিচিত, কেবল দুই একটি মাত্র অপরিচিত। কি করিবেন, কোন উপায় নাই! মহা মহা বীর হইয়াও হস্তপদ-বন্ধন-প্রযুক্ত কোন ক্ষমতা নাই। দেখিতে দেখিতে চক্ষুদ্বয়ও বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিল, ক্রমে শয্যা হইতে শূন্যে শূন্যে কোথায় লইয়া চলিল।

শিবির-মধ্যে যাহারা যথার্থ নিদ্রিত ছিল তাহারা অনেকেই জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা কেহই মরিল না, শিবিরেও থাকিল না, সীমার-দলে মিশিয়া গেল। অবশিষ্টের মধ্যে কে জ্বলন্ত হুতাশন নিবারণ করে? কে প্রভুর অন্বেষণ করে? কে মন্ত্রীদের সন্ধান লয়? আপন আপন প্রাণ লইয়াই মহা ব্যস্ত!

ভূপতিদ্বয়কে বন্ধন-দশাতেই শিবিরে লইয়া সীমার নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন। বন্দীদ্বয়ের বন্ধন, চক্ষের আবরণ মোচন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইলেন। গায় গায় প্রহরী। পদমাত্রও হেলিবার সাধ্য নাই। চক্ষে দেখিলেন যে, তাঁহাদের কতক সৈন্য ঐ দলে দণ্ডায়মান, –মহাহর্ষে বক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান– কিন্তু সীমারের আজ্ঞাবহ।

সীমার বলিলেন, "আপনারা মহারাজ এজিদের বিরুদ্ধে হানিফার সাহায্যে মদিনা যাইতেছেন, সেই অপরাধে অপরাধী এবং আমার হস্তে বন্দী। মহারাজ এজিদ স্বয়ং আপনাদের বিচার করিবেন, ফলাফল তাঁহার হস্তে। আমি আপনাদিগকে এখনই দামেস্কে লইয়া যাইব। আপনারা বন্দী।" এই বলিয়া ভূপতিদ্বয়কে পুনরায় বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া দরবার ভঙ্গ করিলেন।

সীমার-শিবিরে আনন্দের লহরী ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের প্রতীক্ষা। –গত রজনীতে সীমার প্রভাতের প্রতীক্ষা। শিবিরস্থ সৈন্য, যাহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহাদেরও প্রভাতের প্রতীক্ষা। এ প্রভাত কাহার পক্ষে সুপ্রভাত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দগ্ধীভূত শিবিরে অগ্নি এখনও নির্বাণ হয় নাই। কত সৈন্য নিদ্রার কোলে অচেতন অবস্থায় পুড়িয়া মরিয়াছে, কত লোক, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ছটফট করিতেছে। ভূপতিগণের অবস্থা কি হইল, তাঁহারা পুড়িয়া খাক হইয়াছেন, কি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, –পলায়িত সৈন্যগণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। যাহাদের সম্মুখে ভূপতিগণকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা কে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনও জানা যায় নাই।

আজ সীমারের নানা চিন্তা। এ চিন্তার ভাব ভিন্ন, আকার ভিন্ন, প্রকার ভিন্ন। কারণ– সুখের চিন্তার ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই। যে কার্যভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া দামেস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, সর্বতোভাবে তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া মহা গোলযোগ করিতেছে। ধনলাভ, মর্যাদাবৃদ্ধি, কি পদবৃদ্ধি, কি হইবে, কি চাহিবেন, কি গ্রহণ করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। রজনী প্রভাত হইল। জগৎ জাগিল, প্রথমে পক্ষীকূল, শেষে মানবগণ, বিশ্বরঞ্জন বিশ্বপতির নাম মুখে করিয়া জাগিয়া উঠিল। পূর্বগগনে রবিদেব আরক্তিম লোচনে দেখা দিলেন। গত দিবাবসানে যে কারণে মলিনমুখ হইয়া অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজ যেন সে ভাব নাই। ঘোর লোহিত, অসীম তেজ, – দেখিতে দেখিতে সে প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সীমার দামেস্ক যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত– সৈন্যগণ সাজিতেছে, অশ্ব সকল সজ্জিত হইয়া আরোহীর অপেক্ষা রহিয়াছে, বাজনার রোল ক্রমেই বাড়িতেছে, বিজয়-নিশান উচ্চ শ্রেণীতে উর্ধ্বে উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে যেন রবিদেবের প্রজ্বলিত অগ্নিমূর্তির সহিত পূর্ব দিকে প্রায় লক্ষাধিক দেবমূর্তির সশস্ত্র আবির্ভাব। কি দৃশ্য! কি চমৎকার বেশ! রজত-নির্মিত দণ্ডে কারুকার্যখচিত পতাকা। অশ্বপদ-বিক্ষেপের শ্রীই বা কি মনোহর! অস্ত্রের চাকচিক্য আরও মনোহর সূর্যতেজে অতি চমৎকার দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইলেন, পতাকার চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তাহার বদনে বিষাদ-কালিমা রেখার মত শত শত চিহ্ন বসিয়া গেল; অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; চঞ্চল অক্ষি স্থির হইল। মুখে বলিলেন, "এ কাহার সৈন্য? এ যে নতুন বেশ, নতুন আকৃতি, নতুন সাজ! উষ্ট্রোপরি ডঙ্কা, নাকড়া, নিশান-দণ্ড উষ্ট্রপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, আকার-প্রকারে বীরভাবের পরিচয় দিতেছে! বংশীরবে উষ্ট্রসকল মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। ইহারা কাহারা? সৈন্য? ইহারা কাহার সৈন্য?"

উষ্ট্রপৃষ্ঠে নকির উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া যাইতেছে, "ইরাকের অধিপতি মসহাব কাক্কা, হযরত মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন। যদি গমনে বাধা দিতে কাহারও ইচ্ছা থাকে, সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হও। না হয়, পরাজয় স্বীকারপূর্বক পথ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষা কর।"

এই সকল কথা সীমারের কর্ণে বিষসংযুক্ত তীরের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল; তোগানের সৈন্যমধ্যে যাহারা নিশীথ সময় জ্বলন্ত অনল হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া সীমারের ভয়ে জঙ্গলে

দুলাইয়াছিল, তাহার ঐ মধুমাখা রব শুনিয়া মহোল্লাসে নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "বাদশাহ-নামদার! আমাদের দুর্দশা শুনুন, –আমাদের দুর্দশা শুনুন।"

সৈন্যগণ গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইল। ইরাক-অধিপতি সৈন্যগণের সম্মুখে শ্রেণীভেদ করিয়া বিবরণ-জিজ্ঞাসু হইলে ভুক্তভোগী সৈন্যগণ তাঁহার সম্মুখে রাত্রির ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিল। আর বলিল, "বাদশাহ-নামদার! ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছেন– উহাই শিবিরের ভস্মাবশেষ; এখন পর্যন্ত খাকে পরিণত হয় নাই! কত সৈন্য, কত উষ্ট্র, কত আহারীয় দ্রব্য, কত অর্থ, কত বীর যে ঐ মহা-অগ্নির উদরস্থ হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয় মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যের জন্য মদিনায় যাইতেছিলেন; এজিদ-সেনাপতি সীমার রাত্রে দস্যুতা করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে, ভূপতিদ্বয়কে বন্দী করিয়া ঐ শিবিরে লইয়া গিয়াছে, এখন দামেস্কে লইয়া যাইবে। গতকল্য প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমরা কেবল তীরের লড়াই করিয়াছিলাম। বিপক্ষদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিই নাই। শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ঐ দিনের জন্য বন্ধ রাখিল। তাহার পর রাত্রে এই ঘটনা। সীমার ভয়ানক চতুর। বাদশাহ-নামদার! মিথ্যা সন্ধির ভাণ করিয়া শেষে এই সর্বনাশ করিয়াছে।"

মসহাব বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এ কোন সীমার?"

"বাদশাহ-নামদার! গককল্য ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সীমারই স্বহস্তে ইমাম হোসেনের শির খঞ্জর দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিল। এই সীমারই ইমাম হোসেনের বুকের উপর বসিয়া দুই হাতে খঞ্জর চালাইয়া মহাবীর নামে খ্যাত হইয়াছে, লক্ষ টাকা পুরস্কারও পাইয়াছে। পাষাণপ্রাণ না হইলে এত লোককে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারিত কি?"

ইরাক-ভূপতি চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া "উহু! তুমি সেই সীমার! হায়! তুমি সেই!" এই কথা বলিয়া অশ্ব ফিরাইলেন। সৈন্যগণও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব ছুটাইল। অশ্ব পদ-নিক্ষিপ্ত ধূলারাশিতে চতুষ্পার্শ্ব অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় সমহাব কাক্কা সীমার-শিবির আক্রমণ করিলেন। অশ্বের দাপট, অশ্বের চাকচিক্য দেখিয়া সীমার চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আজ নিস্তার নাই। কাক্কা স্বয়ং অসি ধরিয়াছেন, রক্ষা নাই।

মসহাব বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে চিনি, তুমিও আমাকে সেই সময় হইতে বিশেষরূপে জান। আর বিলম্ব কেন? আইস, দেখি তোমার দক্ষিণ হস্তে কত বল! (ক্রোধে অধীর হইয়া) আয় পামর! দেখি, তোর খঞ্জনের কত তেজ!"

সীমার মসহাব কাক্কার বলবিক্রম পূর্ব হইতে অবগত ছিলেন। তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরাশা দূরে থাকুক, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন– কি বলিবেন, কাহাকে কি আজ্ঞা করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মসহাব কাক্কা সৈন্যগণকে বলিলেন, "সেই সীমার! এই সেই সীমার! ইহার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে আমার জীবন পণ! এই সেই পাপিষ্ঠ, এই সেই নরাধম সীমার! আইস, আমার সঙ্গে আইস, বিষম বিক্রমে চতুর্দিক হইতে পামরের শিবির আক্রমণ করি।" কাক্কা অশ্বে কশাঘাত করিতেই অশ্বারোহী সৈন্যগণ ঘোর নিনাদে সিংহবিক্রমে সীমার

শিবিরোপরি যাইয়া পড়িল। আজ সীমারের মহাসঙ্কট সময় উপস্থিত। আত্মরক্ষার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছূ হইল না কিছুই কার্য আসিল না। পরাভব স্বীকারের চিহ্ন দেখাইলেন, কোন ফল হইল না; কাক্কা সে দিকে দৃকপাতও করিলেন না; কেবল মুখে বলিলেন, "সীমার! তোর সঙ্গে যুদ্ধের রীতি কি? তোর সঙ্গে সন্ধি কি? তুই কোথায়? শীঘ্র আসিয়া আমার তরবারির নীচে স্কন্ধ পাতিয়া দে! তোকে পাইলেই আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হই, তোর সৈন্যগণের প্রাণবধ করিতে বিরত হই। তুই কেন গোপন ভাবে আছিস? তুই নিশ্চয়ই জানিস, আজ তোর নিস্তার নাই। এই অশ্বচক্র-মধ্যে তোর প্রাণ,- তোর সৈন্যসামন্ত সকলের প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে। একটি প্রাণী এ চক্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিস, তোদের সকলের জীবন আমাদের এই তরবারির তেজের উপর নির্ভর করিতেছে। তুই সেই সীমার! আবার আজকাল মহাবীর সীমার নামে পরিচিত! শুনিলাম তুই নাকি এজিদের সেনাপতি! তোর আত্মগোপন কি শোভা পায়? ছি ছি, সেনাপতির নাম ডুবাইলি? মহাবীর নামে কলঙ্ক রটাইলি! তোর অধীন সৈন্যগণের নিকট অপদস্থ হইলি! ভীরু ও কাপুরুষের পরিচয় প্রদান করিলি! নিজেও মজিলি, অপরকেও মজাইলি! তোর শুভ্র নিশানে ভুলিব না; তুই গতকল্য যাহা করিয়াছিস, তাহাতে সন্ধির প্রস্তাব আর কর্ণে শুনিব না। তোর কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিব না। তুই যে খেলা খেলিয়াছিস, যে আগুন জ্বালাইয়াছিস, তাহার ফল চক্ষের উপরই রহিয়াছে, –এখনও জ্বলিতেছে, এখনও পুড়িতেছে। তুই অনেক প্রকারের খেলা খেলিয়াছিস। কি ধূর্ত! পরকালের পথও একেবারে নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছিস! তোর চিন্তা কি? তোর মরণে ভয় কি? তোগান ও তুর্কী ভূপতিদ্বয়ের যে দশা ঘটিয়াছে, ইহা তাহাদের ভ্রম নহে। বিশ্বাসী না হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাধ্য কাহার? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোর জীবন-প্রদীপ নির্বাণ না করিলে আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ হইবে না।"

কাক্কা কথা কহিতেছেন, এদিকে সীমারের সৈন্যদল বাতাহত কদলীর ন্যায় কাক্কার সৈন্যহস্তে পতিত হইতেছে, কথাটি বলিবার অবসর পাইতেছে না, নির্বাকে রক্তমাখা হইয়া ভূতলে পড়িতেছে। সীমার কোনও চাতুরী করিয়া আর উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেই বোধ হয়, মসহাব কাক্কা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। বাঁচিলে তো পদোন্নতি? আজ এই কালান্তক কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে তো অন্য আশা! অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, ঘটনাস্রোতে যে দিকে যায়, সেই দিকেই অঙ্গ ভাসাইব; এক্ষণে ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

সীমার ভূপতিদ্বয়কে নিস্কৃতি দিলেন। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয়কে দেখিয়া মসহাব কাক্কা সাদরে ও মিষ্ট সম্ভাষণে বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। সৈন্যসমান্ত, আহারীয় দ্রব্য, অর্থ ইত্যাদি যাহা ভস্মীভূত হইয়াছে, সে জন্য দুঃখ নাই। বিপদগ্রস্ত না হইলে নিরাপদে সুখ কখনই ভোগ করা যায় না; দুঃখভোগ না করিলে সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না। ভ্রাতৃগণ! কথা কহিবার অনেক সময় পাইব, কিন্তু সীমার হাতছাড়া হইলে আর পাইব না। আপনারা আমার সাহায্যে অস্ত্রধারণ করুন, ঐ অশ্ব সজ্জিত আছে, অস্ত্রের অভাব নাই। যে অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করেন, রক্ষীকে আদেশ

করিলেই সে তাহা যোগাইবে; বিলম্বের সময় নহে, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া আমায় সাহায্য করুন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন। দেখি, সীমার যায় কোথায়?"

সীমারের সেনাগণ সেনাপতির কাপুরুষতা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ছি! ছি! আমরা কাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি? এমন ভীরুস্বভাব নীচমনার আজ্ঞাবহ হইয়া সমরসাজে আসিয়াছি! ছি! এমন সেনাপতি তো কখন ও দেখি নাই! বিনাযুদ্ধে সৈন্যক্ষয় করিতেছে। কি কাপুরুষ! যুদ্ধ করিবার আজ্ঞাও মুখ হইতে বর্হিগত হইতেছে না। ছি! ছি! ছি! এমন যোদ্ধা তো জগতে দেখি নাই! ধিক আমাদিগকে! এমন ভীরু-স্বভাব সেনাপতির অধীনে আর থাকিবনা। চল ভ্রাতৃগণ! চল, ঐ বীর-কেশরীর আজ্ঞাবহ হইয়া প্রাণরক্ষা করি; যদি বল, আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বাস না করুক, আগে পাছে উহাদের হাতেই মরণ- নিশ্চয় মরণ! চল, ঐ মহাবীর মসহাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে।"

সীমার-সৈন্যগণ "জয় মোহাম্মদ হানিফা! জয় মোহাম্মদ হানিফা!" মুখে উচ্চারণ করিয়া বিপক্ষদল সম্মুখে দন্ডায়মান এবং তরবারি আদি সমুদয় অস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিল। মহাবীর মসহাব তাহাদিগকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র লইতে দিলেন না।

সীমার অর্থ-লোভ দেখাইয়া, পদোন্নতির আশা দিয়া, অর্থে বশীভূত করিয়া যে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষকে নিজ শিবিরে আনাইয়াছিলেন, তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা যে ব্যবহার করিয়াছি, সীমারের কুহকে পড়িয়া যে কুকান্ড করিয়াছি, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হইবে। কি ভ্রমে পড়িয়া এই কুকার্যে যোগ দিয়াছিলাম! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না, -হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন কথা এই যে, সেনাপতি মহাশয় নিজ সৈন্যদিগকে স্ববলে রাখিতে যখন অক্ষম, তখন আমাদের দশা কি হইবে? অতি অল্প সময় মধ্যেই আমরা কাক্কার হস্তে ধরা পড়িব। কোন দিক হইতে আর জীবনের আশা নাই; আর বিলম্ব করিব না। ভাই সকল! যত সত্বর হয়, মহাবীর মসহাব কাক্কার হস্তে আত্মসমর্পণ করি। কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কে রাখিয়া যাইব না। শেষে ভবিতব্যে যাহা থাকে, হইবে। আমরা বিখ্যাত যোদ্ধা, আমাদের এ কলঙ্ক কালিমা রেখা জগতে চিরকাল সমভাবে আঁকা থাকিবে! মনে হইলেই বলিবে, তুর্কী সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকার কার্য করিয়া সর্বনাশ করিয়াছে। ভাই সকল! তাহাতেই বলি, কথার শেষে আর একটি কথা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াই যাই;- সীমার! সীমার! সীমার!"

সীমার-শিবির-মধ্য হইতে ঘোররবে- "জয় ইরাক-অধিপতি! জয় মোহাম্মদ হানিফা" রব হইতে লাগিল; মুহূর্তমধ্যে সীমারের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রণপ্রাঙ্গণে মসহাব কাক্কার সম্মুখে রাখিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমরা অপরাধী, দণ্ডবিধান করুন! বাদশাহ নামদার! সেনাপতি মহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।"

মসহাব কাক্কা প্রথমে সীমারের চাতুরী মনে করিয়া দ্রুতহস্তে অসিচালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ! তোমরাই বাহাদুর! তোমরাই সীমারকে বন্দীভাবে লইয়া আমার সহিত মদিনায় চল। মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে তোমাদের এবং সীমারের বিচার হইবে।"

এদিকে কাক্কা সৈন্যগণকে গোপনে আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্রোহী সৈন্য ও সীমারকে কৌশলে মদিনায় লইতে হইবে, সাবধান! উহাদের একটি প্রাণীও যেন হাতছাড়া না হয়। বিশেষ সীমার বড় ধূর্ত।" এই আদেশ করিয়া মসহাব কাক্কা মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জগদীশ! তোমার মহিমার অন্ত নাই। কাল কি করিলে! আবার রাত্রে কি ঘটাইলে! প্রভাতেই বা কি দেখাইলে! আবার এখনই বা কি কৌশল খাটাইয়া কি খেলা খেলাইলে! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার কারিগরি! যে ফণীর দ্বারা দংশন করাইলে, সেই বিষধর ফণীর বিষেই ঔষধ করিয়া নির্বিষ করিয়া দিলে! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার লীলা।

যাও সীমার, মদিনায় যাও। তোমার বাক্য সফল। আর ও হাতে লৌহ-অস্ত্র ধরিতে হইবে না। যাও, মদিনায় যাও। মদিনায় গিয়া তোমার কৃতকার্যের ফলভোগ কর। সেখানে অনেক দেখিবে; সে-প্রান্তরে অনেক দেখিতে পাইবে। তোমার প্রাণপ্রতিম প্রিয় সখা ওতবে অলীদকে দেখিতে পাইবে। অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গন- সকলই দেখিতে পাইবে; কিন্তু তুমি পরহস্তে থাকিবে। সীমার! এক বার মনে করিও, সীমার! ফোরাতকূলের ঘটনা একবার মনে করিও। আজকের কথা মনে করিও। তুমি জগৎ কাঁদাইয়াছ, বন, উপবন, পর্বত, গিরিগুহা, গগন, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দিক হইতে যে হৃদয়-বিদারক শব্দ উত্তোলন করাইয়াছ, সে কথাটাও একবার মনে করিও। এই তো সে দিনের কথা! হাতে হাতেই এই ফল!- ইহাতে আর আশা কি? প্রাতে তোমার মনে যে ভাবনা ছিল, এইক্ষণে তাহার কি কিছু আছে? বলতো মানুষের সাধ্য কি? বাহুবল, অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি না দামেস্কের অভিমুখে মহা হর্ষে যাত্রা করিয়াছিলে? সুসময়ে সুখযাত্রার চিহ্নস্বরূপ কত পতাকাই না উড়াইয়াছিলে? কত বাজনাই না বাজাইয়াছিলে? দেখ দেখি, মুহূর্ত মধ্যে কি ঘটিয়া গেল! ভবিষ্যৎ-গর্ভে যে কি নিহিত আছে, তাহা জানিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাও সীমার, মদিনায় যাও, তোমার কৃতকার্যের ফল ভোগ কর।

চতুর্দশ প্রবাহ

হায়! হায়! এ আবার কি? এ দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল! উহু! কি ভয়ানক ব্যাপার ! উহু ! কি নিদারুণ কথা ! এ প্রবাহ না লিখিলে কি " উদ্ধার পর্ব " অসম্পূর্ণ থাকিত, না বিষাদ-সিন্ধুর কোন তরঙ্গের হীনতা জন্মিত ? বুদ্ধি নাই, তাই সীমারের বন্ধনে মনে মনে একটু সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন যে প্রাণ যায় ! এ বিষাদ-প্রবাহে এখন যে প্রাণ যায় ! হায় ! এ সিন্ধুমধ্যে কি মহা-শোকের কল্লোলধ্বনি ভিন্ন আনন্দ-হিল্লোলের সামান্য ভাবও থাকবে না। হায় যে কৃপাণ। আবরণবিহীন কৃপাণ !! এজিদের হস্তে কৃপাণ !! সম্মুখে মদিনার ভাবী রাজা উর্ধ্বদৃষ্টে দণ্ডায়মান। তিন পার্শ্বে সজ্জিত প্রহরী- এক পার্শ্বে প্রহরী নাই। হাসনেবানু, শাহরেবানু, জয়নাল প্রভৃতির দৃষ্টির বাধা না জন্মে- জয়নালের শিরচ্ছেদন স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের চক্ষে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই বন্দীগৃহের সম্মুখে বধ্যভূমি এবং সেই দিকে প্রহরীশূন্য। সন্তানের মস্তক কি প্রকারে ধরায় লুণ্ঠিত হয় তাহাই

মাতাকে দেখাইবার জন্য সে দিক প্রহরীশূন্য। এজিদ অসিহস্তে জয়নাল-সম্মুখে দণ্ডায়মান। মারওয়ান নীরব, পুরবাসিগণ নীরব, দর্শকগণ ম্লানমুখে নীরব ! এ ঘটনা কেহ ইচ্ছা করিয়া দেখিতে আসে নাই। প্রহরীগণ বলপূর্বক নগরবাসিগণকে ধরিয়া আনিয়াছে।

এজিদের আজ্ঞায় যে সময় জয়নাল আবেদীনকে বন্দীগৃহ হইতে বলপূর্বক আনিয়াছে, সেই সময়েই হাসনেবানু অচৈতন্য হইয়াছেন, সে চক্ষু আর উন্মীলিত হয় নাই। শাহরেবানু, জয়নাব, বিবি সালেমা জয়নালের হাসি হাসি মুখখানির প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছেন। নিমেষশূন্য চক্ষে জলের ধারা বহিতেছে– অন্তরে, হৃদয়ে– শ্বাসে, প্রশ্বাসে সেই বিপদতারণ ভগবানের নাম, সহস্র বর্ণে, সহস্র প্রকারে, নিঃশব্দে বর্নিত হইতেছে, জাগিতেছে।

এজিদ বলিলেন, "জয়নাল, তোমার জীবনের এই শেষ সময়। কোন কথা বলিবার থাকে তো বল। পরমায়ু শেষ হইয়াছে। উর্ধ্বদৃষ্টিতে নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলে আর কি হইবে ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে, আমার নামে খোৎবা, পড়িবে, আমাকে রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। ঘটনাক্রমে তাহা ঘটিল না। কাজেই শত্রুর শেষ রাখিতে নাই– হাতে পাইয়াও ছাড়িতে নাই। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না ; এ অবস্থায় তোমাকে আর জীবিত রাখিতে পারি না। জীবিত রাখিয়া সর্বদা সন্দিহান থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। জয়নাল ! উর্ধ্বে কি আছে ? অনন্ত আকাশে সূর্য ভিন্ন আর কি আছে ? তুমি আকাশে কি দেখ ? আমায় দেখ ! আমার হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণ প্রতি চাহিয়া দেখ। তোমার মরণ অতি নিকট ; যদি কোন কথা থাকে, তবে বল। আমি মনোযোগের সহিত শুনিব।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই। আমার জীবন মরণে তোমার সমান ফল। আমি বাঁচিয়া থাকিলেও তোমার নিস্তার নাই, মরিলেও তোমার নিস্কৃতি নাই, বন্দীখানায় থাকিলেও তোমার উদ্ধার নাই।"

এজিদ সরোষে বলিলেন, "এখনও স্পর্দ্ধা ! এখনও অহঙ্কার ! এখনও ঘৃণা ! এখনও এজিদে ঘৃণা! এ সময়েও কথার বাঁধুনী! দেখ এজিদের নিস্কৃতি আছে কি না? দেখ এজিদের উদ্ধার আছে কি না? জীবনে মরণে সমান ফল? –দেখ জীবনে মরণে সমান ফল! এই দেখ জীবনে মরণে সমান–"

এজিদ তরবারি উত্তোলন করিতেই মারওয়ান বলিলেন, "বাদশাহ নামদার! একটু অপেক্ষা করুন, ঐ দেখুন, ওতবে অলীদের সেই নির্দিষ্ট বিশ্বাসী কাসেদ অশ্বারোহী হইয়া মহাবেগে আসিতেছে; ঐ দেখুন, আসিয়া উপস্থিত। একটু অপেক্ষা করুন। যদি হানিফার জীবন শেষ হইয়া থাকে, তবে সে সংবাদ জয়নালকে শুনাইয়া কার্য শেষ করুন। শত্রুর শেষ, সকলের শেষ একেবারে হইয়া যাউক! বাদশাহ-নামদার! একটু অপেক্ষা করুন।"

এজিদের হস্ত নীচে নামিল। কাসেদ কি সংবাদ লইয়া আসিল, শুনিতে মহাব্যগ্র, অতি অল্প সময়ের জন্য জয়নাল বধে ক্ষান্ত– কাসেদ প্রতি তাঁহার লক্ষ্য।

কাসেদ অভিবাদন করিয়া ওহবে অলীদের লিখিত পত্র মারওয়ানের হস্তে দিয়া মলিনমুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেনঃ

"মহারাজাধিরাজ এজিদ বাদশাহ-নামদার সর্ব প্রকারের জয় ও মঙ্গল। আজ্ঞাবহ কিঙ্করের নিবেদন এই যে, মোহাম্মদ হানিফা চতুর্দশ সহস্র সৈন্যসহ মদিনার নিকটবর্তী প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রথম দিনের যুদ্ধে আমার সহস্রাধিক সেনা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। আগামীকল্য যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? যত শীঘ্র হয়, মারওয়ানকে অধিক পরিমাণ সৈন্যসহ আমার সাহায্যে প্রেরণ করুন। হানিফাকে বন্দী করা দূরে থাকুক, মারওয়ান না আসিলে চিরদাস অলীদ বোধ হয় আর দামেস্কের মুখ দেখিতে পাইবে না।"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ! এ আপদ কোথায় ছিল? এক দিনের যুদ্ধে হাজার সৈন্যের অধিক মারা পড়িয়াছে, এ কি কথা!"

মারওয়ান বলিলেন, "বাদশাহ-নামদার! এ সময়ে একটু বিবেচনার আবশ্যক। বন্দীর প্রাণ বিনাশ করিতে কতক্ষণ।"

"না–না, ও সকল কথা কথাই নহে। জয়নালকে আর জগতে রাখা যাইতে পারে না। আমি তোমার এ ভ্রমপূর্ণ উপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

পুনরায় তরবারি উত্তোলন করিতেই দর্শকগণ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ পিছু হটিল, কেহ পড়িয়া গেল, কেহ উভয় পার্শ্বে ধাক্কা খাইয়া এক পার্শ্বে সরিল। জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় সংবাদবাহী এজিদ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! জয়নাল-বধে ক্ষান্ত হউন! বড়ই অমঙ্গল সংবাদ আনিয়াছি। সাধারণ সমক্ষে বলিতে সাহস হয় না।"

এজিদ মহারোষে বলিলেন, "এখানে মোহাম্মদ হানিফা নাই,– বল।"

সংবাদবাহী বলিল, "আমরা যাইয়া দেখি, সেনাপতি সীমার বাহাদুর নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিপক্ষগণের শিবির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রভাত বায়ুর সহিত বিপক্ষদল হইতে অসংখ্য তীর বর্ষণ হইতে লাগিল, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিল। আমাদের সেনাপতি একপদ ভূমিও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে সৈন্যগণ শরাঘাতে জর জর হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সন্ধিসূচক শুভ্র-পতাকা উড়াইয়া দিলেন, কিছুই বুঝিলেন না; যুদ্ধ বন্ধ হইল। কোন পক্ষ হইতেই আর যুদ্ধের আয়োজন দেখিলাম না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নিশার গভীরতার সহিত বিপক্ষশিবিরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার পর দেখিলাম যে, বিপক্ষশিবিরে আগুণ লাগিয়াছে– দেখিতে দেখিতে কত অশ্ব, কত সৈন্য পুড়িয়া মরিল। তাহার পর দেখিলাম, শিবিরস্থ ভূপতিদ্বয়কে বন্দীভাবে সেনাপতি মহাশয় শিবিরে লইয়া আসিলেন, আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রভাত পর্যন্ত মহা আনন্দ। সূর্য উদয় হইলেই শিবির ভগ্ন করিয়া সেনাপতি মহাশয় দামেস্ক নগরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব দিক হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ সজ্জিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপক্ষদলের সৈন্যগণমধ্যে যাহারা পলাইয়া গত রাত্রের জ্বলন্ত হুতাশন হইতে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, দূর হইতে তাহাদের জাতীয় চিহ্নসংযুক্ত পতাকা দেখিয়া তাহারা ঐ আগন্তুক দলে ক্রমে ক্রমে মিশিতে লাগিল।

দলের অধিনায়ক যেমনি রূপবান, তেমনি বলবান। পলায়িত সৈন্যগণের মুখে কি কথা শুনিয়া তিনি চক্ষের পলকে আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে সৈন্যগণসহ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা ঘিরিয়া, শৃগাল-কুকুরের ন্যায় একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহাশয়ের সৈন্যগণ যে মহামন্ত্রে মোহিত– যেন মায়াপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত! শত্রুর তরবারি-তেজে প্রাণ যাইতেছে; দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে, এমনি আশ্চর্য মোহ, কাহারও মুখে কথাটি নাই। কার যুদ্ধ কে করে? পলাইয়া যে প্রাণরক্ষা করিবে, সে ক্ষমতাও কাহারও দেখিলাম না। মহারাজ! দেখিবার মধ্যে দেখিলাম– দামেস্ক সৈন্যমধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, হানিফার নাম করিয়া ঐ মহাবীরের সম্মুখে সমুদয় অস্ত্র রাখিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইল। এই দৃশ্য চক্ষু হইতে সরিতে না সরিতে আবার নতুন দৃশ্য!– আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে কয়েকজন ভিন্নদেশীয় সৈন্য বন্দী অবস্থায় সেই বীরকেশরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং তিনি সেনাপতি বাহাদুরকে ঐ বন্ধনদশায় উষ্ট্রে চড়াইয়া মদিনাভিমুখে লইয়া গেলেন।"

এজিদ হাতের অস্ত্র ফেলিয়া বলিলেন, "সীমার বন্দী!"

মারওয়ান ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি বারবার বলিতেছি, সময় অতি সঙ্কট, মহাসঙ্কট! চারিদিকে বিপদ! যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ইহা নির্বাণ করিয়া রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে।"

এজিদ বলিলেন, "জয়নাল! যাও, কয়েক দিনের জন্য জগতের মুখ দেখ! মারওয়ানের কথায় আরও কয়েক দিন বন্দীগৃহে বাস কর।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা না করিলে তোমার কি সাধ্য? মারওয়ানেরই কি ক্ষমতা? আমি বলি, তুমি যাও। আজ হইতে তুমিও তোমার প্রাণের চিন্তা করিতে ভুলিও না! তোমার সময় অতি নিকট। আমি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিব, কি তুমি কিছু দিন দেখিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?"

এজিদ মহারোষভরে জয়নাল আবেদীনকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বন্দীগৃহে বন্দী আনীত হইলেন।

জয়নাল আবেদীনের চির-বিরহে আর আমাদিগকে কাঁদিতে হইল না। ঈশ্বরের মহিমা!

পঞ্চদশ প্রবাহ

এই তো সেই মদিনার নিকটবর্তী প্রান্তর। উভয় শিবিরের উচ্চ মঞ্চে রঞ্জিত মহানিশান উড়িতেছে, সমরাঙ্গণে সামরিক নিশান গগন ভেদ করিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে– অস্ত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে– মার মার শব্দ হইতেছে। আজ ব্যূহ নাই, সৈন্যশ্রেণীর শ্রেণীভেদ নাই, অস্ত্রচালনার পারিপাট্য নাই, আত্মপর ভাবিয়া আঘাত নাই,– মরিতেছে, মারিতেছে, আহত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, হুহুঙ্কার বজ্রনাদে সমরাঙ্গণ কাঁপাইতেছে। আজ উভয় দলের সৈন্য শোণিতে রণভূমি রঞ্জিত হইতেছে। জয়-পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছে; কিন্তু "অলীদ সৈন্য অধিক পরিমাণে মারা পরিতেছে। আজ মহাসংগ্রাম। উভয় দলে আজ বিষম সমর, দুর্ধর্ষ রণ। সৈন্যগণের চক্ষু উর্ধ্বে উঠিয়াছে, মুখাকৃতি অতি কর্তব্য বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে; রোষে, ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া চক্ষু-তারা ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে; –মুখব্যাদনে জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ,

কণ্ঠনালী পর্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধপ্রবৃতি নিবৃত্তি হইবে না– মনের তৃপ্তি জন্মিবে না বলিয়াই যেন নখাঘাত, দন্তাঘাত, দন্তাঘাত জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে। প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় যুদ্ধ। হানিফা আজ স্বয়ং সৈন্যগণের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক, গাজী রহমান পরিচালক! মহাবীর অলীদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন। এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত গত হইয়াছে, এখন সূর্যদেব মধ্য গগণে,– কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতেছে না– যুদ্ধও ইতি হইতেছে না। অলীদের প্রতিজ্ঞা, –আজ হানিফার শিরচ্ছেদ করিয়া জগতে মহাকীর্তি স্থাপন করিব। হানিফারও চেষ্টা যে, আজ মদিনার পথ পরিস্কার না করিয়া ছাড়িব না। হয় অলীদ-হস্তে জীবন-বিসর্জন, না হয় সসৈন্যে মদিনায় প্রবেশ।
গাজী রহমান বলিলেন, "সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। কি করিবে? এত মারিয়াও যখন শেষ করিতে পারিতেছি না, তখন আর উপায় কি?"
মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা ফিরাইয়া বলিলেন, "আজ উভয় দলেই সৈন্য যে প্রকার ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে মহাবিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি। এখন না নিবারণের উপায় আছে, না উপদেশের সময় আছে না কথা বলিবার অবসর আছে। অলীদের সমস্ত সৈন্য শেষ হইলেও অলীদ কখনই পরাভব স্বীকার করিবে না, আমরা পরাস্ত না করিয়া ছাড়িব না।"
এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময় অলীদ-দলে আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ওতবে অলীদ তাঁহার নতুন সৈনিকদলের ব্যবহার জন্য যে সাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ সাজে সজ্জিত সেনাগণ মসহাব কাক্কার সঙ্গে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া আপন সেনা মনে করিয়া অলীদ মনের আনন্দে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; গাজী রহমানের কর্ণে হঠাৎ ঐ বাজনার রোল মহাবিপদ-জনক ও বিষম বোধ হইতে লাগিল। কারণ উভয় দলই প্রদত্ত-কুঞ্জর-সম যুদ্ধে মত্ত, কেহই পরাজয় স্বীকার করে নাই; এ সময়ে সন্তোষের বাজনা কেন? গাজী রহমানের বিশাল চক্ষু মদিনা-প্রান্তরের চতুর্দিকে চলিতে লাগিল, চিন্তাস্রোহ খরতর বেগে বহিতে লাগিল, –পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়িতেই শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যুদ্ধ জয়ের আশা, মদিনা প্রবেশের আশা, জয়নাল উদ্ধারের আশা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া গেল।
মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশাহ-নামদার! ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্যে বিপর্যয় ঘটাইতে মানুষের ক্ষমতা নাই। সৈন্যশ্রেণী যে প্রকারে চালনা করিয়াছিলাম, সৈন্যগণও যে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল, অতি অল্প সময় মধ্যে অলীদ বাধ্য হইয়া পরাভব স্বীকারে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতেন; আর যদি না পথ না ছাড়িতেন, গাজী রহমানের হস্তে নিশ্চয়ই আজ বন্দী হইতেন। কি করি? ঐ দেখুন, উহারা যখন আমাদের পশ্চাদিক হইতে আসিতেছে, তখন আর রক্ষার উপায় নাই। সম্মুখে পশ্চাতে উভয় দিকেই শত্রু-সেনা, আর নিস্কৃতি কোথা? নিশ্চয় বন্দী! আর সৈন্যসহ আমরা বন্দী!"
মোহাম্মদ হানিফা "বহু অশ্বারোহী সৈন্য বটে, পদাতিক সৈন্যও আছে উহারা যেরূপ বীরদর্পে আসিতেছে, শত্রু-সেনা হইলে মহাবিপদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ অনেক। বাজনাই কি তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ? অথবা ওতবে অলীদ কি এমনই অবোধ যে, না জানিয়া আপন পর না ভাবিয়া, আনন্দ-বাজনা বাজাইয়াছে? নিশ্চয় ইহারা দামেস্কের সৈন্য?"

আগন্তুক সৈন্যদল ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অলীদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, দামেস্ক হইতে মারওয়ান তাঁহার সাহায্যে আসিতেছে।
অলীদ সদর্পে বলিতে লাগিলেন, "বন্দী! বন্দী! মোহাম্মদ হানিফা আজ সৈন্যসহ নিশ্চয় বন্দী! আর কি সন্দেহ আছে? আমারই নির্বাচিত চিহ্ন-সংযুক্ত নূতন সাজ। দামেস্কের সৈন্য না হইয়া যায় না। বাজাও ডঙ্কা! বাজাও ভেরী! কিসের ভয়? সহস্র হানিফা হইলেও আজ অলীদ-হস্তে পরাস্ত, সম্মুখে অস্ত্র, পশ্চাতে অস্ত্র, ইহাতে কি রক্ষা আছে? কাহার সাধ্য? জগতে এমন কোন বীর নাই যে, সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় দিক রক্ষা করিয়া সমানভাবে শত্রু সম্মুখীন হইতে পারে!"
মনের উল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, –"মোহাম্মদ হানিফা, তুমি কোথায়? তোমার চক্ষু কোন দিকে? – তুমি কায়মনে যে ঈশ্বরের বল করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছ, সেই ঈশ্বরের দোহাই, – একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখ। এখনও অলীদ সম্মুখে অস্ত্র রাখিলে না? এখনও যুদ্ধে বিরত হইলে না? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, তোমার প্রদীপ এখনই নির্বাণ হইবে। তোমার বুদ্ধিমান মন্ত্রী গাজী রহমানের জীবন এখনই শেষ হইবে। সম্মুখে অলীদ। পশ্চাতে মারওয়ান, এখনও যুদ্ধ? রাখ তরবারী– কর পরাজয় স্বীকার– মঙ্গল হইবে! –ক্ষান্ত হও, –ক্ষান্ত হও; আত্মসমর্পণের এই উপযুক্ত সময়। বীরের মান বীরেই রক্ষা করিয়া থাকে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমাদের সকলের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। আবার বলি, পশ্চাত্ত চাহিয়া দেখ,– মহারাজ এজিদের কারুকার্যখচিত উড্ডীয়মান নিশান প্রতি চাহিয়া দেখ।"
গাজী রহমান এ পর্যন্ত নিশান প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। অলীদের কথায় নিশান প্রতি চাহিয়াই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। এদিকে অলীদও ভয়ে বিহ্বল প্রায় হইয়া অশ্ব ছুটাইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।
মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি? নিশান দেখিয়া অলীদের মুখ ভারী হইল কেন? ওরূপ দ্রুতবেগে হঠাৎ শিবিরেই বা চলিয়া গেল কেন?"
"বাদশাহ-নামদার! অলীদের বাজনার ধুমে আমি আমার চিন্তাকে ভ্রমপূর্ণ বিপথে চালনা করিয়াছিলাম। অনিশ্চিত, সন্দিহান, অনুমান প্রতি নির্ভর করিয়া যে কার্য করে, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? আরও অধিক আশ্চর্য যে, একজন সেনাপতি এইরূপ করিয়াছেন! অলীদ যে কি প্রকৃতির সেনাপতি, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কি গুণে এতধিক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি না। অলীদ প্রতি আমার ভক্তিমাত্র নাই। আমি আরও আশ্চর্যান্বিত হইতেছি যে, ইহারা কি প্রকারে মহাবীর হাসান-হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। একটু অপেক্ষা করুন, সকলই দেখিতে পাইবেন।"
"আমারও সন্দেহ হইতেছে। ঐ সকল চিহ্নিত পতাকা কখনই এজিদের নহে।"
"বাদশাহ-নামদার! অলীদ আমাকে ভ্রম-কূপে-ডুবাইয়াছে, এখন আর কিছু বলিব না– সকলই ঈশ্বরের মহিমা।"
এদিকে রণপ্রাঙ্গণে অলীদ-পক্ষীয় সৈন্য তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, বাতাবহ কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূমিসাৎ হইতেছে। এক দল হত হইলেই সে অন্য দল আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ

করিতেছিল, তাহা আর হইতেছে না। যাহারা সমরে লিপ্ত ছিল, তাহারাই ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল।

সন্দেহ দূর হইল। মোহাম্মদ হানিফার সৈন্যগণ জাতীয় পতাকা স্পষ্টভাবে দেখিয়া সজোরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রান্তর সহিত রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে মসহাব কাক্কা হানিফার সৈন্যসহ আসিয়া হানিফার সহিত যোগ দিলেন। মসহাব কাক্কা হানিফার পদচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বিলম্বের কারণ পরে বলিব, এখন কি আজ্ঞা?"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভাই! পরে শুনিব, কথা পরে শুনিব। এখন ধর তরবারি– মার কাফের– তাড়াও অলীদ! মনের কথা কহিতে দুঃখের কান্না কাঁদিতে অনেক সময় পাইব। সে সকল কথা মনেই গাঁথা আছে। এখন প্রথম কার্য, – মদিনায় প্রবেশ। তোমার তরবারি এদিকে চলিতে থাকুক, আমি অন্য দিকে চলিলাম!"

হানিফা অসি উঠাইলেন। মসহাব কাক্কাও ঈশ্বরের নাম করিয়া শত্রুনিপাতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। উভয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব নব ভাবের আবির্ভাব হইল। উভয় দলের বাজনা একত্রে বাজিতে লাগিল, উভয় দলের সৈন্য মিলিয়া এক হইয়া চলিল, – অলীদের মনেও নানারূপ চিন্তার লহরী খেলিতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গেই জয়ের আশা ছিল না, তাহার পর তত্তুল্য আর একটি বীর হঠাৎ উপস্থিত হইল– অস্ত্রও ধারণ করিল– আর রক্ষা নাই। কিছুতেই আজ রক্ষা নাই।

অলীদ মহা সঙ্কটে পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সহসা মসহাব কাক্কার সম্মুখে যাইব না। দেখিব মসহাব কাক্কা কি করেন।

অলীদ গুপ্ত স্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, হানিফা দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া মদিনা-গমন-পথ পরিষ্কার করিতেছেন; মসহাব কাক্কা বাম পার্শ্বে (তাঁহারই দিকে) অস্ত্রচালনা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, আর বারবার অলীদ নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "অলীদ! শীঘ্র বাহির হও, –শিবির হইতে শীঘ্র বাহির হও! তোমার বীরপণা দেখিতে আজ ক্লান্ত, পথশ্রান্তভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি। আইস, আর বিলম্ব কি অলীদ! অলীদ আইস, আজ তোমাকে দেখিব। ঈশ্বরের দোহাই, তোমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিব। তোমার বল, বিক্রম সাহস সকলই দেখিব। যদি সময় পাই, তবে তোমার তরবারির তেজ, বর্শার ধার, তীরের লক্ষ্য, খঞ্জরের হাত, গদার আঘাত, সকলই দেখিব, ভয় কি? শত্রু যুদ্ধার্থী, তুমি শিবিরে? ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা! ছি! ছি! অলীদ! তুমি না সেনাপতি! এজিদের বিশ্বাসী সেনাপতি!"

মসহাব কাক্কা অলীদকে ধিক্কার দিয়া, ঘৃনা জন্মাইয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন; কিন্তু অলীদ গুপ্তভাবে থাকিয়া কি দেখিতেছেন, কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার সৈন্যগণের হাবভাবে তাঁহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল; চতুর্দিকে ভারী বিভীষিকাময় মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে, মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, এখনই ছাড়িয়া দিতে হইবে, –না হয় বন্দীভাবে হানিফার পদানত হইতে হইবে, ইহাতে দুঃখ নাই, –অপমানের কথা নাই। কিন্তু আপন সৈন্য দ্বারা অপমানিত

হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা এবং লজ্জার কারণ মনে করিয়া অলীদ বাধ্য হইয়া সশস্ত্রে মসহাব কাক্কার সম্মুখীন হইলেন।

মসহাব কাক্কা বলিলেন, "অলীদ, শত্রুমুখে আসিতে, যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিতে, তোমার আমার কি এত বিলম্ব শোভা পায়? যাহা হউক, আইস, অগ্রে তোমার বাহুবল পরীক্ষা করি। আমি তোমাকে অস্ত্রাঘাতে মারিব না– নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার প্রতি মসহাব কাক্কা কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।"

অলীদ দুইটি চক্ষু পাকাল করিয়া বলিলেন, "মহাবীরের দর্প দেখ! অস্ত্রাঘাতে মারিবেন না, কথার আঘাতে মারিবেন।"

"আরে পামর! কথা রাখ, অস্ত্র ধর!"

"মসহাব! তুমি এইমাত্র আসিয়াছ– এখনই যুদ্ধ? কে না বলিবে– যে দেখিবে সেই বলিবে, যে শুনিবে সেই বলিবে যে, দুর্গম পথশ্রান্তিতে কাতর ছিল, ক্ষণকালও বিশ্রাম করে নাই, যেমনই দেখা অমনই যুদ্ধ, কাজেই পরাস্ত। সেই আমার বিলম্বের কারণ। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিলে না– তোমার ভালোর জন্যই আমি এতক্ষণ আসি নাই।"

মসহাব কাক্কা রোষে অধীর হইয়া সিংহনাদে অলীদের দুই হস্ত দুই হস্তে ধরিয়া সজোরে অলীদ-অশ্বকে পদাঘাত করিলেন, অশ্ব বহু দূরে ছুড়িয়া পড়িল। অলীদ কাক্কার হস্তে রহিয়া গেলেন। মসহাব অলীদকে লইয়া এক লম্ফে হইতে অবতরণ করিয়া মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর অলীদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাক্কার হস্ত হইতে হস্ত ছাড়াইতে পারিলেন না।

মসহাব বলিলেন, "এই তো প্রথম পরীক্ষা; দ্বিতীয় পরীক্ষাও দেখ।"

এই কথা বলিয়াই অলীদকে শূন্যে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন,"দেখ কাফের দেখ, কাহার কথা সত্য, –আমি কথায় আঘাতে মারিতে পারি, কি আছাড় মারিয়া মারিতে পারি।" চতুর্দিক হইতে তখন মহাগোলযোগ হইয়া উঠিল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ যায়, দামেস্করাজ এজিদের সেনাপতি শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ হারায়– বড়ই লজ্জার কথা, অলীদ–সৈন্য মসহাবের দিকে মার মার শব্দ মহারোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে মোহাম্মদ হানিফা ঐ গোলযোগের কারণ জানিতে আসিয়া দেখিলেন, অলীদ কাক্কার হস্তে উত্তোলিত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছেন, আর রক্ষা নাই।

মোহাম্মদ হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মসহাব, আমার কথা রাখ! ভাই, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, কথা রাখ ক্ষান্ত হও। অলীদকে প্রাণে মারিও না, মারিও না। আমি বারণ করিতেছি, উহাকে প্রাণে মারিও না।"

মসহাব বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য; কিন্তু আমি ইহাকে একটি আছাড়া না মারিয়া ছাড়িব না, –তাহাতেই যদি প্রাণ দেহ-পিঞ্জরে আর না থাকে, কি করিবে? উহার প্রতি আমি অস্ত্রের আঘাত করিব না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এজিদের সেনাপতির বীরত্ব দেখুন, বাহুবল দেখুন।"

এই কথা বলিয়াই মসহাব কাক্কা অলীদকে সজোরে বহুদূর শূন্য হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অলীদ চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিংশতি হস্ত ব্যবধানে ছুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল অচৈতন্য রহিয়া জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। একটুকু

চমকা ভাঙ্গিলেই দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে চাহিয়াই উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে, রণ-প্রাঙ্গণ হইতে সভয়ে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে শিবিরাভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। অলীদের সৈন্য এখন কাক্কার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। আর কি করিবে? শেষ পন্থা—পলায়ন।

মসহাব কাক্কা বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, "আয় রে কাফেরগণ! আয় মদিনার পথে বাধা দিতে আয়! এই মদীনার পথে বাধা দিতে আয়! এই মসহাব চলিল।"

মসহাব সমুদয় সৈন্য লইয়া অলীদের শিবির পশ্চাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য মসহাবকে বাধা দেয়? কে সে বীরকেশরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়?

গাজী রহমান বলিলেন, "আজ মদিনায় প্রবেশ করিব না, এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তসীমাতেই থাকিব। সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। আরও কথা আছে, মদিনা প্রবেশের পূর্বে আমাদের কতক সৈন্য নগরের বর্হিভাগে, নগর-প্রবেশ-দ্বারে সর্বদা সজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিবে। দামেস্কের মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। ছল, চাতুরী, অধর্ম, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তাহাদের আয়ত্তাধীন— জাতিগত স্বভাব।"

মসহাব কাক্কা সম্মত হইলেন, মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "হযরত! আর একটা কথা। তুরস্ক ও তোগান রাজ্যের ভূপতিদ্বয় আমার সঙ্গে আছেন, তাঁহারা পথে সীমার-হস্তে যেরূপ বিধ্বস্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলিব। এক্ষণে একটি শুভ-সংবাদ অগ্র না দিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। সেই পাপাত্মা সীমারকে আমি বন্দী করিয়া আনিয়াছি।"

হানিফার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল— নির্বাপিত আগুণ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল— কারবালার কথা মনে পড়িল। হু হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিল, মসহাব অপ্রতিভ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হানিফা মসহাবের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার মাথার মণি, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের ভাই। আইস! তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি। তুমি সীমারকে বন্দী করিয়াছ— তোমার এ গৌরব-কীর্তি অক্ষয়রূপে জগতে চিরকাল সমভাবে থাকিবে— তুমি বিনামূল্যে আজ হানিফাকে ক্রয় করিলে। ভ্রাতঃ! আর আমার গমনে সাধ্য নাই। সীমারের নাম শুনিয়া আমি অধীর হইয়াছি। আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রাতৃবরের শিরচ্ছেদ বিবরণ শ্রবণ অবধি, সীমারকে একবার দেখিব মনে করিয়া আছি। দেখিব তাহার দক্ষিণ হস্তে কত বল, সে খঞ্জর ধরিতে কেমন পটু; তাহাকে কয়েকটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। ইহা ছাড়া সীমারে আর আমার কোন সাধ নাই। সীমার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিবে, আমি তার সঙ্গী আছি। আর বেশি দূরে যাইব না, আজ এইখানেই বিশ্রাম।"

ষোড়শ প্রবাহ

পরিণাম কাহার না আছে? নিশার অবসান, দিনের সন্ধ্যা, পরমায়ুর শেষ, গর্ভের প্রসব, উপন্যাসের মিলন, নাটকের যবনিকা পতন অবশ্যই আছে। পুণ্যের ফল, পাপের শাস্তি —ইহাও নিশ্চয়।

সীমার আজ বন্দী! যে সীমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়াছে, যে সীমার জগৎ কাঁদাইয়াছে, সেই সীমার আজ বন্দী! সেই সীমারের আজ পরিণাম ফল— শেষ দশা! মোহাম্মদ

হানিফা, মসহাব কাক্কা, গাজী রহমান এবং প্রধান সেনাপতিদিগের মত হইল যে, সীমারকে কিছুতেই ইহজগতে রাখা বিধেয় নহে। এমন নিষ্ঠুর, অর্থ-পিশাচ পাপাত্মার মুখ চক্ষে দেখা উচিত নহে। তবে কি কতর্ব্য? যমালয়ে প্রেরণ। কি প্রকারে?—এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

অলীদকে ধৃত করিয়া মোহাম্মদ হানিফা কেন ছাড়িয়া দিলেন? তিনিই জানেন। মোহাম্মদ হানিফা মদিনার প্রবেশ-পথে নির্বিঘ্নে রহিয়াছেন, সীমারের শাস্তিবিধান করিয়া অদ্যই মদিনায় যাইবেন—এই কথাই প্রকাশ।

অলীদের যুদ্ধের আর সাধ নাই— হানিফার মদিনা-গমনে বাধা দিবারও আর শক্তি নাই, মোহাম্মদ হানিফা যখন ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন এক প্রকার প্রাণের ভয়ও নাই,— কিন্তু আশঙ্কা আছে। মসহাব কাক্কার কথা মুহূর্তে মুহূর্তে অন্তরে জাগিতেছে। কি লজ্জা! অধীনস্থ যে সৈন্যগণ জীবিত আছে, তাহারাই বা মনে মনে কি বলিতেছে? আর এক কথা; সে কথা কাহাকেও বলেন নাই— মনে মনেই চিন্তা করিতেছেন, মনে মনেই দুঃখভোগ করিতেছেন— দামেস্কের বহুতর সৈন্য মসহাব কাক্কার সঙ্গী হইয়াছে, ইহার কারণ কি? কেন তাহারা কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিল— ইহার কি কোন কারণ আছে? এই সকল ভাবিয়া অলীদ দামেস্কে না যাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভগ্ন-শিবিরে হানিফার মদিনা প্রবেশ পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকাই স্থির করিয়াছেন।

অসময়ে হানিফার শিবিরে আনন্দের বাজনা। আজ আবার বাজনা কেন? অলীদ ভাবিলেন, আবার কি যুদ্ধ? আবার কি মসহাব কাক্কা রণক্ষেত্রে? মনোযোগের সহিত দেখিলেন— যুদ্ধ-সাজ নহে। মসহাব কাক্কা, মোহাম্মদ হানিফা প্রভৃতি বীরগণ ধনুর্বাণ-হস্তে শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বর্হিগত হইলেন এবং হস্তপদ-বন্ধন অবস্থায় একজন বন্দীকে কয়েক জন সৈন্য ধরাধরি করিয়া আনিয়া উভয় শিবিরের মধ্যবর্তী স্থানে এক লৌহদণ্ডের সহিত বক্ষ বাঁধিয়া দুই দিকে অপর দুই দণ্ডের সহিত কঠিনরূপে বাঁধিয়া বন্দীর পদদ্বয় ঐ হস্তবন্ধ দণ্ডের নিম্নভাগে আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল।

অলীদ মনে মনে ভাবিতেছেন, এ আবার কি কাণ্ড উপস্থিত? এমন নিষ্ঠুরভাবে ইহাকে বাঁধিয়া তীরধনু-হস্তে সকলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে কেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল? এ লোকটি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে? ইহার প্রতি এরূপ নির্দয় ব্যবহার করিতেছে কেন? একটু অগ্রসর হইয়া দেখি— কাহার এই দুর্দশা? কোন হতভাগার পাপের ফল।

মসহাব কাক্কা ধনুবার্ণ হস্তে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলে লাগিলেন, "সীমার, আজ তোমার সৃষ্টিকর্তার নাম মনে কর, তোমার কৃতকার্যের পাপ কথা মনে কর। দেখিলে জগৎ কেমন ভয়ানক স্থান? দেখিলে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে কার্যফল কাঞ্চিৎ পরিমাণে এখানেই পাওয়া যায়। লোকে অজ্ঞতা-তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া ভবিষ্যতের জ্ঞান হারাইয়া অনেক কার্যে হস্তক্ষেপ করে; কিন্তু শেষ কোথায় রক্ষা পায়? কে রক্ষা করে? মাতা, পিতা, স্ত্রী-পরিবার, পরিজন কেহ কাহারও নহে। আজ কে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল? কে তোমার পক্ষ হইয়া দুইটি কথা বলিল? মোহ-তিমিরে কেমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল?— তোমার হৃদয়-আকাশ কেমন ঘনঘটায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল? তুমি একবার ভাব দেখি, নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের মস্তক সামান্য অর্থলোভে স্বহস্তে ছেদন করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আরও অনেকে তোমার সঙ্গে

ছিল, তাহারাও যুদ্ধ জয় করিয়াছিল; কিন্তু ইমাম-শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কৈ কেহই তো অগ্রসর হইল না। ধিক তোমাকে! সীমার, শত ধিক তোমাকে! –তুমি জগৎ কাঁদাইয়াছ, – পশুপক্ষীর চক্ষের জল ঝরাইয়াছ, –মানবহৃদয়ে বিষময় বিশাল শেলের আঘাত করিয়াছ। আকাশ-পাতাল, বন-উপবন, পর্বত, বায়ু তোমার কুকীর্তির কীর্তন করিতেছে– সে রবে প্রকৃতি-বক্ষ পর্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে! কিন্তু তোমার পরিণাম-দশা তুমি কিছুই ভাব নাই। দেখ দেখি! আজ তোমার কোন দিন উপস্থিত? সীমার, তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে, এ দিন চিরদিন তোমার সুখসেব্য সুদিনই যাইবে? এক দিনও কি এ দিনের সন্ধ্যা হইবে না? দেখ দেখি, এখন কেমন কঠিন সময় উপস্থিত! সে পবিত্র মস্তক পবিত্র দেহ হইতে ছিন্ন করিতে খঞ্জর দ্বারা কত কষ্ট দিয়াছ। সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভু কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মনে হয়? ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! ইমামের মুমূর্ষু অবস্থার কথা মনে হয়? তোকে নারকী বলিতে পারি না? পরকালের জন্য যে তোমার চিন্তা নাই, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। তোমার পাপভার– যে পাপভার, হায়! হায়! তুমি যাঁহার বুকের উপর উঠিয়া খঞ্জর দ্বারা গলা কাটিয়াছিলে, তিনিই লইয়াছেন। কিন্তু সীমার, জগতে দৈহিক যাতনার দায় হইতে উদ্ধার করিতে তোমার মুখপানে চায় এমন লোক কৈ? ঈশ্বরের লীলা দেখ, তোমার অনুগত সৈন্য তোমারই হস্তপদ বন্ধন করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। ইহাতেও কি তুমি সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি ভক্তি-সহকারে বিশ্বাস করিবে না। এখনও কি তোমার পূর্বভাব অন্তর হইতে অন্তর হয় নাই? এই আসন্নকালে একবার ঈশ্বরের নাম কর। সীমার! আমরা তোমার সমুচিত শাস্তি বিধান করিব বলিয়া আজ তীর-হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তরবারির আঘাত করিলাম না– বর্শা দ্বারা ভেদ করিলাম না; এই বিষাক্ত তীরে তোমার শরীর জর্জরীভূত করিয়া তোমাকে ইহজগৎ হইতে দূর করিব। ঐ দেখ, তোমার প্রিয়বন্ধু ওতবে অলীদ ছলছল নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন মাত্র। কে আজ তোমার সাহায্য করিতে আসিল? তোমার নীরব রোদনে কে কর্ণপাত করিল? তুমি যাহার নিতান্ত অনুগত, তোমার আজিকার দশা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে, আজিকার এ অভিনয়ের অভাবনীয় দৃশ্য রাজগোচর করিতে অনেক চক্ষু তোমার দিকে রহিয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু কেহই তোমার কিছু করিল না। কি আশ্চর্য, তাহাদের অস্ত্রের অভাব নাই, সাহসের অভাব ঘটিয়াছে কিনা জানি না;– কৈ, তাহারা কি করিল? জগতে কেহ কাহারও নহে। সকলেই স্বার্থের দাস, লোভের কিঙ্কর। তোমার সঞ্চিত অর্থ আজ কোথায় রহিল? সেই পুরস্কারের লক্ষ টাকার কি উপকার হইল? ঈশ্বর-কৃপায় তুমি আজ আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী। ধনুর্বাণ সহিত তোমাকে আজ ক্রীড়া করিব। সীমার! তোমার কৃতকার্যের ফল সামান্যরূপে আজ আমাদের হস্তে ভোগ কর। এই আমার কথার শেষ– বাণের প্রথম। দেখ বাণের আঘাত কত মিষ্ট বোধ হয়! কেমন সুখসেব্য নিদ্রা আইসে!”

ধনুর টঙ্কার সীমারের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রাণের মায়া কাহার না আছে? আজ সীমারের চক্ষে জল পড়িল, আজ পাষাণ গলিল। পূর্বকৃত প্রতি মুহূর্তের পাপকার্যের ভীষণ ছবি মনে উদয় হইল। পাপময় জীবনের নিদারুণ পাপচ্ছায় ভীষণ দর্শনে সীমারের চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল। জলবিন্দুর সহিত শরীরের রক্তবিন্দু ঝরিতে লাগিল। সীমার উর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিয়া হোসেনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে

করিয়া জীবন-শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শরীরের মাংস সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেহস্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে– তথাচ সীমারের প্রাণ দেহ-পিঞ্জরেই ঘুরিতেছে। মসহাব কাক্কা প্রভৃতি দ্বিগুণ জোরে শর-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শরীরের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু প্রাণ বাহির হইল না। কি কঠিন প্রাণ! তখন সীমার উর্ধ্বদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, !হে ঈশ্বর! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার শরীরের মাংসখণ্ড প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িল, অস্থি সকল জরজর হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, তবু প্রাণ বাহির হইল না। হে দয়াময়! আমিও তোমার সৃষ্টি জীব, আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর, আমার প্রাণবায়ু শীঘ্রই হোসেনের পদপ্রান্তে নীত কর।"

মোহাম্মদ হানিফা এবং মসহাব কাক্কা এই কাতরাপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া শরাসনে জ্যা শিথিল করিলেন, আর তূণীরে হস্তনিক্ষেপ করিলেন না। সকলেই দয়াময়ের নাম করিয়া শত সহস্র প্রকারে তাঁহার গুনানুবাদ করিলেন। ক্রমে সীমারের প্রাণবায়ু ইহজগৎ হইতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া হোসেনের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বীরকেশরীগণ আর সীমারের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না; শিবিরে আসিয়া মদিনা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ওতবে অলীদ বিষন্ন বদনে দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে আশা তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল, সে আশা আশা-মরীচিকাবৎ ঐ প্রান্তরের বালুকাকণা-মধ্যে মিশিয়া গেল। মনে মনেই বুঝিলেন, সীমারের সৈন্যগণ মসহাব কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। আর আশা কি? এ প্রান্তরে আর আশা কি?

সপ্তদশ প্রবাহ

মন্ত্রণাগৃহে এজিদ একা। দেখিয়াই বোধ হয় কোন বৃহৎ চিন্তায় এখন তাঁহার মস্তিস্ক-সিন্ধু উতলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের সহিত চিন্তা,– এ চিন্তার কারণ কি? কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহের চতুস্পার্শে দৃষ্টি করিলেন;– দেখিলেন, কেহ নাই। পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে মারওয়ান মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত থাকিবেন; সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাচ মন্ত্রিবর আসিতেছেন না। এজিদের চিন্তাকূল অন্তর ক্রমেই অস্তির হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন–, "সীমার বন্দী! এত দিন পরে সীমার শত্রু হস্তে বন্দী! অলীদেরও প্রাণের আশঙ্কা! আমারই সৈন্য– আমারই চির অনুগত সৈন্য যখন বিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন আর কল্যাণ নাই। হা! কি কুক্ষণেই জয়নাব-রূপ নয়নে পড়িয়াছিল। সে বিশালাক্ষীর দোলায়মান কর্ণাভরনের দোলায় কি মহা অনর্থই ঘটিল। অকালে কত প্রাণীর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল। শত শত নারী পতিহারা হইয়া মনের দুঃখে আত্মবিসর্জন করিল। কত মাতা সন্তান-বিয়োগে অধীর হইয়া অস্ত্রের সহায়তার দৈহিক মায়া হইতে– শোক-তাপের যন্ত্রণা হইতে–আত্মাকে রক্ষা করিল! কত দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল! ছিঃ! ছিঃ! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে মহাপাপী হইতে হইল! হায়! হায়! রূপজ মোহে মোহিত হইয়া, আত্মহারা, বন্ধুহারা, শেষে সর্বস্বহারা হইতে হইল! বিনা দোষে, বিনা কারণে, কত পুণ্যাত্মার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল! এত হইল, এত ঘটিল, তবু আগুন নিভিল না,– সে জ্বলন্ত হুতাশনের তেজ কমিল না, সে প্রেমের জ্বলন্ত শিখা আর নীচে নামিল না– সে রত্ন হস্ত

গত হইয়াও আশা পূর্ণ হইল না, স্ববশে আসিল না। –হোসেনকে বধ করিয়াও সে চিন্তার ইতি হইল না! ক্রমেই আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্যহারা, মিত্রহারা, রাজ্যহারা, ক্রমে সর্বস্বহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! ধিক প্রণয়ে! ধিক রমণীর রূপে! শত ধিক কুপ্রেমাভিলাসী পুরুষে! সহস্র ধিক পরস্ত্রী–পরহারক রাজায়!"

এই পর্যন্ত বলিতেই মারওয়ান উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। এজিদ অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীমারের কি হইল?"

"মহারাজ, সীমার যখন বিপক্ষ দলের হস্তগত হইলেন, তখন তাঁহার আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন ওতবে অলীদের রক্ষা, রাজ্যরক্ষা, প্রাণরক্ষা, এই সকল রক্ষার উপায় চিন্তা করাই অগ্রে কর্তব্য। সীমারের উদ্ধার, সীমারের আশা আর করিবেন না। কারণ, সীমার মোহাম্মদ হানিফার হস্তগত হইলে তাঁহার রক্ষা কিছুতেই নাই।"

"তবে কি সীমার নাই?"

"সীমার নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয় যে, সীমার মোহাম্মদ হানিফের হস্তে পড়িয়াছে। সুতরাং সীমার-উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া অলীদ-উদ্ধারের চিন্তাই এক্ষণে আবশ্যক হইয়াছে। তাহার পর এ কয়েক দিনে যদি অলীদ বন্দী হইয়া থাকেন, কি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া। আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তবে প্রথম চিন্তা দামেস্ক রাজ্য রক্ষা, আপনার প্রাণরক্ষা। আপন সৈন্য যখন বিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন দুঃসময়ের পূর্ব-চিহ্ন, দুরবস্থার পূর্বলক্ষণ, সম্পূর্ণ বিপদের সূচনা দৃশ্য দেখাইয়া অমঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে। আমাদের সৌভাগ্য-শশী চিররাহুগ্রস্ত হইবে বলিয়াই জগতের অন্ধকার ছায়ার দিক ক্রমশঃই সরিতেছে।"

এজিদের কর্ণে কথা কয়েকটি বিষসংযুক্ত সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। তাঁহার মনের পূর্বভাব কে যেন হরণ করিয়া অন্তরময় মহাবিষ ঢালিয়া দিল! সিংহ-গর্জনে গর্জিয়া উঠিলেন, "কি, আমি বাঁচিয়া থাকিতে দামেস্কের সৌভাগ্য-শশী চিররাহুগ্রস্ত হইবে? একথা তুমি আজ কোথায় পাইলে? কে তোমার কর্ণে এ মূলমন্ত্র টিপিয়া দিয়াছে? মারওয়ান! বুঝিলাম, হানিফার তরবারির তেজের কথা শুনিয়া তোমারও হৃৎপিণ্ডের শোণিতধার শুকাইয়া গিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিও এজিদ বর্তমানে থাকিতে এ রাজ্যের সৌভাগ্য শশীর অল্প পরিমাণ অংশও রাহুর গ্রাসে পতিত হইবে না। আমি– তোমাকে এইক্ষণে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহারই উত্তর দাও। জয়নাল আবেদীন, হাসান-পরিবার ইহারা কি এখন জীবিত থাকিবে? মোহাম্মদ হানিফা যদি সীমারের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি জয়নালের শিরচ্ছেদ স্বহস্তে করিব।"

"মহারাজ, এ সময়ে জয়নাল আবেদীনের প্রাণবিনাশ করিলে আর নিস্তার নাই। এ জ্বলন্ত আগুন এখনও নির্বাণের উপায় আছে– এখনও রক্ষার উপায় আছে– এখনও সন্ধির আশা আছে। কিন্তু জয়নালের কোন অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্য, প্রাণ অমূলে বিনাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। দামেস্ক-রাজ্যের আশা, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জয়নাল আবেদীনকে যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারেন। এখন পরাজয় স্বীকার পূর্বক জয়নালকে ছাড়িয়া দিলে দামেস্কনগর রক্ষার আশা কারিলেও করা যাইতে পারে। দেখুন, হাসানের বধ সাধন হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান প্রকাশ্য সভায় যে সারগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশ স্থলে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় আমি

তাঁহার মতের পোষকতা করি নাই। যদি জানিতাম যে, হোসেন ব্যতীত মোহাম্মদ হানিফা নামে প্রবল পরাক্রান্ত আরও এক বীর আছে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সচিবের কথা কখনও 'অবহেলা করিতাম না। আপনার মত প্রবল করিয়া কোন কালেই অগ্রসর হইতাম না; যদি হইতাম, তবে অগ্রে হানিফার বধ-সাধন না করিয়া হোসেনের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না। ভ্রমই লোকের সর্বনাশের মূল। ভ্রমই মনুষ্যের অমঙ্গলের কারণ।"

"মারওয়ান! তোমার এ দুর্বুদ্ধি আজি কেন হইল? আমি পরাজয় স্বীকারে সন্ধি করিব? প্রাণের ভয়ে হানিফার সহিত সন্ধি করিব? জয়নালকে হাসান-পরিজনকে ছাড়িয়া দিব? জয়নাবকে ছাড়িয়া দিব? ধিক তোমার কথায়! আর শত ধিক এজিদের প্রাণে! মারওয়ান! বলতো, এ মহাসংগ্রামের কারণ কি? এ ঘটনার মূল কি? তুমি কি সকলই বিস্মৃত হইয়াছ? মনে হয়, তুমিই না বলিয়াছিলে, স্ত্রীজাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয়? কৈ এত দিনেও তো তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইলাম না। জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে?– এও তোমারই কথা। কৈ, বন্দীগৃহে মহাক্লেশে থাকিয়াও তো সুখী হইতে ইচ্ছা করে না, পাটরাণী হইতেও চাহে না। মারওয়ান! তোমাদের পদে পদে ভ্রম! আমি তো উন্মাদ। গত বিষয় আলোচনা বৃথা। আমার আজ্ঞা এই যে, তোমাকে এখনই অলীদ-সাহায্যে এবং সীমার-উদ্ধারে যাইতে হইবে।"

"আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, অলীদের সাহায্য ব্যতীত এ সময়ে হানিফাকে আক্রমণ করিতে আমি পারিব না।"

"সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিবে না?"

"সুযোগ পাইলে মারওয়ান ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে করিবেন না। তবে অগ্রেই বলিতেছি যে, অলীদকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য। সীমারের দেখা পাইলে কি জীবিত থাকিলে অবশ্যই উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"চেষ্টা করিবে,– কি কথা। উদ্ধার করিতে হইবে।"

"মহারাজ! যে কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চিন্তরূপে আর কিছুই বলিতে পারি না। সময় মন্দ হইলে চতুর্দিক হইতে বিপদ চাপিয়া পড়ে। এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য না করিলে পরিণাম রক্ষা হইবে না। একা মোহাম্মদ হানিফা আপনার শত্রু নহে। নানা দেশের নানা রাজ্যের ভূপতি ও বীরপুরুষগণ আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বলিতে গেলে, মোহাম্মদ-ভক্ত মাত্রেই আপনার প্রাণ লইতে দুই হস্ত বিস্তার করিয়াছে।"

"আমি কি এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছি যে, তোমার বর্ণিত রাজাগণ সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইব?"

"মহারাজ! জয় পরাজয় ভবিষ্যতের গর্ভে।"

"তবে কি হানিফার খণ্ডিতমস্তক আমি দেখিব না?"

"অবশ্যই দেখিতে পারেন– বিলম্বে।"

"কথা অনেক শুনিলাম, তুমি অদ্যই পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অলীদের সাহায্যে এবং সীমারের উদ্ধারে গমন কর, এই আমার আজ্ঞা!"

এই আজ্ঞা করিয়া এজিদ রোষভরে মন্ত্রণাগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

মারওয়ান বলিতে লাগিলেন, "দুর্মতির লক্ষণ এই, যেখানে উচিত সেইখানেই রোষ। যাহা হউক, আমি এখন যাত্রা করিব, সীমারের উদ্ধার যাহা হইবার, বোধ হয় এতদিনে হইয়া গিয়াছে, অলীদের উদ্ধার হয় কি না, তাহাই সন্দেহ।"

অষ্টাদশ প্রবাহ

কি মর্মভেদী দৃশ্য! কি হৃদয়-বিদারক বিষাদ ভাব! কাহারও মুখে কথা নাই, হর্ষের চিহ্ন নাই, যুদ্ধ জয়ের নাম নাই, সীমার-বধের প্রসঙ্গ নাই, অলীদ-পরাজয়ের আলোচনা নাই। রাজার রাজবেশ-শূন্য, শির শিরস্ত্রাণশূণ্য, পদ পাদুকাশূন্য, পরিধেয় নীলবাস,– বিষাদ-চিহ্ন নীলবাস! সৈন্যদলের বাজনা বাজিতেছে না, তুরীডঙ্কার আর শব্দ হইতেছে না। 'নকীব' উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরীরবে ভূপতিগণের শুভাগমন-বার্তা আর ঘোষণা করিতেছে না। সকলেই পদব্রজে-সকলেই ম্লানমুখে– নীরবে। তীর তূণীরে, তরবারি কোষে, খঞ্জর পিধানে, সকল চক্ষুই জলে পরিপূর্ণ। কারুকার্যখচিত সুন্দর নিশান স্থানে আজ নীল নিশান। হানিফা সসৈন্যে রাজপথে– পূন্যভূমি মদিনা নগরের রাজপথে। নগরের উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে, অত্যুচ্চ মঞ্চে, সিংহদ্বারে, নানা স্থানে অনন্ত শোক-প্রকাশক নীল পতাকাসকল, অনিল সহকারে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া হোসেনের অনন্ত শোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রকাশ করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই শোকের চিহ্ন,– বিষাদের রেখা! হোসেন-শোকে মদিনার এই দশা! এ দশা কে করিল? এ অন্তর্ভেদী দুর্দশা কে ঘটাইল? মর্তে, শূন্যে, আকাশে, নীলিমা-রেখা কে অঙ্কিত করিল? হায়! হায়! হোসেন–শোকের অন্ত নাই! এ বিষাদ-সিন্ধুর শেষ নাই! বিমানে সূর্যদেবের অধিকার, রজনী দেবীর তারকামালার অধিকার থাকা পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের অন্তরাকাশ হইতে এ মহাবিষাদ-নীলিমা-রেখা কখনই বিলীন হইবে না– কখনই সরিবে না।

মোহাম্মদ হানিফা নিদারুণ শোকে, মর্মভেদী বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসিগণ হোসেনের নাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মোহাম্মদ হানিফার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হায়! পূণ্যভূমি মদিনা আজ অন্ধকার! মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে শোক-সিন্ধুর তরঙ্গ উঠিয়াছে– প্রবাহ ছুটিয়াছে। নূরনবী হযরত মোহাম্মদের রওজার চতুষ্পার্শ্বে যাইয়া সকলে একত্রে হাসান, হোসেন, কাসেম প্রভৃতির শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমেই ক্রন্দনের আবেগ বৃদ্ধি, আরও বৃদ্ধি। কিন্তু বৃদ্ধি হইতে হইতেই হ্রাস, ক্রমেই মন্দীভূত, ক্রমেই নীরব, ক্রমেই চক্ষু জলহীন, ক্রমেই পরিবর্তন, ক্রমেই হা-হুতাশ, ক্রমেই দুই একটি কথা শুনা যাইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা সকলের কথাই শুনিতে লাগিলেন। কাহাকেও আশ্বস্ত করিলেন, কাহাকেও সাহস দিলেন, কাহাকেও বা সস্নেহ মিষ্ট সম্ভাষণে আদর করিলেন। ক্রমে নাগরিক দলকে বিদায় করিয়া সঙ্গীয় রাজগণ, সৈন্যগণ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ, কে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার তত্ত্বাবধান এবং আহার বিহার বিশ্রামের শৃঙ্খলায় মনোনিবেশ করিলেন।

মদিনার প্রধান ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়?"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "মদিনার সিংহাসনে জয়নাল আবেদীনকে না বসাইতে পারিলে আমার মনে শান্তি হইবে না। দুঃখ করিবার সময় অনেক রহিয়াছে। মদিনার যেরূপ বিশ্রী অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া মহাকষ্টভোগ করিতেছে। জয়নাল আবেদীন নিশ্চয়ই জীবিত আছে। জয়নাল মদিনা ও দামেস্ক উভয় রাজ্যই করতলস্থ করিয়া একচ্ছত্ররূপে রাজত্ব করিবে, ইহা নিশ্চয় অব্যর্থ। যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এত দূর সফল হইল, তাঁহার বাক্যের শেষ অংশ কি আর সফল হইবে না? আপনারা সকলে অনুমতি করিলেই আমি দামেস্ক আক্রমণে যাত্রা করিতে পারি।

নাগরিকদল মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "জয়নাল আবেদীন ঈশ্বরানুগ্রহে অবশ্যই মক্কা, মদিনা ও দামেস্কের সিংহাসন অধিকার করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অটল আশা আছে; তবে কয়েক দিন বিলম্ব মাত্র। আপনি পথশ্রমে শ্রান্ত, সৈন্যগণও অলীদ সহ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়াছেন; এ অবস্থায় কয়েক দিন এই পবিত্রধামে বিশ্রাম করিয়া দামেস্কে যাত্রা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। জয়নাল উদ্ধারে মদিনার আবালবৃদ্ধ আপনার পশ্চাদ্বর্তী হইবে, কেহই ঘরে বসিয়া থাকিবে না। এতদিন আমরা নায়কবিহীন হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছি; যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়াছি; কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। হযরতের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইব বলিয়াই কাসেদ পাঠাইয়াছিলাম। আপনি এত অল্প সৈন্য লইয়া কখনই দামেস্কে যাইবেন না। এজিদের চক্র, মারওয়ানের মন্ত্রণা ভেদ করা বড়ই কঠিন; – আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। কখনও মদিনা বীরশূন্য হয় নাই– এখনও মদিনা পরাধীন বা পরপদভরে দলিত হয় নাই।– এখনও মদিনার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয় নাই; (কখনই হইবে না)। এখনও মদিনা একেবারে নিঃসহায় কি কোন বিষয়ে নিরাশ হয় নাই। এজিদের অত্যাচার –নূরনবী মোহাম্মদের বংশধরগণের প্রতি অত্যাচারের কথা মদিনা ভুলে নাই। যাঁহার জন্য এই পবিত্র সিংহাসন শূন্য আছে, তাঁহার কথা সকলের অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে,– তাঁহার" উদ্ধারের চেষ্টা দিবানিশি অন্তরে জাগিতেছে। আপনি যে-দিন মদিনা হইতে যাত্রা করিবেন, সেই দিন মদিনার লোকের প্রভুভক্তি, রাজভক্তি, একতার আদর্শ, হোসেনের বিয়োগজনিত দুঃখের চিহ্ন সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না; এইমাত্র নিবেদন যে, সপ্তাহকাল এই নগরে বিশ্রাম করুন, সপ্তাহ অন্তর আমরা সকলে আপনার সঙ্গী হইব।"

মোহাম্মদ হানিফা নগরবাসীদিগের অনুরোধে সপ্তাহকাল সসৈন্যে মদিনায় থাকিতে সম্মত হইলেন।

ও দিকে মারওয়ানের মদিনাভিমুখে আগমন এবং অলীদের দামেস্কে গমন, পথিমধ্যে উভয় সেনাপতির সাক্ষাৎ–উভয় দলের মিলন! অলীদ–সঙ্গে অল্প মাত্র সৈন্য; তাহার অধিকাংশ আহত, কত জ্বরা, কত অর্দ্ধমরা, কত অসুস্থ। মুখ মলিন, বসন মলিন, পৃষ্ঠদেশে তূণীর ঝুলিতেছে, তীর নাই। কোষ রহিয়াছে, তরবারি নাই। বর্শার ফলক কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কেবল দন্ড বর্তমান। ছিন্ন পতাকা, ভগ্ন দন্ড, সাহস উৎসাহের নামমাত্র নাই যেন তাড়িত, –ভয়ে চকিত, সর্বদাই পশ্চাৎদৃষ্টি। মনঃসংযোগে অশ্ব–পদ–শব্দ শুনিতে কর্ণ স্থির। সৈন্যগনের অবস্থা দেখিলে অনুমান হয় যে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেই ইহাদের সর্বস্ব উড়িয়া গিয়াছে। আহারাভাবে মহাক্লান্ত!

মন্ত্রীপ্রবর মারওয়ান অলীদের ব্যবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, ঐ সংযোগস্থলেই উভয় দল একত্রিত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন। পরস্পর কথাবার্তা হইলে মারওয়ান বলিলেন, "এইক্ষণ মদিনা আক্রমণ, কি হানিফার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে; আমাদের বলবিক্রমের সহিত তুলনা করিলে হানিফার সৈন্যবল সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ; এ অবস্থায় আত্মরক্ষাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ"।

অলীদ বলিলেন, আত্মরক্ষার ভিন্ন আর উপায় কি? সীমারের দুর্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া গিয়াছে।

"সীমারের দুর্দ্দশা কি?"

অলীদ সীমারের শাস্তির বৃত্তান্ত আদি অন্ত বিবৃত করিলেন।

মারওয়ান বলিলেন, "সীমারের যে দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা আমি অগ্রেই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম"।

অলীদ বলিলেন, "ভ্রাতঃ! হানিফার বলবিক্রম দেখিয়া স্বদেশের আশা, জীবনের আশা, ধন–জন–পরিজন–আশা হইতে একেবারে নিরাশ হই নাই বটে, কিন্তু সন্দেহ অনেক ঘটিয়াছে"।

ওরে ভাই! আমি তো সীমার উদ্ধার ও তোমার সাহায্য, এই দুই কার্যের ভার গ্রহণ কারিয়া আসিয়াছি। সীমারের উদ্ধার তো এ জীবনে এক প্রকার শেষ হইল। এখন তোমার সাহায্য বাকী। যাহা হোক, এই সকল অবস্থা লিখিয়া মহারাজ–সমীপে কাসেদ প্রেরণ করি। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব। এই স্থানটি অতি মনোহর ও মনোরম।

ঊনবিংশ প্রবাহ

রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিয়া দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল। মদিনাবাসীরা মোহাম্মদ হানিফাকে সসৈন্যে আর এক সপ্তাহ মদিনায় থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হানিফা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হাঁ–না কিছুই কহিলেন না।

গাজী রহমান বলিলেন, "আপনাদের অনুরোধ অবশ্যই প্রতিপাল্য; কিন্তু জয়নাল–উদ্ধারে যতই বিলম্ব, ততই বিপদ মনে করিতে হইবে। এ সময় বিশ্রামের সময় নহে। এক এক মুহূর্ত এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে! বিশেষ মারওয়ানের মন্ত্রণার অন্ত নাই–কোন সময় এজিদকে কোন পথে চালাইয়া কি অনর্থ ঘটাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো, সে সময় এজিদের প্রাণান্ত সহিত দামেস্ক নগর সমভূমি করিলেও সে দুঃখের উপশম হইবে না,–সে অনন্ত দুঃখের ইতি হইবে না। আপনারা প্রবীণ প্রাচীন, যাহা ভাল হয়, করুন।"

নাগরিক দল হইতে একজন বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে কারণে প্রভুকে আর এক সপ্তাহকাল থাকিতে অনুরাধ করিতেছি, সে কথা এখন বলিব না। তবে সময়ে তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না। জয়নাল আবেদীন পাপাত্মা এজিদের বন্দীগ্রহে বন্দী; প্রভু হাসান–হোসেনের স্ত্রী পরিবার নূরনবী মোহাম্মদের সহধর্মিণী বিবি সালেমা ইহারাও বন্দী; দিবারাত্রি, প্রহরে দন্ডে, পলে অনুপলে আমাদের অন্তরে এ সকল কথা জাগিতেছে,–প্রাণ কাঁদিতেছে,–তাঁহাদের

দুঃখের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! মনে হইতেছে যদি পাখা থাকিত, যদি মুহূর্ত মধ্যে যাইবার কোন উপায় থাকিত, তবে এখনই যাইয়া দামেস্ক নগর আক্রমণ এবং নরাধম এজিদের প্রাণবধ জয়নাল উদ্ধারের উপায় করিতাম। আমরা ভুক্তভোগী, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা, পদে পদে নৈরাশ্য। অধিক আর কি বলিব, এজিদের আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, অলীদের চক্রে, জাএদার সাহায্যে, মায়মুনার কৌশলে, মহর্ষি হাসানকে হারাইয়াছি। জেয়াদের ছলনায় সেই মহাপাপী চির-নারকী জেয়াদের প্রবঞ্চনায় প্রভু হোসেন, মহাবীর কাসেম এবং আলী আকবর প্রভৃতিকে মদিনা হইতে চিরবিদায় দিয়াছি! মন্ত্রিবর কি বলিব? মদিনার শত শত সমুজ্জ্বল রত্ন কারবালা প্রান্তরে রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে- সে সকল কথা কি আমরা ভুলিয়াছি? তবে যে কেন বিলম্ব করিতেছি, বলিব। যদি ঈশ্বর সে সময়ে মুখ দেখান, তবে বলিব। আমাদের শত অনুরোধ, মদিনাবাসী আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই অনুরোধ আর এক সপ্তাহ আপনারা সসৈন্যে মদিনায় অবস্থিতি করুন। সময় হইলে আমরা কখনই দামেস্ক গমনে বাধা দিব না, বরং মনের আনন্দে জয় জয় রবে জয়নাল–উদ্ধারে আপনাদের সঙ্গে যাত্রা করিব।

মদিনাবাসীদের মত না হইলে দামেস্ক আক্রমণ করা হইবে না, ইহা পূর্ব হইতেই সুসিথর আছে। সুতরাং গাজী রহমান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; অন্য আলাপে নগরবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। সে দিন কাটিয়া গেল। নিশাগমনে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিদ্রাদেবীর নিয়মিত অর্চ্চনায় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা শয়ন করিয়া আছেন, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। স্বপ্ন দেখিতেছেন–যেন হযরত নূরনবী মোহাম্মদ তাঁহার শিয়রে দন্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "মোহাম্মদ হানিফা! জাগ্রত হও, আলস্য পরিহার কর, এ সময় তোমার বিশ্রামের সময় নহে। তোমার পরিজন দামেস্কে বন্দী, তুমি মদিনায় বিশ্রামসুখে বিহ্বল! যাও দামেস্কে, ঈশ্বরের নাম করিয়া এখনই যাত্রা কর, জয়নাল উদ্ধার হইবে, কোন চিন্তা নাই।ঈশ্বর তোমার সহায়"। মোহাম্মদ হানিফা যেন স্বপ্নযোগে প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল–অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে ভীত হইয়া গাজী রহমানকে ডাকিয়া মস্হাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আর আর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণকে জাগাইয়া স্বপ্ন–বিবরণ বলিলেন।

গাজী রহমান বলিলেন, "প্রভুর আদেশ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই; এখনই যাত্রা,–এই শুভ সময়। হাঁ, এখন বুঝিলাম,– সময়ের অর্থ এখন বুঝিলাম। আমরা কেবল রাজনীতি, সমরনীতি, বিধিব্যবস্থা, যুক্ত ও কারণের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য করি। ভ্রম হইলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া রক্ষা পাই। কিন্তু মদিনাবাসীরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি সেই সময়ে অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা! ধন্য তোমার একাগ্রতা!

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "গাজী রহমান! আমরা বাহ্যিক ব্যবহার বাহ্যিক কারণ দেখিয়াই কার্যানুষ্ঠান করি; কিন্তু মদিনাবাসদিগের প্রতি কার্য ঈশ্বরে নির্ভর করে এবং নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি; – তাহার প্রমাণ প্রাচীন কাহিনী প্রভুর জন্মস্থান মক্কা নগরের অধিবাসীরা প্রভুর কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা দূরে থাকুক, বরং তাহার জীবনের বৈরী হইয়াছিল। এই মদিনাবাসীরাই তাহাকে সম্মানের সহিত

গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সত্যধর্ম এই মদিনাবাসীরাই প্রকাশ্যভাবে অকপটে গ্রহণ করে। আর অধিক কি বলিব, মদিনাবাসীর অন্তর সরল ও প্রেমপূর্ণ। আমি এখনই যাত্রা করিব, প্রভাতের প্রতীক্ষায় আর থাকিব না।"

আজ্ঞামাত্র ঘোররবে ভেরী বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ নিদ্রাসুখ পরিহার করিয়া আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল। সাজ সাজ রবে চতুর্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সজ্জিত হইতে প্রভাতীয় উপাসনা-সময়ের আহ্বান স্বরে সকলের কর্ণকে আনন্দিত করিল। মদিনাবাসীরা প্রথমে ভেরী শব্দ এবং পরে উপাসনার সুমধুর আহ্বান-স্বরে জাগরিত হইয়া নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিলেন। মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং সৈন্যগণ সজ্জিতবেশে উপাসনায় দন্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা সমাধান করিয়া জয়নালের উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। নগরবাসীরা মহা ব্যস্ত হইয়া হানিফার চতুর্দিক বেষ্টন করতঃ জোর করে বলিতে লাগিলেন, "হযরত! গতকল্য আমরা যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় গ্রাহ্য হইল না।"

মোহাম্মদ হানিফা বিনয় বচনে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! বিগত নিশায় স্বপ্নযোগে প্রভু মোহাম্মদ আমাকে দামেস্ক গমনে আদেশ করিয়াছেন। আর আমার সাধ্য নেই যে, এখানে ক্ষণকাল বিলম্ব করি।"

"হযরত! আমরা অজ্ঞ, অপরাধ মার্জনা হউক। ঐ আদেশের জন্যই সপ্তাহকাল মদিনায় অবস্থিতির নিমিত্ত পূর্বেও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গতকল্যে প্রার্থনা ও ঐ কারণে। আমরা চির আজ্ঞাবহ দাস, মার্জনা করিবেন। এখন আমাদের আর কোন কথা নাই,-আপনিও প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরাও প্রস্তুত আছি । আপনি অশ্বে কশাঘাত করিলেই দেখিবেন, কত লোক জয়নাল-উদ্ধারে অনুগামী হয়।"

মোহাম্মদ হানিফা, মস্‌হাব কাক্কা, গাজী রহ্‌মান ও হানিফার আর আর আত্মীয়স্বজন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণ বীরদর্পে অশ্বপৃষ্ঠে ঈশ্বরের নাম করিয়া চাপিয়া বসিলেন। রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হানিফার বিজয়-ঘোষণা করিতে করিতে যাত্রা করিল। ধানুকী, পদাতিক ও পতাকাধারিগণ আনন্দরবে অগ্রে চলিল।

সপ্তবার হজরতের পবিত্র রওজা পরিক্রম করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ডাকিয়া সকলে জয়নাল-উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। মদিনাবাসীরাও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহানন্দে হানিফার জয় ঘোষণা করিতে করিতে সৈন্যদলে মিশিলেন। মারণ ভিন্ন মরণ কথা কাহারও মনে নাই। সিংহদ্বার পার হইয়া সকলে পুনরায় একস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পথদর্শক উষ্ট্রারোহী মধুরস্বরে বংশীবাদন করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল।

দিবাভাবে গমন-রাত্রে বিশ্রাম। এইভাবে কয়েক দিন যাইতে যাইতে এক দিন পথদর্শকদল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ভেরী বাজাইতে লাগিল। সকলেই সমুৎসুক হইয়া সম্মুখে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিতেই দেখিলেন যে বহু দূরে শিবিরের উচ্চ চূড়ান্ত লোহিত নিশান উড়িতেছে। গাজী রহমান সাঙ্কেতিক নিশান উড়াইয়া সকলকে গমনে ক্ষান্ত করিলেন। সকলেই মহাব্যস্ত। তত্ত্বানুসন্ধানে জানিলেন যে, সম্মুখে সমর-

নিশান উড়িয়াছে, সবিশেষ না জানিয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। মারওয়ান-শিবিরেও মারওয়ান ভেরীবাদ ধ্বনি শুনিয়াছেন।

শিবিরের বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার মুখে অন্য কোন কথা সরিল না। অস্থির ও আতঙ্কিতভাবে অলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ আবার যে পূর্বগগনে কি দেখা যায়? ঐ কি আগমন?"

"কার আগমন?"

"আর কার? যার ভয়ে অলীদ কম্পমান-মারওয়ান অস্থির।"

অলীদ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন বলিলেন."আর সন্দেহ নাই-এক্ষণে কি করা যায়?"

"আর কি করা যায়! কিছু দিন বিশ্রাম করিব, আশা ছিল-ঘটিল না। আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেই তোমার আমার দশা মিলিয়া মিশিয়া বোধ হয়, একই হইবে। হয়ত কিছু বেশীও হইতে পারে। পূর্বসঙ্কল্প ঠিক রাখিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে, যাইয়া নগর রক্ষার উপায় করা কর্তব্য। নিতান্ত পক্ষে চাপিয়া পড়ে, দামেস্ক নগর-নিকটস্থ প্রান্তরে আবার ডঙ্কা বাজাইয়া নিশান উড়াইব, ফিরিয়া দাঁড়াইব। এখানে আর কিছুই নহে; প্রস্থান-ত্রস্তে প্রস্থান।"

"উহারা যে বিক্রমে আসিতেছে, আমরা যে উহাদের অগ্রে দামেস্কে যাইতে পারিব, তাহাতেও অনেক সন্দেহ! আপন রাজ্যে দ্বিগুণ বল, যেখানেই ধর ধর, সেইখানেই মার মার। ঐ দেখ, উহারাও গমনে ক্ষান্ত হইয়াছে। না জানিয়া বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া, কেন অগ্রসর হইবে? আমাদের সন্ধান না লইতে লইতে আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। আর কথা নাই ভাই! প্রস্থান- শীঘ্র প্রস্থান।"

তখনই শিবির-ভঙ্গের আদেশ হইল, লোহিত পতাকা নীচে নামিল। মুহূর্তমধ্যে শিবির ভঙ্গ করিয়া মারওয়ান ও অলীদ সৈন্যগণসহ দামেস্কাভিমুখে বেগে চলিলেন।

ওদিকে গাজী রহমান মহা চিন্তায় পড়িয়াছেন। এই নিশান উড়িতে উড়িতে কোথায় উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শিবির ভগ্ন হইল। লোকজনও সরিতে লাগিল ক্রমেক্রমেই ঈষৎ দৃষ্টি ক্রমেই দৃষ্টির অগোচর।

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানকে বলিলেন,"আর চিন্তা কেন, পৃষ্ঠ দেখাইয়া যখন পলাইয়া গেল, তখন আর সন্দেহ কি? পলায়িত ব্যক্তির পরিচয় নিস্প্রয়োজন; আজ এই স্থানেবিশ্রাম।"

"তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বিশেষ সতর্কভাবে থাকিতে হইবে। উহারা পলাইল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। গুপ্তচরদিগকে কয়েক জন চতুর সৈন্যসহ সন্ধানে পাঠাইতেছি। সন্ধান করিয়া জানিয়া আসুক, উহারা কে? কেন শিবির স্থাপন করিয়াছিল? কেনই বা চলিয়া গেল।

"উহা তো ওতবে অলীদের শিবির নহে?"

"না-না; অলীদের শিবিরের অতজাকজমক কোথা?

"তবে কি?"

সেই তো সন্দেহ এখনই জানিতে পারিবে।

বিংশ প্রবাহ

"সীমার নাই? আমার চির হিতৈষী সীমার নাই? মহাবীর সীমার ইহজগতে নাই? হায়! যে বীরের পদভারে কারবালা-প্রান্তর কাঁপিয়াছে, যাহার অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বয়িয়াছে, হোসেন-শির দামেস্কে আসিয়াছে, সেই বীর নাই? কে তাহার প্রাণহরণ করিল? হায়, নিমক-হারাম সৈন্যগণ ষড়যন্ত্র করিয়া সীমারকে বাঁধিয়া দিল, তাহাতেই এই ঘটিল। কাসেদ! বল, কে সীমারকে বধ করিল?"

কাসেদ জোড় করে বলিতে লাগিল, "বাদশাহ-নামদার! মহাবীর সীমারকে এক জনে মারে নাই। পঞ্চদশ রথী মিলিয়া বাণাঘাতে সীমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

"সীমারের হস্তে অস্ত্র ছিল না?"

"তাঁহার হস্তপদ লৌহদন্ডে বাঁধা ছিল। ঐ বন্ধন-দশায় তীরের আঘাতে শরীরের মাংস, শেষে অস্থি পর্যন্ত জর্জরিত হইয়া খসিতে লাগিল, তবু মহাবীরের প্রাণ বাহির হয় নাই। শেষে ঈশ্বরের নাম করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করায় মহাবীর সীমারের আত্মা ইহজগৎ হইতে অনন্তধামে চলিয়া গেল।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "সেখানে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ কেহ ছিল না?"

"বাদশাহ-নামদার! সৈন্য বলিতে আর কেহ নাই। তবে পতাকাধারী, ভারবাহী প্রহরী আর জনকয়েক মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।"

"আর আর সৈন্য?"

"আর আর সৈন্য, প্রায়ই হানিফার অস্ত্রে মারা গিয়াছে। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান নাই।"

"অলীদ"

"সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি জীবিতই আছেন, কিন্তু।"

"কিন্তু কি?"

"বাদশাহ-নামদার! সকলই পত্রে লেখা আছে।"

(মহাক্রোধে),"পত্র শেষে শুনিব। ওতবে অলীদ উপস্থিত থাকিতে সীমার উদ্ধার হইল না? সে কি কথা?"

"তিনি উপস্থিত ছিলেন,এখনও জীবিতই আছেন, কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছেন"

"হানিফা মদিনা যাইতে সাহসী হইয়াছে?"

"বাদশাহ-নামদার" সে সকল কথা মুখে বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। পত্রেই বিশেষ লেখা আছে।"

"না-আমি পত্র খুলিব না। তোমার মুখে সকল কথা শুনিব, বল।"

"বাদশাহ-নামদার, অলীদ পরাস্ত হইয়াছেন।"

"কে পরাস্ত করিল?"

"মোহাম্মদ হানিফা"

"কি প্রকারে?"

"অলীদ মদিনা প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে হানিফার সহিত যুদ্ধ হয়। ক্রমে কয়েক দিন যুদ্ধ-দিবারাত্র যুদ্ধ। শেষ দিন মসহাব কাক্কা বিস্তর অশ্বারোহী

সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে দামেস্ক-সৈন্য আর টিকিতে পারিল না।- রক্তমাখা হইয়া দলে দলে ভূতলে গড়াইতে লাগিল। অশ্বদাপটেই বা কত জনের প্রাণ বিয়োগ হইল। বাদশাহ্ নামদার! এমন যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন বীরত্ব কখনও দেখি নাই অস্ত্রের আঘাতে-অশ্বের পদাঘাত সমান চলিল। দেখিতে দেখিতে দামেস্ক-সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া গিয়া কোথাও পলাইল, তাহার অন্ত রহিল না। বিপক্ষেরা সেনাপতি মহাশয়ের শিবির লুটপাট করিয়া মদিনাভিমুখে জয় জয় রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।"

"অলীদ কিছুই করিলেন না?"

"তিনি আর কি করিবেন? মসহাব কাক্কা তাহার অশ্বকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া এক আছাড়েই তাহার প্রাণ বাহির করিবে-মসহাব কাক্কার এইরূপ কথা; কেবল হানিফার অনুরোধে অলীদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কিন্তু মসহাব কাক্কা ছাড়িবার পাত্র নহেন, এমন সজোরে অলীদ মহামতিকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

"মসহাব কাক্কা কে?"

"তিনিই তো মহারথী সীমারকে ধরিয়া লইয়া-"

"তাহা তো শুনিয়াছি, অলীদ বাঁচিয়া গিয়াও কিছু করিলেন না?"

"মহারাজ! পলায়িত, পরাজিত, আতঙ্কিত, নিদ্রাবেশে কাক্কা রূপে চকিত চমকিত; তিনি কি আর তাহার সম্মুখে দাড়াইতে পারেন?"

"মারওয়ান বোধ হয় অলীদের সাহায্য করিতে পারে নাই?"

"তিনি আর কি সাহায্য করবেন? বাদশাহ-নামদার! মোহাম্মদ হানিফা সর্বস্বান্ত করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিলে এদিকে অলীদ মহামতি দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন, ওদিকে মন্ত্রী মহোদয়ও দামেস্ক হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের দেখা। এইক্ষণ তাঁহারা সেই সংযোগ স্থানে শিবির নির্মাণ করিয়া বিশ্রামে আছেন। আমি সেই সংযোগস্থান হইতে মন্ত্রিপ্রবরের পত্র লইয়া আসিয়াছি। তাহারা গোপনানুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন, যে মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্ক নগর আক্রমণ করিবেন।

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন,"তাঁহারা শুনিতে পারেন, তাঁহারা হারিতে পারেন, তাঁহারা হানিফার নামে কাঁপিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্রামও করিতে পারেন। কিন্তু দামেস্ক নগরে মানুষের আক্রমণ করিবার কি সাধ্য আছে? এই নগরে শত্রু প্রবেশের কি ক্ষমতা আছে? এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, পঞ্চবিংশতি লৌহ দ্বারা, যষ্টি, সেতু, অশীতি পরিখা, পঞ্চ সহস্র গুপ্ত কূপ, এজিদ জীবিত,-ইহাতে হানিফা দূরের কথা, হানিফার পিতা আলী গোর হইতে উঠিয়া আসিলেও এ নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। যাও কাসেদ, এখনই যাও, মারওয়ানকে গিয়া বল গে, আমি স্বয়ং যুদ্ধে আসিতেছি। দেখি, মদিনা আক্রমণ করিতে পারি কি না? দেখি, মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারি কি না? দেখি, আমার হস্তে হানিফা বন্দী হয় কিনা? দেখি, এই তরবারিতে মসহাব কাক্কার শির ধরায় গড়াগড়ি যায় কি না? যাও, তোমার পত্র তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও, -যাহা বলিবার বলিলাম-মুখে বলিও।"

এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়া মাওয়ানের পত্র দুরে নিক্ষেপ করিলেন, কাসেদ পত্র লইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

এজিদ বিশ্রাম-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আদেশ করিলেন,"যত সৈন্য এক্ষণে নগরে উপস্থিত আছে, প্রস্তুত হও-সামান্য প্রহরী মাত্র রাজপুরী রক্ষা করিবে, সৈন্য নামে নগরমধ্যে কেহ থাকিতে পারিবে না, সকলকে আমার সহিত মদিনা আক্রমণে যাইতে হইবে- হানিফার বধসাধনে যাইতে হইবে, মসহাব কাক্কার মস্তক চূর্ণ করিতে যাইতে হইবে-সীমারের দাদ উদ্ধার করিতে যাইতে হইবে। বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, আন অশ্ব, আন উষ্ট্র, এখনই যাত্রা করিব।"

অমাত্যগণ যাঁহার তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে বিরত থাকিতে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু কাহারও কথাই এজিদের নিকট স্থান পাইল না, কর্ণে ভাল লাগিল না। পরিশেষে বৃদ্ধ হামান বলিতে লাগিলেন,-এত দিন পরে বৃদ্ধ সচিব নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন,-

"মহারাজ" আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বয়স-দোষে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মিয়াছে, বিবেচনায় দোষ ঘটিয়াছে-দূর চিন্তাতেও অপারগ হইয়াছি; ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মহারাজ! এই বৃদ্ধ আপনার পিতার চিরহিতৈষী, আপনার হিতৈষী, দামেস্করাজ্যের হিতৈষী। এই দামেস্ক রাজ্য পূর্বে যাঁহার করতলগত ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে উচিত বলিতে এই বৃদ্ধ কখনই তাঁহার নিকট সঙ্কুচিত হয় নাই। তাহার পর আপনার পিতার রাজত্বকালেও এই বৃদ্ধ সর্বপ্রধান মন্ত্রীর আসন প্রাপ্ত হইয়া ন্যায্য কথা বলিতে কখনই ক্রটি করে নাই,-ভীত হয় নাই। মহারাজের রাজত্ব-সময়েও কর্তব্য কার্যে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু মহারাজ! সে কাল আর এ কালে অনেক ভিন্ন। পূর্বে মন্ত্রণার বিচার হইত, তর্কে মীমাংসা হইত,-ভ্রম কাহার না আছে? ভূপতির ভ্রম হইল তিনি ভ্রম স্বীকার করিতেন। অমাত্যগণের ভ্রম হইলে তাহারাও ভ্রম স্বীকার করিতেন। এখন সে কাল নাই, সে মন্ত্রণাও নাই, সে মীমাংসাও নাই। ন্যায্য হউক, অন্যায্য হইক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, স্ব স্ব মত প্রবল করিতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চেষ্টিত। বিশেষ অপরিপক্ক মস্তিস্কের নিকট আমরা এক প্রকার বাতুল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছি! মহারাজ! মনে হয়, হাসানের বিষপানের পর এই নির্বোধ বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? সেই প্রকাশ্য দরবারে কি বলিয়াছিল? নবীন বয়সে নূতন সিংহাসনে বসিয়া কৃষ্ণকেশ বিকৃত অপরিপক্ক মস্তিস্কের মন্ত্রণাতেই মত দিলেন। সেই অদুরদর্শী, ভাব-জ্ঞানশূন্য মজ্জারই বেশি আদর করিলেন। মনের বিরাগে সারগর্ভ উপদেশ বিবেচনা না করিয়া সে সম্পূর্ণ ভ্রমময় অসার বাক্যেরই পোষকতা করিলেন। এ পাগল তুচ্ছ হইল। বালকেই বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করে, যুবাই যুবার নিকট আদর পায়। আমি বয়সে মহাপ্রাচীন হইলেও আপনি রাজা-মাথার মণি। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে সেই এক দিন আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, আর আজ রাজ্যের দুরবস্থা-ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি। মহারাজ! বৃদ্ধ মন্ত্রীর অপরাধ মার্জনা হউক। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে কারণে যুদ্ধ, যে কারণে দামেস্ক-রাজ্যের এই শোচনীয় দশা, সে কারণের পরীক্ষা তো অগ্রেই হইয়াছিল? যে আমার নয় আমি তাহার কেন হইব-একথা সকলের বুঝা উচিত। এক জিনিসের দুইটি গ্রাহক হইলে পরস্পর শত্রুতার হিংসাভাব স্বভাবতঃই যে উপস্থিত হয়,

ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবে যাহার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে সে-দিকে ভ্রমেও লক্ষ্য করে না, তাহাও জানি। যাহার অসহ্য হয়, সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসে–করিতেও পারে। কারণ যৌবনকাল বড়ই ভীষণ কাল। সে কালের অনেক দোষ মার্জনীয়। তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে বল আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। তন্দ্র পরিবারের শক্রতা কি? তাহার সন্তান–সন্ততি পরিজনে হিংসা কি? মহারাজ! হোসেনের শির দামেস্কে আসিল কেন? হোসেন–পরিবার দামেস্ক–কারাগারে বন্দী কেন? ইহার কি কোন উত্তর আছে? বিধির ঘটনা, অদৃষ্টের খেলা খন্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মহারাজ, এখনও উপায় আছে–রক্ষার পন্থা আছে। আপনি ক্ষান্ত হউন। রাজ্যবিস্তারে আমার অমত নাই, কিন্তু তাহার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করুন। এখন চতুর্দিকে যে আগুন জ্বলিয়াছে, আপনি তাহা সহজে নির্বাণ করিতে পারিবেন না। প্রকৃতি ন্যায়ের সহায়, অন্যায়ের বৈরী। মন্ত্রিবর মারওয়ান এখন নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া দামেস্ক–রাজ্য রক্ষাহেতু জয়নাল আবেদীনকে কারামুক্ত করিতে মন্ত্রণা দিতেছেন। সে সম্বন্ধে মহারাজ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার সদ্‌ত্তর করিব। তবে সামান্য একটু বলিয়া রাখি যে, হানিফার সে জলন্ত রোষাগ্নি সহজে নির্বাণ হইবার নহে। আপনি যে আজ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে–প্রথম আপনি কোথায় যুদ্ধে যাইতেছেন, যদি বলেন, মদিনা, –আমি বলিতেছি, মদিনায় যাইবার আর ক্ষমতা নাই। সীমার হত, অলীদ পরাস্ত , মাওয়ান ভয়ে কম্পিত; এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ করা দূরে থাকুক–মদিনার প্রান্ত সীমাতেও প্রবেশ করতে পারিবেন না। ধন--বল আর বাহুবলই রাজার বল, ক্রমাগত যুদ্ধে ধন–ভান্ডার প্রায় শূন্য হইল, আর বাহুবল এখন নাই বলিলেই হয়। সীমারের সহিত সীমারের সৈন্যও গিয়াছে–ওতবে অলীদ সৈন্যসামন্ত হারাইয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন মাত্র। এখন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে জীবিত মারওয়ান। রাজ্যরক্ষার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। আজ যে আদেশ প্রচার হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যরক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ, শত্রুর নানা পথ শত্রুর সন্ধান অব্যর্থ। মহারাজ এদিকে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অন্য পথে যদি শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করে, তখন কে রক্ষা করিবে? সে অস্ত্র–সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া কে দন্ডায়মান হইবে? আমি মহারাজের গমনে বাধা দিতেছি না। আপনারই রাজ্য, আপনারই সিংহাসন, আপনিই রক্ষা করিবেন। আমার যাহা বলিবার, বলিলাম–গ্রাহ্য করা না করা মহারাজের ইচ্ছা।

এজিদ মন্ত্রিবর হামানের কথা মনঃসংযোগে শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার চির–হিংসাপূর্ণ হৃদয়কে স্ববশে আনিতে পারিলেন না। দুর্নিবার ক্রোধ দ্বাদশ প্রকার হিংসার জীবন্তমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। লোহিত লোচনে ক্রোধযুক্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি মাবিয়ার মন্ত্রী–আমার সহিত তোমার কোন মতেরই ঐক্য নাই–হইবেও না–হইতে পারেও না। তুমি অনেক সময় আমাকে মনঃকষ্ট দিয়াছ। আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি দূর হও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। কে আছে, এই বৃদ্ধ পাগলকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ কর। যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহার উপযুক্ত স্থান মশান বা শ্মশান। যাও বুদ্ধিমান যাও, তোমার পরিপক্ক মস্তক

লইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ কারাগারে বাস কর। রাজপ্রাসাদে তোমার আর স্থান নাই।"

আজ্ঞামাত্র প্রহরীগণ বৃদ্ধি সচিবকে লইয়া চলিল। মন্ত্রিবর যাইবার সময়ও বলিলেন, "মহারাজ! রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য। আমি এখনও বলিতেছি, আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না, মারওয়ানের সংবাদ না লইয়া কখনও নগর পরিত্যাগ করিবেন না।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "আমি এখনই যুদ্ধে যাইব। কোথায়?—ওমর কোথায়? হাসেম কোথায়?"

শশব্যাস্তে সৈন্যাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইলেন। পুনরায় এজিদ বলিলেন, "মদিনা আক্রমণে, হানিফার বধ-সাধনে, আমার সহিত এখনই সসৈন্যে যাত্রা করিতে হইবে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে আজ ওমর বরিত হইলেন, যাও-প্রস্তুত হও, যত সৈন্য নগরে আছে, তাহাদিগকে লইয়া প্রস্তুত হও।"

একবিংশ প্রবাহ

হুতাশনের দাহন আশা, ধরণীর জলশোষণ আশা, ভিখারীর অর্থলোভ আশা, চক্ষুর দর্শন আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ আশা, ধনীর ধনবৃদ্ধির আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্য-বিস্তার আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপ হৃদয়ে দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি নাই-ইতি নাই। যতই কার্যসিদ্ধি, ততই দুরাশার বৃদ্ধি। জয়নাবের রূপমাধুরী হঠাৎ এজিদ চক্ষে পড়িল, অন্তরে দুরাশার সঞ্চার হইল। স্বামী জীবিত,- জয়নাবের স্বামী আব্দুল জব্বার জীবিত; অত্যাচারে বলপ্রকাশে মাবিয়ার নিতান্ত অমত, অথচ জয়নাব-রত্ন লাভের আশা। কি দুরাশা!- সে কার্যও সিদ্ধ হইল, কিন্তু আশার ইতি হইল না। সে রত্নখচিত সজীব পুষ্পহার দৈবনির্বন্ধে যে কণ্ঠ শোভা করিল-হৃদয় শীতল করিল-সে কন্টক। এজিদ চক্ষে হাসান বিষম কন্টক; তাঁহার জীবন অন্ত করিতে পারিলেই আশা পূর্ণ হয়। তাহাও ঘটিল; কিন্তু আশার ইতি হইল না। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবন প্রদীপ নির্বাণ না করিলে কখনই মনের আশা পূর্ণ হইবে না। ঘটনা-ক্রমে কারবালা-প্রান্তরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তের স্রোত বহিয়া তাহাও ঘটিয়া গেল। সৈন্যসামন্ত প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া যে মহামূল্য জয়নাব রত্ন দামেস্ক নগরে আসিল কিন্তু আশার ইতি হইল না।

বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান কথার ছলে বলিয়াছিলেন, "যে আমার নয়, আমি তাহার কেন হইব?" এ নিদারুণ বচন কি আহত হৃদয়মাত্রেরই মহৌষধ? না-রূপজ মোহ যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মানব-হৃদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুভাবে পরিণত হয়। প্রথম কথাতেই জয়নাবের মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাও দেখিয়াছেন। সে অস্ত্র তাহার বক্ষে বসিবে না, যাঁহার হৃদয়ের রক্ত আজীবন শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যে অদৃশ্যভাবে ঝরিতে থাকিবে, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবে? -আশা আছে। দুরাশা কুহকিনী এজিদের কানে কয়েকটি কথার আভাস দিয়াছে-তাহাতেই এজিদের অন্তরে এই কথা-এ কি কথা? কমলে গঠিত কোমলাঙ্গীর হৃদয় কি পাষাণ! কোমল হস্তে লৌহ অস্ত্র! কোমল অক্ষিতে বজ্রদৃষ্টি? কোমল বদনে কর্কশ ভাষা? কোমল প্রাণে কঠিন ভাবে? অসম্ভব!

অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং বিপরীত! অবশ্যই কারণ আছে। জয়নাল, হানিফা প্রভৃতি জীবিত। সেই কি মূল কারণ? নিশ্চয় তাহারা ভব-ধাম হইতে চিরকালের জন্য সরিলে নিশ্চয় ও বিপরীত ভাব কখনই থাকবে না নিশ্চয়! নিশ্চয়!! চিরকালের জন্য সে সময় সে পদ্মচক্ষুতে ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়া বসিবে না। সে হৃদয়ে সর্বদা এজিদ-রূপ ব্যতীত আর কোন রূপ জাগিবে না। নিশ্চয়ই কমলে কমল মিশিয়া কোমল ভাব ধারণ করিবে। আপাদমস্তকে অন্তরে হৃদয়ে, প্রাণে, শরীরে উত্তাপবিহীন, সুকোমল বিজলী ছটা সবেগে খেলিতে থাকবে!

দুরাশা! দুরাশা!

কুহকিনী আশার এই ছলনায় এজিদ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না দুন্দুভি বাজাইয়া লোহিত নিশান উড়াইয়া যাত্রা করিলেন। ওমর, হাসেম, আবদুল্লাহ জেয়াদ প্রভৃতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ মহারাজের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। গুপ্তচর সন্ধানীরা কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে ছদ্মবেশে, সকলের অগ্রে নানা পথে ছুটিল! যেখানে যাহা শুনিতেছে, দেখিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে আসিয়া জানাইয়া যাইতেছে।

একজন আসিয়া বলিল, "বাদশাহ-নামদারের জয় হউক। কতকগুলি সৈন্য নগরাভিমুখে আসিতেছে।" এজিদের মুখভাব কিঞ্চিৎ মলিন হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার একজন আসিয়া বলিল, "আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, যাহারা আসিতেছে তাহারা দামেস্কের সৈন্য।"

এজিদ মহাসন্তুষ্ট হইয়া সংবাদ বাহককে কিছু পুরস্কৃত করিতে আদেশ দিয়া বিজয়-বাজনা বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, "বাদশা-নামদার! প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অলীদ মহামতি আসিতেছে।"

এজিদ মহাহর্ষে বলিতে লাগিলেন, "ওমর! জেয়াদ! শীঘ্র আইস, বিজয়ী বীরদ্বয়কে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করি। কি সুযাত্রায় আজ অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলাম। যে হানিফার নামে জগৎ কম্পিত, সেই হানিফা বন্দীভাবে, কি জীবনশূন্য দেহে, কি খণ্ডিতশিরে দামেস্কে আনীত হইয়াছে। ধন্য বীর মারওয়ান! কিছু না করিয়া সে আর দামেস্কে ফিরিয়া আসিতেছে না। ধন্য মারওয়ান! খণ্ডিত হউক আর অখণ্ডিত হউক, হানিফার মস্তক বন্দীগৃহের সম্মুখে লটকাইয়া দিব। জয়নাল-শিরও আগামীকল্য ঐ স্থানে বর্শার অগ্রে স্থাপিত করিব। দেখিবে আকাশ, দেখিবে সূর্য, দেখিবে জগৎ দেখিবে দামেস্কের নরনারী, দেখিবে জয়নাল-এজিদের ক্ষমতা!"

যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই আশার ছলনায় মোহিত হইতেছেন, "এখন মদিনার রাজা কে? মারওয়ানকে উভয় রাজ্যের মন্ত্রিত্ব-পদে অভিষিক্ত করিব, আর আজ আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহাই দান করিব। বিজয়ী সেনাগণকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। এ সকল সৈন্যগণকেও পুরস্কৃত করিব। কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।"

এজিদ আশার প্রপঞ্চে পড়িয়া যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে হাসিবার কথা নাই। আশা আর ভ্রম, এই দুয়েই মানুষের পরিচয়। আমরা ভবিষ্যতে অন্ধ না হইলে কখনই ভ্রমকূপে ডুবিতাম না, আশার কুহকে ভুলিতাম না এবং সুখ-দুঃখের বিভিন্নতাও বুঝিতাম না। তাহা হইলে যে কি ঘটিত, কি হইত ঈশ্বরই জানেন।

মারওয়ান ওতবে অলীদসহ দামেস্কাভিমুখে আসিতেছেন, মারওয়ান কখনই পরাস্ত হইবেন না, মারওয়ান কখনই পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলাইবে না, কার্য উদ্ধার না করিয়া দামেস্কে আসিবে না–এই দৃঢ় বিশ্বাস–এই এজিদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতেই এত আশা। অল্প সময় মধ্যেই পরস্পর দেখা–সাক্ষাৎ হইল। এজিদ বিজয় বাজনা বাজাইয়া বিজয়নিশান উড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। মারওয়ানের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল, ম্লান মুখ আরও মলিন হইল।

এজিদ অনুমানেই বুঝিলেন–অমঙ্গলের লক্ষণ! কি বলিয়া কি জিজ্ঞাসা করিবেন? কুকথা কুসংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে, ততক্ষণই মঙ্গল! মন্ত্রিবরের গলায় রত্নহার পরাইবার কথা বিপরীত চিন্তায় চাপা পড়িয়া গেল। বিজয়–বাজনা স্বভাবতঃই বন্ধ হইল। মারওয়ানের মুখে কি কথা অগ্রে বাহির হইবে, শুনিতে এজিদের মহা আগ্রহ জন্মিল।

মারওয়ান নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিনম্রভাবে বলিলেন," মহারাজ, অগ্রসর হইবেন না; শত্রুর দল আগত।"

"তোমাদের আকারে–প্রকারে অনেক বুঝিয়াছি কিন্তু বারবার পশ্চাদ্দিকে সভায় দেখিতেছ কি? পশ্চাতে কি আছে?"

মারওয়ান মনে মনে বলিলেন, "যাহা আপনার দেখিবার বাকী আছে"। (প্রকাশ্যে) "মহারাজ আর কিছু নহে–সেই চাঁদ–তারা–সংযুক্ত নিশানের অগ্রভাগ দেখিতেছি, বেশি বিলম্ব নাই। তাহারা যেভাবে আসিতেছে, তাহাতে কোনরূপ সাজসজ্জা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোন নতুন উপায়, কি নগর রক্ষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিবার আর সময় নাই। যাহা সংগ্রহ আছে, তাহাই সম্বল–তাহার প্রতিই নির্ভর।"

"হানিফা কি এতই নিকটবর্তী?"

"সে কথা আর মুখে কি বলিব? কান পাতিয়া শুনুন, কিসের শব্দ শুনা যায়।"

"হাঁ, কিছু কিছু শুনিতেছি। কোন কোন সময়ে আকাশে যে মেঘ–গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, সেই ঘনঘটাবলী বিজলী সহিত বহু দূরে খেলা করিতেছে।"

"মহারাজ, ও ঘনঘটার শব্দ নহে, বিদ্যুতের আভাও নহে, –দামামা –নাকাড়ায় গুড়্‌গুড়ি, ডঙ্কার কর্ণভেদী ধ্বনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।"

এজিদ আরও মনোনিবেশ করিলেন, স্থিরভাবে অশ্ব–বল্গা ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, স্পষ্টতঃ ভেরীর ভীষণ নাদ, নাকাড়ার খরতর আওয়াজ, শিঙ্গার ঘোর রোল, ক্রমেই নিকটবর্তী। বাজনা শুনিতে শুনিতে দেখিতে পাইলেন, মোহাম্মদী নিশান- দন্ডের অগ্রভাগ, সজ্জিত পতাকায় জাতীয় চিহ্ন, আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণের হস্তস্থিত বর্শা–ফলকের চাকচিক্য, স্ফুর্তিবিশিষ্ট তেজীয়ান অশ্বের পদচালনা।

এজিদ সদর্পে বলিলেন, "যাহার জন্য আমাকে বহু দূর যাইতে হইত, ঘটনাক্রমে নিকটেই পাইলাম। চিন্তা কি? মারওয়ান, এত আশঙ্কা কি? চালাও অশ্ব–এখনই আক্রমণ করিব।"

"মহারাজ! আমরা সর্ববলে বলীয়ান না হইয়া এ সময়ে আর আক্রমণ করিব না। আমাদের বহু সৈন্য মোহাম্মদ হানিফার হস্তে মারা গিয়াছে। সৈন্যবল বৃদ্ধি না করিয়া আর আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না। আত্মরক্ষা নগর–রক্ষা এই দুইটির প্রতিই

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কায্য করিতে হইবে; বিশেষ ইহাতে আমার আর একটি উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

"কি উদ্দেশ্য সফল হইবে?"

"মহারাজ! কারবালা-প্রান্তরে হোসেন যেমন জলবিহনে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সারা হইয়াছিল, সেইরূপ দামেস্ক নগরে হানিফা অন্নবিহনে সর্বস্বান্ত হইবে। এ রাজ্যে কে তাহাদের আহার যোগাইবে? কে তাহাদের সাহয্য করিবে? আমরা আক্রমণের নামও করিব না, উহারাই আক্রমণ করুক; আক্রমণে ইচ্ছা না হয়, শিবির নির্মাণ করিয়া বসিয়া থাকুক; অগ্রে কিছুই বলিব না। যতদিন বসিয়া থাকিবে, ততই আমাদের মঙ্গল। অন্নের অনটন পড়ুক ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হউক; সময় পাইলে আমরা মনোমত প্রস্তুত হইতে পারিব। সে সময় বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিব।"

এজিদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সম্মত হইলেন, আক্রমণের জন্য আর অগ্রসর হইলেন না, অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

ওদিকে গাজী রহমান আপন সুবিধামত স্থানে শিবির নির্মাণের আদেশ দিয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি গাজী রহমানের নির্দিষ্ট স্থানে মনোনীত করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব উষ্ট্র ইত্যাদি ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বাসোপযোগী বস্ত্রাবাস নির্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। গাজী রহমানের আদেশে দক্ষিণে বামে, সম্মুখে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া তখনই সামরিক নিশান উড়িতে লাগিল। মারওয়ানের চিন্তা বিফল হইল। সমর ক্ষেত্রে-উভয় দলের সম্মুখ ক্ষেত্র। এজিদ পক্ষেও যুদ্ধ-নিশান উড়িল, শিবির-নির্মাণেও ক্রটি হইল না-প্রভাতে যুদ্ধ।

দ্বাবিংশ প্রবাহ

নিশার অবসান না হইতেই উভয় দলে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। এক পক্ষে হানিফার প্রাণবিনাশ, অপর পক্ষে এজিদের পরমায়ু শেষ, দুই দলে দুই প্রকার আশা। দামেস্ক নগরবাসীরা কোন পক্ষের হিতৈষী, তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে কেহ কোন কথা বলিলে, জয়নাল আবেদীনের জন্য কেহ দুঃখ করিলে সে রাজদ্রোহী মধ্যে গণ্য হয়, কোতোয়ালের হস্তে তাহার প্রাণ যায়-এ এবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই আনন্দিত। কেহ দূরে, কেহ অদূরে কেহ নগর প্রাচীরে, কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষোপরি থাকিয়া উভয় দলের যুদ্ধ দেখিবার প্রয়াসী হইল। মোহাম্মদ হানিফার পক্ষ হইতে জনৈক আম্বাজী সৈন্য যুদ্ধার্থে রণ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দন্ডায়মান হইলেন। প্রতিযোধ না পাঠাইয়া উপায় নাই। মারওয়ান বাধ্য হইয়া বল্লকীয়া নামে জনৈক বীরকে আম্বাজীর মস্তক শিবিরে আনিতে আদেশ করিলেন। যেই আজ্ঞা-সেই গমন। সকলেই দেখিল, উভয় বীর অস্ত্রচালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণে সময়ে সময়ে চঞ্চলা চপলাবৎ অগ্নিরেখা দেখা দিতেছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আম্বাজী বল্লকীয়া-হস্তে পরাস্ত হইলেন। পরাভব স্বীকার করিলেও বল্লকীয়া অস্ত্র নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেন না। সকলেই দেখিলেন, মোসলেম-শোণিতে দামেস্ক-প্রান্তর প্রথমে রঞ্জিত হইল-এজিদের মন মহাহর্ষে নাচিয়া উঠিল।

বল্লকীয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আয়, কে যুদ্ধ করিবি, আয়! শুনিয়াছি, আম্বাজীরা বিখ্যাত বীর, আয় দেখি! বীরের তরবারির নিকটে কোন মহাবীর আসিবি, আয়!"

আহ্বানের পূর্বেই দ্বিতীয় আম্বাজী বল্লকীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক্ষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইল না। উষ্ণীষ সহিত দ্বিতীয় আম্বাজী-শির ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সপ্তজন আম্বাজী বল্লকীয়া–হস্তে শহীদ হইল।

এজিদ হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন, "মারওয়ান, আজ কি দেখিতেছ? এই সকল সৈন্য তো তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে, শৃগাল–কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়া আনিয়াছে! তাহারাই তো ইহারা?"

"মহারাজ! ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের একটি সৈন্যহস্তে মোহাম্মদীয় সাতজন সৈন্য কোন যুদ্ধেই যমপুরী দর্শন করে নাই। সকলই মহারাজের প্রসাদাৎ আর দামেস্ক–প্রান্তরের পবিত্রতার গুণে।"

এজিদ–পক্ষে উৎসাহসূচক বাজনার দ্বিগুণ রোল উঠিয়াছে। বল্লকীয়ার সম্মুখে কেহই টিকিতেছে না! হানিফার সৈন্যশোণিতেই রণপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইতেছে! এজিদ মহা সুখী!

গাজী রহমান মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশাহ্–নামদার, এ প্রকারে যোধ শত্রু–সম্মুখে পাঠান আর উচিত হইতেছে না। বুঝিলাম, দামেস্ক রাজ্যের সৈন্যবল একেবারে সামান্য নাহে।"

মসহাব কাক্কা, ওমর আলী প্রভৃতি বল্লকীয়ার যুদ্ধ বিশেষ মনোযোগে দেখিতেছিলেন। একা বল্লকীয়া কতকগুলি সৈন্য বিনাশ করিল দেখিয়া তাহারা সকলেই যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমার সহ্য হইতেছে না, সমুদয় শরীরে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। আর শিবিরে থাকিতে পারিলাম না। তোমরা আমার পশ্চাৎ রক্ষা করিবে, গাজী রহমান শিবিরের তত্ত্বাবধানে থাকিবে, সৈন্যদিগের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে–আমি চলিলাম। আমি হানিফার অস্ত্র আর এজিদের সৈন্য এই দুইয়ে একত্র করিয়া দেখিব, বেশি বল কাহার।"

হানিফা ঐ কথা বলিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া বলিলেন, "বীরবর! তোমার বীরপনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি কিন্তু তোমার জীবনের সাধ সকলই মিটিল। ইহাই আক্ষেপ!"

বল্লকীয়া বলিলেন, "মহাশয়! আর একটি সাধের বাকী রাখিলেন কেন?" আর কি সাধ?"

"হানিফার মস্তকচ্ছেদন! দোহাই আপনার, আপনি ফিরিয়া যাউন। কেন আপনি আপনার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ সদৃশ অসময়ে জগৎ ছাড়িবেন? আপনি ফিরিয়া যাউন।"

"তোমার সাধ মিটিবে। আমারই নাম মোহাম্মদ হানিফা।"

"সে কি কথা? এত সৈন্য থাকিতে মোহাম্মদ হানিফা সমরক্ষেত্রে? ইহা বিশ্বাস্য নহে। আচ্ছা এই আঘাত।"

"সে আঘাত কে দেখিল? পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এজিদের প্রাণে আঘাত লাগিল। বল্লকীয়ার শরীরের দক্ষিণভাগ দক্ষিণ হস্তসহ এক দিকে পড়িল, বাম উরু, বাম হস্ত, বাম চক্ষু, বাম কর্ণ লইয়া অপরার্দ্ধ ভাগ অন্য দিকে পড়িল।

এজিদ অলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ওহে বলিতে পার এ সৈন্যের নাম কি?"
অলীদ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! ইনিই মোহাম্মদ হানিফা।"
এজিদ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,"সৈন্যগণ! অসি নিষ্কোষিত কর, বর্শা উত্তোলন কর, যদি দামেস্কের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাও, মহাবেগে হানিফাকে আক্রমণ কর। এমন সুযোগ আর হইবে না। তোমাদের বল-বিক্রমের ভালরূপ পরিচয় পাইলে হানিফা যুদ্ধক্ষেত্রে আর আসিবে না, নিশ্চয় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে। যাও শীঘ্র যাও, শীঘ্র হানিফার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আন। তোমারই আমার দক্ষিণ বাহু, তোমারাই আমার বল বিক্রম, তোমারই আমার সাহস তোমারই আমার প্রাণ। ঘোরা বিক্রমে হানিফাকে আক্রমণ কর। হয় বন্ধন- নয় শিরচ্ছেদ, এই দুইটি কার্যের একটি কার্য করিতে আজ জীবন-পণ কর। বীরগণ! বীর দর্পে চলিয়া যাও। তোমাদের পারিতোষিক আমার প্রাণ মন, দেহ। মণি মুক্তা, হীরক আদি অতি তুচ্ছ কথা।"
সৈন্যগণ অসিহস্তে মার মার শব্দে সমরাঙ্গনে যাইয়া হানিফাকে আক্রমণ করিল। এজিদের চক্ষু হানিফার দিকে। এজিদ দেখিলেন, হানিফার তরবারি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় চাকচিক্য দেখাইয়া উদের্ধ নিম্নে বামে দক্ষিনে ঘুরিল এবং লোহিত রেখায় তাহার পূর্ব চাকচিক্য কিঞ্চিৎ মলিন ভাব ধারণ করিল। সম্মুখে একটি প্রাণীও নাই। চক্ষুর পলকে যেন স্থির বায়ুর সহিত মিশিয়া অশ্ব সহিত অন্তর্দ্ধান হইল।
মারওয়ান বলিলেন, - "বাদশাহ নামদার দেখিলেন, অলীদ সহজে মদিনার পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। এই যে হানিফার অস্ত্র চলিল, আমরা পরাজয় স্বীকার না করিলে এ অস্ত্র আর থামিবে না, -দিবা রাত্রি সমানভাবে চলিবে হানিফার মন কিছুতেই টলিবে না- রক্তের স্রোত বহিয়া দামেস্ক-প্রান্তর ডুবিয়া দিলেও সে বিশাল হস্তের বল কমিবে না, -অবশ হইবে না। তরবারি তেজ কমিবে না, ক্লান্ত হইয়া শিবিরেও যাইবে না।"
এজিদ রোষে জ্বলিতেছেন। পুনরায় পূর্বপ্রেরিত সৈন্যর দ্বিগুণ সৈন্য হানিফা-বধে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ মহাবীরের সম্মুখে যাইয়া একত্র একযোগে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যিনি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় হানিফা তাঁহাকে সেই অস্ত্রেরই যমপুরী পাঠাইয়া দিলেন। এজিদের ক্রোধের সীমা রহিল না। পুনরায় চতুর্গুণ সেনা পাঠাইলেন। সেবার এজিদ হানিফাকে তরবারিহস্তে তাঁহার সৈন্যগণের নিকট যাইতে দেখিলেন মাত্র। পরক্ষণে দেখিলেন যে, প্রেরিত সৈন্যের অশ্বসকল দিগ্বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, একটি অশ্বপৃষ্ঠেও আরোহী নাই।
এজিদ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মারওয়ান করযোড়ে বলিলেন,-"মহারাজ! এমন কার্য করিবেন না, আজ মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে কখনই যাইবেন না। এখনও দামেস্কের অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে, আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে হানিফার সম্মুখীন হইতে দিব না।"
এজিদ মারওয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইলেন। সেদিন আর যুদ্ধ করিলেন না। সে দিনের মত শেষ বাজনা বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া মারওয়ান সহ শিবিরে আসিলেন।
মোহাম্মদ হানিফাও তরবারি কোষে পূর্ণ করিয়া অশ্ববল্গা ফিরাইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

প্রভাত হইল। পাখিরা ঈশ-গান গাহিতে গাহিতে জগৎ জাগাইয়া তুলিল। অরুণোদয়ের সহিত যুদ্ধ-নিশান দামেস্ক-প্রান্তরে উড়িতে লাগিল। যে মস্তক জয়নাবের কর্ণাভরণের দোলায় দুলিয়াছিল, ঘুরিয়াছিল (এখনও দুলিতেছে, ঘুরিতেছে) আজ সেই মস্তক হানিফার অসত্র চালনের কথা মনে করিয়া মহাবিপাকে বিষম পাকে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ান, অলীদ, জেয়াদ, ওমরের মস্তক পরিশুষ্ক। সৈন্যগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার-না জানি, আবার কি ঘটে!

উভয় পক্ষই প্রস্তুত। হানিফার বৈমাত্রেয় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী করযোড়ে হানিফার নিকট বলিলেন,-"আর্য্য! আজিকার যুদ্ধভার দাসের প্রতি অর্পিত হউক।"

হানিফা সস্নেহে বলিলেন,-"ভ্রাতঃ! গতকল্য যে উদ্দেশ্যে তরবারি ধরিয়াছিলাম, যে আশায় দুলদুলকে কশাঘাত করিয়াছিলাম, তাহা আমার সফল হয় নাই। বিপক্ষদল আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, যুদ্ধ শেষ না করিয়া আর তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না,- শিবির হইতে যে বাহির হইয়াছি, আর শিবিরে যাইব না, আজি প্রথম-আজি শেষ। শুনিয়াছি, বিশেষ সন্ধানেও জানিয়াছি, এজিদ স্বয়ং আসিয়াছে যুদ্ধ-সময়েই হউক, কি শেষেই হউক, অবশ্যই এজিদকে হাতে পাইতাম। আমার চক্ষে পড়িলে তাহার জীবন কালই শেষ হইত। এজিদ হোসেনের মস্তক কারবালা হইতে দামেস্কে আনিয়াছিল। আমি তাহার মস্তক হস্তে করিয়া দামেস্কবাসীদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বন্দী-গ্রহে যাইয়া জয়নালের সম্মুখে ধরিতাম, আমার মনের আশা মনেই রহিল। কি করি, বাধ্য হইয়া গতকল্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছি, আজ তুমি যাইবে, যাও। ভাই! তোমাকে ঈশ্বরে সঁপিলাম। দয়াময়ের নাম করিয়া, নূরনবী মোহাম্মাদের নাম করিয়া, ভক্তিভাবে পিতার চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া তরবারি হস্তে কর। শত সহস্র বিধর্মী বধ করিয়া জয়নাল-উদ্ধারের উপায় কর। তোমার তরবারির তীক্ষ্ণদার আজ শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হউক, এই আশীর্বাদ করি। কিন্তু ভাই, এজিদের প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপ করিও না। ক্রোধবশতঃ ভ্রাতৃ-আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মহাপাপ-কূপে ডুবিও না; সাবধান, আমার আজ্ঞা লংঘন করিও না।"

ওমর আলী ভ্রাতৃ-উপদেশ শিরোধার্য করিয়া ভক্তিভাবে ভ্রাতৃপদ পূজা করিয়া হানিফার উপদেশ মত তরবারি হস্তে করিলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া ওমর আলীর জয় ঘোষণা করিল।

মহাবীর ওমর আলী পুনরায় ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। নক্ষত্রবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই এজিদ-পক্ষীয় বীর সোহবার জঙ্গ অশ্ব-দাপটের সহিত অসিচালনা করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। স্থিরভাবে ক্ষণকাল ওমর আলীর আপাদমস্ক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি মোহাম্মদ হানিফা?"

ওমর আলী বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি? তোমার কাজ কি? তোমার কাজ কি? তোমার কাজ তুমি কর।"

"কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? সিংহ কি কখন শৃগালের সহিত যুঝিয়া থাকে? শুনিয়াছি, মোহাম্মদ হানিফা সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তুমি কি সেই হানিফা?"

"আমার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, ফিরিয়া যাও।"
সোহ্‌রাব হাসিয়া বলিলেন, –"এত দিন পরে আজ নতুন কথা শুনিলাম। সোহ্‌রাব জঙ্গের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার! তুমি যদি মোহাম্মাদ হানিফা হও, বীরত্বের সহিত পরিচয় দাও। পরিচয় দিতে ভয় হয়, তুমিই ফিরিয়া যাও।"
"আমি ফিরিয়া যাইব!"
"তবে কি তুমি যথার্থই মোহাম্মদ হানিফা?"
"এত পরিচয়ে আবশ্যক কি? তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি পাপাত্মা এজিদ?"
"সাবধান! দামেস্ক–অধিপতির অবমাননা করিও না।"
"আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, তরবারির ক্ষমতা দেখিতে চাই।"
"জানিলাম তুমিই মোহাম্মদ হানিফা।"
"শোন কাফের নারকী! তুই তোর অস্ত্রের আঘাত ভিন্ন যদি পুনরায় কথা বলিস, তবে তুই যে পাথর পুজিয়া থাকিস সেই পাথরের শপথ।"
"আমি পাথর পূজা করি, তুই তো তাহা করিস না! অনিশ্চিতভাবে নিরাকারের উপাসনায় কি মনের তৃপ্তি হয় রে বর্বর?"
"জাহান্নামী কাফের!" আবার বাকচাতুরী? জাতীয় নীতির বহির্ভূত বলিয়া কথা বহিতে সময় পাইতেছিস।"
"আমি তোমার পরিচয় না পাইলে কখনও অপাত্রে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব না। ভাল মুখে বলিতেছি, তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা না হও, তবে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই–যুদ্ধ নাই। তুমি আমার পরম বন্ধু, প্রিয় সুহৃদ।"
"বিধর্মীদিগের বাকচাতুরী এই প্রকার –প্রস্তর–পূজকদিগের স্বভাবই এই।"
"ওরে বর্বর! প্রস্তরে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নাই? দেখ–দেখ–লৌহতে কি আছে।" আঘাত –অমনি প্রতিঘাত।
সোহরাব বলিলেন, –"রে আম্বাজী! তুই মোহাম্মাদ হানিফা; কেন আমাকে বঞ্চনা করিতেছিস? আমার আঘাত সহ্য করিবার লোক জগতে নাই। সোহরাবের অস্ত্র এক অঙ্গ দুইবার স্পর্শ করে না।"
এ কথাটা কেবল ওমর আলী শুনিলেন মাত্র। আর যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি দেখিয়াছেন, সোহরাবের দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। কাহার আঘাত? আর কাহার ওমর আলীর!
সোহরার নিধন এজিদের সহ্য হইল না। মহাক্রোধে নিষ্কোষিত অসিহস্তে সমর প্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন, –তুই কে? আমার প্রাণের বন্ধু সোহরাবকে বিনাশ করিলি? বলতো আম্বাজী, তুই কে?"
"আবার পরিচয়? বলতো কাফের তুই কে?"
"আমি দামেস্কের অধিপতি। আরও বলিব, আমার নাম এজিদ।"
ওমর আলীর হৃদয় কাঁপিয়া গেল, ভয়শূন্য হৃদয়ে মহাভয়ের সঞ্চার হইল। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, – তুই কি যথার্থই এজিদ?"
"কেন, এজিদ নামে এত ভয় কেন?"

"সহস্র এজিদে আমার ভয় নাই, কিন্তু –"

"ও সকল 'কিন্তু' কিছু নহে! ধর এজিদের আঘাত!"

"আমি প্রস্তুত আছি।"

এজিদ মহাক্রোধে তরবারির আঘাত করিলেন্ ওমর আলী বর্মে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, – "তুই যদি যথার্থই এজিদ, তবে তোর আজ পরম সৌভাগ্য।"

"আমার সৌভাগ্য চিরকাল।"

"তা বটে –কি বলিব, ভ্রাতৃ–আজ্ঞা!"

এজিদ পুনরায় আঘাত করিলেন। ওমর আলী সে আঘাত উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,–"আর কেন? তোমার বাহুবল, অস্ত্রবল সকল দেখিলাম।"

এজিদ মহাক্রোধে পুনরায় আঘাত করিলেন্ ওমর আলী সে আঘাত অসিতে উড়াইয়া দিলেন। ক্রমাগত এজিদের আঘাত ও ওমর আলীর আত্মরক্ষা।

এজিদ বলিলেন, "ওহে তুমি যদি মোহাম্মাদ হানিফা না হও, তবে যথার্থ বল, তুমি কে?"

"এখন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তোমার আর কি ক্ষমতা আছে দেখাও।"

"ক্ষমতা তো দেখাইবঃ কিন্তু দেখিবে কে? আমার একটু সন্দেহ হইতেছে, তাহাতেই বিলম্ব।"

"রণক্ষেত্রে সন্দেহ কি? হাতে অস্ত্র থাকিতে মুখে কথা কেন?"

"তোমার অস্ত্রে ধার আছে কিনা, দেখিলাম না কিন্তু কথার ধারে গায়ে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।"

"বাকচাতুরী ছাড়, এখন আঘাত কর!"

এজিদ ক্রমে তরবারি, তীর বর্শা যা কিছু তাহার আয়ত্তে ছিল, আঘাত করিলেন। কিন্তু ওমর আলী সেই অচল পাষাণ প্রতিমাবৎ দন্ডায়মান–এজিদ মহা লজ্জিত।

এজিদ বলিলেন, "আমার সন্দেহ ঘুচিল, তুমিই মোহাম্মদ হানিফা! হানিফা! গতকল্য তোমার যুদ্ধ দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম! ধন্য তোমার বাহুবল! এত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমার সহ্যগুণ–"

ওমর আলী হাসিয়া বলিলেন, " এজিদ, তোমার আর কি ক্ষমতা আছে দেখাও। অস্ত্র থাকিতে আজ আমি নিরস্ত্র, বল থাকিতে দুর্বল কি পরিতাপ! আমার হাতে পড়িয়া আজ বাঁচিয়া গেলে।"

"ওরে পাষন্ড! সাধ্য থাকিতে অসাধ্য কি? ভেকে কি কখনও অহি–মস্তকে
আঘাত করিতে পারে? শৃগালের কি ক্ষমতা যে শার্দুলের গায়ে অঙ্গুলি স্পর্শ করে? তুই যাহাই মনে করিয়া থাকিস, নিশ্চয় জানিস আজ তোর জীবনের শেষ।"

"কথাটা মিথ্যা বোধ হইতেছে না। তাহা যাহা হউক, হয় অস্ত্রত্যাগ কর না হয় পলাও।"

"আমি পলাইব! তোমার জীবন শেষ না করিয়া।"

এজিদ পুনরায় তরবারির আঘাত করিলেন, –বৃথা হইল। পরিশেষে ফাঁস–হস্তে তিন চারিবার ওমর আলীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ওমর আলীর গলায় ফাঁস নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু ফাসিতে আটকায় কৈ? ওমর আলী ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আজ এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। এজিদ এখন অস্ত্র ছাড়িল, মল্লযুদ্ধ আরম্ভ

করিলেই ওমর আলীর মনের সাধ পুর্ণ হয়। তিনি সেই চিন্তায় আছেন, সময় খুঁজিতেছেন–কার্যে তাহাই ঘটিল।

মোহাম্মদ হানিফা শিবিরে বসিয়া যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন মাত্র। এ পর্যন্ত কেহই পরাস্ত হয় নাই। এজিদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছেন, আর হানিফা–বোধে ওমর আলীকে যথাসাধ্য আক্রমণ করিয়াছেন, এ কথার তত্ত্ব কেহই সন্ধান করেন নাই, হানিফাও শুনিতে পান নাই। এজিদ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবেন ইহা কেহই মনে করেন নাই।

এজিদ নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, এই মোহাম্মদ হানিফা। উভয় ভ্রাতার আকৃতি প্রায় এক; তবে যে ভেদ– তাহা জগৎকর্তার সৃষ্টির মহিমা ও কৌশল! এজিদ এক দিন মাত্র দেখিয়া সে ভেদ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আবার এ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না এ কি কথা! মল্লযুদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব–মল্লযুদ্ধে নিশ্চয়ই ধরিব; ইহাই এজিদের মনের ভাব।

উভয়ের মনের আশাই উভয়ে সফল করিবেন। প্রকৃতি কাহার অনুকূল, তাহা কে বলিতে পারে? উভয় বীর অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন–মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীর পদ দলনে পদতলস্থ মৃত্তিকা স্বাভাবিক ছিদ্রে অঙ্গ মিশাইয়া ক্রমে সরিতে লাগিল।

মারওয়ান, আবদুল্লাহ জেয়াদ প্রভৃতি এই অলৌকিক যুদ্ধে এজিদকে লিপ্ত দেখিয়া মহাবেগে অশ্ব চালাইলেন। হানিফা–পক্ষীয় কয়েক জন যোদ্ধাও ওমর আলীকে হঠাৎ মল্লযুদ্ধ রত দেখিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। এজিদ কতবার ওমর আলীকে ধরিতেছেন, ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ওমর আলীও এজিদকে ধরিতেছেন কিন্তু স্ববশে আনিতে পারিতেছেন না।

মোহাম্মদ হানিফা–পক্ষীয় বীরগণ এজিদকে চিনিয়া চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, ওমর আলীর মল্লযুদ্ধের কারণ। এজিদের প্রতি কাহারও অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার অনুমতি নাই। কাজেই ওমর আলীরও নিস্তার নাই। হায়! হায়! এ কি হইল, মনে মনে এই আন্দোলন করিয়া মোহাম্মদ হানিফার নিকট এ কথা বলিতে কেহ কাহার অপেক্ষা না করিয়া সকলেই শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে এজিদ মল্ল–যুদ্ধের পেঁচাও বন্ধে গ্রীবা এবং উরু সাপটিয়া ধরিয়াছেন। ওমর আলী সে বন্ধন কাটিয়া এজিদকে ধরিলেন। সেই সময় মারওয়ান, জেয়াদ প্রভৃতি সকলেই ত্রস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া মহাবীর ওমর আলীকে ধরিলেন এবং ফাঁসি দ্বারা তাহার হস্ত, পদ, গ্রীবা বাধিয়া জয় জয় রব করিতে করিতে আপন শিবিরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা এজিদের সংবাদ পাইয়া সজ্জিত বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সমরাঙ্গনে জন–প্রাণী মাত্র নাই। এজিদের শিবিরের নিকট মহা প্রতিপালন করিতে গিয়া আজ ওমর আলী বন্দী!

মোহাম্মদ হানিফা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মহা চিন্তায় বসিয়া পড়িলেন।

বিপক্ষদলে বাদ্যের তুফান উঠিল, দামেস্ক প্রান্তর হর্ষে এবং বিষাদে কাঁপিয়া উঠিল। এজিদ–দলে প্রথম কথা– মোহাম্মদ হানিফা বন্দী; শেষে সাব্যস্ত হইল মোহাম্মদ হানিফা

নহে, এ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা–নাম ওমর আলী। যাহা হউক, হানিফার দক্ষিণ হস্ত ভঙ্গ, সিংহের এক অঙ্গ হীন– এজিদের জয়।

এজিদ আজ্ঞা করিলেন,–আগামী কল্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে; কারণ ওমর আলীর প্রাণবধ। শত্রুকে যখন হাতে পাইয়াছি, তখন ছাড়িব না; নিশ্চয় প্রাণবধ করিব। কিসে প্রাণদন্ড? তরবারিতে নহে, অন্য কোন প্রকারে নহে–শূলে প্রাণদন্ড। হানিফা দেখিবেন, তাঁহার সৈন্য সামন্ত দেখিবে, প্রকাশ্য স্থানে শূলে ওমর আলীর প্রাণবিনাশ করিতে হইবে। এখনই ঘোষণা করিয়া দাও, "হানিফার ভ্রাতা মহারাজ হস্তে বন্দী আগামীকল্য তাহার প্রাণবধ।"

মারওয়ান তখনই রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের প্রস্তুত হইলেন। মুহূর্ত মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ও নগরে ঘোষণা হইল "মোহাম্মদ হানিফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, রাজা কৌশলে সে পাপী আজ বন্দী। আগামীকল্য দামেস্ক নগরের পূর্বপ্রান্তরে সমরক্ষেত্রের নিকট শূলে চড়াইয়া তাহার প্রাণবধ হইবে।"

মোহাম্মদ হানিফার কর্ণেও এ নিদারুণ ঘোষণা প্রবেশ করিল। শিবিরস্থ সকলেই এই মর্মভেদী ঘোষণায় মহা আকুল হইলেন। গাজী রহমানের বিশাল মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিস্কের মজ্জা আলোড়িত হইয়া তড়িৎবেগে চালিত হইতে লাগিল।

চতুর্বিংশ প্রবাহ

আজ ওমর আলীর প্রাণবধ। এ সংবাদে কেহ দুঃখী কেহ সুখী। নগরবাসীরা কেহ ম্লানমুখে বধ্যভূমিতে যাইতেছে–কেহ মনের আনন্দে হাসি–আনন্দে হাসি–রহস্যের নানা কথার প্রসঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইতেছে। শূলদন্ড দন্ডায়মান হইয়াছে। স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যদল ওমর আলীর বধক্রিয়া স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে, মন্ত্রী মারওয়ান সে উপায় বিশ্বে বিবেচনা করিয়া করিয়াছেন। দিনমণির আমগনসহ নাগরিকদল দলে দলে দামেস্ক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। প্রায় সকল লোকের মুখেই এক কথা–"আজ শূলদন্ডের অগ্রভাগ রক্তমাখা হইয়া ওমর আলীর মজ্জা ভেদ করিবে। কাল মসহাব কাক্কার খন্ডিতশির ধরায় লুণ্ঠিত হইবে; তাহার পর হানিফার দশা যাহা ঘটিবে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়।

কথা গোপন থাকিবার নহে; বিশেষ মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অতি গুপ্ত স্থানে প্রবেশ করে। বন্দীগৃহেও ঐ কথা। শেষে প্রাণবধের কথা শুনিয়া শাহরে–বানু ও হাসনে বানুর মুখের কথা বন্ধ হইয়াছে অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। ক্রন্দন ভিন্ন তাহাদের আর উপায় কি? হোসেন পরিজনের দুঃখের অন্ত নাই। রক্ত, মাংস অস্থি ও চর্মযুক্ত শরীর বলিয়াই এ সহ্য হইতেছে, –পাষাণে গঠিত হইলে এত দিন বিদীর্ণ হইত, লৌহনির্মিত হইলে কোন দিন গলিয়া যাইত।

শাহরে বানু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,–"হায়! সর্বস্ব গেল, প্রাণ গেল, রাজ্য গেল, স্বাধীনতা গেল! আশা ছিল, জয়নাল আবেদীন বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার হইবে। কিন্তু যিনি উদ্ধার হেতু কত কষ্ট কত বিপদ কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দামেস্ক প্রান্তর পর্যন্ত আসিলেন, আসিয়াও তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

আর ভরসা কি? আজ ওমর আলী-কাল শুনিব যে মোহাম্মদ হানিফার জীবন শেষ! আর আশা কি! জগদীশ, তোমার মনে ইহাই ছিল! তোমার মনে ইহাই ছিল।"
সালেমা বিবি বলিলেন, "শাহরে বানু এ কি কথা? ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সেই নির্বিকার নিরাকার দয়াময়কে কোন প্রকারে দোষী করিও না,-মহাপাপ! মহাপাপ! তিনি জীবনের ভালর জন্যই আছেন অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্য অনেক সময় অনেক লীলা দেখাইয়া থাকেন। সেই করুণাময় ভগবান কৌশলে দেখাইয়া দেন যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব ক্ষমতাশীল হইলেও তাহার ক্ষমতার নিকট অতি ক্ষদ্র ও তুচ্ছ। আমাদের স্বভাবই এই যে কোন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই আমরা সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের কথা একবোরেই ভুলিয়া যাই। কিন্তু সেই মহাশক্তি প্রভাবে মানবের অন্তরে মূঢ়তা ও মূর্খতা দূর করিতে সেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী মানব প্রতি এমন কোন বিপদজাল বিস্ত ার হয় যে তাহার সে অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তি যে কোথায়- কোন পথে কিসে মিশিয়া যায়, তাহার সে আর সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনিই সর্বমূল তিনিই বিপদের কান্ডারী বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র তরী। মানুষের ক্ষমতা কি? ওমর আলীর সাধ্য কি? হানিফার শক্তি কি? সেই বিপদতারণ ভগবানের কৃপা না হইলে দয়াময়ের দয়া না হইলে কোন প্রাণী কাহাকে বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তিনিই রক্ষাকর্তা তিনিই সর্ববিজয় সর্বরক্ষক বিধাতা্ শাহরেবানু স্থির হও। হৃদয়ে বল কর। সেই অদ্বিতীয় ভগবান প্রতি একমনে নির্ভর কর। দুঃখে পড়িয়া সামান্য লোকের ন্যায় বিহ্বল হইও না। বলহীন হৃদয়ের ন্যায় ব্যাকুল হইওনা। তাহার নামে কলঙ্ক রটাইও না। তিনি তাহার সৃষ্ট জীবের মন্দ চিন্তা কখনই করেন না। সাবধান শাহরেবানু সাবধান মনের মলিনতা দুর কর। তিনি অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তিনি সর্বমঙ্গলময় অদ্বিতীয় ঈশ্বর।
"এত বিপদ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে! সকলইতো ঈশ্বরের কার্য। আমরা কি অপরাধে অপরাধী? কি পাপ করিয়াছি যে, তাহারই এই প্রতিফল?"
এই কথা মুখে আনিও না,-বিপদ, ব্যাধি, জরা, জগতে নতুন নহে। নূরনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার পরিজন হইলেই যে, ইহজগতে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না একথা কখনই অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান তাহার শক্তি মহান। কত নবী কত অলি, কত দরবেশ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কত শত সহস্র মহাপুরুষ, যোগী, ঋষি এই ভাবেই জন্মিয়া গিয়াছেন। কত ভক্তের মন পরীক্ষার জন্য তিনি কত কি করিয়াছেন। তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ ভুলিয়া যাইতেছ? ছি! ছি! ঈশ্বরে নির্ভর কর! তুমি কি সকলই ভুলিয়া গিয়াছে? হযরত আদমকেও বেহেশতের চিরসুখশান্তি পরিত্যাগের চিরসন্ত াপহারিণী নয়নের মণি পরম প্রিয়তমা প্রাণের প্রাণ অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া এক নয় দুই নয় ৪০ বছর সজল নয়নে দেশদেশান্তরে পর্বতে বিজনে প্রান্তরে মহাকষ্টে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। হযরত এব্রাহিমকেও গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হযরত নূহ পয়গম্বরকে জলে ভাসিতে হইয়াছিল। হযরত আইউবকে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হযরত ইউসুফকে অন্ধকূপে ডুবিতে হইয়াছিল। হযরত ইউনুসকে মৎস্যের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হযরত জাকারিয়াকে করাতে দ্বিখন্ডিত হইতে হইয়াছিল। হযরত

মুসাকে প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। ঈসায়ীদিগের মতে হযরত ঈসাকেও শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণবিসর্জন করিতে হইয়াছিল। আমাদের হযরত মোহাম্মদ কম বিপদে পড়িয়াছিলেন? প্রাণভয়ে জন্মভূমি নগর পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনা যাইতে হইয়াছিল। ইহারা কি বিপদকালে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়াছিলেন? নূরনবী মোহাম্মদের কথা একবার মনে কর। ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি না করিয়াছেন? রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নমরূদ, ফেরাউন, কারূণ, ইহাদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন-বল রাজ্য বল, বাহু-বল সদাকাল সম্পূর্ণভাবে থাকা সত্ত্বেও তাহারা কত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল প্রাচীন কাহিনী প্রাচীন কথা কেবল সেই অদ্বিতীয় ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে তিনি কি না করিতে পারেন? আজ ওমর আলীর প্রাণবধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বরে যাহা ঘটাইবেন, তাহা নিবারণে কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব প্রকারে দয়াময়-সকল অবস্থাতেই করুনাময়। ভাবিলে কি হইবে? আর কাদিলেই বা কি হইবে?"

"আপনার হিতোপদেশে আমার মন অনেক সুস্থ হইল। কিন্তু একটি কথা এই যে, প্রধান বীর ওমর আলী এজিদ হস্তে মারা পড়িল, ইহাতে হানিফার সাহস বল উৎসাহ অনেক লাঘব হইল।"

"সে কি কথা? সেই অদ্বিতীয় ভগবান হানিফাকেও এজিদহস্তে বিনাশ করাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। তাহার নিকটে এ কার্য কিছুই নহে। তিনি কি না করিতে পারেন? পর্বতকে সমুদ্রে পরিণত করিতে, মহানগরকে বনে পরিণত করিতে, মহাসমুদ্রে মহানগর বসাইতে তাহার কতক্ষণের কাজ? তাহার ক্ষমতার- দয়ার পার নাই। তবে জগৎ-চক্ষে সাধারণ বিবেচনায় দেখিতে হইবে যে এ সকল ঘটনার মূল কি? আমার মনের কথা আমি বলিতেছি-ইহা আর কিছু নহে-ঈশ্বরের লীলা প্রকাশে-ক্ষমতা বিকাশ কিন্তু সেই ঈশ্বরই সেই ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে উপদেশ দিতেছেন-জীব! সাবধান এই কার্যে এই ফল, এই পথে চলিলে এই দুর্গতি আমার নির্ধারিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে এই শাস্তি! তিনি সকলকেই সমান ক্ষমতা দিয়াছেন! কাহাকেও কোন কার্য করিতে নিবারণ করেন না। আপন ভালমন্দ আপনিই বুঝিয়া লইতে হইবে। সংসার বড় ভয়ানক কঠিন স্থান! আজ আমরা দামেস্কে বন্দীখানায় বন্দীভাবে বসিয়া এত কথা বলিতেছি। ভাব দেখি, ইহার মূল কি?"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে জয়নাব আসিয়া বলিলেন,-"আমি গবাক্ষদ্বারে দন্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, নগরের বহুসংখ্যক লোক দামেস্ক-প্রান্তরে যাইতেছে। সকলের মুখে একই কথা। "আজ ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিব, কাল মোহাম্মদ হানিফার খন্ডিতশির দামেস্কপ্রান্তরে লুটাইতে দেখিব।" জয়নাল আবেদীন কারাগার সম্মুখে দন্ডায়মান ছিল; প্রহরিগণ কে কোথায় আছে, দেখিতে পাইলাম না। জয়নাল ঐ জনতার মধ্যে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি সঙ্কেতে অনেক নিষেধ করিলাম-শুনিল না। একবার ফিরিয়া তাকাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বেগে চলিয়া গেল। কেবলমাত্র একটি কথা শুনিলাম-হায় রে অদৃষ্ট! কারবালার ঘটনা এখানেও ঘটিতে আরম্ভ হইল "এক একটি করিয়া এজিদ হস্তে-এই কথা শুনিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না, দেখিতে দেখিতে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়িল-এ আবার কি ঘটনা ঘটিল!"

শাহরেবানু জয়নাবের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তাঁহার মুখের ভাব সে সময় যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা কবির কল্পনার অতীত,-চিন্তার বহির্ভূত। জয়নাল আবেদীনই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা! শাহরেবানুর প্রাণপাখী সে সময় দেহপিঞ্জরে ছিল কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? চক্ষু স্থির! কণ্ঠরোধ! সেই এক প্রকার ভাব–স্পন্দনহীন। সালেমা বিবি বুদ্ধিমতী, সহ্যগুণ তাহার বিস্তর। কিন্তু শাহরেবানুর অবস্থা দেখিয়া তিনিও বিহ্বল হইলেন! নাম ধরিয়া অনেকবার ডাকিলেন। চৈতন্য নাই। বুকে মুখে হাত দিয়া সান্ত্বনার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শাহরেবানুর মোহ–ভঙ্গ হইল না, তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,–"জয়নাল! বাবা জয়নাল! নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর সন্তান, কোথায় গেলি বাপ? তোর পায় পায় শত্রু, পায় পায় বিপদ, আমরা চিরবন্দী। দুঃখের ভার বহন করিতে জগতে আমাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। তুই দুঃখিনীর সন্তান, কি কথা মনে করিয়া কোথা গেলি? তুই কি তোর পিতৃব্য ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে গিয়াছিস? তুই সেই বধ্যভূমিতে গিয়া কি করিবি? তোকে যে চিনিবে, সেই এজিদের নিকট লইয়া গিয়া তোকেও ওমর আলীর সঙ্গী করিবে। এজিদ এখন হানিফার প্রাণ লইতেও অগ্রসর হইয়াছে। তোকে কয়েকবার মারিতে গিয়া কৃতকার্য হয় নাই। আজ তোকে দেখিলে তার ক্রোধের কি সীমা থাকিবে? বন্দী পলাইলে কার না রোষের ভাগ দ্বিগুণ হয়? জয়নাল তোর এ বুদিধ কেন হইল?"

শাহরেবানু বিস্তর দুঃখপ্রকাশ করিলেন। সালেমা বিবিও অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে সালেমা বিবি বলিলেন,–শাহরেবানু স্থির হও। ঈশ্বর তাহাকে বীরপুরুষ করিয়াছেন। এজিদের অত্যাচার তাহার হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সে একা কিছুই করিতে পারিবে না। আবার আমাদিগকে বন্দীখানায় রাখিয়া এমন কোনও কার্যে হঠাৎ হস্তক্ষেপ করিবে না যে তাহাতে সে মারা পড়ে কি ধরা পড়ে। তাহার আশা অনেক। ঈশ্বরে নির্ভর কর, এ সকল তাহারই লীলা তুমি স্থির হও, ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়নালকে আশীর্বাদ কর,–তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও এজিদ হস্তে তাহার মৃত্যু নাই। সেই মদিনার রাজা, সেই দামেস্কের রাজা। আমি মাননীয় নূরনবীর মুখে শুনিয়াছি, জয়নাল আবেদীন দ্বারা মদিনার সিংহাসন রক্ষা হইবে,ইমাম বংশ জীবিত থাকিবে, রোজকেয়ামত পর্যন্ত জয়নাল আবেদীনের বংশধরগণ জগতে সকলের নিকট পূজনীয় হইয়া থাকিবে। নূরনবীর বাণী কি কখনও মিথ্যা হয়? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, জয়নালের মনোবাঞ্ছা নির্বিঘ্নে পরিপূর্ণ হউক।"

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

মানবের ভাগ্যবিমানের দুঃসময়–কালমেঘ দেখা দিলে সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, ভ্রমেও কেহ ফিরিয়া দেখে না। ভাল মুখে দু'টি ভাল কথা বলিয়া তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করা দূরে থাকুক, মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে ঘৃণা জন্মে, সে দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও অপমান জ্ঞান হয়। সে উপযাচক হইয়া মিশিতে আসিলেও নানা কৌশলে তাড়াইতে ইচ্ছা করে, আত্মীয় স্বজন পরিজন জ্ঞাতি কুটুম্বের চক্ষেও দুর্ভাগার আকৃতি চক্ষুঃশূল বোধ হয়। এক প্রাণ, এক আত্মা, হৃদয়ের বন্ধুও সে সময় সহস্র দোষ

দেখাইয়া ক্রমে সরিতে থাকেন। দুঃখের সময় জীবন কাহার না ভারবোধজনক? শনি-গ্রস্ত জীবের কোথায় না অনাদর? রাহুগ্রস্ত বিধুর অপবাদই বা কত? ভবের ভাব বড়ই চমৎকার! কালে আবার সেই আকাশে,-সেই মানবের ভাগ্য আকাশে,মৃদু মৃদু ভাবে সুবাতাস বহিয়া, কালমেঘগুলি ক্রমে সরাইয়া সৌভাগ্য-শশীর পুনরুদয় দেখাইয়া দিলে আর কথা নাই। কত হৃদয় হইতে প্রেম, প্রণয় ভালবাসা, আদর, স্নেহ যত্ন এবং মায়ার স্রোত প্রবাহ-ধারা, যাহা বল, ছুটিতে থাকে-বহিতে থাকে। কত মনে দয়ার সঞ্চার, মিলনের বাসনা এবং ভক্তির উদয় হইতে থাকে কত চক্ষুস্মানের বঙ্কিমে দেখিতে ইচ্ছা করে। শতমুখে সুযশ সুখ্যাতি গাহিতে ইচ্ছা করে, শতমুখে সুকীর্ত্তির গুণ বর্ণনা হইতে থাকে। আর যাচিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় না, ডাকিয়াও কাছে বসাইতে হয় না। পরিচয় না থাকিলেও পরিচয়ের পরিচয় দিয়া চাপিয়া বসিয়া থাকে। আজ এজিদের ভাগ্য-বিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাগ্য-শশীর উদয় হইয়াছে-ওমর আলী বন্দী! শত শত ঘোষণা দিয়া, দ্বিগুণ বেতন আশা দেখাইয়াও আশার অনুরূপ সৈন্যসংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ওমর আলী বন্দী; তাঁহার শূলদন্ডে প্রাণবধ ঘোষণা শুনিয়া লোকে দলে দলে সৈন্যদলে নাম লেখাইতেছে, স্বার্থের আশায় অর্থের লালসায় কত লোক বিনা বেতনে এজিদপক্ষে মিশিতেছে। অপরিচিত বিদেশী বোধে যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মারওয়ানের অমত হইতেছে, তাহাদের কেহ কেহ স্ব স্ব গুণ দেখাইয়া, কেহ বা বাহুবলের পরিচয় দিয়া সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার উপরোধে প্রবেশপথ পরিস্কার করিয়া লইতেছে। সকলেই যে সমরক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইবে, তাহা নহে, জয়ের ভাগ যশের অংশগ্রহণ করাই অনেকের অন্তরের নিগুঢ় আশা। আজ ওমর আলীর জীবন শেষ, কাল হানিফার পরমায়ূ শেষ, যুদ্ধের শেষ-এই বিশেষ তত্ত্বেই স্বদেশী বিদেশী বহু লোকের সৈন্যদলে প্রবেশ। আবার ইহাও অনেকের মনে,-যদি বিপদ সম্ভব বিবেচনা হয়, পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায়, তবে ভবের ভাব, প্রকৃতির প্রভাব, সময়ের তাৎপর্য দেখাইয়া ক্রমে সরিতে থাকিবে। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনাই ওমর আলীর প্রাণবধ-হানিফার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন, একই কথা। একা হানিফার এক হস্ত কি করিবে? জয়ের আশাই অধিক। এজিদের ভাগ্যবিমানে সুবায়ু প্রতিঘাতে কালমেঘের অন্তর্দ্ধান অতি নিকট। এজিদ-শিবিরের চতুষ্পার্শে বিষম জনতা-সকলের দৃষ্টিই শূলদন্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে।

অন্যদিকে মোহাম্মদ হানিফার প্রাণ ওষ্ঠাগত, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠ শুষ্ক, সৈনিক-দলে মহা আন্দোলন! হায়! এমন বীর বিপাকে মারা পড়িল! ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অকালে কালের হস্তে নিপতিত হইল! কি সর্বনাশ! এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না,- এই কথাতেই আজ ওমর আলী কিশোর বয়সে শত্রুহস্তে শূলবিদ্ধ হইতে চলিল । ধন্য রে ভ্রাতৃভক্তি! ধন্যরে স্থির প্রতিজ্ঞা! ধন্য আজ্ঞাপালন! ধন্য ওমর আলী।

সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা বড় বিষম ব্যাপার। বিপদকালেই দূরদর্শিতার পরিচয়, ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচয়ের পরীক্ষা হয়। সুখের সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ ভাবনা প্রায় কোন মস্তক বহন করিতে ইচ্ছা করে না।

মোহাম্মদ হানিফা শুধু আক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গাজী রহমানও কেবল বিলাপ-বাক্য শুনিয়াই নিশ্চিত হন নাই। তাহাদের মস্তিষ্ক-সিন্ধু আজ বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছে। সহসা এজিদ শিবির আক্রমণ করিবেন না, অথচ ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার আশা অন্তরের এক কোণে বিশেষ গোপনভাবে রহিয়াছে। বিনা বেতনের চাকরে গৃহকার্যের সুবিধা নাই, তাহাতে আবার যুদ্ধকান্ডে! অবৈতনিক সৈন্য কি ভয়ানক কথা! কি সাংঘাতিক ভ্রম! এ ভ্রম কাহার?

এজিদ বস্ত্রমন্ডপে দরবার আহবান করিয়া স্বর্ণময় আসনে মহাগর্বিতভাবে বসিয়াছে। রাজমুকুট শিরে শোভা পাইতেছে। মন্ত্রিপ্রবর মারওয়ান দক্ষিণপার্শ্বে দন্ডায়মান। সৈন্যশ্রেণী দরবার-সীমা ঘিরিয়া গায় গায় মিশিয়া, অসি-হস্তে খাড়া হইয়াছে। পঞ্চবিংশতি রথী নিষ্কোষিত কৃপাণহস্তে ঘিরিয়া বন্ধনবশায় ওমর আলীকে দরবারে উপস্থিত করিল।

মারওয়ান ওমর আলীকে বলিলেন, " ওমর আলী! তুমি যে বন্দী, সে কথা তোমার জ্ঞান আছে?"

ওমর আলী বলিলেন,"এইক্ষণে তোমার হস্তে বন্দী -সে কথা আমার বেশ জ্ঞান আছে।"

"বন্দীর এত অহঙ্কার কেন? নতশিরে জোড়করে রাজ-সমীপে দন্ডায়মান হওয়া কি তোমার এ সময়ে উচিত নহে? রাজাকে অভিবাদন করা কি এ অবস্থায় কর্তব্য নহে? মূহূর্ত পরে তোমার কি দশা ঘটিবে তাহা তুমি মনে কর না?"

"আমি সকলই মনে করিতেছি। তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, অনর্থক বাকবিতন্ডায় প্রয়োজন নাই । আমি কোনরূপ অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না যে, নতশিরে ন্যূনতা স্বীকারে দরবারে খাড়া হইব।"

"সাবধান! সতর্ক হইয়া জিহ্বা চালনা করিও। নম্রভাবে কথা কহা কি তোমাদের কাহারও অভ্যাস নাই?"

"আমি প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি,-বাকবিতন্ডায় প্রয়োজন নাই। আমাকে জ্বালাতন করিও না। আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

এজিদ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমার সহিত কথা বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমিই এমন পবিত্র শরীর ভবধামে অধিষ্ঠান করিয়াছ যে, নিজের গৌরব নিজেই প্রকাশ করিতেছ, তোমার সহিত কথা বলিলে কি আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে?"

"গৌরব বৃদ্ধি হউক বা না হউক, অতি অল্প সময়ও যদি জগতের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া মান্য কর, আমি তোমাকে প্রাণদন্ড হইতে মুক্ত করিতেছি।"

"কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এজিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! এজিদের আশ্রয় গ্রহণ! মাবিয়ার পুত্রের বশ্যতা স্বীকার! ছি! ছি! তুমি আমার প্রভু হইতে ইচ্ছা কর? তোমার বংশাবলীর কথা তোমার পিতার কথা একবার মনে কর। ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা! এজিদ এত আশা তোমার -তুমি আবার মহারাজ!"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন, -"তোমার গর্দান লইতে পারি, তোমাকে খন্ড খন্ড করিয়া শৃগাল -কুকুরের উদরস্থ করাইতে পারি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা জানাও যে, মহারাজ! মহাকষ্টে যেন আমাকে বধ না করা হয়।"

ওমর আলী ক্রোধে বলিলেন, "ধিক তোমার কথায়! আর শত ধিক্ আমার জীবনে! সহজে প্রাণবধ করা হয় ইহাই আমার প্রার্থনা! তোমার যাহা করিবার ক্ষমতা থাকে, কর আমি প্রস্তুত আছি।"

"মরণের পূর্বে যে লোকে বিকারগ্রস্ত হয়, এ কথা সত্য! তোমার কপাল নিতান্ত মন্দ, আমি কি করিব?"

"তুমি আর কি করিবে? যাহা করিবে, তাহার দ্বিগুণ ফলভোগ করিবে।"

এজিদ সক্রোধে বলিলেন, "মারওয়ান! ইহার কথা আমার সহ্য হয় না। প্রকাশ্য স্থানে যাহাতে সর্বসাধারণে দেখিতে পারে বিপক্ষগণ দেখিতে পারে, এমন স্থানে শূলে চড়াইয়া এখনই ইহার প্রাণবধ কর। কার্যশেষে আমাকে সংবাদ দিও।"

ওমর আলী বলিলেন, "কার্য শেষ করিলে তোমাকে আর সংবাদ শুনিতে হইবে না। তোমারই সংবাদ অনেকে শুনিবে।"

মহাক্রোধে এজিদ বলিলেন, "আর সহ্য হয় না? মারওয়ান! শীঘ্র ইহাকে শূলে চড়াও।"

মারওয়ান নতশিরে সম্ভাষণ করিয়া বন্দীসহ দরবার-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

শিবির-বাহির লোকে লোকারণ্য। নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে বন্দীসহ গমন করা বড়ই কঠিন। মারওয়ান শিবির-দ্বারে দন্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, দর্শকগণের মনে কোন প্রকারে কষ্ট না হয়, রাজাজ্ঞাও প্রতিপালিত হয়। আবার শত্রুপক্ষ অতি নিকট! তাহারাই বা কি কান্ড করিয়া বসে, তাহারই বা বিচিত্রতা কি? প্রকাশ্য স্থানে শূলে চড়াইয়া প্রাণবধ করিতে হইবে, এ কথাও তাহারা শুনিয়াছে। শূলদন্ড যে দন্ডায়মান হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টভাবেই দেখিতেছে। ইহাতে যে তাহারা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, নির্বাকে দন্ডায়মান হইয়া ওমর আলীর বধ-ক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিবে এত কখনই বিশ্বাস হয় না। হয়তো কোন নতুন কান্ড করিয়া তুলিবে।

মারওয়ান বিশেষ চিন্তা করিয়া আদেশ করিলেন, "বধ্যভূমি পর্যন্ত যাইবার সুপ্রশস্ত পথ মধ্যে রাখিয়া উভয় পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী দন্ডায়মান করা হইবে। প্রহরী ও প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত সামান্য সৈন্য কি কোন প্রাণী আমার বিনানুমতিতে এপথে বধ্যভূমিতে যাইতে পারিবেনা।

আদেশমাত্র নিষ্কোষিত অসি-হস্তে সৈন্যগণ গায় গায় মিশিয়া বধ্যভূমি পর্যন্ত গমনোপযোগী প্রশস্ত স্থান রাখিয়া দুই শ্রেণীতে পরস্পর সম্মুখে দন্ডায়মান হইল। তখন শিবির-দ্বার হইতে শূলদন্ডের সমগ্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। মারওয়ান পুনরায় আজ্ঞা করিলেন, "শূলদন্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকার কতক স্থান রাখিয়া শূলদন্ডসহ ঐ চক্রাকার স্থান সজ্জিত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। এক শ্রেণীতে চক্রাকারে ঐ স্থানে বেষ্টন করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। সপ্তচক্র সৈন্য দ্বারা ঐ স্থান বেষ্টন করিতে হইবে। চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে বিপক্ষদল হইতে সামান্য একটি প্রাণীও আমাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য

রাখিতে হইবে। আবার এদিকেও শিবির দ্বার চতুষ্টয়ে এবং সীমান্ত স্থানে রক্ষীদিগের উপরেও সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বিশেষ সতর্কে শিবির রক্ষা করিতে হইবে।"

মারওয়ান সৈন্যাধক্ষগণকে আহবান করিয়া আরও আজ্ঞা করিলেন, "যে সকল সৈন্য বিশেষ শিক্ষিত ও পুরাতন তাহাদের দ্বারা শিবির এবং শিবির দ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিতে হইবে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ সীমার প্রত্যেক সীমায় সহস্র সহস্র সৈন্য তীর, বর্শা ও তরবারিহস্তে রক্ষীরূপে দন্ডায়মান থাকিবে। শিবিরের মধ্যে যেখানে যেখানে প্রহরী নিযুক্ত আছে, সেই সেই স্থানে দ্বিগুণিত প্রহরী ও সম্ভবমত সৈন্য নিয়োজিত করিয়া শিবির রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন সৈন্যদলের প্রতি বিশেষ সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিবেন।"

"ওমর আলীর বধসাধন হইতে কল্য প্রভাত পর্যন্ত সাধ্যাতীত সতর্কতার সহিত থাকিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্বারোহী হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে শিবিরের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিবেন। ওমর আলীর বধসাধনে হর্ষ, বিপদ, বিষাদ সকলই রহিয়াছে, সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাবধান! আমার এই আজ্ঞার অণূমাত্রও যেন অন্যথা না হয়। যে সকল সৈন্য নতুন গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাদিকে কখনই শিবির রক্ষার কার্যে কি সীমা রক্ষার কার্যে কি প্রহরীর কার্যে কোনরূপ কার্যে নিযুক্ত করা হইবে না। এমন কি আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত তাহারা শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে তাহাদিকে এ সকল কথা না বলিয়া বাহিরের অন্য কোন কার্যে কি শূলদন্ড যে প্রণালীতে রক্ষা করা আদেশ হইয়াছে।তাহাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে কিন্তু সপ্তচক্রের সীমা- চক্রে কি ষষ্ঠ বা পঞ্চম চক্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না। প্রথম দ্বিতীয় চক্রেই তাহাদের স্থান শূলদন্ডে নিকট হইতে উপরি উক্ত চক্রদ্বয় ভিন্ন অন্য কোন চক্রে তাহারা না যাইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।"

মারওয়ান এই সকল আদেশ করিয়া বন্দীসহ বধ্যভূমিতে যাইতে উদ্যত হইলেন, বন্দী ওমর আলী চতুর্দিকে চাহিয়া বধ্যভুমিতে যাইতে অসম্মত হইলেন।

মারওয়ান বলিলেন, " ওমর আলী! তুমি জানিয়া শুনিয়া বিহ্বল হইতেছ? বন্দীভাবে রাজ-আজ্ঞা অবহেলা! তুমি স্বেচ্ছাপূর্বক বধ্যভূমিতে না গেলে কি আমি তোমাকে শূলে চড়াইয়া মারিতে পারিব না? তুমি এখনও যদি মহারাজ এজিদের বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া মান্য কর, অপরাধ মার্জনাহেতু জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে এখনও তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমি মহারাজের রোষাগ্নি নির্বান করিতে চেষ্ট করিব। বধ্যভুমিতে যাইবে না, এ কি কথা সাধ্য কি যা তুমি না যাইয়া পার? তোমাকে নিশ্চয়ই ঐ শূলদন্ডের নিকটে যাইতে হইবে, নিশ্চয়ই ঐ শূলে আরোহণ করিতে হইবে, -বিদ্ধ হইতে হইবে, মরিতে হইবে। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা অলংঘনীয়।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও-শূলে দাও।কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্বক শূলদন্ডের নিকট যাইব না, -শূলে আরোহণ করা তো শেষের কথা। আমার প্রাণবধ করাই তো তোমাদের ইচ্ছা; তরবারি আছে, আঘাত কর -তীর আছে বক্ষ পরি লক্ষ্য কর-বর্শা আছে বিদ্ধ কর-গদা আছে মস্তক চূর্ণ কর -ফাঁস আছে গলায় দিয়া শ্বাস বন্ধ কর-যে প্রকারে ইচ্ছা হয়, প্রাণ বাহির কর। আমি শূলে চড়িব না।"

"আমি তোমাকে শূলে চড়াইব। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। তুমি তোমার প্রাণ বাহির করিবার দশটি উপায় বাহির করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ঐ একমাত্র শূলদণ্ডেই তোমার জীবন শেষ–কেন আমাকে বিরক্ত কর?"

"তোমার দক্ষতা থাকে আমাকে লইয়া যাও।"

"কেন? শূলে চড়িয়া প্রাণ দিতে কি লজ্জাবোধ হয়? হায় রে লজ্জা! এমন অমূল্য জীবন যদি গেল, তবে সে লজ্জা ফল কি?"

"আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তেমার কার্য তুমি কর, আমি আর এক পদ অগ্রসর হইব না।"

"মুহূর্ত পরে যাহার জীবন–কান্ডের শেষ অভিনয় হইয়া জীবনের মত যবনিকা পতন হইবে, তাহার আবার আস্পর্দ্ধা?"

"দেখ মারওয়ান! সাবধান হইয়া কথা বলিস্ আমার হস্ত কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, নতুবা তোর মুখের শাস্তি দিতে ওমর আলীকে বেশি দূর যাইতে হইত না।"

মারওয়ান মহাক্রোধে ওমর আলীকে পশ্চাৎদিক হইতে সরোষে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "চল পায়ে হাটাইয়া শুলে চড়াইব।"

ওমর আলী নীরব্ মারওয়ান অনেক চেষ্টা করিলেন, তিল পরিমাণ স্থানও ওমর আলীকে সরইতে পারিলেন না। লজ্জিত হইয়া বলিলেন সকলে একত্রে একযোগে হইয়া তোকে শূন্যে শূন্যে লইয়া যাইব।"

ওমর আলী হাস্য করিয়া বলিলেন, "মারওয়ান তুমি তো পারিলে না! সকলে একত্র হইয়া আমাকে শূলদন্তের নিকট লইয়া যাইবে, ইহাতে তোমার গৌরব কি? তুমি সুখী হও কোন মুখে?"

"আমি সুখী হই বা না হই, তোকে শূলে চড়াইব।"

"এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলে তো শূল?"

মারওয়ান প্রহরিগণকে বলিলেন, "তোমরা অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া সকলে ইহাকে ধর, শূন্যে শূন্যে লইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

প্রহরিগণ প্রভু–আজ্ঞা প্রতিপালন করিল বটে, কিন্তু ওমর আলী সেই পাষাণ, সেই পাষাণবৎ অচল। তিনি যে পদ যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেই পদ সেইখানেই রহিয়া গেল। প্রহরিগণ লজ্জিত–মারওয়ান রোষে অধীর।

মারওয়ান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহাবিপদ! এখান হইতে বধ্যভূমি পর্যন্ত লইতে এত কষ্ট, শূলের উপর চড়ান তো সহজ কথা নহে?"

ওমর আলী বলিলেন, "মারওয়ান, চিন্তা কি? তুমি যদি আমাকে বধ্যভূমি পর্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি ইচ্ছা করিয়া শূলে চড়িব। তুমি চিন্তা করিও না। যতক্ষণ থাকি, জগতে হাসি–তামাসা করিয়া চলিয়া যাই। মরণ কাহার না আছে? আজ আমার এই প্রকার মরণ হইতেছে; কাল না হউক, কালে তোমাকে অন্য প্রকারে মরিতে হইবে।"

মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখান হইতে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেলেও তো শূলে চড়ান্ মহাবিপদ দেখিতেছি। আবদুল্লাহ জেয়াদকে ডাকি।" এই স্থির করিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিলেন, "আবদুল্লাহ জেয়াদকে ডাকিয়া আন, আর তাঁহার অধীনে যে

কয়েকজন বলবান সৈন্য গতকল্য সৈন্যদলে নাম লিখাইয়াছে, তাহাদিগকেও এখানে আসিতে বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "ওহে মন্ত্রি! কোন আবদুল্লাহ্ জেয়াদ? কুফা নগরের জেয়াদ?–সেই নিমকহারাম জেয়াদ? বিশ্বাসঘাতক জেয়াদ?–না অন্য কেহ?"

"তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন কিছুই নাই –তবে পাপাত্মার মুখখানা চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে আছে। শীঘ্র আসিতে বল মরণকালে দেখিয়া যাই।

"তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত–এ সময়েও তোমার হাসি তামাসা এ সময়েও আমাদিগকে ঘৃণা?"

"কাহার অন্তিমকাল কোন সময় উপস্থিত হয়, তাহা তুমি বলিতে পার না– আমি বলিতে পারি।"

"আমি তো আর তোমাদের মত মূর্খ নহি যে, কারণ, কার্য ও যুক্তি অবহেলা করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিব? তুমি মনে করিয়াছ যে, আমরা তোমার প্রাণবধ করিতে পারিব না, – আমাদের হস্তে মরিবে না। ওমর! অঙ্গার যদি হরিদ্রার কান্তি পায়, মশকও যদি সমুদ্র শুষিয়া ফেলে অচল ও যদি সচলভাব ধারণ করে সূর্যদেবও যদি পশ্চিমে উদিত হন অথচ তোমার জীবন কখনই রক্ষা হইতে পারে না। মারওয়ানের হস্ত হইতে বাঁচিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। মুহূর্ত পরেই তোমার চক্ষের পাতা ইহকালের জন্য বন্ধ হইবে। শূলদন্ড তোমার মস্তক ভেদ করিয়া বর্হিগত হইবে। এখনও বাঁচিবার আশা জেয়াদকে দেখিবার আশা।

"অত বক্তৃতা করিও না অত দৃষ্টান্ত দিয়াও আমাকে বুঝাইও না। ঈশ্বরের মহিমার পার নাই। তিনি হযরত ইব্রাহিমকে অগ্নি হইতে ।ইউসুফকে কূপ হইতে নূহকে তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কত জনকে কত বিপদ কত কষ্ট কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। আর আমাকে এই সামান্য বন্ধন হইতে, এজিদের আদেশ হইতে আর বিভ্রান্ত আহম্মক মন্ত্রী মারওয়ানের হস্ত হইতে উদ্ধার করা তাহার কতক্ষণের কার্য?

"তোমার ঈশ্বর, যুক্তি ও কারণের নিকট পরাস্ত। আমি যদি তোমার এ বন্ধন না খুলিয়া দিই তোমার ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে খুলিয়া দিন দেখি? কারণ ব্যতীত কোন কালে কোন কার্য হইয়াছে? দৈব কথা দৈবশক্তি ছাড়িয়া দাও– না হয় তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ ও কথায় মারওয়ানের মন টলিবে না।

"মন টলিবে না বটে, টলিতে পারে।"

"পূর্বেই বলিয়াছি–মারওয়ান তোমার মত পাগল নহে।"

এদিকে বীরবর আব্দুল্লাহ্ জেয়াদ কয়েকজন সজ্জিত সৈন্যসহ মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনা দেখিলেন–শুনিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। ক্ষণকাল পরে জেয়াদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,"আমি ওমর আলীকে বধ্যভূমিতে লইতেছি। কি আশ্চর্য! ওমর আলীকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে উত্তোলন করা যায় না, এ কি কথা! অস্ত্রের সাহায্যে সকলেই সকল করিতে পারে।

জেয়াদ ওমর আলীর নিকট যাইয়া তাহাকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে তুলিতে অনেক চেষ্টা করিলেন –পারিলেন না। লজ্জা রাখিবার আর স্থান কোথা? বিরক্তভাবে বলিলেন, “বাহরাম! তুমি তো আপন বাহুবলে ক্ষমতা অনেক দেখাইয়াছ–উঠাও!”
মারওয়ান বলিলেন, “বাহরামের বাহুবল দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি সত্য কথা বলিতে কি ঐ গুণেই আমি বহেরামকে সৈন্যদলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি । এখন পদোন্নতি–পুরস্কার সকলই যদি ওমর আলীকে– ।
বাহরাম, মারওয়ান ও জেয়াদকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “গোলাম এখনই হুকুম তামিল করিতেছে।”
ওমর আলী আড় নয়নে বাহরামকে দেখিয়া বলিলেন, “জেয়াদ! কত জনকে ঠকাইতে চাও? স্বপ্ন বিবরণে প্রভু হোসেনকে ঠকাইয়াছ, মদিনা বিখ্যাত বীর মোসলেমকে ঠকাইয়াছ, আজ আবার কাহাকে ঠকাইবে।?”
জেয়াদ বলিলেন, তোমার অস্ত্রের ধার বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কথার ধারটুকু এখনও আছে এখনই সে ধার বন্ধ হইবে। উপযুক্ত লোক আনিয়াছি।”
“উপযুক্ত লোক হইলে অবশ্যই পরাভব স্বীকার করিব; যে যাহা বলিবে, বিনা বাক্যব্যয়ে শুনিব কিন্তু মরা বাঁচা ঈশ্বরের হাত।”
“আরে মুর্খ! এখনও মরা বাঁচা ঈশ্বরের হাত? তোমার ঈশ্বর এখনও তোমাকে বাচাইবেন ভরসা আছে? ইচ্ছাকরিলে কেবল মহারাজ এজিদ বাঁচাইলে বাঁচাইতে পারেন।
“রে বর্বর জেয়াদ তুই ঈশ্বরে মহিমা কি বুঝিবি পামর?”
“তোমার হিতোপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করে না। এখন গাত্রোত্থান কর, যমদূত শিয়রে দন্ডায়মান।”
ওমর আলী জেয়াদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই পূর্ববৎ দন্ডায়মান সেই– অটল অচল।
জেয়াদ বাহরামকে পুনরায় বলিলেন, “আর দেখ কি? উহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া চল”।
বাহরাম সিংহ–বিক্রমে ওমর আলীকে ধরিল এবং জয় মহারাজ এজিদ শব্দ করিয়া একেবারে শূন্যে উঠাইয়া বলিল, “হুকুম হয় তো এই স্থানে ইহার বধ–ক্রিয়া সমাধান করিয়া দিই । এক আছাড়েই অস্থি চূর্ণ করিয়া মজ্জা বাহির করি।”
বাহরামের বাহুবল দেখিয়া মারওয়ান, জেয়াদ শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাহরাম, ওমর আলীকে মারিয়া ফেলিও না রাজাজ্ঞা তাহা নহে। শূলে চড়াইয়া মারিতে হইবে। শিবিরের মধ্যে প্রাণবধের ইচ্ছা থাকিলে অনেক উপায় ছিল। শূলদন্ড পর্যন্ত ইহাকে শূন্যভাবে লইয়া যাইতে হইবে।”
“যো হুকুম” বলিয়া বাহরাম এজিদের জয়–ঘোষণা করিতে করিতে ওমর আলীকে তৃণবৎ লইয়া চলিল। মারওয়ান ও জেয়াদ হাসিতে হাসিতে আর আর সঙ্গিসহ চলিলেন।দৃশ্য ভয়ানক ! সকলের চক্ষেই ভীম দর্শন। শূলদন্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে সৈন্যশ্রেণী দন্ডয়মান। দর্শকগণের চক্ষু শূলের অগ্রভাগে কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই নীরব। প্রান্তর নীরব।

বাহ্‌রাম ওমর আলীকে শূলদণ্ডের নিকট লইয়া ছাড়িয়া দিলেন, জেয়াদ ও মারওয়ান পুনঃ পুনঃ বাহ্‌রামকে প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, অবশেষে বলিলেন, "বীরবর বাহ্‌রাম! তুমি ওমর আলীকে শূলদণ্ডে চড়াইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর।"
জেয়াদ মারওয়ানকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয় সে পর্যন্ত ওমর আলী শূলদণ্ডেই বিদ্ধ থাক।"
মারওয়ান বলিলেন, এ কথাটা বড় গুরুতর। মহারাজের অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। শত্রুর মনে কষ্ট দিতে তোমার এ যুক্তি সর্বপ্রধান বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা তাহা নহে। আমার মতে মৃতদেহে শত্রুতা নাই কিন্তু হানিফার বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শত্রুকে জব্দ করাই তো কথা। তোমার মত প্রকাশ করিয়া মহারাজের নিকট হইতে ইহার মীমাংসা করিয়া আসিতেছি। তুমি এদিকের কার্য শেষ কর। আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছিল, আমি সে ভার তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ওমর আলীকে মহারাজের আজ্ঞামত বধ কর। আমি মহারাজের নিকট হইতে ঐ কথার মীমাংসা করিয়া এখনই আসিতেছি।"
জেয়াদ বাহ্‌রামকে বলিলেন, "বাহ্‌রাম! বন্দীকে জিজ্ঞাসা কর, এখন তার আর কথা কি? এখনও মহারাজ এজিদ দয়া করিলে করিতে পারেন।"
বাহ্‌রাম জিজ্ঞাসা করিল,"ওমর আলী! তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত। কোন কথা বলিবার থাকে তো বল, –আর বিলম্ব নাই।"

ওমর আলী বলিলেন, "এতক্ষণ অনেক বলিয়াছি আর কোন কথা নাই। তবে ইচ্ছা যে, যাইবার সময় একবার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যাই কিন্তু আমার হস্তপদ যে কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে উপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে। যদি তোমাদের সাহস হয়, তবে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দাও। আমি অন্তিম সময়ে একবার পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যথার্থ নাম উচ্চারণ করিয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অন্তরকে পরিতৃপ্ত করি।"
জেয়াদ বলিলেন, " ওমর! আমি তোমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিতেছি। তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার ইষ্টদেবতার নাম কর, তোমার ঈশ্বরকে যথাবিধি পূজা কর, মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে আমি কখনই বাঁধা দিব না। ঈশ্বর তোমাকে যে এখনও রক্ষা করিতে পারেন, এ ভ্রমও পরীক্ষা কর। আমি তোমাকে তোমার ইষ্টদেবতার শপথ দিয়া বলিতেছি, তোমার উদ্ধারের জন্য কায়মনে তোমার নিরাকার নির্বিকার দয়ালু প্রভুর নিকট আরাধনা কর।" এই বলিয়া জেয়াদ স্বহস্তে ওমর আলীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।
ওমর আলী মৃত্তিকা দ্বারা অজু ক্রিয়া সমাপন করিয়া যথারীতি ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। উপাসনার পর দুই হস্তে তুলিয়া মহাপ্রভুর গুণানবাদ করিতে করিতে শূলদণ্ডের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং বীরত্বের সহি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর আলীর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্‌রাম বলিয়া উঠিলেন, "জেয়াদ! বিশ্বাসঘাতকার ফল গ্রহণ কর। মোসলেমের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। মোসলেমের হত্যার ফল গ্রহন কর। ওমর আলীকে উদ্ধার করিতে আসিয়া তোমাকে সুযোগমত পাইয়াছি–ছাড়িব না।" এই বলিয়া সজোর আঘাতে জেয়াদ –শির দেহবিচ্ছিন্ন হইলে

শিরসংযুক্ত কেশগুচ্ছ ধরিয়া শিরহস্তে বাহরাম বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্মী এজিদ! দেখ, কি কৌশলে বাহরাম ওমর আলীকে লইয়া চলিল। কেবল ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার জন্যই বাহরাম ছদ্মবেশে তোমার প্রিয় সেনাপতি জেয়াদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি মোহাম্মদ হানিফার দাস্ যুদ্ধ সময়ে আগন্তুক সৈন্য গ্রহণ করার এই প্রতিফল –সৈন্য বৃদ্ধি লালসায় ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিয়া যাওয়ার এই ফল। দেখ–এই দেখ–আজ কি ঘটিল। আগন্তুক সেনার বিশ্বাস নাই বলিয়া তোমার মন্ত্রিপ্রবর শূলদন্ডের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রে নতুন সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহারা বাহির চক্রে থাকিলে কি জানি কি বিপদ ঘটায় তাহার এই দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন। এখন দেখ! বাহরাম জেয়াদের শির লইয়া বীরত্ব প্রকাশে ওমর আলীকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

ওমর আলী জেয়াদের কটিবন্ধ হইতে তরবারি সজোরে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "মোহাম্মদীয় ভ্রাতৃগণ! আর কেন? প্রভুর নাম ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে শিবিরে চল্ ওমর আলী সহজেই উদ্ধার হইলেন। আর আত্মগোপন প্রয়োজন কি?" প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চক্রের সেনাগণ সমস্বরে আল্লাহু আকবর জয় মোহাম্মদ হানিফা জয় মোহাম্মদ হানিফা" বলিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। দেখিতে দেখিতে চতুর্থ এবং পঞ্চম চক্র ভেদ করিয়া ষষ্ঠ চক্রে গিয়া পড়িল। ঘোর সংগ্রাম অবিশ্রান্ত অসি চলিতে লাগিল। এজিদের বিশ্বাসী সৈন্যগণ, যাহারা ষষ্ঠ এবং সপ্তম চক্রে ছিল, হঠাৎ স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহা ভীত হইল। বাহিরে শত্রু ওমর আলীকে না লইতে পারে, ইহাই তাহাদের মনে ধারণা, তাহাতেই মনঃসংযোগ ও সতর্কতা। হঠাৎ বিপরীত ভাব দেখিয়া কিছুই সিথর করিতে পারিল না। কোথা হইতে কি ঘটিল, কি কারণে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল, কিছুই সন্ধান করিতে পারিল না। জেয়াদের খন্ডিতশির অপরিচিত সৈন্যহস্তে দেখিয়া মহারাজ এজিদ বাচিয়া আছেন কি না, ইহাই সমধিক শঙ্কার কারণ হইল। চক্র টিকিল না। মুহূর্তমধ্যে চক্র ভগ্ন করিয়া ওমর আলী এবং বাহরাম সঙ্গিগণসহ বাহিরে আসিলেন। যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারই রক্তমাখা হইয়া মৃত্তিকাশায়ী হইল।

আশা ছিল কি–ঘটিল কি? কোথায় ওমর আলীর শূলবিদ্ধ শরীর সকলের চক্ষে পড়িবে,–না জেয়াদের খন্ডিত দেহ দেখিতে হইল! মারওয়ানের দুঃখের সীমা নাই। ওদিকে হানিফা–শিবিরে শত সহস্র বিজয়–নিশান উড়িতেছে,সন্তোষ -সূচক বাজনায় দামেস্ক প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এজিদ এ সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বধ্যভূমিতে আগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! করিয়া বধ কে করিল? যাহা হউক, হানিফার উচ্চ বিস্তার বলে ওমর আলী কৌশল করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। আমাদেরও শিক্ষা হইল। সমরক্ষেত্রে আগন্তুক সৈন্যকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করার ফল,প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিল। আমাদের অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতার কার্যফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতে হইল। আমার ইহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু জেয়াদের শিরশূন্য দেহ দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। জেয়াদের শির আজ হানিফার শিবিরে যাইবে, একথা কাহার মনে ছিল?–কে ভাবিয়াছিল?– কিন্তু চিন্তা কি? এখনই প্রতিশোধ, এখনই ইহার প্রতিশোধ লইব? ঐ শূলদন্ড যে ভাবে আছে, সেই

ভাবেই রাখিব। ভবিষ্যৎ বিপদ গণনা করিয়া আর বিরত হইব না, আর কাহারও কথা শুনিব না। যাও–এখনই দামেস্কে যাও। জয়নাল–আবেদীনকে বাঁধিয়া আন। ঐ শূলদণ্ডে তাহাকে চড়াইয়া প্রিয়বন্ধু জেয়াদের শোক নিবারণ করিব, মনের দুঃখ দূর করিব। জয়নালবধে শত শত বাধা দিলেও এজিদ আজ ক্ষান্ত হইবে না। শূলে চড়াইয়া শত্রুবধ করিতে পারি কি না, হানিফাকে দেখাইতে এজিদ কখনই ভুলিবে না। বন্দীকে ধরিয়া আনিয়া শুলে চড়াইব, ইহাতে আর আশঙ্কা কি? শঙ্কা থাকিলেও আজ এজিদ কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবে না। এখনই যাও। মারওয়ান! এখনই যাও, জয়নালকে ধরিয়া আন–এজিদ এই বধ্যভূমিতেই রহিল। ভেরীর বাজনার সহিত, ডঙ্কার ধ্বনির সহিত নগরে,

প্রান্তরে, সমরক্ষেত্রে হানিফার শিবিরের নিকটে ঘোষণা করিয়া দাও যে, ওমর আলীর জন্য যে শূলদন্ড স্থাপিত করা হইয়াছিল, সেই শূলদণ্ডে জয়নালকে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিহিংসা লওয়া হইবে।"

মারওয়ান আর দ্বিরুক্তি করিল না রাজাদেশ মত ঘোষণা প্রচারে আজ্ঞা করিয়া সপ্তবিংশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ অশ্বারোহণে তখনই নগরাভিমুখে ছুটিলেন।

ষড়বিংশ প্রবাহ

এক দুঃখের শেষ হইতে আর একটি দুঃখের কথা শুনিতে হইল। জয়নাল আবেদীনকে অদ্যই শূলে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিশোধ লইবে, এজিদের এই প্রতিজ্ঞা।

জয়নাল বন্দীগৃহে নাই একথা এজিদপক্ষীয় একটি প্রাণীও অবগত নহে। মারওয়ান কারাগারে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে অনুমতি করিলেন, "তোমরা কয়েকজন জয়নালকে ধরিয়া আন। সাবধান, আর কাহাকেও কিছু বলিও না।"

মন্ত্রিবরের আজ্ঞায় প্রহরীগণ কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জয়নাল আবেদীন এ গৃহে নাই।"

মারওয়ানের মস্তক ঘুরিয়া গেল, অশ্বপৃষ্ঠে আর থাকিতে পারিলেন না। উদ্বিগ্নচিত্তে স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন, কারাগৃহের প্রত্যেক কক্ষে তন্ন তন্ন করিয়াদেখিলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না। হোসেন পরিজনের চিত্তবিকার এবং হাব–ভাব দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন, জয়নাল বিষয়ে ইহারাও অজ্ঞাত। বিলম্ব না করিয়া নগর–মধ্যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ওদিকে মোহাম্মদ হানিফা এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বিপদ সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, –যাহার জন্য মহাসংগ্রাম, যাহার উদ্ধার জন্য মদিনা হইতে দামেস্ক পর্যন্ত স্থানে স্থানে শোণিত–প্রবাহ, শত শত বীরবরের আত্মবিসর্জন, মদিনার সিংহাসন শূন্য–হায়! হায়! সেই জয়নালের প্রাণবধ! ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? ওমর আলীকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ জয়নালকে শূলে চড়াইয়া সংহার করিবে! হায়! হায়! যাহার উদ্ধার জন্য এত দূর আসিলাম, যাঁহার উদ্ধার জন্য এত আত্মীয় বন্ধু হারালাম,–হায়! হায়! আজ স্বচক্ষে তাঁহার বধক্রিয়া দেখিতে হইল! কোন পথে কোন কৌশলে আনিয়া শূলে চড়াইবে, তাহার সন্ধান কি

প্রকারে করি–উদ্ধারের উপায়ই বা করি কি প্রকারে! সন্ধান করিয়া কোন ফল দেখি না। সামান্য সুযোগ পাইলে যে নিজের উদ্ধার নিজেই করিতে পারিবে, সে ক্ষমতা কি তাহার মস্তকে আছে?

" হায়! হায়! আমার সকল আশা মিটিয়ে গেল। কেন দামেস্কে আসিলাম? কেন এত প্রাণবধ করিলাম? কেন ওমর আলীকে কৌশলে উদ্ধার করিলাম? ওমর আলীর প্রাণ দিয়াও যদি জয়নালকে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও উদ্দেশ্য ঠিক থাকিত। বোধ হয়, ইমাম–বংশ রক্ষা পাইত। দয়াময়, করুণাময়! জয়নালকে রক্ষা করিও! আজ আমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে! ভেরীর বাজনার সহিত ঘোষণার কথা শুনিয়া আমার মস্তকের মজ্জা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভ্রাহঃ ওমর আলী, ভ্রাতঃ আক্কেল আলী (বাহ্রাম), প্রিয় বন্ধু মসহাব, চির–হিতৈষী গাজী রহমান কোথা? তোমরা জয়নালের প্রাণ–রক্ষার উপায় কর, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতেছি।"

গাজী রহমান বলিলেন, "বাদশাহ–নামদার! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে অবশ্যই শান্তিবাধ হইবে। মনে করিলাম, আজই যুদ্ধের শেষ, জীবনের শেষ। যে কল্পনা করিয়া আজ পর্যন্ত এজিদের শিবির আক্রমণ করি নাই, সে কল্পনার ইতি এখনই হইয়া গেল। কোন উপায়ে অগ্রে জয়নালকে হস্তগত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ এজিদ রীতিনীতির বাধ্য নহে, স্বেচ্ছাচার কলঙকরেখায় তাহার আপদমস্তক জড়িত। এই দেখুন, জেয়াদ মারা পড়িল, জয়নালের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রচার হইল, এই সকল ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যে দিন জয়নাল হস্তগত হইবে, সেই দিনই এই যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিয়া এজিদ–বধ কান্ডের যনবিকা পাতন করিব। বাদশাহ নামদার! যদি তাহাই হইল, তবে আর বিলম্ব কি? ভ্রাতৃবধ! চিন্তা কি? সাজ সমরে! বন্ধুগণ! সাজ সমরে–বাজাও ডঙ্কা, উড়াও নিশান, ধর তরবারি, ভাঙ্গ শিবির, মার এজিদ, চল নগরে দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক। আর ফিরিব না। –জগতের মুখ আর দেখিব না! জয়নালকে হারাইয়া শুধু প্রাণ লইয়া স্বদেশেও যাইব না। –এই প্রতিজ্ঞা আজ গাজী রহমানের এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা!"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানে বাক্যে সিংহ–গর্জনের ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন; আর আর মহারথিগণও ঐ উৎসাহবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া "সাজ সমরে" মুখে বলিতে বলিতে মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত হইলেন। ঘোরে রোলে বাজনা বাজিয়া উঠিল। মোহাম্মদ হানিফা অসি, বর্ম, তীর, খঞ্জর, কাটারী প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া দুলদুলে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সংবাদবাহিগণ এজিদ– সমীপে করজোড়ে নিবেদন করিলেন,"মহারাজ! মোহাম্মদ হানিফা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহাতেজে শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন, এক্ষণে উপায়? মন্ত্রিবর মারওয়ান শিবিরে নাই –সৈন্যগণও নিরুৎসাহ যুদ্ধসাজের কোন আয়োজন নাই। কুফাধিপতির দুদর্শায় সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত, উৎসাহ উদ্যম কাহারও নাই। নৈরাশ্যের সহিত বিষাদ–মলিন–রেখা সৈন্যগণের বদনে দেখা দিয়াছে।"

এজিদ মহা ব্যস্ত হইয়া শিবির বর্হিভাগে গিয়া দেখিলেন যে প্রান্তরের প্রস্তররাশি চুর্ণ করিয়া বালুকণা শূন্যে উড়াইয়া অসংখ্য সৈন্য শিবির আক্রমণে আসিতেছে।

এদিকে মন্ত্রিবর মারওয়ান ম্লানমুখ হইয়া উপস্থিত। বলিলেন "জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, নগরে নাই, বিশেষ সন্ধানে জানিলাম, জয়নালের কোন সন্ধান নাই্ মহা বিপদ! চতুর্দিকেই বিপদ, সম্মুখেও ঘোর বিপদ! মহারাজ! সেই ঘোষণা প্রকাশেই এই আগুন জ্বলিয়াছে। মোহাম্মদ হানিফার হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিবার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ ঘোষণা– জয়নালের প্রাণদন্ডের ঘোষণা।"

এজিদ মহা ভীত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে উপায়? সৈন্যগণের মনের গতি আজ ভাল নয়। হানিফাকে কোন কৌশলে ক্ষান্ত করিতে পারিলে কাল দেখিব। সৈন্যগণের হাব ভাব দেখিয়া আজ আমি এক প্রকার হতাশ হইয়াছি।"

মারওয়ান বলিলেন, "এইক্ষণে সে সকল কথা বলিবার সময় নহে, শত্রুগণ প্রায় আগত। জয়নাল আবেদীন নগরে নাই, বন্দীগৃহে নাই, একথা প্রকাশ হইলে যে কথা–শূলে চড়াইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিলেও সেই কথা। এখন এই উপস্থিত আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় করাই আবশ্যক। বিপক্ষদলের যেরূপ রুদ্রভাব, উগ্রমূর্তি দেখিতেছি, ইহাতে কি যে ঘটিবে, বুঝিতেছি না; চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

মারওয়ান তখনই সন্ধিসূচক নিশান উড়াইয়া দিলেন এবং জনৈক বিশ্বাসী দূতকে কয়েকটি কথা বলিয়া সেই বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণের সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অপর অপর আত্মীয়গণ দূতের প্রতি একযোগে অসি উত্তোলন করিয়া বলিলেন , "রাখ্ তোর সন্ধি! রাখ তোর সাদা নিশান!"

গাজী রহমান এস্তে মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "বাদশাহ–নামদার, ক্ষান্ত হউন। পরাজিত শত্রু মহাবীরের বধ্য নহে–বিশেষ দূত। রোষপরবশ হইয়া রাজবিধি রাজপদে দলিত করিবেন না। অস্ত্র কোষে আবদ্ধ করুন। দূতবরের প্রার্থনা শুনিতেই হইবে, গ্রাহ্য করা না করা বাদশাহ নামদারের ইচ্ছা।"

হানিফা লজ্জিত হইয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন; তরবারি পিধানে রাখিয়া বলিলেন, "গাজী রহমান! তুমি যথার্থই আমার বুদ্ধিবল। দুর্দমনীয় ক্রোধেই লোকের মূর্খতা প্রকাশ করে–মানুষকে নিন্দার ভাগী করে। যাহা হউক, তুমি দূতবরের সহিত কথা বল।"

এজিদ দূত মহাসমাদরে মোহাম্মদ হানিফাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "জয়নাল আবেদীনকে শূলে চড়াইয়া বধ করিবার ঘোষণা রহিত করা গেল, শূলদন্ড এখনই উঠাইয়া ফেলিব। আমাদের সৈন্যগণ মহাক্লান্ত–বিনা যুদ্ধেই আজ আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। যদি ইহাতেই আপনারা চিরজয় মনে করেন, তবে মহারাজ এজিদ তাহার হস্ত স্থিত তরবারি যাহা ভুমিতে রাখিয়া দিয়াছেন, আর তাহা হস্তে স্পর্শ করিবেন না। গলায় কুঠার বাঁধিয়া আগামীকল্য আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমপর্ণ করিবেন।

গাজী রহমান বলিলেন, "যদি জয়নাল আবেদীনের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয় এবং তাঁহার প্রাণের প্রতিভু মহারাজ এজিদ হয়েন, তবে আমরা আজিকার মত কেন যত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন, সম্মত আছি। বিনা যুদ্ধে, কি দৈববিপাকে, কি অপ্রস্তুতজনিত, কি অপারগতা–হেতু পরাভব স্বীকার করিলে আমরা তাহাকে জয় মনে করি না। যে সময় তোমাদের তরবারির তেজ কম হইবে, সমর–প্রাঙ্গণ হইতে প্রাণভয়ে পলাইতে থাকিবে, শৃগাল–কুকুরের ন্যায় তাড়াইতে থাকিব, কোথায় নিশান, কোথায় ব্যূহ, কোথায় কে, কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, জ্ঞান থাকিবে না, রক্তস্রোত রঞ্জিতদেহ সকল

ভাসিয়া যাইবে, কোন স্থানে তোমাদের সৈন্য দেহখন্ড, খন্ডিত অশ্ব-দেহে শোণিত সংযোগে জমাট বাঁধিয়া গড়াইতে থাকিবে, কোন স্থানে দ্বীপাকার ধারণ করিবে, শিরশূন্য কবন্ধ সকল রক্তের ফোয়ারা ছুটাইয়া নাচিতে নাচিতে হেলিয়া দুলিয়া শবদেহের উপর পড়িয়া হাত পা আছড়াইতে থাকিবে, আমরা বীরদর্পে বিজয়নিশান উড়াইয়া দামেস্ক রাজপাটে জয়নাল আবেদীনকে বসাইয়া রক্তমাখা শরীরে রঞ্জিত তরবারি সকল মহারাজ জয়নাল আবেদীন সম্মুখে রাখিয়া মহারাজাধিরাজ সম্ভাষণে নতশিরে দন্ডায়মান হইব, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সেও আমাদের সহিত ঐ অভিষেক-ক্রিয়ায় যোগদান করিবে, নগরময় যখন অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণ-তারকা চিহ্নিত পতাকাসকল উড়িতে থাকিবে, দূতবর! সেই দিন যথার্থ জয়ী হইলাম, মনে করিব। অন্য প্রকার জয়ের আশা আমাদের অন্তরে নাই। যাও দূতবার, তোমার রাজাকে গিয়া বল- আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলাম। যে দিন তোমাদের সমর-নিশান শিবির -শিরে উড়িতে দেখিব, ভেরীর বাজনা স্বকর্ণে শুনিব, সেই দিন আমাদের তরবারির চাকচিক্য, তীরের গতি, বর্শার চাল, অশ্বের দাপট, নিশানের ক্রিয়া সকলই দেখিতে পাইবে। আজ ক্ষান্ত দিলাম, কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, জয়নালের প্রাণ তোমাদের রাজার প্রতিভূতে রহিল। যাও দূতবর, শিবিরে যাও, আমরাও শিবিরে চলিলাম।"

সপ্তবিংশ প্রবাহ

রজনী দ্বিপ্রহর। তিথির পরিভোগে বিধুর অনুদয়, কিন্তু আকাশ নক্ষত্রমালায় পরিশোভিত। মহাকোলাহলপূর্ণ রণ-প্রাঙ্গণ এইক্ষণে সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ। দামেস্ক-প্রান্তরে প্রাণীর অভাব নাই কিন্তু প্রায় সকলেই নিদ্রার কোলে অচেতন। জাগে কে? প্রহরীদল, সন্ধানীদল, আর উভয় পক্ষের মন্ত্রীদল। মন্ত্রীদল মধ্যেও কেহ আলস্যের পরিভোগে চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, কেহ দিবাভাগের সেই অভাবনীয় ঘটনার কোন কোন অংশ ভাবিয়া উপবেশন স্থানেই গড়াইয়া পড়িয়াছেন, কেহ শয়ন-শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া আধজাগরণে, আধস্বপ্নে জেয়াদের শিরশূন্য দেহ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। যথার্থ জাগরিত কে? এক পক্ষে মারওয়ান, অন্য পক্ষে গাজী রহমান।

মারওয়ান আপন নির্দিষ্ট বস্ত্রাবাসের বহির্দ্বারে সামান্য কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিয়া বলিতেছেন, "ভাবিলাম কি? ঘটিল কি? এখনই বা উপায় কি? রাজ্যরক্ষা, রাজজীবন রক্ষা, নিজের প্রাণ রক্ষার উপায় কি? কি ভ্রম! কি ভয়ানক ভ্রম! আশা ছিল শত্রুকে শূলে দিয়া জগতে নাম জাঁকাইব-যুদ্ধে জয়লাভ করিব; সে আশা-বারিধি গাজী রহমান মস্তিস্ক-তেজে ছদ্মবেশ বাহরামের বাহুবলে এবং ওমর আলীর কৌশলে একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন জীবনের আশঙ্কা, রাজ-জীবনে সন্দেহ। জয়নাল আবেদীনের বন্দী-গৃহে হইতে পলায়নে আরও সর্বনাশ ঘটিল। দ্বারে দ্বারে প্রহরী, নগর প্রবেশের দ্বারে প্রহরী, বহির্দ্বারে প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া আপন মুক্তি আপনিই করিল! কি আশ্চর্য কান্ড! এখন আর কাহার জন্য যুদ্ধ? আর কি কারণে হানিফার সহিত শত্রুতা? কেন প্রাণীক্ষয়? জয়নালকে হানিফা হস্তে দিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। সন্ধির প্রস্তাব মুখে আনিতেও আমার আর ক্ষমতা নাই- আর তাহাতে ভুলিবে না। সন্ধির নিশানে আর

পড়িবে না। শত সহস্র দূতের প্রস্তাবেও আর কর্ণপাত করিবে না। পরাজয় স্বীকারে মৃত্তিকায় তরবারি রাখিয়া দিলেও আর ছাড়িবে না। যদি জয়নালের মুক্তির কথা গোপনই থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাদের লাভ কি? জয়নালই যদি আমাদের হাতছাড়া হইল, তবে হানিফা পরাজয়ে ফল কি? ফল আছে। মহারাজের প্রাণ, স্বদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণরক্ষা করা ভিন্ন আর কি আশা? কিন্তু ইহাতেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কালই হউক, দু'দিন পরে হউক, তাহার বল বিক্রম সে প্রকাশ করিবে,-নিশ্চয় করিবে। সে নব-কেশরীর নব-গর্জনে দামেস্ক নগর কাঁপিবেই কাঁপিবে। তাহার পিতৃ-প্রতিশোধ সে লইবেই লইবে।"

মারওয়ানের চিন্তার ইতি নাই। দামেস্কের এ দুর্দশা কেন ঘটিল, এও এক প্রশ্ন আছে। এজিদের দোষ, কি তাহার দোষ-সে কথারও মীমাংসা হইতেছে। সর্বোপরি প্রাণের ভয়-মহাভয়। যদি আবদুল্লাহ জেয়াদকে ওমর আলীর বধসাধন-ভার অর্পণ করিয়া রাজসমীপে না যাইতেন, তাহা হইলে এই নিশীথ সময়ে প্রান্তরে বসিয়া আর চিন্তার ভার বহন করিতে হইত না! এ কথা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেছেন।

মারওয়ান যে স্থানে বসিয়াছিল, সে স্থান হইতে হানিফার শিবিরে প্রজ্জ্বলিত দীপমালা সমুজ্জ্বল নক্ষত্রমালার ন্যায় তাহার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছিল। প্রদীপ্ত দীপরাশির উজ্জ্বলাভা মনঃসংযোগে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে নতুন একটি কথার সঞ্চার হইল। কথাটা কিন্তু গুরুতর অথচ নীচ কিন্তু মারওয়ানের হৃদয়ে সে কথার সঞ্চার আজ নতুন নহে। বিশেষ আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিবশে মারওয়ান মনের কথা মুখে আনিলেন।"গুপ্তভাবে হানিফার শিবিরে যাইলে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারা যায় কি? যদি জয়নাল হানিফার হস্তগত হইয়া থাকে, তবে সকলই বৃথা। কোন উপায়ে কি কোন কৌশলে কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে এখনও রক্ষার অনেক উপায় করা যায়। মদিনায় মায়মুনার আবাসে কত নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে যাইয়া কত গুপ্ত অনুসন্ধান করিয়াছি, কত অসাধ্য সাধন সহজে সাধন করিয়াছি, আর এ দামেস্ক নগর-আপন দেশ, নিজের অধিকার এখানে কিছুই করিতে পারিব না? তবে একটা কথা,-পাত্রভেদে কিছু লঘু গুরু আছে। আবার একেবারে নিঃসন্দেহের কথাও নহে। মোহাম্মদ হানিফা বুদ্ধিমান! প্রধানমন্ত্রী গাজী রহমান্ অদ্বিতীয় রাজ-নীতিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও চতুর, তাহাদের নিকট মারওয়ান পরাস্ত। কি জানি, কি কৌশল করিয়া শিবির-রক্ষার কি উপায় করিয়াছে, হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হইলেও হইতে পারি। অদ্বিতীয় ভালবাসার প্রাণ পাখীটাই যে দেহ পিঞ্জর হইতে একেবারে দূর না হইতে পারে, তাহাই বা কে বলিল? এও সন্দেহ; নতুবা দামেস্ক প্রান্তরে এই নিশীথ সময়ে একা একা ভ্রমণ করিতে মারওয়ান সন্দিহান নহেন, দামেস্ক রাজমন্ত্রী ভীত নহেন।"

এই বলিয়া মারওয়ান আসন ছাড়িলেন। দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন একা যাইব না অলীদকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে- পথিক- সাজে- সামান্য পথিক সাজে বাহির হইব।

মারওয়ান বেশ পরিবর্তন জন্য বস্ত্রাবাস-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অলীদের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। মহাবীর-হৃদয় আজ মহাচিন্তায় অস্থির। এ যুদ্ধের পরিণাম-ফল কি? সময়ের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, শেষ ঘটনায় নিয়তিদেবী যে কোন দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়ের যবনিকা পাতন করিবেন, তাহাা তিনিই জানেন।

বীরবর শিবির- বাহিরে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, আর ভাবিতেছেন মাঝে মাঝে বিমানে পরিশোভিত তারাদলের মিটি মিটি ভাব দেখিয়া মনে মনে আর একটি মহাভাবের ভাবনা ভাবিতেছেন। কিন্তু সে ভাব ক্ষণকাল- সে জ্বলন্ত দৃঢ়ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মায়াময় সংসারে স্বার্থপূর্ণ ভাবই প্রবল বেগে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। নিশার শেষের সহিত কি আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিবে? কার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিবে? আবার তারাদলে নয়ন পড়িল,- সেই মধুমাখা মিটি মিটি হাসি ভাব,-এ তারা ও তারা, কত তার দেখিলেন, কিন্তু অরুন্ধতী নক্ষত্র তাহার নয়নে পড়িল না। তারাদল হইতে নয়ন ফিরাইয়া আনিতেই হানিফার শিবিরে প্রদীপ্ত দীপালোক প্রতি চক্ষু পড়িল; অলীদ সেদিকে মনোযোগ না করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি করিতেই তীর ধনু হস্তে লইলেন। ছদ্মবেশী মারওয়ান কথা না কহিলে অলীদ বাণে তখনই তাহার জীবন শেষ হইত।

অলীদ বলিলেন, "নিশীথ-সময়ে এ বেশে কোথায়? ভাগ্যে কথা বলিয়াছিলেন!"

"তাহাতেও দুঃখ ছিল না। যে গতিক দেখিতেছি, তাহাতে দুই এক দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। ভাল, তোমার চক্ষেও যে আজ নিদ্রা নাই?"

"আপনার চক্ষেই বা কি আছে!"

"অনেক চেষ্টা করিলাম, -কিছুতেই নিদ্রা হইল না। মনে শান্তি নাই, আত্মার পরিতোষ কিসে হইবে? নানা প্রকার চিন্তায় মন মহা-আকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি কি ভ্রম! কি করিতে গিয়া কি ঘটিল! জেয়াদের মৃত্যু জেয়াদ নিজ বুদ্ধিতেই টানিয়া আনিয়াছিল। এমন আশ্চর্য ঘটনা, অভাবনীয় বুদ্ধিকৌশল, হাতে হাতে চাতুরী কখনই দেখি নাই, আজ পর্যন্ত কাহারও মুখে শুনি নাই। ধন্য মোহাম্মদ হানিফা, ধন্য মন্ত্রী গাজী রহমান!"

"গত চিন্তা বৃথা। আলোচনাতে কেবল আক্ষেপ ও মনের কষ্ট। ও কথা মনে করিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন রাত্রি প্রভাতের পর উপায় কি? যুদ্ধ আর ক্ষান্ত থাকে না, - সে যুদ্ধই বা কাহার জন্য মূলধন তো সরিয়া পরিয়াছে।"

"সেও কম আশ্চর্য নহে।":

"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চল, একবার হানিফার শিবিরের দিকে যাইয়া দেখিয়া আসি,কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান লইতে পারি কি না; এখন মূল কথা জয়নাল আবেদীন। যুদ্ধ করিতে হইলে জয়নাল। পরাভব স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা রাজ্যরক্ষা- করিতে হইলেও জয়নাল। সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইলেও সেই জয়নাল। জয়নালের সন্ধান না করিয়া আর কোন কথা উঠিতে পারে না। জীবনে, মরণে, সকল অবস্থাতেই জয়নালের প্রয়োজন।"

"তাহা তো শুনিলাম! কিন্তু একটি কথা এই নিশীথ সময়ে জয়নালের সন্ধান করিতে কি বিপক্ষ-শিবিরে সন্ধান জানিতে যাইব? তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিব কি না, সে বিষয় একটু ভাবা চাই। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পথিক, পরিব্রাজক, দীন দুঃখীর পরিচয় দিলেই যে কার্যসিদ্ধি হয়, তাহা নহে। এ মদিনার মায়মুনা নহে, দগ্ধ-হৃদয় জাএদা নহে। এ

বড় কঠিন হৃদয় বৃহৎ মস্তক। এ মস্তক মস্তকে ভাগও অতি অধিক, শক্তিও বেশি পরিমাণ, ক্ষমতা ও অপরিসীম, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো অনেক দেখিতেছি, আবার এই নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে গোপনভাবে দেখিয়া অধিক আর কি লাভ হইবে? তাহাদের গুপ্তসন্ধান জানিয়া সাবধান সতর্ক হওয়া কি কোন কার্যের প্রতিযোগিতা করা, কি নতুন কার্যের অনুষ্ঠান করা, বহু দূরের কথা। শিবিরের বহিঃস্থ সীমার নিকট যাইতে পার কি না সন্দেহ! তোমার ইচ্ছা হইয়াছে–চল, দেখিয়া আসি, গাজী রহমানের সতর্কতাও জানিয়া আসি; কিন্তু লাভ কিছু হইবে না, বরং বিপদের আশঙ্কাই অধিক।"

"ল্যাভের আশা যাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সে যে ঘটিবে না, তাহাও বুঝিয়াছি। অথচ যদি কিছু পারি।"

"পারিবে তো অনেক । মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলে রক্ষা।"

"আচ্ছা দেখাই যাউক, আমাদের তো রাজ্য।"

"আচ্ছা আমি সম্মত আছি।"

"তবে আর বিলম্ব কি? পোশাক লও।"

"পোশাক তো লইবই আরও কিছু লইব।"

"সাবধান! কেহ যেন হঠাৎ না দেখিতে পায়।"

ওতবে অলীদ ছদ্মবেশে মারওয়ান সঙ্গে চুপে চুপে বাহির হইলেন। প্রভাত না হইতেই ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা পথে স্থির হইল। কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া মারওয়ান বলিলেন, "একেবারে সোজা পথে যাইব না। শিবিরের পশ্চাদভাগ সম্মুখে করিয়া যাইতে হইবে। এখন আমাদের বাম পার্শ্ব হইয়া ক্রমে শিবির বেষ্টন করিয়া যাইতে থাকিব।"

এই যুক্তিই স্থির করিয়া তাহারা ক্রমে বাম দিকেই যাইতে লাগিলেন। ক্রমে হানিফার শিবিরের পশ্চাৎ দিক তাহাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে যেরূপ আলোর পারিপাট্য সেইরূপ পশ্চাৎ পার্শ্ব সকল দিকেই সমান। সম্মুখ পার্শ্ব পশ্চাতের কিছুই ভেদ নাই। কখনও দ্রুতপদে, কখনও মন্দ মন্দ ভাবে চতুর্দিকে লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সতর্কিতভাবে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূরে গিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের সঙ্গে আরও লোক আসিতেছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, হাসি–রহস্য বিদ্রূপসূচক কোন কোন কথার আভাস তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। কোন দিকে কত দূর হইতে এই কথার আভাস আসিতেছে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কারণ কখন দক্ষিনে কখন বামে কখন সম্মুখে আবার কখনও পশ্চাতে অতি মৃদু মৃদু কথার আভাস কানে আসিতে লাগিল। উভয়ে গমনে ক্ষান্ত দিয়া মনঃসংযোগে বিশেষ লক্ষ্যে চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোন দিকে কিছুই নাই, চারিদিকে অন্ধকার, উপরে তারকারাজি। উভয়ে আবার যাইতে লাগিলেন। অনুমান দশ পাদভূমি অতিক্রম করিয়া যাইলেই মানব–মুখোচ্চারিত অর্থসংযুক্ত কথার ঈষৎ ভাব স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন। সে কথার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু আর বেশি দূর যাইতে হইল না। আনুমানিক পঞ্চ হস্ত পরিমান ভূমি পশ্চাৎ করিতেই তাহাদের বাম পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল– আর নয়, অনেক দূরে আসিয়াছ।

মারওয়ান চমকিয়া উঠিলেন। আবার শব্দ হইল, "কি অভিসন্ধি?"

মারওয়ান ও অলীদ উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন, অঙ্গ শিহরিয়া উঠল স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন।

আবার শব্দ, "হইল নিশীথ সময়ে রাজ শিবিরের দিকে কেন? সাবধান! আর অগ্রসর হইও না। যদি কোন আশা থাকে সূর্য উদয়ের পর।"

মারওয়ান ও অলীদ উভয়ে ফিরিলেন আর সে পথের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না কিছু দূর আসিয়া অন্য দিক শিবিরের অন্য দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। মারওয়ান বলিলেন, "অলীদ! আমাদেরই ভুল হইয়াছে এ দিকে না আসিয়া অন্য দিকে যাওয়া ভাল ছিল।

"অন্য কোন দিকে যাওয়া ভাল ছিল বলুন, সেই দিকেই যাই। ভুল সংশোধন করিতে কতক্ষণ লাগে? যে দিকে আপনার নিঃসন্দেহ বোধ হয় সেই দিকেই চলুন।"

মারওয়ান শিবিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে যাইতে মনে কোন সন্দেহ হইল না। পশ্চাতে সম্মুখে কি বামে কোন দিকেই আর ভারি ভারি বোধ হইল না। নিঃসন্দেহে যাইতে লাগিলেন।

অলীদ বলিলেন, "দেখিলে? গাজী রহমানের বন্দোবস্ত দেখিলে?"

"এ দিকে কি?"

"বোধ হয়, এ দিকের জন্য তত আবশ্যক মনে করেন নাই।"

"সে কি আর ভ্রম নয়?"

"মারওয়ান! এখন ও কথা মুখে আনিও না। গাজী রহমানের ভ্রম–এ কথা মুখে আনিও না। কার্যসিদ্ধ করিয়া নির্বিঘ্নে শিবিরে যাইয়া যাহা বলিবার বলিও। কোন দিকে কি কৌশল করিয়াছে, তাহা তাহারাই জানে।"

"তা জানুক, এদিকে কোন বাধা নাই, নিঃসন্দেহে যাইতেছি; মনে কোনরূপ শঙ্কা হইতেছে না।"

"আমি ভাই আমার কথা বলি। আমার মনে অনেক কথা উঠিয়াছে; ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব না। দুইজনে একত্রে সমান ভাবে যাইব। কেহই কাহার অগ্রপশ্চাৎ হইব না।

মারওয়ান হাসিয়া বলিলেন, "অলীদ, তুমি আজ মহাবীরের নাম হাসাইলে! অল্পমতি বালকগণের মনের সহিত পরিপক্ক মনের সমান ভাব দেখাইলে! বীর–হৃদয়ে ভয়! দুইজনে সমান ভাবে একত্র যাইতে পারিলেই নির্ভয়, এ কি কথা?"

"মারওয়ান! আমরা যে কার্যে বাহির হইয়াছি, সে কার্যের কথা মনে আছে? কার্যগতিকে সাহস, রুচিগতিকে বল। এখন তোমার মন্ত্রিত্ব নাই, আমার বীরত্ব নাই। যেমন কায্য, তেমনই স্বভাব।"

উভয়ে হাসি–রহস্যে একত্রে যাইতেছেন, প্রজ্বলিত দীপের প্রদীপ্ত আভায় শিবির দ্বারে মানুষের গতিবিধি স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। গমনের বেগ কিছু বেশি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসি রহস্য চলিতেছে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের হাসি মুখ বেশিক্ষণ রহিল না। দৈবাৎ একটি শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল দক্ষিণে বামে দৃষ্টি করিলেন, অন্ধকার সম্মুখে দীপালোক গমনে ক্ষান্ত হইলেন আবার সেই হৃদয়–কম্পনকারী শব্দ ক্ষিপ্তহস্ত নিক্ষিপ্ত তীরের শন্ শন্ শব্দ? অন্তরে জানিয়াছেন তীরের গতি, মুখে বলিতেছেন! কিসের শব্দ?

অলীদ ও কিসের শব্দ? কি বিপদ মুখের কথা মুখে থাকিতেই তিনটি লৌহশর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখন কি করিবেন অগ্রে পা ফেলিবেন কি পাছে সরিবেন কি স্থিরভাবে একস্থানে দন্ডায়মান থাকিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গম্ভীর নাদে শব্দ হইল শত্রু হও, মিত্র হও, ফিরিয়া যাও রাত্রে এ শিবিরে প্রবেশ নিষেধ রাত্রে আঘাত মহারাজের নিষিদ্ধ তাহাতেই প্রাণ বাঁচাইয়া দেলে; নতুবা ঐ স্থানেই ইহকালের মত পড়িয়া থাকিতে হইত।"

আর কোন কথা নাই। চতুর্দিকে নিঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে অলীদ বলিলেন, "মারওয়ান! এখন আর কথা কি? অঙ্গুলি-পরিমাণ ভূমি আগে যাইতে আর কি সাহস হয়?"

মারওয়ান মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওহে চুপ কর । প্রহরীরা আমাদের নিকটেই আছে।"

"নিকটে থাকিলে তো ধরিয়া ফেলিত।"

"ধরিবার তো কোন কথা নাই। তবে উহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত শিবির রক্ষা করিতেছে যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম তাহা ঘটিল না। এখন নিরাপদে শিবিরে যাইতে পারিলে রক্ষা।"

"সে কথা তো আমি আগেই বলিয়াছি। এখন লাভের মধ্যে প্রাণ লইয়া টানাটানি।"

মারওয়ান বলিলেন, "আর কথা বলিব না; চুপে চুপে নিঃশব্দে চলিয়া যাই।"

উভয়ে কিছু দূর আসিয়া "রক্ষা পাইলাম" বলিয়া দাঁড়াইলেন। চুপি চুপি কথা কহিতেও আর সাহস হইল না–পারিলেনও না। কণ্ঠতালু শুষ্ক, জিহ্বা একবারে নীরস, –তবুও বহু দূর সরিয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণকাল পরে একটু স্থির হইয়া মারওয়ান বলিলেন, "অলীদ বাচিলাম চল আমাদের শিবিরে যাই।"

মুখের কথা শেষ হইতেই পশ্চাৎ দিক হইতে বজ্রনাধে শব্দ হইল "সাবধান আর কথা বলিও না– চলিয়া যাও। ঐবৃক্ষ ঐ তোমার সম্মুখে ঐ উচ্চ খর্জ্জুর বৃক্ষ সীমা। আমাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যদি প্রাণ বাচাইতে চাও, সীমার বাহিরে যাও।"

কি করেন, উভয়ে দ্রুতপদে সীমা–বৃক্ষ ছাড়িয়া রক্ষা পাইলেন। আর কোন কথা শুনিলেন না। জীবনে এমন অপমান কখনও হয় নাই। কি লজ্জা!

মারওয়ান বলিলেন, "কি বিপদ! হানিফার প্রহরীরা কি প্রান্তরে চতুস্পার্শ্ব ঘিরিয়া রহিয়াছে? এখনও কিছুতেই মন সুস্থির হয় নাই: এখনও হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয় নাই। এখানে দাঁড়াইব না। এখনও সন্দেহ হইতেছে। আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য সীমা বৃক্ষ উহাদের। কি আশ্চর্য! সীমা-বৃক্ষ না ছাড়াইয়া আসিলে জীবন যায় কি ভয়ানক ব্যাপার চল শিবিরে যাই।

উভয়ে নীরবে আপন শিবিরাভিমুখে চলিলেন।যাইতে যাইতে সম্মুখে এক খন্ড বৃহৎশিলাখন্ড দেখিয়া মারওয়ান বলিলেন, "অলীদ এই শিলাখন্ডের উপরে একটু বসিয়া বিশ্রাম করি। নানা কারণে মন অস্থির হইয়াছে। আর কোন গোলাযোগ নাই। ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া মনের অস্থিরতা দূর করি। যেমন কার্যে আসিয়াছিলাম, তাহার প্রতিফল পাইলাম।

অলীদ মারওয়ানের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া শিলাখন্ডের চতুষ্পার্শ্ব একবার বেষ্টন করিয়া আসিলেন এবং নিঃসন্দেহভাবে উভয়েবসিয়া অস্ফুটস্বরে দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

এক কথার ইতি না হইতেই অন্য কথা তুলিলে কথার বাঁধুনী থাকে না; সমাজ বিশেষে অসভ্যতাও প্রকাশ পায়। জয়নাল আবেদীন বন্দীগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এমন সুযোগ পাই নাই যে তাহার বিবরণ পাঠকগনের গোচর করি। মারওয়ান এবং ওতবে অলীদ শিলাখন্ডের উপর বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনের কথা ভাঙ্গচুর করুন, এইা অবসরে আমরা জয়নালের কথাটা বলিয়া রাখি।

জয়নাল আবেদীন ওমর আলীর শূলের ঘোষণা শুনিয়া বন্দীগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ হইতে প্রহরীদলের সাবধানতায় নাগরিক দলে মিশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি নামে সকলের কাছে পরিচিত; কিন্তু অনেকেই তাহাকে চক্ষে দেখে নাই। মোহাম্মদ হানিফাকে তিনি কখনও দেখেন নাই, ওমর আলীকে দেখেন নাই অথচ ওমর আলীর প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন এই দুরাশার কুহকে মাতিয়াই দামেস্ক প্রান্তরে আসিয়াছিলেন। এজিদের শিবির, হানিফার শিবির ওমর আলী নিস্কৃতি সমুদয় দেখিয়াছেন, তাহার নিজের প্রাণবধ করার ঘোষণাও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। ঐ ঘোষণার পর তিলার্দ্ধকালও দামেস্ক- প্রান্তরে অবস্থিতি করেন নাই; নিকটস্থ এক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করিয়া দিবা অতিবাহিত করিয়াছেন। নিশীথ সময়ে পবর্ত-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার প্রথম চিন্তা -কি উপায়ে মোহাম্মদ হানিফার সহিত একত্রিত হইবেন। সে শিবিরে তাহার পরিচিত লোক কেহই নাই। নিজ মুখে নিজ পরিচয় দিয়া খাড়া হইতেও নিতান্ত অনিচ্ছা। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দুই এক পদ কারিয়া হানিফার শিবিরাভিমুখেই যাইতেছেন।

অলীদ বলিলেন, -"মারওয়ান! কিছু শুনিতে পাইতেছ?"

স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু মানুষের গতিবিধির ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। একজন দুইজন নহে, বহু লোকের সাবধান পদবিক্ষেপ শব্দ অনুভব হইতেছে। আর এখানে থাকা নহে। বোধ হয় বিপক্ষেরা আমাদের পরিচয় পাইয়াছে, এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই। ঐ দেখ, সম্মুখে চাহিয়া দেখ। আমরা ছদ্মবেশে আসিয়াছি, কেবল তোমার নিকট একখানি তরবারি আর আমার নিকট সামান্য একখানি ছুরি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নাই। আর থাকিলেই বা কি হইবে? তাহাদের তীরের মুখ হইতে দিনে রক্ষা পাওয়াই দায় তায় আবার ঘোর নিশা। মনঃসংযোগে কান পাতিয়া শোন, যেন চুতর্দিকেই লোকের গতিবিধি, চলাফেরা, সাড়া পাওয়া যাইতেছে। চল, এখানে থাকা বিধেয় নহে।" এই বলিয়া শিলাখন্ড হইতে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া সমতল-ক্ষেত্রে দন্ডায়মান হইলেন।

জয়নাল আবেদীনও নিকটবর্তী হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

মারওয়ান থতমত খাইয়া সভয়-হৃদয়ে উত্তর করিলেন, "আমরা পথিক, পথহারা হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

"নিশীথ সময়ে পথিক পথহারা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে! এ কি কথা?"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে পথিক! তোমরা কি বিদেশী?"

"হাঁ আমরা বিদেশী।"
"কি আশ্চর্য! তোমরা বিদেশী হইয়া এই মহা সংগ্রামস্থলে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? সত্য বল, কোন চিন্তা নাই।"
মারওয়ান বলিলেন, "যথার্থ বলিতেছি, আমরা বিদেশী, অজানা দেশ, পথ-ঘাটের, ভাল পরিচয় নাই-চিনি না। দামেস্ক নগরে চাকরির আশায় যাইতেছি। দিবসে সৈন্য-সামন্তের ভয়; রাত্রেই নগরে প্রবেশ করিব, আশা করিয়াছি।"
"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাদের বসতি কোথায়?"
"আমরা মদিনা হইতে আসিয়াছি। মদিনাই আমাদের বাসস্থান।"
ভীমনাদে শিলারাশির পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল, "ওরে ছদ্মবেশী নিশাচর! মদিনাবাসীরা দামেস্কে চাকরির আশায় আসিয়াছে? আর কোথায় যাইবি? এই স্থানে নিশা যাপন কর। প্রভাতে পরীক্ষার পর মুক্তি। এক পদও আর অগ্রসর হইতে পারিবি না। যদি চক্ষের জ্যোতিঃ থাকে, দৃষ্টির ক্ষমতা থাকে তবে যে দিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ; পঞ্চবিংশতি বর্শার ফলক তোমাদের বক্ষ, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। সাবধান, কোন কথার প্রসঙ্গ করিও না, নীরবে তিন মূর্তি প্রভাত পর্যন্ত এই স্থানে দন্ডায়মান থাক। আর যাইবার সাধ্য নাই। মোহাম্মদ হানিফার গুপ্ত সৈন্য দ্বারা তোমরা তিনজন সূর্যোদয় পর্যন্ত বন্দী।"

অষ্টাবিংশ প্রবাহ

রাজার দক্ষিণ হস্ত মন্ত্রী,-বুদ্ধি-বল মন্ত্রী! মন্ত্রিপ্রবর গাজী রহমানের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই, একথা সপ্তবিংশতি প্রবাহের প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে। গাজী রহমান এক্ষণে মহাব্যস্ত। নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গুপ্তচরেরা এ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। আজিকার সংবাদ দামেস্ক নগরের সংবাদ এজিদ শিবিরের নতুন সংবাদ এ পর্যন্ত কোনসংবাদই প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় দিনে শিবির আক্রমণের উদ্যোগে জয়নাল আবেদীনের প্রাণবধ হইতে বিরত হইল, ইহাতে কি কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে? আজ হউক, কাল হউক, শিবির আক্রমণ হইবেই হইবে, সে ভয়ে জয়নালের প্রাণবধে ক্ষান্ত হইবে কেন?"
দূরদর্শী মন্ত্রী উপরোক্ত আলোচনায় চিন্তার বেগ বিস্তার করিয়াছেন। নগর, প্রান্তর, শিবির বন্দীগৃহ যুদ্ধক্ষেত্র সৈনিকদল শূলদন্ড এজিদ মারওয়ান সকলের বিষয় এক একবার আলোচনা করিতেছেন। আবার মনে উঠিল জয়নাল বধে ক্ষান্ত থাকিবে কেন? মারওয়ানের কূটবুদ্ধির সীমা বহুদূরব্যাপী। নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন কেহ শিবিরে ফিরিতেছে না, ইহারই বা কারণ কি? আর যে দুইটি ছদ্মবেশীর কথা শুনিলাম, তাহারা শিবিরের দিকে আসিতেছিল, প্রহরীদিগের সতর্কতায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও শিবিরের বর্হিভাগ রেখার নিকটে আসা দূরে থাকুক, সহস্র হস্ত ব্যবদান হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ইহারাই বা কে? বিশেষ গোপনভাবে চারিদিকে শেষ পঞ্চবিংশতি আম্বাজী সৈন্যকেও পাঠাইয়াছি। তাহারাই বা কি করিল? মন্ত্রিপ্রবর এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শিবির অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় দ্বার পর্যন্ত

আসিয়া সর্বপ্রধান দ্বারী মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ।"

মালিক বলিলেন, "আমি এ পর্যন্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।"

মন্ত্রিবর মৃদুমন্দপদে চতুর্থ দ্বার পর্যন্ত যাইয়া সাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন সংবাদ নাই?"

সাদ জোড়করে বলিলেন, "আমি, যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া জানাই নাই।"

"কি সংবাদ?"

"শিবির বর্হিদ্বারে চন্দ্ররেখা পর্যন্ত শাহবাজের পাহারায় আছে। তাহার কিছু দূরে সীমা-নির্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষ। সেই কিঞ্চিৎ দূরে স্তুপাকার শিলাখন্ডোপরি সেই দুইটি লোক অস্ফুটস্বরে কি আলাপ করিতেছিল। অনুমানে বোধ হয় তাহারা কোনরূপ দূরভিসন্ধিতেই আসিয়াছিল।

মন্ত্রিবর আরও চিন্তিত হইলেন ক্রমে শিবিরের বর্হিদ্বার পর্যন্ত যাইয়া দাড়াইতেই সুদক্ষ প্রহরী আব্দুল কাদের করজোড়ে বলিল, "শিলাসমষ্টির নিকটে যে দুই জন ছদ্মবেশী বসিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে আর একজন আসিয়া মিশিয়াছে। এ সকল সংবাদে কোন বিশেষ সারত্ব নাই বলিয়া চরেরা পুনরায় গিয়াছে।"

উভয়ে এই কথা হইতেছে, ইতিমধ্যে দামেস্ক- নগরে প্রেরিত গুপ্তচর দ্বারে প্রবেশ করিতেই মন্ত্রিবরকে দেখিয়া নতশিরে অভিবাদনপূর্বক বলিল, "আজ বড় ভয়ানক সংবাদ আনিতে হইয়াছে। জয়নাল আবেদীন বন্দীগৃহে নাই। এজিদের আজ্ঞায় মারওয়ান জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে দামেস্ক নগরে ঘরে ঘরে এজিদের সন্ধানী লোক ফিরিতেছে; রাজপথ, গুপ্ত পথ দীন দরিদ্রের কুটীর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। জয়নাল আবেদীন কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

এ সংবাদ শুনিয়া গাজী রহমান একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন। বহু চিন্তার পর সাব্যস্ত হইল, জয়নাল আবেদীন নগর হইতে বাহির হইয়াছেন, সংবাদে মন্ত্রিপ্রবরের মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মজ্জা চিন্তাশক্তির অপরিসীম বেগে অধিকতর আলোড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্মবিন্দুতে ললাট পরিশোভিত হইল।

একজন গুপ্তচর আসিয়া সেই সময় বলিতে লাগিল,"নিশাচরদ্বয় শিলাখন্ডে বসিয়া আলাপ করিতেছিল, কোন কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল না। কেবল 'মদিনা' চলুন 'ফিরিয়া যাই' এই তিনটি কথা বুঝা গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আর একজন লোক হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হইলেই উহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, "আমরা পথিক।" পুনরায় প্রশ্ন "পথিক এ পথে কেন?" উত্তর পথ ভুলিয়া।" আবার প্রশ্ন কোথায় যাইবে?" উত্তর দামেস্ক নগরে। কি আশা চাকুরী। বসতি কোথায়?" মদিনা। চতুর্দিক হইতে শব্দ হইল, আর কোথায় যাইবি? মদিনার লোক চাকুরির জন্য দামেস্কে! আম্বাজী গুপ্ত সৈন্যগণ বর্শাহস্তে তিনজনকেই ঘিরিয়া ফেলিল; পঞ্চবিংশতি বর্শা- ফলক তাহাদের বক্ষ এবং পৃষ্ঠে উত্থিত হইয়া তিন জনকেই বন্দী করিল। প্রভাতে পরিচয়- পরীক্ষার পর মুক্তি।

মন্ত্রির এই সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া আদেশ করিলেন, এখনই আরও শত বর্শাধারী সৈন্য লইয়া যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ঐ বন্দী তিনজনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আনিয়া তিন স্থানে আবদ্ধ কর। সাবধান কাহারও সহিত যেন কেহ আর কোন কথা না কহিতে পারে,- দেখা না করিতে পারে। বন্দীগণ প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা বা অপমানসূচক কোন কথা কেহ যেন প্রয়োগ না করে। সাবধান আর তোমরা কেহ দামেস্ক নগরে যাও কেহ কেহ এজিদ শিবিরের নিকটও সন্ধান কর। নিকটবর্তী পর্বত, বন, উপবন, যেখানে মানুষের গতিবিধি যাওয়া আসা সম্ভব মনে কর, সেইখানেই সন্ধান করিবে। আর সতর্ক হইয়া সর্বদা মনে রাখিয়া দেখিও যে, কেহ কাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া যায় কি না। যদি ধরিয়া লয়, তাহার অনুসরণে যাইবে-দুই এক জন আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিবে, নিশা অবসানের সহিত আমি ইহার সংবাদ তোমাদের নিকট চাই। চরগণ আজিই তোমাদের পরিশ্রমের শেষ দিন! আজিকার পরিশ্রমই যথার্থ পরিশ্রম। প্রভুর উপকার ও সাহায্যের জন্য প্রাণপণে সন্ধান লইবে-প্রত্যুষে পুরস্কার। আমি তোমদের আগমন-প্রতীক্ষায় জাগরিত রহিলাম।"

গুপ্ত চরগণ মন্ত্রিবরের পদচুম্বন করিয়া স্ব স্ব গন্তব্যপথে যথেচ্ছা চলিয়া গেল। মন্ত্রিবর চক্ষের পলক ফিরাইতে অবসর পাইলেন না, কে কোথায় কোন পথে চলিয়া গেল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া আর একটা আজ্ঞা প্রচার করিলেন,-নিশাবসানের পূর্বে এজিদ শিবিরের নিকট ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ঘোষণা করিবে, তিনটি লোক আমাদের হাতে বন্দীঃ যদি তোমাদের শিবিরস্থ কেহ হয়, তবে সূর্যোদয়ের পর চাহিয়া পাঠাইলেই ছাড়িয়া দিব। মন্ত্রিবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বহির্দ্বার চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ

মদ্যপায়ীর সুখে-দুঃখে সমান ভাব। সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন। মনকে প্রফুল্ল করিতে, মনো দুঃখ দূর করিতে, মনে কিছুই নাই অর্থাৎ কালি নাই, বালি নাই ময়লা নাই, একবারে সাদা সে সময়ও মদের প্রয়োজন। গগনে শুকতারা দেখা দিয়াছে প্রভাত নিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম নাই। ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছেন, উদরে ঢালিতেছেন। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না এবং আনন্দও জন্মে না-মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐ কথা ঐ ওমর আলীর নিস্কৃতির কথা জয়নালের নিরুদ্দেশের কথা মধ্যে মধ্যে আবদুল্লাহ জেয়াদের খন্ডিত শিরের কথা মনে পড়িতেছে, পেয়ালা চলিতেছে। ক্রমেই চিন্তার বেগ বৃদ্ধি, পূর্ব-কথা স্মরণ। প্রথম সূচনা পরে অনুতাপের সহিত চক্ষুর জল। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হইল। এজিদ পাত্র হস্তে করিয়া একটু চিন্তার পর উদরে ঢালিলেন জ্বলন্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মনের গতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইল, মুখে কথা ফুটিল। কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাহিলাম হায়! হায়! সেই একদিন আর আজ একদিন! কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কি না ঘটিল! কত প্রাণ ছিঃ! ছিঃ! কত প্রাণ বিনাশ হইল। উহু কি কথা মনে পড়িল! সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল। আমি সীমার রত্ন হারাইয়াছি, অকপট মিত্র জেয়াদ ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন মারওয়ান, ওতবে অলীদ, ওমর এই তিন রত্ন জীবিত; কিন্তু শত্রুমুখে বক্ষবিস্তারে দাঁড়ায় কে? ওমর বৃদ্ধ,

মারওয়ান বাকচাতুরীতে পটু বুদ্ধি চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্র-চালনায় একেবারে গন্ডমূর্খ। বল ভরসা একমাত্র ওতবে অলীদ। অলীদেরও পূর্বের ন্যায় বল-বিক্রম নাই মসহাব কাক্কার নামে কম্পমান। কাক্কার নাম শুনিলে সে কি আর যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের? কার জন্য যুদ্ধ? এ যুদ্ধ করে কে? কি কারণে যুদ্ধ? জয়নাল আবেদীন কোথা -এ কথার উত্তর কি?"

আর এক পাত্র লইলেন। আবার কোন চিন্তায় মজিলেন, কে বলিবে? মুখে কথা নাই নীরব। অগ্নির দাহনকারিতা, জলের শীতলত্ব প্রস্তরের কাঠিন্য আর মদের মাদকতা কোথায় যাইবে? আবার সাধ্যাতীত হইলেও সুরা মহাবিষ।

মায়মুনা জাএদার অঙ্গীকারপূর্ণ পর্বোপলক্ষে পাঠকগণ এজিদের সুরাপান দেখিয়াছেন। সে সময়ে এজিদের চক্ষে জল পরিয়াছিল, এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। বিশাল বিস্ফোরিত যুগল চক্ষে এখন আর জল নাই। কিছু যে না আছে তাহা নহে; তরলতার বেশি প্রভেদ বোধ হয় নাও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ণে একেবারে বিপরীত টকটকে লাল জবাফুল পরাস্ত। তাহাতেই বলিতেছি, এজিদের চক্ষে জলনাই। যদি পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এই ক্ষণ কিছু পড়িবার থাকে, তবে কি পড়িবে? সে রক্তজবা সদৃশ লাল চক্ষু হইতে এই ক্ষণে কি পড়িবে? না না না, সে জল নহে! যে দুই এক ফোঁটা পড়িবে, সে দুই এক ফোঁটা জল নহে জল হইবার কথা নহে। মর্মাঘাতের আহত স্থানের বিকৃত শোণিতধার মর্মাঘাতে ক্ষতস্থানের রক্তের ধার দুই চক্ষু ফাটিয়া পড়িবে! জগৎ দেখিবে, এজিদের চক্ষে জল পড়ে নাই। এজিদও দেখিবে, তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হয় নাই-সে বিশাল নেত্রযুগল হইতে আজ জলধারা প্রবাহিত হয় নাই। হৃদয়ের বিকৃত শোণিতধার চক্ষুদ্বার-বহির্গত হইয়া সে পাপ তাপ অংশের তেজ সকিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস বোধ জন্মাইবার জন্যই বোধ হয়, যদি পড়িতে হয় দুই এক ফোঁটা পড়িবে। বিশাল বিস্ফোরিত চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু তারা লোহিত সাগরে হাবুডুবু খেলিতেছে। আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুর-প্রিয় অনন্তসুধা মূর্খ হস্তে পড়িয়া মহাবিষে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আবার পেয়ালা পূর্ণ হইল। চক্ষের পলকে চক্ষুদ্বয় আরও লোহিত হইল। মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী পদদ্বয় বেঠিক। মানসিক ভাব বিলীন, পশুভাব জাগ্রত। বাকশক্তি বৃদ্ধি কিন্তু অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতভাবেই পূর্ণ মনে মুখে এক।

এজিদ বলিতেছেন-সুরাপূর্ণ পেয়ালা হস্তে করিয়া বারবার পেয়ালার দিকে চাহিতেছেন আর বলিতেছেন, "এ স্বর্গীয় সুরা ধরাধামে কে আনিল? এ যন্ত্রণানিবারক আর মনোদুঃখাপহারক, মনস্তাপবিনাশক, প্রেমভাব-উত্তেজক, ভ্রাতৃভাব-সংস্থাপক, ষড়রিপু-সংহারক, নবরস-উদ্দীপক, দেহকান্তি-পরিবর্দ্ধক, কণ্ঠস্বর প্রকাশক, এই নবগুণবিশিষ্ট অমৃত ধরাধামে কে আনিল? মরি! মরি! আহা মরি মরি! এ স্বর্গীয় অমৃত ধরাধামে কে আনিল? অহো করুণা! অহো দয়া! কথা বলিব? মনের কথা বলিব, সত্য কথা বলিব?"

পরিপূর্ণ পাত্র আবার মুখে উঠিল, গলধঃ হইল, জ্বলিতে জ্বলিতে পাকযন্ত্র পর্যন্ত ধাইল, তখনই শেষ-পাত্রের শেষ। এজিদ মত্ততায় অধীর হইয়া মনের কপাট খুলিয়া দিয়াছেন, অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া দশজনকে শুনাইতেছেন। "আজ উচিত পথে চলিব।

সীমার মরিয়াছে, ভালই হইয়াছে। বেশ হইয়াছে, (হস্তের উপর হস্ত সজোরে আঘাত করিয়া) বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হোসেন আমার শত্রু (তেজের সহিত) তা'র কি? সীমারের কি? রে পাষন্ড সীমার! তোর কি? তুই তাহার মাথা কাটিলি কেন? সে ব্যক্তি টাকার লোভে মানুষের মাথা কাটে তা'র ঘাড়ে কি মাথা থাকিবে? (পেয়ালার প্রতি চাহিয়া) তার মাথা কাটা পড়িবে না।? জেয়াদ গিয়াছে, মন্দ কি? বিশ্বাসঘাতকের ঐরূপ শাস্তি হওয়াই উচিত, যেমন কর্ম তেমনি ফল। আগে করছ পাছে ভুগেছে শেষে জাহান্নামে গিয়াছে। এজিদের কি? বাহাদুরী করিয়া শত্রুর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলে কেন? সে হাতে মরণ নাই সেই পরম সৌভাগ্য। ও যে বাহরাম নয়, হানিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা–আক্কেল আলী! আবার পাত্র (নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) সৈন্যদলের কথা– কিছুই নাহে। বেতনভোগী চাকর, টাকা দিয়াছি, জীবন লইয়াছি। এজিদের জন্যই আমার মরণ– কেন জয়নাবকে এজিদ চক্ষু তুলিয়া দেখিল? কেন আব্দুল জব্বারকে প্রতারণা করিল? কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল? কেন নিরপরাধ মোসলেমকে হত্যা করিল? কেন হাসানকে বিষপান করাইল? যে আমায় ভালবাসিল না, এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন? স্ত্রী হস্তে স্বামী বধ। মানিলাম, এজিদের মনে ইহকাল ও পরকালে আগুন জ্বালাইয়া হাসান জয়নাব লাভ করিয়াছিল। হাসান মরিয়া গেল এজিদের মনের আগুন জ্বলিতে থাকিল। জ্বলুক, আরও পুড়ুক জ্বলুক, শাস্তিভোগ করুক কিন্তু হোসেন কে? নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিল, যত্নে রাখিয়াছিল। ছি! ছি! তাহারই জন্য সমর! ছি! ছি! তাহারই জন্য কারাবালায় রক্তপাত। তাহাতেই বা কি হইল? দামেস্ক নগরে আনিয়া বন্দীভাবে রাখিয়া ও ঐ কথা! কি হইল? তাহাতেই বা কি হইল? জয়নাব সেইপ্রথম দর্শনেই এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল, আজও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকে–লাভের মধ্যে বেশির ভাগ ঘৃণা। থাক ও কথা থাক। হানিফার অপরাধ? আমি তাহার মাথা কাটিতে চাহি কেন? তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাই আর একটি কথা বড় মূল্যবান এজিদের বন্দীগৃহে জয়নাল আবেদীন নাই। থাকবে কেন? সে সিংহশাবক শৃগালের কুটীরে থাকিবে কেন? সে বীরের পুত্র বীর তীর না ছুড়িয়া থাকিবে ে কন?"

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিয়া করজোড়ে বলিলেন, "বাদশাহ নামদার! প্রহরীগণ বলিতেছে, নিশীথ সময়ে প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ওতবে অলীদ ছদ্মবেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তাহারা এখনও শিবিরে আসিলেন না। সন্ধানী অনুচরেরাও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয় তাহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।

এজিদ প্রসন্নমুখে জড়িত রসনায় আরক্তিম লোচনে বলিলেন, "পরকে উঃপরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন্ আপনিও তো সেনাপতি। বলুন তো, ছল–চাতুরী করিয়া কে কয় দিন বাঁচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয় একথা নিশ্চয় যে, তেজশূন্য শরীর বলশূন্য বাহু সাহসশূন্য বক্ষবুদ্ধি শূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় শত্রুগৃহে প্রবেশ করে এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্যোদ্ধারের পথ দেখে। ওমর ভয় কি? কোন চিন্তা করিও না। নিশার শেষ, যুদ্ধেরও শেষ আশারও শেষ। আর যাহার যাহার শেষ তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া

দামেস্করাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন না। বিন্দু পরিমাণ শোণিত থাকিতে দামেস্করাজ নিরাশ হইবেন না। মারওয়ান মারা গিয়াছে ক্ষতি কি? তুমিও সেনাপতি। যদি মারওয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে ভালই; উভয়েই সেনাপতি উভয়েই মন্ত্রী। যুদ্ধনিশান উড়াইয়া দাও রণবাদ্য বাজিতে থাকুক মারওয়ান ও অলীদ শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর তুমি নামে মাত্র সেনাপতি আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন; চিন্তা কি?"

অকস্মাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদ শিবিরে যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা শুনিল, ভেরী বাজাইয়া বলিতেছে, শিবির রক্ষকদের কৌশলে আজ নিশীথ সময়ে তিনজন লোক ধৃত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে নজরবন্দী মতে কয়েদ আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, যাহা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।" শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন।"আমাদের তো কেহই নহে? আমাদের শিবিরের তো কোন প্রভু নহে? এইরূপ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ মহামতিও স্বকর্ণে ঘোষণা শুনিলেন।

ওমর বলিলেন, "মহারাজ, অনুমানে কি বুঝা যায়?"

"তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আর ওতবে অলীদ।"

"তবে তিন জনের কথা কেন?"

"বোধ হয়, মন্ত্রিবরের সহিত কোন সেনা গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের অন্য কেহ হইবে। কি চমৎকার বুদ্ধি! হানিফার নিকট আমি ভিক্ষা করিব? ধিক এজিদের অমন সহস্র মারওয়ান বন্দী হইলেও এজিদ কাহারও নিকট ভিক্ষা করিবে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্রধারণ করিতে বিলম্ব। ওমর তুমি সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া এক শ্রেণীতে সমুদয় সৈন্য দন্ডায়মান করিয়া দাও। আজ হানিফার প্রাণবধ না করিয়া ছাড়িব না।এখনই যুদ্ধনিশান উড়াইয়া রণভেরী সাজাইয়া দাও।"

ওমর অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। "কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব" এই বলিয়া এজিদ ওমরকে বিদায় করিলেন কিন্তু সুরার মোহিনীশক্তিতে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিল। সুরে আজ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া দুর্নামের ভাগী হইলে, কুখ্যাতি ধ্বজা উড়াইয়া দিলে, অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া ভদ্র সমাজে অস্পৃশ্য হইলে দশবার বলিব, তোমারই কল্যাণে তোমারই কুহকে মহারাজ এজিদ যুদ্ধসাজে সজ্জিত না হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। যুদ্ধের আয়োজনই বা কি চমৎকার সুরে তোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই দশা তুমি দূর হও বীরের অন্ত হইতে দূর হও জগতের মঙ্গলাকাংখীর হৃদয় হইতে দূর হও সমাজের হিতাকাংখীর চিত্ত হইতে দূর হও–সংসারীর নয়ন পথ হইতে দূর হও দূর হও তুমি দূর হও জগৎ হইতে দূর হও।

ত্রিংশ প্রবাহ

তমোময়ী নিশা কাহাকে হাসাইয়া, কাহাকে কাদাইয়া, কাহারও সর্বনাশ করিয়া যাইবার সময় স্বাভাবিক হাসিটুকু হাসিয়া চলিয়া গেল। মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে ঈশ্বর উপাসনার ধূম পড়িয়া গেল। নিশার গমন দিবাকরের আগমন সেই সংযোগে বা শুভসন্ধি সময়ে সকলের মুখেই ঈশ্বরের নাম সেই অদ্বিতীয় দয়াল প্রভুর নাম নূরনবী মোহাম্মদের

নাম সহস্র প্রকারে সহস্র মুখে। নিশার ঘটনা নিশারবসান না হইতে গাজী রহমান প্রধান প্রধান যোধ ও মোহাম্মদ হানিফার নিকট আদ্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। সকলেই বন্দীগণকে দেখিতে সমুৎসুক।

আজ প্রত্যুষেই দরবার আড়ম্বরশূন্য। রাজদরবারে, –সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাবে ভ্রাতৃ ব্যবহারে পদগৌরবে কেহই গৌরবান্বিত নহেন–সকলেই ভাই, সকলেই আত্মীয়, সকলেই সমান্ ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিলেন। মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা এবং প্রধান প্রধান সৈন্যধ্যক্ষ সকলেই আসিয়া সভায় যোগ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে এক জন বন্দী সৈন্যবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইল।

গাজী রহমান গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আপনি যেই হউন, মিথ্যা কথা বলিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন না, এই আমার প্রার্থনা।"

বন্দী বলিলেন, "আমি মিথ্যা বলিব না।"

সুখী হইলাম। আপনি কোন ধর্মে দীক্ষিত?

আমি পৌত্তলিক।

আপনার ধর্মে অবশ্যই আপনার বিশ্বাস আছে?

বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম কি?

মিথ্যা কথা কহা যে মহাপাপ সকল ধর্মই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বলুন তো কি উদ্দেশ্যে নিশীথ সময়ে এ শিবিরের দিকে আসিতেছিলেন।

"সন্ধান লইতে!"

"শত্রু–শিবিরে যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই–ই লাভ।"

"আপনি কি এজিদ পক্ষীয়?"

"আমি দামেস্ক মহারাজের সেনাপতি! আমার নাম ওতবে অলীদ।"

"ভাল কথা, কিন্তু আমার"–

"আর বলিতে হইবে না। আমি বুঝিয়াছি আপনার সন্দেহ এখনই দূর করিতেছি। আমরা ছদ্মবেশী হইয়া আছিয়াছিলাম, এই দেখুন উপরিস্থ এ বসন কৃত্রিম।"

ওতবে অলীদ কৃত্রিম বসন পরিত্যাগ করিলেন। কারুকার্যে–খচিত সৈন্যাধ্যক্ষের বেশ–দোলায়মান অসি বাহির হইল। সভাস্থ সকলে সিথরচক্ষে অলীদের আপদমস্তক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

গাজী রহমান পুনরায় বলেন, "আপনি আমাদের মাননীয়। আপনার নাম আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। আপনার অনেক বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি। আপনি অতি মহৎ। সেই মহৎ নাম যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার মত কার্য করিবেন।"

"বলুন! আমি যখন বন্দী, আমার জীবন আপনাদের হস্তে; এ অবস্থায় আমার কি নিজের ক্ষমতা আছে যে, তদ্দারা আমি আমার মহত্ত্ব রক্ষা করিব? অলীদ এখন আপনাদের আজ্ঞানুবর্তী, আপনাদের দাস।"

"যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনই দেখিলাম আপনার জীবন যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, আর কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর আপনার সেই মহত্ত্ব, সেই মান সম্ভ্রম, জীবন সকলই রক্ষা করিবেন। আপনি আমাদের সকলের পূজনীয়।

"আমিও ভ্রাতৃভাবে পরাভব স্বীকারে এই তরবারি রাখিলাম। এ জীবনে আপনাদের বিনা অনুমতিতে এ হস্তে আর অস্ত্র ধরিব না, এই রাখিলাম।"

অলীদ গাজী রহমানের সম্মুখে অস্ত্র রাখিয়া দিলে গাজী রহমান বিশেষ আগ্রহে ওতবে অলীদকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গীদ্বয়ের পরিচয় কি?"

"দুইজনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গী, অপর একজনকে আমি চিনি না। যিনি আমার সঙ্গী, তাহার পরিচয় তিনিই দেবেন। যদি তাহার কোন কথায় সন্দেহ হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি যাহা জানি অবশ্যই বলিব।"

গাজী রহমানের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বন্দী (মারওয়ান) প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সভামন্ডপে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলের চক্ষু দ্বিতীয় বন্দীর প্রতি, বন্দীর চক্ষুও সকলের প্রতি। বন্দী সকলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শান্তভাব; রোষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার চিহ্নের নাম মাত্র সভায় নাই। পদমর্যাদার গৌরব, ক্ষমতার ন্যূনধিক্য, পরিচ্ছেদের জাঁকজমক, উপবেশনের ভেদাভেদ কিছুমাত্র সভায় নাই। সকলেই এক, সকলেই সমান, সকলেই ভ্রাতা। ভ্রাতৃভাব মূলমন্ত্রে ইহারই যেন যথার্থ দীক্ষিত। দেখিলেন, সভাস্থ প্রায়ই তাঁহার অপরিচিত। ক্রমে সকলের চক্ষুর সহিত তাঁহার চক্ষুর মিলন হইল। আক্কেল আলীর (বাহরাম) প্রতি চক্ষু পরিতেই রোষের সহিত ঘৃণা, উভয়ে একত্র মিশাইয়া চক্ষুকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাহারই প্রিয় সহচর অলীদ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া হানিফার দলে মিশিয়াছেন।

মারওয়ান মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কি কথা! বেশ পরিত্যাগ-দলে আদৃত অস্ত্র সভাতলে! এ কি কথা!"

অলীদের প্রতি বারবার চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরবরে বিশাল চক্ষু অন্য দিকে,-সে চক্ষু মারওয়ানের মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। মারওয়ান কি করিবেন, কোন উপায় নাই; যে দিকে দৃষ্টি করেন, সেই দিকেই সহস্র প্রহরী সেই দিকেই সহস্র শাণিত অস্ত্রের চাকচিক্য।

মনে মনে বলিলেন,"তবে কি আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না? তবে কি আর মহারাজের সহিত দেখা হইল না? হায়! হায়! তবে কি দামেস্কের স্বাধীনতা-"

মারওয়ানের মনের কথা শেষ না হইতেই গাজী রহমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কোন ধর্মাবলম্বী?"

"ধর্মের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন এমন কিছু নহে, তবে মোহাম্মদীয় হইলে আপনি অবাধ্য, সহস্র প্রকারে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও আপনি ভ্রাতা-এক প্রাণ এক আত্মা-এক হৃদয়।"

"আমি মুহম্মদের শিষ্য।"

মিথ্যা কথায় কি পাপ, তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নাই; ধর্মমাত্রই মিথ্যার বিরোধী।"

"বিরোধী বটে, কিন্তু প্রানরক্ষার জন্য বিধিও আছে।"

"তবে কি আপনি প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিবেন?"

"আমি মিথ্যা বলিব না। বিধি আছে তাহাই বলিলাম।"

"বলুন আপনি কে? আর কি কারণে রাত্রে এ শিবিরে আসিতেছিলেন।"
"আমি পথিক, চাকুরীর আশায় আপনাদের নিকট আসিতেছিলাম।"
"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"
"আমি মস্কাট হইতে আসিতেছি।"
"আপনার সঙ্গী কেহ নাই, আমি তাহাদিগকে চিনি না।"
"এ কি কথা! অলীদ মহামতি কি মিথ্যা বলিয়াছেন?"
"প্রাণ বাঁচাইতে কে না মিথ্যা বলিয়া থাকে। আমি অলীদকে চিনি না। আমার পূর্বে যদি কেহ কোন কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য, এ কথা আপনাকে কে বলিল? এ বিশ্বাস আপনার কিসে জন্মিল?"
"কিসে যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, সে কথা শুনিয়া আপনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। এখনই আপনাকে সত্য-মিথ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারি কিন্তু তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া কিছুই বলিব না। অনর্থক আমাদের অস্থির মনকে ভ্রমপথে লইয়া যাইবেন না।"
"আমি ভ্রমপথে লইতেছি না। আপনারা নিজে ভ্রমকূপে পড়িয়াছেন।"
"সে সত্য, কিন্তু একটি মিথ্যাকে সত্য করিয়া পরিচয় দিতে সাতটি মিথ্যার প্রয়োজন। তাহাতেও শ্রোতার মনের সন্দেহ দূর হয় কি না সন্দেহ্ আপনার পরিচয় জানিতে আমাদের বেশি আয়াস আবশ্যক করিবে না; তবে তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া আপনাকে আর কিছুই বলিব না; কিন্তু আপনার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে।"
এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই প্রহরীগণ কঠিন বন্ধনে মারওয়ানের হস্তদ্বয় তখনই বন্ধন করিল। গাজী রহমান পুনরায় বলিলেন,"তৃতীয় বন্দীকে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া আনিবে, ক্রমেই সন্দেহের কারণ হইতেছে।"
সভা- মধ্য হইতে ওমর আলী বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিবর! বন্দীর আকার-প্রকারে কথার স্বরে আমি চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু বেশের পরিবর্তনের একটু সন্দেহ হইয়াছে মাত্র। বন্দীর গাত্রের বসন উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করুন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই বন্দী এজিদের প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান। কাল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে, হাসি তামাসা করিতেও বাকী রাখি নাই।"
গাজী রহমানের ইঙ্গিতে প্রহরীগণ মারওয়ানের সেই ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতেই মহামূল্য মণিমুক্ত-খচিত বেশের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। ওমর আলী আক্কেল আলী (বাহরাম) প্রভৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে মারওয়ানকে চিনিতেন, তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,"মারওয়ান! এই সেই মারওয়ান!"
গাজী রহমান বলিলেন, "কি ঘৃনার কথা! সর্বশ্রেষ্ঠ সচিবের এই দশা! মারওয়ানের মন এত নীচ, বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিবেন না। দেখি, তৃতীয় বন্দীর সত্যবাদিতা এবং এই মারওয়ান সম্বন্ধে তিনিই বা কি জানেন। এক্ষণে ইহাকে সভার এক প্রান্তে বিশেষ সতর্কভাবে রাখিতে হইবে।"
মন্ত্রিবরের আদেশে মারওয়ান বন্ধন-দশায় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া সভার এক প্রান্তে রহিলেন।

এদিকে তৃতীয় বন্দী সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিলেন না। প্রহরীগণ যে দিকে লইয়া চলিল, তিনি সেই দিকে ঈশ্বরের নাম লইয়া চলিলেন। প্রহরীগণ তাহাকে গাজী রহমানের সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীনকে দেখিয়া দরবারের যাবতীয় লোকের মনে যে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সে ভাবের কথা কে বলিবে? সে কথা কে মুখে আনিবে? শত্রু জন্য মন আকুল, এ কথা কে বলিবে? সকলে মনেই ঐ ভাব–ঐ স্নেহপূর্ণ পবিত্রভাব কিন্তু মনের কথা মন খুলিয়া বলিতে কেহই সাহসী হইলেন না্ মোহাম্মদ হানিফা জয়নালের মুখাকৃতি স্থির- নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কত কথা তাহার মনে উদয় হইল। বন্দীর মুখাকৃতি, শরীরের গঠন দেখিয়া ভ্রাতৃবর হোসেনের কথা মনে পড়িল। জয়নাল নাম হৃদয়ে জ্বলন্তভাবে জাগিতে লাগিল।

গাজী রহমান বিশেষ ভদ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনার পরিচয় দিয়া আমাদের মনের ভ্রান্তি দূর করুন।"

জয়নাল আবেদীন সভাস্থ সকলকে অভিবাদন করিয়া বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, " আমার পরিচয়–জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমার প্রার্থনা যে, আর দুই জন যাঁহারা আমার সঙ্গে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুন।"

গাজী রহমান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বন্দীদ্বয় এই সভা মধ্যেই আছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে।"

"আমার প্রয়োজন অনেক। তবে গত রাত্রে আমার সহিত যখন তাহাদের দেখা হয়, তখন এক জনকে আমি বিশেষরূপে চিনিয়াছি। কিন্তু রাত্রের দেখা তাহাতে কিছু সন্দেহ আছে।"

"তবে আপনি তাঁহাদের সঙ্গী নহেন?"

"আমি কাহারও সঙ্গী নহি–নিরাশ্রয়।"

জয়নাল আবেদীন ওতবে অলীদকে কারবালার প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন মাত্র, তাহাকে বিশেষরূপে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি ইহাকে ভালরূপে চিনিতে পারিলাম না। আমি যে পাপাত্মা জাহান্নামীর কথা বলিয়াছি, নিশীথ সময় সেই প্রস্তর খন্ডের নিকট যাহাকে দেখিয়াছি, চাকুরী করিতে মদিনা হইতে দামেস্কে আসিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি। তাহাকেই আমার প্রয়োজন।"

গাজী রহমানের আদেশে প্রহরিগণ বন্ধন–অবস্থান মারওয়ানকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "রে, পামর, তোকে গত নিশীথেই চিনিয়াছিলাম। চিনিয়া কি করিব, আমি নিরস্ত্র।"

মারওয়ান বন্দী অবস্থাতেই বলিলেন, "আমি সশস্ত্র থাকিয়াই বা কি করিলাম। কি ভ্রম! কি ভ্রম! সুবিধামত তোমাকে পাইয়াও যখন আমার এই দশা, তখন আর আশা কি? কি ভ্রম!"

"ওরে নরাধম! ঈশ্বর কি না করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা তুই কি বুঝিবি পামর!"

"আমি বুঝি বা না বুঝি, মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। যদি চিনিতাম যে তুমিই–"

সভাস্থ সকলে মহা চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিতেই গোলাযোগের সম্ভাবনা দেখিয়া জয়নাল আবেদীন বলিতে লাগিলেন, "সভাস্থ মহোদয়গণ! আমার পরিচয়-"

"আমার পরিচয়" এই দুইটি শব্দ জয়নালের মুখ হইতে বহির্গত হইতেই সকলে নীরব হইলেন। সকলেই সমুৎসুকে জয়নালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

জয়নাল বলিলেন, "আমরা এক সময়ে বন্দী- অথচ পরস্পর শত্রুভাব, ইহা কম আশ্চর্যের কথা নহে। অগ্রে এই পাপাত্মার পরিচয় দিয়া শেষে আমার কথা বলিতেছি। ইহার নাম জগৎরাষ্ট্র। এই পাপাত্মার মন্ত্রণাতেই মহাত্মা হাসানবংশ একেবারে বিনষ্ট। প্রভু হোসেনের বংশও সমূলে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। সে কথা এই দুরাচার নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে।-"কি ভ্রম! কি ভ্রম!" ঐ ভ্রমই মঙ্গলের সকল কারণ। এই নরাধমই সকল ঘটনার মূল। সেই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় যাহা আমি মাতার নিকট শুনিয়াছি, আর যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি আপনাদের নিকট বিচার- প্রার্থী।

সভাস্থ সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। জয়নাল গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই নরাধম, এই পাপাত্মাই এজিদ-পক্ষ হইতে আপনা নাম স্বাক্ষর করিয়া মহাত্মা হাসানের নিকট মক্কা-মদিনার স্বাধীনতা -সূর্য হরণ করিয়া চিরপরাধীনতার অন্ধকার অমানিশায় আবরিত করিতে সসৈন্যে মদিনায় আসিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মায়মুনার যোগে জাএদার সাহায্যে হীরকচূর্ণ দ্বারা মহাত্মা হাসানের জীবন অকালে বিনাশ করিয়াছে। এই দুরাচারই কুফা নগরে আবদুল্লাহ জেয়াদকে টাকায় বশীভূত করিয়া মহাবীর মোসলেমের জীবন মিথ্যা ছলনায় কৌশলে ফোরাত কূল বন্ধ করিয়া শত সহস্র যোধকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া বিনাশ করিয়াছে। কি দুঃখের কথা! তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের বক্ষ ভেদ করাইয়া জগৎ কাঁদাইয়াছে। অন্যায় যুদ্ধে মহাবীর আব্দুল ওহাবকে বধ করিয়াছে। কত বলিব, এই পাপাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ-।"

জয়নালের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পুনরায় করুণস্বরে বলিলেন, "আবরেব সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কাসেমের জীবন-লীলা শেষ করিয়াছে। এই পাপাত্মাই পতিপরায়ণা সখিনা বিবির আত্মহত্যার কারণ। আর কত বলিব। এই জাহান্নামী কাফের মারওয়ানই পুণ্যাত্মা পিতা প্রভু হোসনের জীবন-"

জয়নালের মুখে আর কথা সরিল না, -চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা হৃদয়সংবরণে অধির হইয়া -"হা ভ্রাতঃহাসান! হা ভ্রাতঃ হোসেন! বাবা জয়নাল! হানিফার অন্তরাত্মা শীতল কর বাপ!" এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জয়নালকে বক্ষে ধারণ করিলেন। শোক-বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সভাস্থ আর সকলে ক্রোধে, রোষে, দুঃখে, শোকে এক প্রকার জ্ঞানহারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি সেই মারওয়ান? এ কি সেই মারওয়ান? মার শয়তানকে। ভাই সকল, আর দেখ কি?"

গাজী রহমান বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সভাস্থ সকলের সেই উগ্রমূর্তি, সেই বিকট ভাব পরিবর্তন করিতে পারিলেন না, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না; শেষে মোহাম্মদ হানিফার কথা পর্যন্ত কেহ গ্রাহ্য করিল না। "মার শয়তানকে!" বলিতে বলিতে পাদুকাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, অস্ত্রাঘাত, যত প্রকার আঘাত প্রচলিত আছে, বজ্রাঘাতের ন্যায় মারওয়ানের

শরীরে পড়িতে লাগিল। চক্ষের পলকে মারওয়ানের দেহ ধূলায় লুটাইয়া শোণিত-ধারে সভাতল রঞ্জিত করিল।

মারওয়ান অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জয়নাল আবেদীন! আমি তোমার ভালও করিয়াছি-মন্দও করিয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু সম্মুখে মহা ভীষণ রূপ এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আমি কখনও দেখি নাই। আমাকে রক্ষা কর।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, " মারওয়ান! ঈশ্বরের নাম কর, এই সময় তিনি ভিন্ন রক্ষার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত সেই দয়াময়ের নাম মুখে উচ্চারণ কর। তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

মারওয়ান আর্তনাদসহকারে বিকৃতস্বরে বলিলেন, "আমি মারওয়ান, আমি মারওয়ান দামেস্ক-রাজমন্ত্রী মারওয়ান। আমাকে মারিও না, দোহাই তোমার, আমাকে মারিও না। অগ্নিময় লৌহদন্ডে আমাকে আঘাত করিও না। আমিও অগ্নিসমুদ্রে আমাকে নিক্ষেপ করিও না। আমি মিনতি করিয়া দু'খানি পায়ে ধরিয়া বলিতেছি ও অগ্নি-সমুদ্রে আমাকে নিক্ষেপ করিও না। দোহাই তোমার রক্ষা কর। দোহাই তোমার রক্ষা কর। দোহাই তোমাদের, আমাদের রক্ষা কর। আমি এজিদের প্রধানমন্ত্রী আমাকে- আর মারিও না। প্রাণ গেল- আমি যাইতেছি! ঐ আগুনে প্রবেশ করিতেছি,- রক্ষা কর।"

বিকট চীৎকার করিতে করিতে মারওয়ানের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে অদৃশ্যভাবে উড়িয়া গেল। রক্তমাখা দেহ সভাতলে পড়িয়া রহিল। মোহাম্মদ হানিফা- গাজী রহমান, ওমর আলী, মসহাব কাক্কার প্রভৃতিকে বলিতে, লাগিলেন,"ভ্রাতৃগণ এখন আর চিন্তা কি? এখন প্রস্তুত হও, যাহার জন্য এত দিন সঙ্কুচিত ছিলাম, যাহার জীবনে আশঙ্কা করিয়া এত দিন নানা সন্দেহে সন্দিহান হইয়াছিলাম, আজ সে জীবনের জীবন-নয়নের পুত্তলি, হৃদয়ের ধন, অমূল্য বিধি হস্তে আসিয়াছে! ঈশ্বর আজ তাহাকে আমাদের হস্তগত করাইয়াছেন আর ভাবনা কি? এখনই প্রস্তুত হও।এখনই সজ্জিত হও। এখনই এজিদ বধে যাত্রা করিব্ শুন ঐ শুন এজিদ শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে। গাজী রহমানের স্বীকৃত বাক্য রক্ষা হইল। ঈশ্বরই চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বও এখন আর সহ্য হইতেছে না, শীঘ্র প্রস্তুত হও। অদ্যই দুরাত্মার জীবন শেষ করিব, পরিজনদিগকে বন্দিগৃহ হইতে উদ্ধার করিব।"

সকলে মনের আনন্দে যুদ্ধসাজে ব্যাপৃত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা জয়নালকে ওতবে অলীদের পরিচয় দিয়া দিয়া বলিলেন,"এই অলীদ কোন সময় বলিয়াছিলেন যে, এজিদের জন্য অনেক করিয়াছি। হাসান-হোসেনের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আমি উহা পারিব না। সেই কথা কয়েকটা আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি সেই কারণেই ইহাকেই মসহাব কাক্কার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই অলীদ যদি এ প্রকারে আমাদের হস্তগত না হইতেন, তাহা হইলেও আমি কখনই ইহার প্রাণের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইতাম না। জানিতপক্ষে কাহাকে আক্রমণ করিতে দিতাম না। এই মহাত্মা প্রকাশ্যে পৌত্তলিক- অন্তরে মুসলমান।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন,"আর প্রকাশ্য গোপন, দ্বিভাবের প্রয়োজন কি?"

অলীদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "হযরত! আমি অকপটে বলিতেছি, আপনি আমাকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করুন।"

জয়নাল "বিসমিল্লাহ" বলিয়া ওতবে অলীদকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে অলীদ অন্তরে সে সত্যধর্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস, "ঈশ্বর এক– সেই এক ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই" অক্ষয়রূপে নিহিত হইল।

মোহাম্মদ হানিফা অলীদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি অটল ভক্তি হউক দয়াময় আপনাকে জান্নাতবাসী করুন– আমি আশীর্বাদ করি।"

জয়নাল আবেদীনও অলীদের পরকাল উদ্ধার হেতু অনেক আর্শীবাদ করিলেন।

এদিকে মহাঘোর নিনাদে যুদ্ধ বাজনা বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ মনের আনন্দে সজ্জিত হইয়া শিবির বর্হিভাগে দন্ডায়মান হইলেন। ওমর আলী, মসহাব কাক্কা প্রভৃতি মনোমত বেশভূষায় ভূষিত ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া দন্ডায়মান হইলেন। তখন মোহাম্মদ হানিফা বলিতে লাগিলেন,"ভ্রাতৃগণ! আজ সকলকেই ভ্রাতৃ সম্বোধনে বলিতেছি, আমাদের বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন ইমাম–বংশের মহামূল্য মণি মদিনার রাজা প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে ঈশ্বর কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যৎ ভাবনা, জয়নালের জীবনের আশঙ্কা সদাচিন্তিত অন্তর হইতে দূর হইয়া বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এ নিদারুণ দুঃখ–সিন্ধু হইতে শীঘ্রই উদ্ধার পাইবার ভরসাও হৃদয়ে জন্মিয়াছে। আজ হৃদয়ে মহাতেজ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে বক্ষ স্ফীত হইয়া বাহুদ্বয়মহাবলে বলীয়ান বোধ হইতেছে। ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতি আজ আমাদের সানুকূলে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে নানাবিধ শুভ চিহ্ন শুভযাত্রার শুভ লক্ষণ দেখাইতেছেন। নিশ্চয় আশা হইতেছে যে, এই যাত্রায় এজিদ বধ করিয়া পরিজনবর্গকে বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ, এই শুভ সময়ে এই আনন্দ–উচ্ছ্বাস– সময়ে আমার একটি মনঃসাধ পূর্ণ করি, জগৎপূজিত মদিনার সিংহাসন আজ সজীব করি। আমাদের সকলের নয়নের জগতের যাবতীয় মোসলেম চক্ষের পুত্তলী হৃদয়ের ধন অমূল্য মণিকে আমরা ভক্তির সহিত আজই শিরে ধারণ করি। ভ্রাতৃগণ মনের হর্ষে প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে আজই এই স্থানে এই দামেস্ক প্রান্তরে মদিনার রাজপদে অভিষিক্ত করি।

সমস্বরে সম্মতিসূচক আনন্দ–ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে গগন আচ্ছন্ন করিল। মোহাম্মদ হানিফা 'বিসমিল্লাহ্' বলিয়া রাজমুকুট মণিমুক্তাখচিত তরবারি জয়নাল আবেদীনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ওমর আলী, মসহাব কাক্কা, গাজী রহমান প্রভৃতি যথারীতি অভিবাদন করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ সহিত জয়নাল আবেদীনের জয়-ঘোষণা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া উপঢৌকনাদি জয়নালের সম্মুখে রাখিয়া অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিলেন। মদিনা এবং নানা দেশী ও বিদেশীয় সৈন্যগণ অবনতমস্তকে নবীন রাজার সম্মুখে অস্ত্রাদি রাখিয়া সমস্বরে মদিনা সিংহাসনের জয় ঘোষণা করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় বলিলেন, " ভ্রাতৃগণ, এখন সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র পুনর্ধারণ করিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, তার পর নূরনবী মোহাম্মদের নাম এবং সর্বশেষে নবীন ভূপতির জয় ঘোষণা করিয়া বীরদর্পে দন্ডায়মান হও।"

হানিফার কথা শেষ না হইতেই গগনভেদী শব্দ হইল, ঈশ্বরের নামের পর নুরনবী মোহাম্মদের প্রশংসার পর "জয় মদিনার সিংহাসনের জয়-জয় নবীন ভূপতির জয়-জয়নাল আবেদীন মহারাজের জয়" শব্দ হইতে লাগিল।

আবার মোহাম্মদ হানিফা বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, এই অসি ধারণ করিলাম বীরবেশে সজ্জিত হইলাম, আর ফিরিব না-তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না। যত দিন এজিদ বধ ও পরিজনগণের উদ্ধার না হয়, ততদিন এই বেশ এই বীর বেশ অঙ্গে থাকিবে। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গী, আমিও আজ সৈন্য, আমিও আজ জয়নালের আজ্ঞাবহ। সকলেরই আজ এই প্রতিজ্ঞা-ধর্ম প্রতিজ্ঞা। এই যাত্রাতেই হয় এজিদ- বধ না, হয় আমাদের জীবনের শেষ। দিবা হউক, নিশা আগমন করুক, আবার সূর্যের উদয় হউক-এজিদ, বধ। এজিদ- বধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বেশ এই বীর বেশ! বিশ্রামের নাম করিব না, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিব না, পশ্চাৎ হটিব না জীবন পণ হানিফার জীবন পণ, এজিদ বধে সকলেরই জীবন পণ। আজিকার যুদ্ধে বিচার নাই ব্যূহ নাই, কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই, মার কাফের, জ্বালাও শিবির। আজ সকলেই সেনাপতি সকলেই সৈন্য। সকলের মনে যেন এই কথা মুহূর্তে মুহূর্তে জাগিতে থাকে, মহাত্মা হাসান-হোসেন পরিজনগণের উদ্ধার সাধন করিতে জীবন পণ দামেস্করাজ্য সমভুমি করিতে জীবন পণ।"

ভ্রাতৃগণ, মনে কর, আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন এবং শেষ সময়।শত্রুদল চক্ষে দেখা ভিন্ন আপন সহযোগী সাহায্যকারী সৈন্য-সামন্ত প্রতি এমন কি স্ব স্ব শরীর প্রতি কেহ লক্ষ্য করিবেন না। আজ হাসানের শোক হোসনের শোক এই তরবারিতে নিবারণ করিব। সে আগুন এই শাণিত অসেত্রর সহায়ে এজিদ-শোণিতে আজ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিব। আজ কাফের বধ করিয়া বারবালার প্রতিশোধ দামেস্ক প্রান্তরে লইব। আজ কাফেরের দেহ বিনির্গত শোণিতে লোহুর নদী বহাইব,- মরুভূমে রক্তের প্রবাহ ছুটাইব। শত্রুর মনঃকষ্ট দিতে আজ কাহারও বাধা মানিবনা। কোন কথা শুনিব না। ঐ জাহান্নামী কাফের মারওয়ানের মস্তক কাটিয়া এক বর্শায় বিদ্ধ কর। পাপীর দেহ শতখন্ডে খন্ডিত কর। মস্তক ও খন্ডিত দেহসকল বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাও এবং মুখে বল, "এই সেই কাফের মারওয়ান, এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।"

হানিফার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে মদিনাবাসী কয়েকজন নবীন যোধ অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটিয়া আসিয়া "এই সেই মারওয়ান, এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান, এই সেই নরাধম পিশাচ" ইত্যাদি শত শত প্রকার সম্বোধন করিয়া চক্ষের নিমিষে মারওয়ানের দেহ এক দুই তিন ইত্যাদি ক্রমে গণিত শত খন্ডে খন্ডিত করিলেন। বর্শার অগ্রে বিদ্ধ করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইল না।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আজ হানিফা এই অস্ত্র ধরিল, পুনরায় বলিতেছি, ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এজিদ বধ না করিয়া এ অস্ত্র আর কোষে রাখিব না। ভ্রাতৃগণ, আমার অসহায় পরিজনদিগের কথা মনে করিও এই আমার প্রার্থনা। গাজী রহমান উপযুক্ত সৈন্য লইয়া জয়নাল আবেদীনসহ আমাদের পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর ফিরিব না। আর শিবিরের আবশ্যক নাই। বিশ্রাম উপযোগী

দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। জীবনরক্ষা হইলে আজই সুবিস্তৃত দামেস্ক-রাজ্য লাভ হইবে। জয়নালকে বসাইতে পারিলে বিশ্রাম বিলাস সকলই পাইব। আর যদি জীবন শেষ হয়, তবে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না। ভাঙ্গ শিবির, লুটাও জিনিস।"

এই কথা বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা অশ্বারোহণ করিলেন। সকলে সমস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া ঘোরনাদে মহারাজ জয়নালের জয়-ঘোষণা করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মারওয়ানের খণ্ডিতদেহ শত শত বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল! শিবির বাহির হইয়া পুনরায় ভীমনাদে ঈশ্বরের নাম করিয়া এজিদ বধে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে শত শত বর্শাধারী সমস্বরের বলিতে লাগিল, "এই সেই কাফের মারওয়ান এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান ।" আর মুহূর্তে মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম এবং নবীন রাজার জয়ধ্বনিতে দামেস্ক প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল।

এজিদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মস্তক ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের বেদনাও আছে। শরীর অলস, স্ফুর্তি বিহীন, দুর্বল। নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। কিন্তু উপস্থিত ভীষণ শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেই এজিদ সেই আরক্তিম নয়নে পরিশুস্ক মুখে বিকৃত মস্তকে শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর কাঁপিতে লাগিল। মহা অস্থির হইয়া শিবিরদ্বার পর্যন্ত আসিয়া দেখিলেন যে, মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত। কোথায় মারওয়ান? কোথায় অলীদ? এ দুঃসময়ে কাহারও সন্ধান নাই। ওমর ও অন্যান্য সেনাপতিগণ আসিয়া অভিবাদনপূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রাত্রের ঘটনার আভাস বলিতে সমুদয় কথা এজিদের মনে হইল। বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, "ওমর তুমিই আজ প্রধান সেনাপতি। চিন্তা কি? মারওয়ান গিয়াছে, অলীদ গিয়াছে, এজিদ আছে। চিন্তা কি? যাও যুদ্ধে। দাও বাধা -মার হানিফাকে। তাড়াও মুসলমান। ধর তরবারী। আমি এখন আসিতেছি, আজ হানিফার যুদ্ধ- সাধ, জীবনের সাধ এখনই মিটাইতেছি।

ওমর শিবির-বাহিরে আসিয়া পূর্ব হইতে তুমুলরবে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিলেন। মনের উৎসাহে আনন্দে সৈন্যগণ বিষম বিক্রমে দনডায়মান হইল। এদিকে এজিদ স্বসাজে-মণিময় বীরসাজে সজ্জিত হইয়া শিবির বাহির হইয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ মারওয়ানের জন্য দুঃখ নাই, অলীদের কথা তোমরা কেহ মনে করিও না। আমার সৈন্যাধ্যক্ষ মধ্যে বিস্তর অলীদ, বহু মারওয়ান এখনও জীবিত রহিয়াছে। কোন চিন্তা নাই। বীর-বিক্রমে আজ হানিফাকে আক্রমণ কর। আমি আজ পৃষ্ঠপোষক। এজিদের সৈন্য-বিক্রম, হানিফা জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাসান দেখিয়াছে, কারবালা প্রান্তরে হোসেন দেখিয়াছে, আর আমি আজ দামেস্ক প্রান্তরে হানিফাকে দেখাইব। মার হানিফা, মার বিধর্মী তাড়াও, মুসলমান। উহারা বিষম বিক্রমে আসিতেছে, আমরাও মহাপরাক্রমে আক্রমণ করিব। হানিফার যুদ্ধের সাধ আজ মিটাইব। সমস্বরে দামেস্ক সিংহাসনের বিজয় -ঘোষনা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হও।"

এজিদ মহাবীর। এজিদের সৈন্যগণও অশিক্ষিত নহে- প্রভুর সাহসসূচক বচনে উত্তোজিত হইয়া বীরদর্পে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিকার যুদ্ধ চমৎকার! কোন

দলে ব্যূহ নাই, শ্রেণীভেদ নাই আত্মরক্ষার ভাবেও কেহ দন্ডায়মান হয় নাই। উভয় দলই অগ্রসর, উভয় দলেরই সম্মুখে গমনের আশা।

এজিদ সৈন্যদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন এবং সুযোগ মত হানিফার সৈন্যদলের আগমন দেখিতেছেন–অগণিত সৈন্য, সর্বাগ্রে বর্শাধারী। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন–মানব– শরীরের খন্ডিত অংশ সকল বর্শায় বিদ্ধ এবং বর্শাধারিগণের মুখে এই কথা এই সেই মারওয়ান প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।" এজিদ সকলই বুঝিলেন, মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশে সে দুঃখ চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইল না, হাবভাবেও কেহ বুঝিতে পারিল না। সদর্পে বলিলেন, "সৈন্যগণ মারওয়ানের খন্ডিতদেহ দেখিয়া ভীত হইও না, হাতে পাইয়া সকলেই সকল কার্য করিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র পদবিক্ষেপ কর, বজ্রনাদে আক্রমণ কর, অশনিবৎ অস্ত্রের ব্যবহার কর। আমরা গাজী রহমানের দেহ সহস্র খন্ডে খন্ডিত করিয়া শৃগাল কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইব। কর আঘাত, কর আঘাত।"

যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ। কি ভয়ানক যুদ্ধ! কি ভীষণ কান্ড!!! প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় অস্ত্র, প্রান্তরময় সমর! উভয় দলেই আঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। অসি, বর্শা, খঞ্জর, তরবারি সকলই চলিল। কি ভয়ানক ব্যাপার! যে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, সে তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় নাই, পাত্রাপাত্র প্রভেদ নাই। সম্মিলন–স্থলে উভয় দলে যে বাধা জন্মিয়াছে, তাহাতে কোন পক্ষেরই আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইতেছেনা। কেবল সৈন্যক্ষয়–বলক্ষয় হইতেছে মাত্র। ওমর আলী, মসহাব কাক্কা প্রভৃতি দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু টিকিতে পারিতেছেন না। মোহাম্মদ হানিফা এখনও তরবারি ধরেন নাই, কেবল সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছেন, মুহূর্তে মুহূর্তে ভৈরব নিনাদে দামেস্ক প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। সৈন্যগণ সময় সময় "আল্লাহু আকবার" শব্দ করিয়া গগন পর্যন্ত কাপাইয়া তুলিতেছে।

এখনও মোহাম্মদ হানিফা তরবারি ধরেন নাই। দুলদুলে কশাঘাত করিয়া সৈন্য শ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে ঘুরিয়া দেখিতেছেন। যেখানে একটি মন্দভাবে তরবারি চলিতেছে, সেইখানেই সেই দলেই পৃষ্ঠপোষক হইয়া দুই চারিটি কথা কহিয়া কাফের বধে উৎসাহ দিতেছেন। কি লোমহর্ষণ সময়! কি ভয়ানক সমর! বিনা মেঘে বিজলী খেলিতেছে (অস্ত্রের চাকচিক্য), হুহুঙ্কারে গর্জন হইতেছে (উভয় দলের সৈন্যগণের বিকট শব্দ) অজস্র শিলার বর্ষণ হইতেছে (খন্ডিত দেহ) মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে (দেহ নিগর্ত রুধির) কি দুর্ধর্ষ সমর।

বেতনভোগী সৈন্যগণ ইহারা হানিফার কে? এজিদেরই বা কে? হায় রে অর্থ! হায় রে হিংসা! হায় রে ক্রোধ! হানিফার সৈন্যগণ আজ অজ্ঞান; মদিনাবাসীরা বিহব্বল; পদতলে অশ্ব পদতলে নরদেহ নরশোণিত । ক্রমেই খন্ডিত দেহ খন্ডিত অশ্ব বিষম সমর।

দৈবাধীন ওতবে অলীদ আর ওমরের যুদ্ধ কি চমৎকার দৃশ্য! এ দৃশ্য কে দেখিবে? ঈশ্বরের মহিমায় যাহার অণুমাত্র সন্দেহ আছে, সেই দেখিবে। কাল ভ্রাতৃভাব, আজ শত্রুভাব, এ লীলার অন্ত মানুষ কি বুঝবে? ওমর বলিলেন, "নিমকহারাম, নিশীথ সময় শিবির হইতে বাহির হইয়া শত্রুদলে মিশিলে? প্রভাত না হইতেই আশ্রয়–দাতা

পালনকর্তা তোমার চির উপকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলে? ধিক তোমার অস্ত্রে! ধিক তোমার মুখে নিমকহারাম ধিক তোমার বীরত্বে!"

ওতবে অলীদ বলিলেন, "ভ্রাতঃ ওমর ক্রোধে অধীর হইয়া নীচত্ব প্রকাশ করিও না। ছি ছি! তুমি প্রবীণ প্রাচীন! সমর গুণে তোমার কি মতিভ্রম ঘটিল? ছি ভ্রাতঃ স্থির ভাবে কথা বল, কথার অনিচ্ছা হয়, অস্ত্রের দ্বারা সদালাপ কর।"

"তোমার সঙ্গে কথা কি? তুমি বিশ্বসঘাতক, তুমি নিমকহারাম, তুমি বীরকুলের কুলাঙ্গার।"

"দেখ ভাই, ওমর আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, নিমকহারাম নহি, কুলাঙ্গার নহি। মারওয়ানের সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলাম। পরাভব স্বীকারে আত্মসমর্পন করিয়া সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সেই একেশ্বরের জ্বলন্ত ভাব আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছি, চক্ষের উপর ঘুরিতেছে; তাই বিধর্মী মাত্রই আমার শত্রু; দেখিলেই বধের ইচ্ছা হয়; কারণ সেই নরাকার পশু, যে নিরাকার ঈশ্বরকে আকারে পূজা করে। আবার যাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার মিত্র-মিত্র, তাঁহার শত্রু-পরম শত্রু আর কি বলিব? তোমাকে গালি দিব না। তোমার কার্য তুমি কর, আমার কার্য আমি করিব।"

দুই জনে কথা হইতেছে, এমন সময় এজিদ ওমরের নিকট দিয়া যাইতেই অলীদকে দেখিয়া অশ্ব-বল্গা ফিরাইলেন।

ওমর বলিতে লাগিলেন, "বাদশাহ নামদার দেখুন আপনার প্রধান সেনাপতির বীরত্ব দেখুন।"

এজিদ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "অলীদ এত দিন এত যত্ন করিলাম, পদবৃদ্ধি করিলাম কত পারিতোষিক দান করিলাম কত অর্থ সাহায্য করিলাম; তাহার প্রতিফল, তাহার প্রতিফল, তাহার পরিণাম ফল বুঝি ইহাই হইল?"

"আমি নিমকহারামী করি নাই, কোন লোভের বশীভূত হইয়া আপনার শত্রুদলে মিশি নাই। শত্রু-শিবিরে যাইতেছিলাম দৈবনির্বন্ধে ধরা পড়িলাম। কি করি, পরাভব স্বীকার করিয়া সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরকালের মুক্তির পথ পরিস্কার করিতেই আজ কাফের বধে অগ্রসর হইয়াছি অস্ত্র ধরিয়াছি।"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন, "ওমর এখনও অলীদ শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য!"

এজিদ ওমরকে সজোরে পশ্চাৎ করিয়া অলীদ প্রতি আঘাত করিলেন। কি দৃশ্য! কি চমৎকার দৃশ্য!!

অলীদ সে আঘাত বর্মে উড়াইয়া দিলেন, "আমি আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। বিশেষ মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা, যিনি আজ স্বয়ং যুদ্ধভাব গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছেন, তাহার নিষেধ আছে।"

এজিদ বলিলেন, "ওরে মুর্খ এক রাত্রি মুর্খদলের সহবাসে থাকিয়াই তোর দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। স্বয়ং রাজা সেনাপতি! তবে বরিত হইল কে? রাজ মুকুট শোভা পাইল কাহার শিরে? রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলে ক্ষতি কি? সেনাপতি উপাধি লইয়া স্বয়ং রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া থাকে রে বর্বর?"

"এজিদ নামদার আমি বর্বর নহি। রাজা সেনাপতি পদ গ্রহণ করেন না, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। মোহাম্মদ হানিফা তাহার রাজ্যের রাজ মদিনার তিনি কে?"

"মদিনায় আবার কোন রাজার আবির্ভাব হইল।"

"মহাশয়, যিনি মদিনার রাজা, তিনি দামেস্কের রাজা, তিনি মুসলমান রাজ্যের রাজা সেই রাজরাজেশ্বর মহারাজাধিরাজ আজ রাজপদে বরিত হইয়াছেন। রাজমুকুট তাহারই শিরে শোভা পাইতেছে, রাজ অস্ত্র তাহারই কটিদেশে দুলিতেছে।"

"অলীদ, তোমার বুদ্ধি এরূপ না হইলে ভিখারীর ধর্ম গ্রহণ করিবে কেন? আমি শুনিয়াছি, মোহাম্মদ হানিফাকে মদিনার লোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান-রাজ্য মোহাম্মদ হানিফার নামে কম্পিত হয়,—কেমন নতুন ধার্মিক?"

"ধর্মের সঙ্গে হাসি তামাসা কেন? আপনার জ্ঞান থাকিলে কি আজ হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেন? আপানি মন্ত্রিহারা, জ্ঞানহারা, আত্মহারা হইয়াছেন। অতি অল্প সময়েই রাজ্যহারা হইবেন। আপনার জীবন হরণের জন্য মহাবীর হানিফা আছেন। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যাহা তাহার কথা বলিলাম। বলুন আজিকার যুদ্ধে স্বার্থ কি?"

"হানিফার জীবন শেষ, জয়নাল আবেদীনের বধ—মদিনার সিংহাসন লাভ! আর স্বার্থের কথা শুনিবে? সে স্বার্থ অন্তরে হৃদয়ে চাপ।"

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই অন্তরে চাপা থাকিবে। আর মুখে যাহা বলিবেন, তাহাই কেবল মুখে থাকিবে। বলনু তো মহাশয়, জয়নাল আবেদীনকে কি প্রকারে বধ করিবেন?"

"কেন, বন্দীর প্রাণবধ করিতে আর কথা কি?"

"তবে বুঝি রাত্রের কথা মনে নাই! থাকিবে কেন? কথাগুলি সমুদয় পেয়ালায় গুলিয়া পেটে ঢালিয়াছেন।"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, মনে হইয়াছে; জয়নাল বন্দীগৃহ হইতে পলাইয়াছে। আমার রাজ্যে যাবে কোথা?"

"যেখানে যাইবার সেখানে গিয়াছেন। ঐ শুনুন সৈন্যগণ কাহার জয়—ঘোষণা করিতেছে।"

"জয়নাল কি হানিফার সঙ্গে মিশিয়াছে?"

"আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, মোহাম্মদ হানিফা আজ সেনাপতি, সৈন্যগণ সহস্রমুখে প্রতি মুহূর্তে নবভূপতির জয় ঘোষণা করিতেছে। আর কি শুনিতে চাহেন?"

এজিদ মহাব্যস্তে বলিলেন, "অলীদ তুমি আমার চিরকালের অনুগত, অধিক আর কি বলিব, ঐ দিকে যখন গিয়াছ, তখন মন ফিরাও হানিফার সৈন্য শিরেই তোমার অস্ত্র বর্ষিতে থাকুক। আর কি বলিব, আমার এই শেষ কথা আমি তোমাকে দামেস্ক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্বপদ দান করিব।"

"ও কথা মুখে আনিবেন না। আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন, না হয়, আমার অস্ত্রের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাউন। আমি জয়নাল আবেদীনের দাস—মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞাবহ। আপনার মন্ত্রী হইয়া লাভ যাহা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। ঐ দেখুন বর্শার অগ্রভাগ দেখুন আপনার এক মন্ত্রী এক শত মারওয়ান রূপ ধারণ করিয়া বর্শার অগ্রভাগে বসিয়া আছে।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "নিমকহারাম, কমজাৎ কমিন আমার সঙ্গে তামাসা? ইহকালের মত তোর কথা কহিবার পথ বন্ধ করিতেছি।" সজোরে অলীদ শির লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন। অলীদ সে আঘাত বামহস্তস্থি বর্শাদন্ড দ্বারা উড়াইয়া দিতেই ওমর আলীদের গ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিলেন। বহু দূর হইতে ওমর আলী এই ঘটনা দেখিয়া নক্ষত্রবেগে অলীদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে এজিদ ও ওমর উভয়ে অলীদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন।

ওমর আলী চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন, "এজিদ, এ দিকে কেন? মোহাম্মদ হানিফার দিকে যাও। সে দিনও দেখিয়াছ, আজিও বলিতেছি, তোমার প্রতি কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। তোমার শোণিতে হানিফার তরবারি রঞ্জিত হইবে। যাও সে দিকে যাও–আজ–"

ওমর আলীর কথা শেষ হইতে না হইতেই ওমর ওলীদ প্রতি দ্বিতীয় আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এজিদ অলীদের অশ্বকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত পার করিয়া দিলেন। অশ্ব কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। ওমর এই সুযোগে অলীদের পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন, বর্শাফলক পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থ হইতে রক্তমুখে বর্হিগত হইল। অলীদ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শহীদ হইলেন।

ওমর আলী এজিদকে দেখিয়া একটু দূরে ছিলেন, অলীদের দর্শনে অসি সঞ্চালন করিয়া ভীমনাদে ওমরের দিকে আসিয়া প্রথমতঃ ওমরের অশ্বগ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিতেই বাজীরাজ শিরশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। বাম পার্শ্বে ফিরিয়া দ্বিতীয় আঘাতে এজিদের অশ্বমস্তক মৃত্তিকায় লুটাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে, ওমর এখনও সুস্থির হইয়া দন্ডায়মান হইতে পারেন নাই; তৃতীয় আঘাতে বৃদ্ধ ওমরকে ধরাশায়ী করিলেন।

এজিদ ওমরের অবস্থা দেখিয়া তাড়তাড়ি বল্লম হস্তে ওমর আলীর দিকে ধাইয়া যাইতেই ওমর আলী সরিয়া গিয়া বলিলেন, "এজিদ এ দিকে কেন আসিতেছ? যাও হানিফার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর গিয়া। ওমর আলী তোমার সৈন্য বিনাশ করিতে চলিল।

দেখিতে দেখিতে ওমর আলী এজিদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সিংহবিক্রমে ঘোর নিনাদে শব্দ হইতেছে, "জয়! জয়নাল আবেদীনের জয়! জয় মদিনার সিংহাসনের জয়! জয় নব ভূপতির জয়!"

এজিদ ব্যস্ততা–সহকারে চাহিতেই দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদল–মধ্যে কোন দল পৃষ্ঠ দেখাইয়া মহাবেগে দৌড়িতেছে, কোন দল রণে ভঙ্গ দিয়া দাড়াইয়া আছে। বিপক্ষদলের আঘাতে অজ্ঞান জড় পদার্থের ন্যায় নীরবে আত্মবিসর্জন করিতেছে। আর রক্ষার উপায় নাই কোথায় পতাকা কোথায় বাদিত্রদল কোথায় ধানুকী কোথায় অশ্বরোহী কোথায় অস্ত্র কোথায় বেশভূষা প্রাণ বাঁচানই মূল কথা। এখন আর আশা নাই এদিকে প্রহরী দ্বিতীয় অশ্বতরী যোগাইল। এজিদ ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিলেন, রাজশিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, বিপক্ষদল অন্য অন্য শিবির লুণ্ঠন করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সৈন্যগণ প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতেছে। মসহাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী প্রভৃতি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বর্শাঘাতে ধরাশায়ী করিতেছে, তরবারির আঘাতে শির উড়াইয়া দিতেছে। আবার জয়ধ্বনি, আবার সেই জনরব এজিদ সে দিকে

চাহিতেই দেখিলেন, অগণিত সৈন্য, সকলের হস্তে উলঙ্গ অসি, মাঝে মাঝে উর্দ্ধদন্ডে অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারা সংযুক্ত দীন মোহাম্মদী নিশান শুভ্র মেঘের আড়ালে উড়িতে উড়িতে জয়নাল আবেদীনের বিজয় ঘোষণা প্রকাশ করিতে করিতে নগরাভিমুখ যাইতেছে। এজিদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে জয় ঘোষণায় জয়নালের নাম শুনিয়া মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন না যে নিশ্চয়ই জয়নাল এই সৈন্য প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নগরে যাইতেছে। রাজ প্রাসাদে যাইতেছে। এখন কোথা যাই কি করি হতাশে চতুস্পার্শ্বে দেখিতেই দেখিলেন যে সেই কালান্তক কাল এজিদের মহাকাল দ্বিতীয় আজরাইল মোহাম্মদ হানিফা রঞ্জিত কৃপাণ হস্তে রক্তমাখা দেহে রক্ত আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথা এজিদ" কৈ এজিদ? বলিতে বলিতে আসিতেছেন। এজিদ প্রাণভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মোহাম্মদ হানিফাও এজিদের দ্রুতগতি অশ্বের দিকে দুলদুল চালাইলেন।

প্রথম প্রবাহ

এজিদ-বধ পর্ব

বন্দীগৃহ। বন্দীগৃহ সুবর্ণে নির্মিত, মহামূল্য প্রস্তরে খচিত, সুখসেব্য আরামের উপকরণে সুসজ্জিত হইলেও মহাকষ্টপ্রদ যন্ত্রণা-স্থান। সুখ সম্ভোগের সুখমায় সামগ্রী দ্বারা পরিপূরিত হইলেও বন্দীগৃহ দেহদগ্ধকারী মহাকষ্টপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নিময় নরকনিবাস। সুবর্ণ-পাত্রে স্বস্বাদু সুমিষ্ট সরস- খাদ্য- পরিপূরিত রসনা পরিতৃপ্ত করিতে সুন্দর বন্দোবস্ত সহিত সুব্যবস্থা থাকিলেও বন্দীগৃহ মহাকাল, যমালয়। কোন বিষয়ের অভাব অনটন না হইলেও সর্বতোভাবে মশান হইতে শ্মশান আদরের, অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা-ধন যে স্থানে বর্জিত, সে স্থান অমরপুরী সদৃশ মনোনয়ন মুগ্ধকর সুখসম্ভোগের স্থান হইলেও মানবচক্ষে অতি কদাকার ও জঘন্য, বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন সজীব প্রাণি- নয়নে কন্টক- সমাকীর্ণ বিসদৃশ বিজন বন। বিজন বনেও পশুদিগের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ, স্বজাতিস্বজন পরিদর্শন ক্ষমতা আছে বন্দীখানার বন্দীর ভাগ্যে তাহাও নাই। সুতরাং বাধ্য বাধকতা অধীন- অধীনাত সংস্রবে স্বর্গসুখও মহা যন্ত্রণাদায়ক। যন্ত্রণাদায়ক কেন? সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আমূল পরিচ্ছেদক।

বন্দীর মনে নানা ভাব, নানা চিন্তা, নানা কথা কাহারও অন্তরে আত্মগ্লানির মহা বেগ শতধারে ও সহস্র প্রকারে ছুটিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থান পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে। কাহারও অনুতাপানল আক্ষেপ ইন্ধনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তেজে রসনা আশ্রয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেহ মনের কথা মন- ভারে মনে মনে চাপিয়া হৃদয়ের রক্ত সমধিক হা- হুতাশে জলে পরিণত করিতেছে, কাহারও প্রতি লোমকুপ হইতে সে হা-হুতাশকৃত জলের কথঞ্চিৎ অংশ ঘর্মচ্ছলে বহির্গত হইয়া অবসাদে নির্জীবপ্রায় করিতেছে। কেহ গত কথা স্মরণ করিয়া বন্দীখানাস্থিত মনুষ্যঘাতী জল্লাদের কুঠার হস্তে দন্ডায়মান উচ্চ মঞ্চের উপরিভাগ প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিয়া মস্তিষ্কে মজ্জা পরিশুষ্ক করিতেছে। বন্দীমাত্রই যে ন্যায় ও যথার্থ বিচারে দন্ডিত তাহা নহে। ভ্রান্তি ভ্রম মানবেই সম্ভব ইহাও নিশ্চয় নির্ভুল অন্তর জগতে নাই। ভ্রমশূন্য মজ্জাও মানুষে নাই। ইহার পর নিরপেক্ষ সদ্বিচারক সংখ্যা অতি অল্প। কত বন্দী ভ্রমে পক্ষপাতিত্বে অনুরোধে বিভ্রাটে আজীবন ফাটকে আটক রহিয়াছে।

পাঠক! এই তো আপনার সম্মুখে দামেস্ক-কারাগারের অঙ্কিত চিত্র। সুবিচার অবিচার, হিংসা- দ্বেষে কত বন্দী কত স্থানে কত প্রকার শাস্তি ভোগ করিতেছে, বন্দীখানার তুল্য কোন স্থানই জগতে নাই! প্রহরীদল মানবাকার হইলেও স্বভাব ও ব্যবহারে পশু হইতে নীচ! তাহাদের শরীর সে রক্ত মাংস হৃদয় সংযোগে গঠিত ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটুকুই তাহাদের রাজ্য। সে রাজ্যের অধীশ্বরই তাহারা। প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করার কল্যাণে, রাক্ষসভাব, পশুভাব অমানুষিকভাব আসিয়া তাহাদের মস্তকে নির্ভর করিয়াছে। দয়া, মায়া, অনুগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া পড়িয়াছে। মুখখানিও রসনা সহকারে এমনই বিকট ভাব ধারণ

করে যে কর্কশ নীরস অন্তর্ঘাতী, মর্মপীড়িত নিদারুন বাক্য– রোগে সর্বদা বন্দীদিগকে জর্জরিত করিতে থাকে। তদুপরি যথা অযথা যন্ত্রণা– পদাঘাত– দন্ডাঘাত বন্দীভাগ্যে কথায় কথায় হইতে থাকে; দামস্কে নগরে এজিদের বন্দীগৃহ নরক হইতেও ভয়ানক। শাস্তির মাত্রাও সেই প্রকার। ক্রমে দেখিতে পাইবেন বিধির বিধানে এজিদ আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, প্রভু হোসেন পরিবার জয়নাল আবেদীন প্রভৃতি সকলেই ঐ বন্দীখানায় বন্দী। কিন্তু ইহাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তির বিধান নাই। পৃথক খন্ডে– ভিন্ন কক্ষে ইহাদের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বন্দীগৃহের প্রধান অধ্যক্ষ হস্তে। তিনি যে সময় বিবেচনা করেন, সেই সময় শুষ্ক রুটি এবং এক পাত্র জল যাহা বরাদ্দ আছে তাহাই দিতে অনুমতি করেন। অন্য অন্য বন্দীর ভাগ্যে তাহাও নাই।
পাঠক, ঐ দেখুন, দামেস্ক বন্দীগৃহে শাস্তির চিত্র দেখুন। অধিক ক্ষণ দেখাইব না। কোন চক্ষু এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিতে ইচ্ছা করে? তবে মহারাজ এজিদের বিচার চিত্র অনেক দেখিয়াছেন বন্দীখানার চিত্রও কিছু দেখুন।
ঐ দেখুন, জীবন্ত নরদেহ লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া কি ভয়াবহ রূপ ধারণ কারিয়াছে অত্যাচারে, অনাহারে, অনিয়মে শরীর জীর্ণ বর্ণ বিবর্ণ চক্ষু কোটরে জিহ্বা তালু শুষ্ক কণ্ঠ নীরস মুখাকৃতি বিকৃত শরীর অন্তঃসারশূন্য অস্থিপুঞ্জের সমাবেশ। কাহার হস্তপদে জিঞ্জির, কাহার হস্তপদ মৃত্তিকার সহিত জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কোন বন্দী মৃত্তিকা শয্যায় শায়িত অথচ হস্ত পদ লৌহশৃঙ্খলে লৌহ পেরেকে ভূতলে আবদ্ধ। কাহার বক্ষঃস্থল পর্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত কাহারও গলদেশ পর্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত। ঐ দিকে দেখুন! নরাকার রাক্ষসগণ হাসিতে হাসিতে জীবের জীবন্ত অঙ্গ হইতে সুতীক্ষ্ণ চুরিকা দ্বারা কেমন করিয়া চর্ম ছাড়াইতেছে লবণ মাখাইতেছে সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু টানিয়া বাহির করিতেছে। দেখুন, দেখুন লৌহশলাকা উত্তপ্ত– লৌহশলাকা মানুষের হাতে পায়ে হাতুড়ীর আঘাতে বসাইয়া মৃত্তিকার সহিত কিভাবে আঁটিয়া দিতেছে। এ সময়ে তাহাদের প্রাণ কি বলিতেছে তাহা কি ভাবা যায় না সহজ জ্ঞানে বোঝা যায়? হস্ত-পদ মৃত্তিকার সহিত্ লৌহ পেরেকে আবদ্ধ বক্ষে পাষাণ চাপা, চক্ষু উর্দ্ধে কোন দিকে দৃষ্টির ক্ষমতা নাই দৃষ্টি কেবল অনন্ত আকাশে! আরও দেখুন, পা দুখানি কঠিনরূপে উর্ধ্বে বাধা মস্তক নিম্নে হস্তদ্বয় ঝুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; জিহবা মুখ হইতে বাহির হইয়া নাসিকা ঢাকিয়া চক্ষুর উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু উল্টাইয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হইতেছে; ইহাতেও নিস্তার নাই, সময়ে সময়ে দোররার আঘাতে শরীরের চর্ম ফাটিতেছে। রক্ত পড়িতেছে। কি মর্মঘাতী অন্তরভেদী ভীষণ ব্যাপার! আর দেখা যায় না। চলুন, অন্যদিকে যাই।
ঐ যে বৃদ্ধ বন্দী-লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিবিষ্টচিত্তের ধ্যানে মগ্ন, হাব-ভাব দেখিয়া যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে। কোথায় যেন দেখিয়াছি, মনে পড়ে। অনুমান মিথ্যা নহে। এই মহাত্মা মন্ত্রিপ্রবর হামান, হযরত মাবিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এজিদের পুণ্যাত্মা পিতার প্রিয় সচিব মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ হামান, এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী-লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ! বৃদ্ধ বয়সে এই যন্ত্রণা! মন্ত্রী-প্রধান হামান কি যথার্থ বিচারে বন্দী? মহারাজ এজিদ কি অপরাধে ইহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাহা কি মনে হয়? হানিফার সহিত যুদ্ধে অমত, দামেস্কাধিপতির স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অমত প্রকাশ এজিদের মতের সহিত অনৈক্য-

সুতরাং এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী। দামেস্ক নগরের ভূতপূর্ব দণ্ডধর হযরত মাবিয়ার দক্ষিণ-হস্তই ছিলেন-এই হামান। এজিদের হস্তে পড়িয়া মহাঋষির এই দুদর্শা! হায় রে জগৎ! হায় রে স্বার্থ! দামেস্ক-সিংহাসনের চির-গৌরবসূর্য এজিদ-কল্যাণে অস্তমিত!

পিতার মাননীয়- পিতার ভালবাসার পাত্রকে কোন পুত্র অবজ্ঞা করিয়া থাকে? হামানের চিন্তা ভ্রম– সঙ্কুল ছিল না। আশা ও দুরাশার পথে অযথা দন্ডায়মান হইয়া কুহকে মাতিয়া ছিল না কারণ এ আশা মানুষেরই হয়। মানুষের দৃষ্টান্তেই মানুষ শিক্ষা পায়। আশা ছিল,– মন্ত্রিপ্রবরের মনে আশা ছিল, এজিদ মাবিয়ার সন্তান, পিতৃ-অনুগৃহীত বলিয়া অবশ্যই দয়া করিবে বৃদ্ধ বয়সে নবীন রাজপ্রসাদে সুখী হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর–আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া যাইবে। নিয়তির বিধানে তাহা ঘটিল না। অথচ এজিদের স্বেচ্ছাচার– বিচারে বৃদ্ধ বয়সে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইল। শুনুন মন্ত্রিপ্রবর মৃদু মৃদু স্বরে কি কথা বলিতেছেন।

"রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ– বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবদুর্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশা– সাগরে ভাসিতে হয় না–আশা থাকে। রাজার মজ্জা– দোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশায় মন্ত্রণাদাতাগণ অবিচার অত্যাচার নিবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে– সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয়না। স্বাধীনতা সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় বড়ই ভাগ্যের কথা।

"রাজা আর রাজ্য এই দুইটি পৃথক কথা– পৃথক ভাব– পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি দোষে অপদস্থ হউন, সৎযুক্তি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পর– পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচরিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্যানুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, সুমন্ত্রণা– বিদ্বেষী, নীতি– বিবর্জিত, উচিতে বিরক্তি, এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বরে ধ্বংস হয় ততই মঙ্গল ততই রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা। দামেস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয় বাসনায়, পরিণয়–ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না, সে মনঃকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজা–রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যে পরিমাণ জ্ঞান থাকে, একতা–বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বৈরীভাব না থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা ও ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের

প্রতি সর্বদা লক্ষ্য থাকে আলস্য, অবহেলা এবং শৈথিল্যে বিরোধী যদি কেহ থাকে চেষ্টা থাকে, বিদ্যার চর্চা থাকে আর সর্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে তবে যুগ-
যুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক সহস্রাধিক বর্ষ গত হউক, কোন কালে হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতা গগনে স্বাধীনতা সূর্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে কিন্তু দামেস্ক রাজ্যে সে আশা- আশা- মরীচিকা। দামেস্ক বীরশূন্য। দামেস্ক চিন্তাশীল দেশহিতৈষী মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। সে উপকরণে গঠিত কোন মস্তক আছে কিনা, তাহাতেই বিশেষ সন্দেহও হইবে কি না, তাহাতেও নানা সন্দেহ।

"যে দিন রমনী- মুখচন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণীপতির মস্তক ঘুরিয়াছে, মহীপাল এজিদের মহাশক্তি সম্পন্ন মজ্জা পরকর শোভিত মর্দিত কমলদলের মুমূর্ষ অবস্থার ঈষৎ আভায় গলিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই দিন নিরাশার সঞ্চার হইয়া স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটিয়াছে। রাজার আচার রাজার ব্যবহার প্রজার আদর্শ এবং শিক্ষার স্থল। যে রাজ চক্ষুমোহাম্মদ হানিফার সুতীক্ষ্ণ তরবারির জ্বলন্ত তেজ সহ্য করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। সে অসীম বলশালী মহাবীরের অস্ত্রাঘাত কি রূপজ মোহে ঘূর্ণিত মস্তক সহ্য করিতে পারে? কখনই নহে। আর আশা কি?- কামিনী কটাক্ষশরে জর্জরিত হৃদয়ের আশ্বাস জন্য রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকারণ রণবাদ্য বাজাইতে যে মন্ত্রী মন্ত্রণা দেয় সে মন্ত্রী গাজী রহমানের মন্ত্রণা ভেদ করিয়া অকারণ কৃতকার্য হইতে কোন কালেও ক্ষমতাবান হইবে না, কখনই গাজী রহমানের সমকক্ষ হইতে পারে না। যদি যুদ্ধই ঘটিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই পরাভব- নিশ্চয়ই দামেস্কের অধঃপতন- নিশ্চয়ই দামেস্কের সিংহাসনে জয়নাল আবেদীন নিশ্চয়ই এজিদের মৃত্যু মারওয়ানের মনোগত আশা বিফল। পিরীত, প্রণয়, প্রেম, এই তিন কারনেই আজ দামেস্কের এই দুর্দশা! কি ঘৃণা! কি লজ্জা!!

"বৃদ্ধ বয়সে অবিচারে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আকুলিত হই নাই। যতদূর বুঝিয়াছি, বলিয়াছি। আমার ভ্রম দর্শাইয়া ইহা অপেক্ষা শত গুণ শাস্তি দিলেও ক্ষোভের কারণ ছিল না। উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট, এ কথা নূতন নহে। প্রকাশ্য দরবারে মত জিজ্ঞাসা করায় বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা আসিয়াছে, বলিয়াছি। ইহাই তো অপরাধ, ইহাতেই বন্দী, ইহাতেই পিঞ্জ আবদ্ধ! কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কারণ মূর্খ, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর, আকাংখী, স্বেচ্ছাচারী ও রোষপরবশ রাজার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে? প্রাণদন্ডের আদেশ হয় নাই, ইহাই শত লাভ, সহস্র প্রকারে ঈশ্বরে ধন্যবাদ!"

"ভাল কথা-ওমর আলী বন্দী হওয়ার কথাই শুনিলাম, প্রাণবধের কথা তো শুনিলাম না। শূলে জয়নাল আবেদীনের প্রাণদন্ড হইবে, ঘোষণার কথাই কানে প্রবেশ করিল,শেষ আর কেহ বলিল না। সংবাদ কি? এ অন্যায় যুদ্ধের পরিণাম কি হইতেছে, কি ঘটিতেছে, কোন বীর কেমন তরবারি চালাইতেছে, বর্শা উড়াইতেছে, তীর চালাইতেছে, কৈ-কেহই তো কিছুই বলে না! আমাদের পক্ষের অতি সামান্য সামান্য শুভ-সংবাদ লোকের মুখে ক্রমে অসামান্য হইয়া উঠে। কৈ-এ কয়েক দিন ভালমন্দ কোন সংবাদই তো শুনিতে

পাই না? মন্দ কথা কানে আসিবার কথা নহে– ভাল কথার যখন একটা বর্ণও প্রকাশ হইতেছে না, তখন আর কি বলি।

"যুদ্ধকান্ড বড়ই কঠিন! সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে সর্বস্ব বিনাশ, লক্ষ লক্ষ প্রাণী প্রাণ মুহূর্তে ধ্বংস। বড়ই কঠিন ব্যাপার! দামেস্ক রাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এ সময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। যুদ্ধের কারণ দেখিতে হইবে, লাভালাভের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণও বুঝিতে হইবে, ধনাগারের অবস্থাও ভাবিতে হইবে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পুরবাসী প্রতিবেশী, সমকক্ষ, সমশ্রেণী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং রাজ্যের গণমান্য ধনী ও সাধারণ প্রজার মনের ভাব বিশেষ করিয়া অতি গোপনে অতি কৌশলে পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল ধনভান্ডার খুলিয়া দিয়াই চক্ষু শীতল করিলে চলিবে না। আহার্য সামগ্রী–কেবল মানুষের নয় গরু ঘোড়া ইত্যাদি পালিত জীবজন্তুসহ নগরস্থ প্রাণীমাত্রের কত দিনের আহার মজুত, প্রাণীর পরিমাণ, আহার্য সামগ্রীর পরিমাণ, আনুমানিক যুদ্ধকালের পরিমাণ করিয়া সমুদয় সাব্যস্ত, বন্দোবস্ত, আমদানি, রপ্তানি, পানীয়জলের সুবিধা পর্যন্ত করিয়া– তবে অন্য কথা।

"এ যুদ্ধে এ কথাটা অগ্রেই ভাবা উচিত ছিল। মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা বহু দূর হইতে আক্রমণ আশায় আসিয়াছেন। ভিন্ন দেশ, তাঁহার পক্ষে সহসা প্রবেশই অসাধ্য। ইহার পর নগর আক্রমণে আশা–। রাজবন্দী গৃহ হইতে পরিজনগণকে উদ্ধারের আশা– এজিদ– বধ করিয়া দামেস্ক সিংহাসন অধিকার করিবার আশা– এক একটি আশা কম পরিমাণের আশা নহে। কথাচ্ছলে আমি ইহাকে এক প্রকার দুরাশাও বলিতে পারি, কারণ রাজ্যের সীমাই যুদ্ধের সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া নগরের প্রান্তভাগের প্রান্তরে এজিদের মহাকাল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! এক গাজী রহমানের বুদ্ধিকৌশলে সকল বিষয়ে সুন্দর বন্দোবস্ত। যাহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল, তাহাও তাহারা অনায়াসেই সুসিদ্ধ করিয়াছে। রাজ্য– সীমায় প্রবেশ দূরে থাকুক– নগরের প্রান্তসীমায় রণভূমি আর, আশা কি?

"অন্যায় সমরে রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে! কি পরিতাপ! যে রাজা রাজনীতির বাধ্য নহে, সমরনীতির অধীন নহে, স্বেচ্ছাচারিতাই যাহার মস্তিস্কের বল, তাহার কি আর মঙ্গল আছে? প্রণয়, প্রেমে, যে রাজা আসক্ত, তাহার কি আর শ্রীবৃদ্ধি আছে? যুদ্ধবিগ্রহে পিরীত প্রণয়ের প্রসঙ্গ আসিতেই পারি না। মূল কারণ হওয়া দূরে থাকুক, সে নামেই সর্বনাশ! রাজনীতি, সমরনীতি এই দুইটি নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যত জ্ঞানলাভ হইবে, যত অভিজ্ঞতা জন্মিবে ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহার মধ্যে কি না আছে। জগতেরে সমুদয় ভাব স্বভাব, ব্যবহার কার্যপ্রণালী সমুদয় ঐ দুই নীতির মধ্যগত। কিন্তু ব্যবহার ক্ষমতা পরিচালনার বল কার্যে পরিণত করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে জগতে কোন প্রাণীর মস্তকে আছে কি না সন্দেহ।

"এ ধর্মনীতির কথা নহে যে, ঘাড় নোওয়াইয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে যে, কালে হইবেই হইবে। এ প্রসূতির প্রসব– বিষয়ে চিন্তা নহে যে, দশ মাস দশ দিন পরে যাহা হয় একটা হইবেই হইবে।এ অদৃষ্ট–লিপির প্রতি নির্ভরের কার্য নহে, যাহা কপালে লেখা আছ তাহাই ঘটিবে। এ রাজচক্র; ইহার মর্মভেদ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সমর–কান্ড। যেমন কুটিল, তেমনি জটিল। যখনই প্রশ্ন তখনই উত্তর যে

মুহূর্তে চিন্তা, সেই মুহূর্তেই কার্য, তখনই কার্যফল। দ্রুতগতি সময়ের সহিত সমরকান্ডের কার্য-সম্বন্ধ। বুদ্ধির কৌশল, বিবেচনার ফল। জয়-পরাজয়ের সময় অতি সংক্ষেপ। দক্ষিণ চক্ষু দেখিল, বীরবরের হস্তস্থিত তরবারি বিদ্যুৎ লতায় চমকিতেছে বাম চক্ষু দেখিল, ঐ মহাবীরের রঞ্জিত দেহ ভূতলে গড়াইতেছে, রঞ্জিতহস্তে রঞ্জিত তরবারি বদ্ধমুষ্টিতে ধরাই রহিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের যে কি ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন। আমার সময় মন্দ। কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, কাহারও মুখে কিছু শুনিতে পাই না। মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন বন্দী হইয়াছি। লৌহশৃঙ্খল গলায় পরিতে হুকুম দিয়াছেন, হুকুম তামিল কারিয়াছি। দুঃখমাত্রও নাই, অন্তরেও বেদনা বোধ করি নাই। তবে বেদনা লাগিয়াছে যে, এই সঙ্কট সময়ে অকারণ যুদ্ধে অগ্রসর-স্বয়ং রাজা অগ্রসর, স্বয়ং অস্ত্রধারণ! বড়ই দুঃখের কথা! এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইল? কে হারিল, কে জিতিল? সন্ধি-অসম্ভব! যুদ্ধ অনিবার্যরূপে চলিতেছে, সমর গগনে লোহিত নিশান বায়ুর সাহিত এখনও খেলা করিতেছে। সন্দেহমাত্র নাই। আমার তো এই বিশ্বাস যে, দামেস্ক সৈন্যশোণিতে দামেস্ক প্রান্তরই রঞ্জিত হইতেছে। দামেস্ক- ভূমি দামেস্ক- বীর শিরেই পরিপূর্ণ হইতেছে। এ অবৈধ সমরে সন্ধির নামই আসিতে পারে না। এজিদ হানিফার রণক্ষেত্রে শুভ্র নিশান উড়িতেই পারে না। বড়ই শক্ত কথা!"

মন্ত্রিপ্রবর হামান মনের কথা এইরূপে অকপটে মুখে প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বাররক্ষক দ্রুতপদে মন্ত্রিপ্রবরের নিকট আসিয়া চুপে চুপে কি কথা বলিতে লাগিল। বন্দী সচিব- তাহার মুখে কোন কথাই প্রকাশ হইল না। দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল- দীর্ঘ নিঃশ্বাস! পাঠক! চুপি চুপি কথা আর কিছু নহে, আমাদের জানা কথা- গত কথা যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন এই সংবাদ।

চলুন, অন্য দিকে যাওয়া যাক-শুনিতেছেন? শুনিতে পাইতেছেন? স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন? কি কথা, একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

"বাবা জয়নাল! তুই যে বন্দীখানা হইতে পলাইয়াছিস-বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস বাপ! আর দেখা দিস না। কখনই কাহার নিকট দেখা দিস না! তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ! তোকে বুকে করিলে বুক শীতল হয়! চক্ষু জুড়ায় তুই আমাকেও দেখা দিস না। (উচ্চৈঃস্বরে) জয়নাল! তুই আমার- তুই আমার কোলে আয়। এ বন্দীখানায় কি অপরাধে অপরাধী হইয়া বন্দী হইয়াছি- দয়াময় ঈশ্বরই জানেন কতকাল এই ভাবে থাকিতে হইবে, তাহাও তিনিই জানেন। জয়নাল, তোর মুখখানির প্রতি চাহিয়াই এত দিন বাঁচিয়া আছি। তুই ইমাম বংশের একমাত্র সম্বল, মদিনার রাজরত্ন। তোর ভরসাতেই আজ পর্যন্ত দামেস্ক-বন্দীগৃহে তোর চিরদুঃখিনী মা প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। পবিত্রভূমি মদিনা পরিত্যগ করিয়া যে দিন কুফায় গমন করিতে পথে বাহির হইয়াছি, সেই দিন হইতেই সর্বনাশের সূচনা হইয়াছে। কত পথিক দূর দেশে যাইতেছে, কত রাজা সৈন্যসামন্তসহ বন, জঙ্গল, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গিরিগুহা অনায়াসে পার হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে যাইতেছে। ভ্রম নাই- পথশ্রান্তি নাই-স্বচ্ছন্দে যাইতেছে, আসিতেছে কোন রূপ পথ-বিঘ্ন নাই, বিপদ নাই, কথা নাই। হায়, আমাদের কি দুর্ভাগ্য! দিনে দুই প্রহরে ভ্রম! মহাভ্রম! কোথায় কুফা! কোথায় কারবালা! সেখানে যাহা

ঘটিবার ঘটিল। আত্মঘাতী হইলাম না, প্রাণও বাহির হইল না, কেন হইল না? বাপ! তোর মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দীখানাতেও তোরই মুখখানি দেখিয়া কিছু করি নাই। তুই দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন অঞ্চলের নিধি! তোর দশা কি ঘটিল? হায়, হায়, কেন তুই ওমর আলীর প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া বন্দীগৃহ হইতে বাহির হইলি? আমার মন অস্থির- বিকার- প্রাপ্ত। কি বলিতে কি বলি তাহার স্থিরতা নাই। বন্দীখানায় থাকিলে দুর্দ্দান্ত পিশাচ মারওয়ানের হস্ত হইতে তোকে কখনই রক্ষা করিতে পারিতাম না; আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইত। হায়! হায়! সে সময়ে তোর মুখের দিকে চাহিয়া আমার কি দশা ঘটিত বাপ তুই বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস। এজিদ জীবিত থাকিতে লোকালয়ে আসিস না। বনে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিস এবং বনের ফল, মূল, পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিস। কখনও লোকালয়ে আসিস না। আর না হয়, যে দেশে এজিদের নাম- নাই তোর নাম- নাই সে দেশে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাস। তাহাতেও শাহরে রানুর প্রাণ শীতল থাকিবে।"

এ কি! প্রহরিগণ ছুটাছুটি করে কেন? প্রহরিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে! যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতে ছুটিয়াছে। পরস্পর দেখা হইতেছে, কথা হইতেছে, কিন্তু বড় সাবধানে চুপে চুপে কথা কহিতেছে- পরামর্শ- করিতেছে সাবধান হইতেছে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে। কেন? কি সংবাদ? দেখুন- কি আশ্চর্য দেখুন। একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানের কানে চুপি চুপি কি কহিয়া ঐ দেখুন কি করিল! দ্রুতহস্তে লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিল এবং হোসেন পরিবার ব্যতীত অন্য অন্য বন্দিগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সত্বরে বাহির করিয়া দিল। বন্দিগণ অবাক! কেহ কোন কথা কহিতেছে না। সকলেই যেন ব্যস্ত। পলাইয়াতে পারিলেই রক্ষা- জীবন রক্ষা।

দ্বিতীয় প্রবাহ

সমরাঙ্গণে পরাজয়-বায়ু একবার বহিয়া গেলে, সে বাতাস ফিরাইয়া বিজয়-নিশান উড়ান বড় শক্ত কথা। পরাজয়- বায়ু হঠাৎ চারিদিক হইতে মহাবেগে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে না; প্রথমতঃ মন্দ মন্দ গতিতে রহিয়া রহিয়া বহিতে থাকে, পরে ঝঞ্ঝাবাতসহ তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া এক পক্ষকে উড়াইয়া দেয়। জেতৃপক্ষের ঘন ঘন হুঙ্কারে অস্ত্রের চাকচিক্যে মহাবীরের হৃদয়ও কম্পিত হয়। হতাশে বুক ফাটিয়া যায়।

আজ দামেস্ক প্রান্তরে তাহাই ঘটিয়াছে; মদিনার সৈন্যদিগের চালিত অস্ত্রের চাকচিক্যে এজিদ- সৈন্য ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছে। তাহার- আসমানে কি জমিনে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছে না।তবে বিপক্ষগণের অস্ত্রের ঝনঝন শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া রণরঙ্গের কথা তাহাদের মনে পড়িতেছে বটে কিন্তু সে সময় প্রাণভয়ে প্রাণ চতুর্গুণ আকুল হইতেছে; দেখিতেছে যেন প্রান্তরময় বৃষ্টিপাত হইতেছে। গগনস্থ ঘনঘটা হইতে বৃষ্টি হইতেছে না। সে রক্তবৃষ্টি মেঘ হইতে ঝরিতেছে না। ঝরিতেছে দামেস্ক সৈন্যের শরীর হইতে! আর ঝরিতেছে- আম্বাজী সৈন্যের তরবারির অগ্রভাগ হইতে। মেঘ- মালার খন্ড খন্ড অংশই শিলা তাহারও অভাব হয় নাই খন্ডিত দেহের খন্ড খন্ড অংশই সে- ক্ষেত্রে শিলারূপ দেখাইতেছে।

দামেস্ক-প্রান্তর দামেস্ক-সৈন্য শোণিতেই ডুবিয়াছে। রক্তের ঢেউ খেলিতেছে, মহাবীর হানিফার সম্মুখে যে সৈন্যদলই পড়িয়াছে, সংখ্যায় যতই হউক, তৃণবৎ উড়িয়া খন্ডিত দেহে ভূতলশায়ী হইয়াছে। সে রঞ্জিত তরবারির ধারে খন্ডিত দেহের রক্তধার ধরনী বহিয়া মরুভূমি সিক্ত করিয়া প্রান্তরময় ছুটিতেছে। কিন্তু হানিফার মনের আগুন নিভিতেছে না মদিনাবাসীর ক্রোধানল একটুও কমিতেছে না।

প্রভু হোসেনের কথা, কারবালা প্রান্তরে এক বিন্দু জলের কথা, হোসেনের ক্রোড়স্থিত শিশুসন্তানের কোমল বক্ষ ভেদ করিয়া লৌহ তীর প্রবেশের কথা মনে হইয়া হানিফার প্রাণ আকুল কারিয়াছে। বিস্ফোরিত চক্ষে রোষাগ্নির তেজ বহিয়া অবশেষে বাষ্পবারি বহাইয়া তাহাকে এক প্রকার উম্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। কৈ এজিদ? কৈ সে দুরাত্মা এজিদ? কৈ সে নরাধম এজিদ! কৈ এজিদ? কৈ এজিদ? মুখে বলিতে বলিতে এজিদ- অম্বেষণে অশ্বের কষাঘাত করিয়াছেন। সে মূর্তি এজিদের চক্ষে পড়িতেই এজিদ ভাবিয়াছিলেন যে এ মহাকালের হস্ত হইতে আর রক্ষা নাই পলায়নই শ্রেয়ঃ। বীরের ন্যায় বক্ষবিস্তারে হানিফার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া "আমি এজিদ- আমিই সেই মদিনার মহাবীরগণের কালস্বরূপ এজিদ। হানিফা! আইস, তোমাকে ভবযন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিই" এই সকল কথা বলা দূরে থাকুক, যেই দেখা অমনই পলায়নের চেষ্টা- প্রাণ ভয়ে দামেস্করাজ অশ্বারোহণ করিয়া যথাসাধ্য অশ্ব চালাইতেছেন।

হানিফাও এজিদের পশ্চাৎ দুলদুল চালাইয়াছেন। এই দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই। রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীর সকল একথা অনেকেই শুনেন নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাও তাহার পর কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে এ পর্যন্ত কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। কোন সন্ধানী সন্ধান আনিতে পারে নাই।

এদিকে মসহাব কাক্কা ওমর আলী আক্কেল আলী (বাহরাম) প্রভৃতি মহামহিম যোধসকল কাফেরদিগকে পশুপক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছ বধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাজী রহমানের পূর্ব্বচন সফল হইল। এজিদ সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইয়াও প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেছে না। অশ্বের দাপটে, তরবারির আঘাতে, বর্শার সূক্ষ্মাগ্রে, তীরের লক্ষ্যে, গদার প্রহারে, খঞ্জরের দুধারে প্রাণ হারাইতেছে। কত শিবির, কত চন্দ্রাতপ, কত উষ্ট্র, কত অস্ত্র, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় হুহু শব্দে পুড়িয়া ছাই হইতেছে।এজিদপক্ষের জীবন্ত প্রাণী আর কাহারও চক্ষে পড়িতেছে না। দৈবাৎ দেখা পাইলে মার মার শব্দে চারিদিক হইতে হানিফার সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া ক্রীড়া কৌতুক হাসি রহস্য করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। ক্রোধের ইতি নাই, মার মার শব্দের বিরাম নাই। সময়ে সময়ে মুখে সেই হৃদয়বিদারক, মর্মঘাতী কথা কহিয়া কাঁদিতেছে, জগৎকে কাঁদাইতেছে। হায় হোসেন! হায় হোসেন! তোমরা আজ কোথায়? সে মহাপ্রান্তর কারবালা কোথায়? ফোরাতের উপকূল কোথায়? যে সৈন্যদল ফোরাতের জল লইতে পথ বন্ধ করিয়াছিল, তাহারাই বা কোথায়? কৈ এজিদের সৈন্য? কৈ এজিদ? কৈ তাহার শিবির? কিছুই তো চক্ষে দেখিতেছি না; প্রভু হোসেন তুমি কোথায়? এ দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। অহো! কাসেম মদিনার শ্রেষ্ঠ বীর কাসেম এক বিন্দু জলের জন্য হায়! হায়! এক বিন্দু জলের জন্য কি না ঘটিয়াছি। উহু কি নিদারুন কথা!

পিপাসায় কাতর হইয়া প্রভুপুত্র আলী আকবর পিতার জিহবা চাটিয়াছিল। হায় হায় সে দুঃখ তো কিছুতেই যায় না। কারবালার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। সে দিন রক্তের ধারা ছুটিয়া কারবালা প্রান্তর ডুবিয়াছে। আজ দামেস্ক- প্রান্তর দামেস্ক- সৈন্য শোণিতে ডুবিতেছে. দামেস্ক- রাজ্য মদিনার সৈন্য পদতলে দলিত হইতেছে। কিন্তু আশা মিটিতেছে না সে মনোবেদনার অণুমাত্রও উপশম বোধ হইতেছে না। বুঝিলাম- হোসেন- শোক অন্তর হইতে অন্তর হইবার নহে; মানিলাম কারবালার ঘটনা, মদিনায় মায়মুনার কীর্তি জাএদার আচরণ জগৎ হইতে একেবারে যাইবার নহে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র যত দিন জগতে থাকিবে ততদিন তাহা সকলের মনে সমভাবে জ্বলন্তরূপে বিষাদ-কালিমা-রেখায় অঙ্কিত থাকিবে।

সমরাঙ্গনে অস্ত্রাগ্নি নির্বাণ হইয়াছে কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। উর্ধ্বে অগ্নিশিখা- নিম্নে রক্তের খেলা । রক্তমাখা দেহ সকল রক্তস্রোতেই ভাসিতেছে ডুবিতেছে গড়াইয়া যাইতেছে।

সৈন্যদলসহ মসহাব কাক্কা প্রভৃতি নগরের নিকট পর্যন্ত আসিলেন। শত্রুপক্ষীয় একটা প্রাণীও তাঁহাদের চক্ষে আর পড়িল না। জয়নাল আবেদীনসহ গাজী রহমান নগর প্রবেশ- দ্বার পর্যন্ত যাইয়া হানিফা অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাক্কার দল আসিয়া জুটিলেই "জয় মদিনাভূপতির জয়! জয় জয়নাল আবেদীনের জয়।" ঘোষণা করিতে করিতে বীরদর্পে নগরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য বাধা দেয়? কে মাথা উঠাইয়া সে বীরগণের সম্মুখে বক্ষ বিস্তারে দন্ডায়মান হয়? কাহার সাধ্য একটি কথা কহিয়া সরিয়া যায়? জনপ্রাণী দ্বারে নাই। রাজ পথেও কোন লোক কোন স্থানে কোন কার্যে নিয়োজিত নাই। পথ পরিস্কার- জনতা কোলাহলের নাম মাত্র নাই। কেবল স্বদল- মধ্যে, মধ্যে মধ্যে মার মার কাট কাট "জয় জয়নাল আবেদীন" "জয় মোহাম্মদ হানিফা" আর বহু দূরে প্রাণ ভয়ে পলায়নের কোলাহল আভাস। শত্রু-হস্তে ধন মান প্রাণ রক্ষা হইবে না ভাবিয়া অনেকেই ঘর- বাড়ি ছাড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, রক্ষার উপায় ভাবিতেছে। পরস্পরে এই সকল কথা ডাকা হাঁকা প্রস্থানের লক্ষণ, অনুমানে অনুভূত হইতেছে। বিনা যুদ্ধে বিনা বাক্যব্যয়ে গাজী রহমান মহা মহা বীরগণ ও সৈন্যগণসহ জয়নাল আবেদীনকে লইয়া সহস্রমুখে বিজয় ঘোষণা করিয়া দীন মোহাম্মদী নিশান উড়াইয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া সিংহদ্বার পার হইলেন।

যেখানে সমাজ, সেইখানেই দল। যেখানে লোকের বসতি, সেই খানেই গোলযোগ- সেইখানেই পক্ষাপক্ষ, সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা! যেমন এক হস্তে তালি বাজিবার কথা নহে, তেমনই দলাদলি না থাকিলেও কথা জন্মিবার কথা নহে। কথা জন্মিলেই পরিচয়, স্বপক্ষ বিপক্ষ সহজেই নির্ণয়। সে সময় খুঁজিতে হয় না- কে কোন পথে কে কোন দলে।

এজিদ দামেস্কের রাজা । প্রজামাত্রই যে মহারাজগত প্রাণ,-অন্তরের সহিত রাজানুগত-সকলেই যে তাঁহার হিতকারী তাহা নহে, সকলেই যে তাহার দুঃখে দুঃখিত তাহা নহে। দামেস্ক- সিংহাসন পরপদে দলিত হইল ভাবিয়া সকলেই যে দুঃখিত হইয়াছে, চক্ষের জল ফেলিয়াছে, সকলের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাও নহে। অনেক পূর্ব হইতেই হযরত মাবিয়ার পক্ষীয়, প্রভু হাসান- হোসেনের ভক্ত রহিয়াছে।

আজ পরিচয়ের দিন পরীক্ষার দিন। সহজে নির্বাচন করিবার এই উপযুক্ত সময় ও অবসর।

জয় ঘোষণা এবং বিজয় বাজনার তুমুল রবে নগরবাসীরা ভয়ে অস্থির হইল। কেহ পলাইবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কেহ যথাসর্বস্ব ছাড়িয়া জাতি মন প্রাণ বিনাশ- ভয়ে দীন- দরিদ্র- বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কেহ ফকির দরবেশ কেহ বা সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করিয়া জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিল। কেহ আনন্দবেগ সংবরণে অপারগ হইয়া "জয় জয়নাল আবেদীন!" মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে জাতীয় সম্ভাষণ জাতীয় ভাব প্রকাশ করিয়া, গাজী রহমানের দলে মিশিয়া চিরশত্রু বিনাশের বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল। কাহারও মনে দারুন আধাত লাগিল "জয় জয়নাল আবেদীন" কথাগুলি শেলসম অন্তরে বিধিতে লাগিল কর্ণেও বাজিল। সাধ্য নাই, নগর রক্ষার কোন উপায় নাই; রাজবলের কোন লক্ষণই নাই। আর উপায় কি? পলাইয়া প্রাণরক্ষা করাই কর্তব্য যথাসাধ্য পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। যাহারা জয়নাল আবেদীনের দলে মিশিল না কাফের বধে অগ্রসর হইল না পলাইবার ও উপায় পাইল না, তাহাদের ভাগ্যে যাহা হইবার হইতে লাগিল। বিপক্ষদলে জাতক্রোধে এবং সৈন্যদলের আন্তরিক মহারোষে অধিবাসীরা যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে লাগিল। সন্তানসন্ততি লইয়া ত্রস্তপদে যাহারা পলাইতে পারিয়াছিল, প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া গুপ্ত পথে, কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইল, তাহারাই বাঁচিল। বাড়িঘরের মায়া ছাড়িতে জন্মের মত জন্মভূমি হইতে বিদায় লইতে যাহাদের একটু বিলম্ব হইল, তাহাদের প্রাণবায়ু মুহূর্তমধ্যে অনন্ত আকাশে শূন্যে উড়িয়া গেল। কিন্তু জন্মভূমির মায়াবশে দেহ দামেস্কেই পড়িয়া রহিল। কা'র অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া কে করে? কা'র কান্না কে কাঁদে! সুন্দর সুন্দর বাসভবন সকল ভূমিসাৎ হইতেছে, ধনরত্ন গৃহসামগ্রী হস্তে হস্তে চক্ষের পলকে উড়িয়া যাইতেছে। কে কথা রাখে আর কেই বা শুনে? কোথাও ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিতে দেখিতে সজ্জিত গৃহ সকল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। নগরময় হাহাকার! নগরময় অন্তরভেদী আর্তনাদ! আবার মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনি বিজয়ের উচ্চরব আবার মাঝে মাঝে কান্নার রোল আর্তনাদ- কোলাহল হৃদয় বিদারক "মলাম,- গেলাম- প্রাণ যায়" বিষাদের কণ্ঠ উহু! এ কি ব্যাপার! ভীষণ কান্ড! পিতার সম্মুখে পুত্রের বধ! মাতার বক্ষের উপর কন্যার শিরচ্ছেদ! পত্নীর সম্মুখে পতির বক্ষে বর্শা প্রবেশ! পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধ মাতার মস্তক চূর্ণ! সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশযুক্ত রমনী শির কৃষ্ণ, শুভ্র, লোহিতগত ত্রিবিধ অঙ্গের আভা দেখাইয়া পিতার সম্মুখে ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। কলিজা পার হইয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। কি ভয়ানক ভীষণ ব্যাপার কত নরনারী ধর্মরক্ষায় নিরাশ হইয়া পাতালস্পর্শী কূপে আত্মবিসর্জন করিতেছে। কেহ অস্ত্রের সহায়ে কেহ অন্য উপায়ে যে প্রকারে যে সুবিধা পাইতেছে অত্যাচারের ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া পাপীর মস্তকে পাপভার অধিকতররূপে চাপাইতেছে। মরিবার সময় বলিয়া যাইতেছে "রাজার দোষে রাজ্যনাশ, প্রজার বিনাশ, ফল হাতে হাতে, প্রতীকার কাহার না আছে? রে এজিদ! রে জয়নাল!!"

সৈন্যদল নগরের যে পথে যাইতেছে, সেই পথেই এইরূপ জ্বলন্ত আগুন জ্বালাইয়া পাষাণ-হৃদয়ের পরিচয় দিয়া যাইতেছে! দয়ার ভাগ যেন ভাগ যেন জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। মায়া মমতা যেন দুনিয়া হইতে জন্মের মত সরিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এত করিয়াও হানিফার সৈন্যদিগের হিংসার নিবৃত্তি হইতছে না। এত অত্যাচার, এত রক্তধারেও সে বিষম তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না। এত করিয়াও শত্রুবধ-আকাংখা মিটিতেছে না! মদিনার বীরগণ করুণস্বরে বলিতেছে,- "আম্বাজী সৈন্যগণ! গঞ্জামের ভ্রাতৃগণ! তোমরা মনে মনে ভাবিতেছ যে, আমরা সময় পাইয়া শত্রুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছি। ভাই! ভাবিয়া দেখিবে-একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে তাহা নহে। এজিদ মদিনাবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ এখনও হয় নাই! অস্ত্রের আঘাতে কত দিন শরীরের বেদনা থাকে? ভ্রাতৃগণ, এরূপ অনেক আঘাত হৃদয়ে লাগিয়াছে যে, সে বেদনা দেহ থাকিতে উপশম হইবে না, প্রাণান্ত হইলেও প্রাণ হইতে সে নিদারুণ আঘাতের চিহ্ন সরিয়া যাইবে কি না, জানি না। আপনারা চক্ষে দেখেন নাই; বোধ হয়, বিশেষ করিয়া শুনিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এক বিন্দু জলের জন্য কত বীর বিঘোরে কাফেরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। কত সতী পুত্রধনে স্বামীরত্নে বঞ্চিত হইয়া নীরসকণ্ঠে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, খঞ্জরের সহায়ে সে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছে। কত বালকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া "জল জল" রব করিতে করিতে কণ্ঠরোধ এবিং বাকরোধ হইয়াছে। আভাসে, ইঙ্গিতে জলের কথা মনের সহিত প্রকাশ করিয়া জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে! ভ্রাতৃগণ, আর কত শুনিবেন? আমাদের প্রতি লোমকূপে প্রতি রক্তবিন্দুতে এজিদের অত্যাচার কাহিনী জাগিতেছে। মদিনার সিংহাসনের দুর্দশা, রাজপরিবারের বন্দীদশা, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচারের কথা শুনিয়া আমরা বুদ্ধি-হারা হইয়াছি, আজরাইল সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি; মৃত্যুমুখে দন্ডায়মান হইয়াছি।

"ঈশ্বর মহান, তাঁহার কার্য মহৎ। কোন সূত্রে কোন সময়ে কাহার প্রতি তিনি কি ব্যবস্থা করেন, তাহা তিনিই জানেন। মদিনার বীরশ্রেষ্ঠ কাসেমের শোক কি আমরা ভুলিয়াছি? প্রভু হোসেনের কথা কি আমাদের মনে নাই? প্রভু-পরিবার এখনও বন্দীখানায়। নূরনবী মোহাম্মদের প্রাণতুল্য প্রিয় পরিজন এখনও এজিদের বন্দীখানায় কয়েদ,-একি শুনিবার কথা! না চক্ষে দেখিবার কথা মার কাফের, জ্বালাও নগর- আসুন আমাদের সঙ্গে।"

এই সকল কথা শুনিয়া নগরের পথে দলে দলে মার মার শব্দে হানিফার সৈন্যগণ ছুটিল। গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা প্রভৃতি জয়নাল আবেদীনকে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে চলিয়াছেন। রাজপুরী নিকটবর্তী, বন্দীগৃহ কিছু দূরে। গাজী রহমানের আজ্ঞায় গমনবেগ ক্ষান্ত হইল। সঙ্গেত-চিহ্নে সমুদয় সৈন্য দামেস্ক-রাজপথে যে যে পদে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সে পদ সে স্থানেই রাখিল। কি সংবাদ? ব্যস্ত হইয়া সকলেই জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপোপরিস্থ পতাকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কোনরূপ বিরূপ বা বিপর্যয় ভাব দেখিলেন না, জাতীয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া গৌরবের সহিত শূন্যে উড়িতেছে। জয়-বাজনা সমভাবে বাজিতেছে। গাজী রহমান অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই মসহাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আক্কেল আলীর সহিত কথা কহিতেছেন। অশ্বসকল

গ্রীবাবক্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান কিন্তু সময়ে সময়ে পুচ্ছগুচ্ছ হেলাইয়া ঘুরাইয়া কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও তেজোভাবের পরিচয় দিতেছে।

গাজী রহমান বলিলেন, "রাজপুরী নিকটবর্তী, বাদশাহ্-নামদারের কোন সংবাদ পাইতেছি না।"

মসহাব কাক্কা বলিলেন, "গুপ্তচর-সন্ধানীগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে। এ পর্যন্ত সংবাদ নাই এ কি কথা কারণ কি?

"যুদ্ধবসানে কি বিজয়ের শেষ মুহূর্তে আপন আপন সৈন্যসামন্ত ভারবাহী সংবাদবাহী প্রধান প্রধান যোধ এবং সেনানায়কগণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়। বিজয়-আনন্দে কে কোথায় কাহার পশ্চাতে মার মার শব্দে মতোয়ারা হইয়া ছুটিতে থাকে, কিছুই জ্ঞান থাকে না। সে সময় বড়ই সতর্ক ও সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আপন দলবল ছাড়িয়া কে কাহার পশ্চাৎ কত দুর তাড়াইয়া যায়, সে জ্ঞান প্রায় কাহারও থাকে না। এই অবস্থায় যুদ্ধজয়ের পরেও অনেক নেতা সামান্য লোকের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। পলায়িত শত্রুগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় লুকাইয়া থাকে, কে বলিতে পারে? এজিদের সৈন্য বলিতে একটি প্রাণীও আর যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। তবে মোহাম্মদ হানিফা কোথায় রহিলেন? এজিদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিপক্ষ দলের কোন সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তবে এটা নিশ্চয় কথা যে, বিপক্ষদলের সংবাদ শূন্য। মোহাম্মদ হানিফা কোথায়, আমার সেই চিন্তাই এইক্ষণ অধিকতর হইল। অশ্বারোহী সন্ধানী পাঠাইয়া এখনই সংবাদ আনিবে।আমরা রাজপুরী পর্যন্ত যাইতে যাইতে যুদ্ধ স্থানের সংবাদ অবশ্যই পাইব, আশা করি।"

আদেশ মাত্র সন্ধানী দূতের অশ্ব ছুটিল। শুভ্র নিশানের অগ্রভাগ আরোহীর মস্তকোপরি বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

গাজী রহমান পুনরায় মসহাব কাক্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নগর-প্রবেশ সময় পৃথক পৃথক পথে সৈন্যদলকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সে দিক হইতে যে দল রাজভবন পর্যন্ত যাইবে, সে দিক রক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকিবে। যে পর্যন্ত পুরীমধ্যে দীন মোহাম্মদী নিশান উড়িতে না দেখিবে, জয়নাল আবেদীনের বিজয়- ঘোষণা যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ণে না শুনিবে সে পর্যন্ত কোন দলই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মোহাম্মদ হানিফার সংবাদ না জানিয়া এজিদ পুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

"ভালই, সংবাদ না জানিয়া এজিদ- পুরীতে যাইব না। ভাল কথা এই অবসরে বন্দীগণকে উদ্ধার করিলে ক্ষতি কি?"

"না না, তাহা হইতে পারে না, অগ্রে মহারাজের সংবাদ, তাহার পর পুরী-প্রবেশ। পুরী-প্রবেশ করিয়াই সর্বাগ্রে রাজসিংহাসনে মর্যাদা রক্ষা, পরে বন্দীমোচন।"

"তবে ক্রমে অগ্রসর হওয়া যাক। ঐ আমাদের সৈন্যগনের জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে। যাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই আমাদের সহিত একত্র মিশিবে।"

আবার সঙ্কেত সূচক বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহারাজ জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপ-সংযুক্ত জাতীয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। "জয়-মহারাজ জয়নাল

আবেদীনের জয়!" সৈন্যগনের মুখে বার বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজপথে অন্য লোকের গতিবিধি নাই। এজিদপক্ষের জন- প্রাণীর নাম মাত্র নগরে নাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ি- ঘর সকল শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কিছু দুর হইতে দামেস্ক- রাজপুরীর সুরঞ্জিত অত্যুচ্চ প্রবেশদ্বার সকলের নয়নগোচর হইল। এত সৈন্য, এত অশ্ব, এত উষ্ট্র, এত নিশান, এত ডঙ্কা এত কাড়া রাজপথ জুড়িয়া হুলস্থুল বাধাইয়া যাইতেছে। ঐ সকল কোলাহল ভেদ করিয়া দ্রুতগতি অশ্বসঞ্চালনের তড়াক তড়াক পদশব্দ সকলের কর্ণকুহরেই প্রবেশ করিল। কিন্তু গাজী রহমানের আজ্ঞা ব্যতীত বলিতে কি একটি মক্ষিকার উড়িয়া বসিবার ক্ষমতা নাই। কাহার সাধ্য স্থিরভাবে দাড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে? কাহার সাধ্য তাহার সন্ধান লয়? কে সে লোক, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে?

মনের কথা মন হইতে সরিতে না সরিতেই বাঁশীর স্বরে কয়েকটি কথা কর্ণে প্রবেশ করিল-"আম্বাজী সংবাদবাহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছে। রাস্তা পরিষ্কার" দ্বিতীয়বারে বাঁশী বাজিল, শব্দ হইল-"সাবধান!"।

সকলে সাবধান হইলেন। সংবাদবাহীর অশ্ব বায়ুভরে উড়িয়া সকলের বাম পার্শ্ব হইয়া চক্ষের পলকে রহমানের নিকট চলিয়া গেল। গাজী রহমানের নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্বক বলিতে লাগিল "দামেস্ক নগরের মধ্য হইতে রণক্ষেত্র গমনের পথ এবং অন্য অন্য পথ-ঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ গমনে মহাকষ্ট। ধরাশায়ী খন্ডিত দেহ সকলের সে দৃশ্য দেখিতেও মহাকষ্ট। বহু কষ্টে রণক্ষেত্র পর্যন্ত যাইয়া দেখিলাম সব শবাকার। খন্ডিত নরদেহ এবং অশ্বদেহ সকল কতক অল্প রক্তে মাখা, কতক রক্তে প্লাবিত। দেখিলাম, মরুভূমিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত। কি ভীষণ রণ! এজিদ-শিবিরের ভস্মাবশেষ হইতে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাসহ ধূমরাশি অনবরত গগনে উঠিতেছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে এক জন ফকির রণক্ষেত্রের মধ্যে খন্ডিত দেহ সকলের নিকট যাইয়া কি যেন দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে, তাহার চলনভঙ্গী অনুসন্ধানের ভাব দেখিয়া যথার্থ ফকির বলিয়া সন্দেহ হইল। ত্রস্তে ঘোড়া ছুটাইয়া ফকির-বেশধারীর নিকট যাইয়াই দেখি যে, আমাদের গুপ্তচর ওসমান- গলায় তসবীহ হাতে আশা, গায়ে সবুজ পিরহান। দেখা হইবামাত্র পরিচয় আদর, আহলাদ, সম্ভাষণ। তাহারই মুখে শুনিলাম, "মহারাজাধিরাজ, মোহাম্মদ হানিফা মদিনাধিপতি, সহিত দামেস্ক নগরে প্রবেশ করেন নাই। ঘোর যুদ্ধ সময়েই তিনি এজিদের সন্ধান করেন। যুদ্ধজয়ের পরক্ষণেই এজিদ তাঁহার চক্ষে পড়ে। এজিদের চক্ষুও উজ্জ্বল; পশ্চাৎ চাহিতেই দেখেন যে-সে বিস্ফোরিত চক্ষু দ্বয় হইতে ঘোর রক্তবর্ণের তেজ সহস্র শিখায় বহির্গত হইতেছে; ঘোড়াটিও রক্তমাখা হইয়া এক প্রকার নূতন বর্ণ ধারণ করিয়াছে বাম হস্তে অশ্বের বলগা দক্ষিন হস্তে বিদ্যুৎ- আভাসংযুক্ত রক্তমাখা সুদীর্ঘ তরবারি মুখে" কৈ এজিদ কৈ এজিদ।" এজিদ আপন নাম শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াই বুঝিলেন আর রক্ষা নাই, এক্ষণে পলায়ন শ্রেয়ঃ। যেই দেখা অমনই যুক্তি পলায়নই শ্রেয়ঃ। অশ্বে কশাঘাত অশ্ব ছুটিল। মহারাজও এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিংহ- বিক্রমে দুলদুল ছুটাইলেন। দেখিতে দেখিতে দামেস্ক- প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের পশ্চিম দিকস্থ পর্বতশ্রেণীর নিকটস্থ হইলেন। পশ্চাৎ দিক হইতে তীর মারিলেই এজিদের জীবনলীলা ঐ স্থানেই শেষ হইত।

মোহাম্মদ হানিফা একবার এজিদের এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন যে, অসির আঘাত করিলে এচিদের শির তখনই ভূতলে লুণ্ঠিত হইত। পশ্চাৎদিক হইতে কোন অস্ত্রাঘাত করিবেন না, সম্মুখ হইতে এজিদকে আক্রমণ করিবেন এই আশাতেই বোধ হয়, মহাবেগে ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু এজিদও এমনভাবে অশ্ব চালাইয়াছিল যে, কিছুতেই মহারাজকে তাহার অগ্রে যাইতে দেয় নাই। দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না। প্রথম অশ্ব দর্শন, শেষে আরোহীদ্বয়ের মস্তক পর্যন্ত চক্ষের অগোচর। আর কোন সন্ধান নাই, সংবাদ নাই। কয়েকজন আম্বাজী অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অনেক পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। এই শেষ সংবাদ।"

সংবাদবাহী অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। গাজী রহমান আর অপেক্ষা করিলেন না। রাজপুরী মধ্যে অগ্রে পদাতিক সৈন্য প্রবেশের অনুমতি করিলেন। তাহার পর অশ্বারোহ বীরগণ পুরীমধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। তৎপরে মহারথিগণ এজিদপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। বীর দাপে জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলেই প্রবেশ করিলেন। সে বীর দাপে জয় রবে রাজপ্রাসাদ কাঁপিতে লাগিল সিংহাসন টলিল। সে রব দামেস্কের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিল।

গাজী রহমান মসহাব কাক্কা, ওমর আলী অন্যান্য রাজগণ মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া "বিসমিল্লাহ" বলিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরীমধ্যে একটি প্রাণীও তাহাদের নয়নগোচর হইল না। সকলই রহিয়াছে, এখনই যেন পুরবাসীরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে! প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও ঐ ভাব; কেহই নাই। অস্ত্রধারী, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, সকলই তাহাদের ক্রমে তৃতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা; গৃহসামগ্রী যেখানে যেরূপ সাজান, ঠিক তাহাই আছে; কোনরূপ রূপান্তর হয় নাই। এখনই ছাড়িয়া এখনই তাড়াতাড়ি ফেলিয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কক্ষের পর কক্ষ, শেষ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি আশ্চর্য সেখানেও সেই ভাব। সকলই আছে, রাজপুরী মধ্যে যাহা প্রয়োজন, সকলই রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আপন সৈন্যসামন্ত ও তুরী- ভেরী- নিশানধারিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কক্ষে কক্ষে সন্ধান করিয়াও জনপ্রাণীর দেখা পাইলেন না। ভাবে বোধ হইল যেন কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে। কোথায় সে গুপ্ত স্থান? তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। জয়ের পর যুদ্ধ- জয়ের পর, বিপক্ষ, রাজপুরী প্রবেশের পর, রাজপ্রাসাদ অধিকারের পর যাহা হইয়া থাকে, তাহা হইতে আরম্ভ হইল। দুই হস্তে লুট। প্রথম সৈন্যগণের লুট, যে যাহা পাইল, সে তাহা আপন অধিকারে আনিল। কত গুপ্ত গৃহের কপাট ভগ্ন হইতেছে হীরা, মতি, মণি, কাঞ্চন, কত রাজবসন, কত মণিমুক্তাখচিত আবরণ, রাজব্যবহার্য দ্রব্য যাহার হস্তে যাহা পড়িতেছে, লইতেছে। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে, ভাঙ্গিয়া ছারখার করিতেছে।

নব ভূপতি মহারথিগণে বেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া "আলহামদোলিল্লাহ" বলিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। রাজ-নিশান শতবার শির নামাইয়া দামেস্কাধিপতির বিজয় ঘোষণা করিল। অন্যান্য রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া রাজ-সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা

করিলেন এবং রক্তমাখা তরবারি হস্তে যথোপযুক্ত আসনে রাজ-আদেশে উপবেশন করিলেন। সৈন্যগণ নিষ্কোষিত অসি-হস্তে নব ভূপতির বিজয় ঘোষণা করিয়া নতশিরে অভিবাদন করিলেন।

গাজী রহমান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভিন্ন দেশীয় মহামাননীয় ভূপতিগণ, রাজন্যগণ, মাননীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, সৈন্যগণ, যুদ্ধ সংশ্রবী বীরগণ এবং সভাস্থ বন্ধুগণ, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের বলবিক্রমের সহায়ে ও সাহায্যে আজ জগতে অপূর্ব কীর্তি স্থাপিত হইল। ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়, তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত রেখায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিল। এই দামেস্ক সিংহাসন আজ বক্ষ পতিয়া যে ভূপতিকে উপবেশন- স্থান দিয়াছে, ইহা এই নব ভূপতিরই পৈতৃক-আসন। যে কারণে এই আসন হযরত মাবিয়ার করতলস্থ হয় তদ্বিবরণ এইক্ষণে উল্লেখ দ্বিরুক্তি মাত্র। বোধ হয়, আপনারা সকলেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের প্রতি নারাজ হইয়া যাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে পুনরায় প্রতিদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, যে কৌশলে এজিদ মহামান্য প্রভু হাসান হোসেনকে বঞ্চনা করিয়া এই রাজ্য যে ভাবে আপন অধীনে রাখিয়াছিলেন, সে বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। ইমাম বংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া নির্বিবাদে দামেস্ক এবং মদিনারাজ্য একচ্ছত্ররূপে ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া যে কৌশলে এজিদ প্রভু হাসানের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন, যে কৌশলে ইমাম হোসেনকে নূরনবী মোহাম্মদের রওজা হইতে বাহির করিয়া কুফায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন। মহাপ্রান্তর কারবালার ঘটনা যদিও আমরা চক্ষে দেখি নাই কিন্তু মদিনাবাসীদিগের মুখে যে প্রকার শুনিয়াছি; তাহা আমার বলিবার শক্তি নাই। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, হইয়াছে। তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

"যে দিন দামেস্ক-প্রান্তরে আমাদের শেষ আশা মুসলমান জগতের শেষ আশা-ইমাম বংশের একমাত্র রত্ন, পবিত্র সৈয়দ বংশের একমাত্র অমূল্য নিধি, এই নবীন মহারাজ জয়নাল আবেদীনকে যে দিন এজিদ শূলে চড়াইয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দিন এজিদ প্রেরিত সন্ধিপ্রার্থী দূতবরকে যে যে কথা বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছিলাম, মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবান আজ আমাদিগকে সেই শুভ দিনের মুখ দেখাইলেন, পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন কিন্তু আশা মিটিল না, মনোবিকার মন হইতে একেবারে বিদূরিত হইল না,- সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিবে? সিংহাসনাধিকারের পূর্বে মহারাজ হানিফার তরবারি এজিদ- রক্তে রঞ্জিত হইতে দেখিলাম না। সে মহাপাপীর পাপময় শোণিত বিন্দু মোহাম্মদ হানিফার তরবারি বহিয়া দামেস্ক- ধরায় নিপতিত হইতে চক্ষে দেখিলাম না। সে স্বেচ্ছাচারী, পরশ্রীকাতর, দামেস্কের কলঙ্ক মহাত্মা মাবিয়ার মনোবেদনাকারী এজিদ- শির দামেস্ক-প্রান্তরে লুণ্ঠিত হইতে দেখিলাম না। আক্ষেপ রহিয়া গেল। আরও আক্ষেপ এই যে এই শুভ- সময়ে রাজশ্রী মোহাম্মদ হানিফাকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম না, সময়ে সকলই হইল কিন্তু সুখসময়ে উপস্থিত দুইটি অভাব রহিয়া গেল। না জানি, বিধাতা ইহার মধ্যে কি আশ্চর্য কৌশল করিয়াছেন! দয়াময় ভগবান কি কৌশল করিয়া

কি কৌশলজাল-বিস্তা আম্বাজ-অধিপতিতে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন! যে পর্যন্ত সন্ধান পাইলাম তাহাতে আশঙ্কার কথা কিছুই নাই। তবে সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। (আনন্দধ্বনি) অনেক শুনিলাম, এ জীবনে অনেক দেখিলাম। আশ্চর্য ঈশ্বর- লীলা! ঈশ্বরভক্ত- ঈশ্বর প্রেমিকদিগের সাংসারিক কার্য কখনই সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। তাহারা আজীবন কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরিবারগণকেও যে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম। অনেক অজ্ঞ লোক এই সকল ঘটনার প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে না পারিলেও মনে মনে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে, ভক্ত প্রেমিকের দশাই এইরূপ।

"পয়গম্বরগণ যে ঈশরের এত ভালবাসার, এত প্রিয়- প্রিয়জন, তাহারাও সময় সময় মহাকষ্টে পতিত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ, আপনারা অবগত আছেন, -হযরত নূহকে তুফানে; ইব্রাহিমকে আগুনে মানবচক্ষে কতই না কষ্ট পাইতে হইয়াছে! আর দেখুন হযরত সোলেমান রাজা ও পয়গম্বর। রাজা কেমন?- সর্বপ্রাণীর উপর রাজত্ব, সর্বজীবের উপর আধিপত্য ও অধিকার! পরিবার পরিজন সৈন্যসামন্ত সহ সুসজ্জিত সিংহাসন এই জগদ্ব্যাপী বায়ু মাথায় করিয়া শুন্যে শুন্যে বহিয়া লইয়া যাইত। সামান্য ইঙ্গিতে দেব, দৈত্য, দানব, জেন, পরী, সাগরে জঙ্গলে পর্বতে কোথায় কে লুকাইত- তাহার আর সহজে সন্ধান পাওয়া যাইত না। এমন যে দৈব, দানব দল নরকিন্নর- পূজিত ভূপতি ও পয়গম্বর, তাহাকেও মহাবিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। তাহার হস্তস্থিত মহাগৌরবান্বিত ও শক্তিশালী অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া চল্লিশ দিবস তিনি কি কষ্টই না ভোগ করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে এক ধীবরের নিকট মজুরী স্বরূপ- দৈনিক দুইটি মৎস্য প্রাপ্ত হইবেন এই নিয়মে চাকুরী স্বীকার করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইয়াছিল। চাকুরী বাচাইতে মৎস্যের বোঝা মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া। ধীবর-কন্যা বিবাহ করিতে পশ্চাৎপদ হইতে, কি অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাধ্য হয় নাই। এত বড় মহাবীর হযরত মোহাম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজা! কোরেশ- বংশে কেন সমগ্র আরব দেশে তাহার তুল্য বীর আর কেহ ছিলেন না। সেই মহাবীর হামজাকেও একটা সামান্য স্ত্রীলোক- হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। পয়গম্বরই হউন, আর মহাবীর গাজীই হউন, উচ্চমস্তকে, উচ্চগৌরবে নিষ্কলঙ্কে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্রবসনে এই মায়াময় কুহকিনী ধরণী -পৃষ্ঠ হইতে সরিয়া যাইতে কেহই পারেন না!- ইহাতে মোহাম্মদ হানিফা- আমাদের আম্বাজ- অধিশ্বর যে অক্ষত শরীরে নিষ্কলঙ্কভাবে, সর্ব দিকে সুবাতাস বহাইয়া, বিজয়নিশান উড়াইয়া, বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া জগতে অক্ষুন্ন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে যাইবেন, ইহা ত কখনই বিশ্বাস হয় না। মহাকৌশলী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের লীলার অর্থ কে বুঝিবে? এ গুপ্ত রহস্য ভেদ কে করিবে? ধার্মিক এবং ঈশ্বর-প্রেমিক জীবনই কি এত কন্টকময়! সে জীবনের কি এত বিপদ, এত যন্ত্রণা! অপ্রেমিক অধার্মিক এ জগতে এক প্রকার সুখী। অনেক কার্য সুন্দর মত সর্বাঙ্গীন সুন্দরের সহিত সম্পন্ন করিয়া লয়।

"ঈশ্বর! প্রেমিকগণ এবং তাহাদের পরিবারগণ কি প্রকারে সংসারচক্রের আবর্তে পড়িয়া এত ক্লেশ, এত দুঃখ ভোগ করেন কারণ হয়ত অনেকেই অনুসন্ধান করেন নাই। বুঝিলে

এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় অতি সহজেই মীমাংসা হয়। প্রেমিকের প্রেম পরীক্ষাই ইহার মূল তত্ত্ব এবং তাহাই উদ্দেশ্য; দৈহিক কষ্ট জগতে কিছুই নহে। আত্মার বল আবং পরকালের সুখই যথার্থ সুখ। অনন্তধামের অনন্ত সুখভোগই যথার্থ সুখসম্ভোগ!

"দামেস্ক নগরের মাননীয় বন্ধুগণ, আপনারা পূর্ব হইতেই ইমাম বংশের প্রতি মনে মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাদের এই নবীন ভূপতির কারাগার অবস্থায় খোৎবা পাঠ সময়ের ঘটনার কথা শুনিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আমি স্বচক্ষেই দেখিতেছি। ঈশ্বর ইহাদের মঙ্গল করুন। রাজানুগ্রহ চিরকাল ইহাদের প্রতি সমভাবে থাকুক; ইহাই সেই সর্বাধীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি।"

দামেস্ক নগরস্থ ইমামভক্ত দলপতিগনের মধ্য হইতে মহাসম্ভ্রান্ত এবং মাননীয় কোন মহোদয় দন্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, " আমরা চিরকালই হযরত নূরনবী মোহাম্মদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, মহাবীর হযরত মোরতজা আলীর চিরভক্ত। মধ্যে কয়েক দিন মহামহিম হযরত মাবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্তভাবে ধর্মকর্ম রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি। হযরত মাবিয়ার পীড়ার সময় হইতেই আমাদের দুর্দশার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মন্ত্রীপ্রবর হামান অপদস্থ হওয়ায় এবং এজিদ দরবারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বয়সদোষে বুদ্ধিবিবেচনায় ভ্রম জন্মিয়াছে, মারওয়ানের বিবেচনায় এই কথা সাব্যস্ত হওয়ার পর হইতেই আমাদের দুর্দশার পথ সহজেই পরিষ্কার হইয়াছে। আর কোথায় যাই এক প্রকার জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া দামেস্কে বাস করিতেছিলাম; এইক্ষণে দয়াময় জগদীশ্বর যাহাদের রাজ্য তাহাদের হস্তেই পুনঃ অর্পণ করিলেন; আমাদের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ সকলই ইহকাল পরকাল হইতে উপশম হইল। আমরা দুই হস্ত তুলিয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনের রাজমুকুট চিরকাল অক্ষুন্নভাবে পবিত্র শিরে শোভাবর্ধন করুক। আমরাও মনের সহিত রাজসেবা করি, পুণ্যভূমি মদিনার অধীনস্থ হইয়া চিরকাল গৌরবের সহিত সংসারযাত্রা করিতে থাকি। মদিনার অধীনতা স্বীকার করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা সর্বান্তঃকরণে মহারাজ জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল কামনা করি। আজ মনের আনন্দে নবীন মহারাজের বিজয় ঘোষণা করিয়া মনের আবেগ দূর হইল, শান্তি- সুখে সুখী হইয়া ভাগ্যবান হইলাম।"

বক্তার কথা শেষ হইতে না হইতেই শাহী দরবার হইতে সহস্র মুখে "জয় জয়নাল আবেদীন" রব উচ্চারিত হইয়া প্রবাহিত বায়ুর সহিত প্রতিযোগিতার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল "জয় জয়নাল আবেদীন" সকলেই নতশিরে নবীন মহারাজের সিংহাসন চুম্বন করিলেন এবং যথোপযুক্ত উপঢৌকনাদি রাজগোচর করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন, ইহকাল এবং পরকালের আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা বলিয়া শত শত বার সিংহাসন চুম্বন করিলেন। সেই সময় সাদিয়ানা- বাদ্য বাদিত না হইয়া রণবাদ্যই বাজিতে লাগিল। কারণ, এজিদের কোন সংবাদ নাই; এজিদ- বধের কোন সমাচার পাওয়া যায় নাই। দরবার বরখাস্ত হইল। মহারাজ জয়নাল আবেদীন, গাজী রহমানের মন্ত্রণায় জননী, ভগ্নী এবং অন্যান্য পরিজনকে বন্দীগৃহ হইতে রাজপুরী- মধ্যে আনয়ন করিতে ওমর আলী ও আক্কেল আলী সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বন্দী- গৃহে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য রাজগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রামসুখপ্রয়াসী হইয়া বিশ্রামভবনে গম করিলেন। দ্বারে দ্বারে প্রহরী খাড়া

হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ সৈন্যগণ দামেস্ক- সৈন্য- নিবাসে যাইয়া সজ্জিত কক্ষ সকল নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

তৃতীয় প্রবাহ

দয়াময় ভগবান! তোমার কৌশল- প্রবাহ কখন কোন পথে কত ধারে যে অবিরত ছুটিতেছে, কৃপাবারি কখন কাহার প্রতি কত প্রকারে বা কত আকারে ঝরিতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বুঝিবার সাধ্য জগতে কাহারও নাই। সে লীলা- খেলার যথার্থ মর্ম কলমের মুখে আনিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতাও কোন কবির কল্পনায় নাই। কাল জয়নাল আবেদীন দামেস্ক- কারাগারে এজিদ হস্তে বন্দী, প্রাণভয়ে আকুল, আজ সেই দামেস্ক সিংহাসন তাঁহার বসিবার আসন, রাজ্যে পূর্ণ অধিকার, রাজপুরী পদতলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণ তাহার করমুষ্টিতে কাল বন্দীবেশে বন্দীগৃহ হইতে পলায়ন, শূলে প্রাণবধে ঘোষণা শুনিয়া পর্বতগুহায় আত্মগোপন, নিশীথ- সময় স্বজন হস্তে পুনরায় বন্দী, চিরশত্রু মারওয়ান সহ একত্র এক সময় বন্দী; আজ হামান জীবনের মত বন্ধন দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আর জয়নাল আবেদীনের শিরে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে। ধন্য রে কৌশলি! ধন্য ধন্য তোমার মহিমা।

আবার কি এ দেখিতেছি! এখনই কি দেখিলাম, আবার এখনই বা কি দেখিতেছি! এই কি সেই বন্দীগৃহ! যে বন্দীগৃহের কথা মনে পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠে হৃদয়ের শোণিতাংশ জলে পরিণত হয়, এ কি সেই বন্দীগৃহ! যে সূর্যাধিকারে একবার দেখিয়াছি, এখনও সে অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও লোহিত সাজে সাজিয়া পররাজ্যে দেখা দিতে জগৎচক্রে চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই, ইহারই মধ্যে এই দশা! এত পরিবর্তন? কৈ, সে যমদূত–সদৃশ প্রহরী কৈ? সে নির্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায়? শাস্তির উপকরণ লৌহশলাকা, জিঞ্জির কটাহ, মূষল সকলই পড়িয়া আছে। জীবন্ত জীব কোথায়? কৈ কাহাকেও তো দেখিতেছি না। কেবল দেখিতেছি জীবনশূন্য দেহ আর চর্মশূন্য মানব, শরীর।

কেন নাই, এদিকে একটি প্রাণীও কেন নাই যে দিকে থাকিবার সে দিকে আছে। প্রভু হোসেন- পরিবার যে দিকে বন্দী, সে দিকের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সে কণ্ঠনিনাদ, সেই স্ত্রীকণ্ঠে আর্তবিলাপ, সেই মর্মান্তিক বেদনাযুক্ত গত কথা, কিন্তু ভাব ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন, কণ্ঠ ভিন্ন।

"হায়! কোথায় আমি জয়নাব। সামান্য ব্যবসায়ী দীন হীন দরিদ্রের কুলবধু! দৈহিক শ্রমোপার্জিত সামান্য অর্থাকাঙ্খীর সমধর্মিনী। রাজাচার রাজব্যবহার- রাজপরিবারগনের অতি উচ্চ সুখ সম্ভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি রাজ অন্তঃপুরে কেন? মদিনার পবিত্র রাজপুরী- মধ্যে জয়নাবের বাস অতি আশ্চর্য; দামেস্কের রাজকারাগারে বন্দিনী সে আরও আশ্চর্য! আমার সহিত এ কারাগৃহের সম্বন্ধ কি? হায়! হায়! আমার নিজ

জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতবাগিনীই বিষাধ সিন্ধুর মূল। জয়নাব এই মহা প্রলয়কান্ডের মূল কারণ! হায় হায় আমার জন্যই নূরনবী মোহামামদের পরিবার পরিজন প্রতি এই সাংঘাতিক অত্যাচার । হায় রে আমার স্থান কোথা? আমি পাপীয়সী! আমি রাক্ষসী! আমার জন্য 'হাবিয়া' নরকদ্বার উদঘাটিত রহিয়াছে। কি পরিতাপ! আমারই জন্য জাএদার কোমলান্তরে হিংসার সূচনা! এ হতভাগিনীর রূপ- গুণেই জাএদার মনের আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণ পঞ্চগুণে বৃদ্ধি! অবলা প্রাণে কত সহিবে? পতিপ্রাণা ললনা আর কত সহ্য করিবে? সপত্নীবাদে মনের আগুন কি নির্বাণ হয়? সপত্নী ছাড়িয়া শেষে স্বামীকেই আক্রমণ করে। মন যাহা চায়, নিয়তির বিধান থাকিলে তাহা পাইতে কতক্ষণ। খুঁজিলেই পাওয়া যায়। মায়মুনার মনসাধ পূর্ণ করিতে জাএদার প্রয়োজন। জাএদার মনসাধ পূর্ণ করিতে মায়মুনার আবশ্যক। সময়ে উভয়ের মিলন হইল সোনায় সোহাগা মিশিল। শেষে নারীহস্তে- উহু! মুখে আনিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়! বিষ! মহাবিষ!"
(নীরব)
কর্ণে শুনিতেছেন, নগরের জনকোলাহল, সৈন্যগণের ভৈরব নিনাদ- কাড়া নাকাড়া দামামার বিঘোর রোল। মধ্যে মধ্যে জয় উল্লাস সহিত জয়নাল আবেদীনের নাম। মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, " -এ কি! আমি আবার এ কি শুনি! এত জনকোলাহল কিসের জন্য?" অনেকক্ষণ স্থির কর্ণে- স্থির মনে রহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বন্দীগৃহের দ্বারে দ্বারে যেখানে রক্ষিগণ পাহারা দিতেছিল, সেখানে কেহই নাই। -সমুদয় দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন, বিবি সালেমা, শাহরেবানু হাসনেবানু ম্লান বদনে নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে শাহরেবানু কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন, "ওরে বাপ! বাবা জয়নাল! তুই কোথা গেলি বাপ? তুই আমার কোলে আয় বাপ!" জয়নাব যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রহিলেন এবং পূর্ব কথা বলিতে লাগিলেন।
"উহু! বিষ! -জাএদার হস্তে বিষ!! যদি জয়নাব হতভাগিনী হাসানের দাসী শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা না হইত, যদি রূপ গুণ, না থাকিত, যদি স্বামীসোহাগিনী না হইত, তাহা হইলে জাএদার হস্তে কখনই বিষ উঠিত না। মায়মুনার কথা কখনই শুনিত না। এই হতভাগিনীর জন্যই বিষ। এজিদ- মুখে শুনিয়াছি সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতে গবাক্ষদ্বারে আমাকে দেখিয়াছিল। কত চক্ষু এজিদকে দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, আমি নাকি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া গবাক্ষ- দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমার তো কিছুই মনে হয় না; পাপিষ্ঠ আরও বলিল- সেদিন আমার মস্তকোপরি চিবুক- সংলগ্ন মুক্তার জালি ছিল। কর্ণে কর্ণাভরণ দুলিতেছিল। ছি! ছি! কেন গবাক্ষ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই কুলক্ষণ গবাক্ষ- দ্বারে অবস্থানই আমার কাল হইয়াছিল। এই মহা দুর্ঘটনার প্রধান কারনই গবাক্ষ দ্বারে অবস্থান, বিনা আবরনে মস্তক উলঙ্গ করিয়া

দণ্ডায়মান। এখন বুঝিলাম, সেই শাহীনামার মর্ম। এখন বুঝিলাম, রাজ-প্রাসাদে আবুদল জব্বারের আহ্বান। এখন বুঝিলাম, সামান্য দরিদ্র গৃহে রাজ কাসেদের শাহীনামা লইয়া গমন, আব্দুল জব্বার নিমন্ত্রণের মন্ত্রণা সকলই চাতুরী। এরূপ আহ্বান আদর সমাদর নামা প্রেরণ সকলই আমার জন্য। এজিদের চাতুরী আব্দুল জব্বার কি বুঝিবে? রাজ জামাতা হইয়া আশার অতিরিক্ত সুখভোগ করিবে, সামান্য ব্যবসায়ী– সামান্য অর্থের জন্য যে লালায়িত– সে রাজকুমারী সালেহাকে লাভ করিয়া জীয়ন্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, নরলোকে বাস করিয়া স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত মিলিত হইয়া পাপাত্মক শীতল করিয়া সুখী হইবে। এই আশাতেই আমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিল। কি নিষ্ঠুর! কি নির্দয়! কি কপট! সেই শাহীনামা প্রাপ্তি পূর্বক্ষণ, আমার দুঃখ দেখিয়া কত আক্ষেপ কত মনোবেদনা প্রকাশ– কি কপট রন্ধনশালার কার্যে অগ্নির উত্তাপে মুখে ঘর্মবিন্দু মুক্তা-র বিন্দু আকারে ফুটিয়াছিল। ছাই কয়লার কালী বস্ত্রে হস্তে লাগিয়াছিল। সম্মুখে দর্পন ধরিয়া দর্পণে আমার ছায়া আমাকে দেখান হইল, টাকা থাকিলে কি এত দুঃখ তোমার হয়? আমার প্রাণ কি ইহা সহ্য হয়! কত প্রকার আক্ষেপ করিয়াছিল. তাহার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে দেখাইল। সেই দিনেই দামেস্ক–যাত্রা। রাজপ্রাসাদে সাদরে গৃহীত। যেমনই প্রস্তাব, অমনই অনুমোদন আমাকে পরিত্যাগ। ধন্য বিবি সালেহা! স্পষ্ট উত্তর করিলেন– এক স্ত্রীর সহিত যখন এই ব্যবহার– অর্থলোভে চিরপ্রণয়িনী প্রিয়– পত্নীকে পরিত্যাগ। তবে বিশ্বাস কি? বিবাহে অস্বীকার– যেমন কর্ম তেমনই ফল। এজিদের জয়। এজিদেরই মন আশা পূর্ণ। কৌশলে জয়নাবকে হস্তগত করিবার উপায় পথ আবিষ্কার। আব্দুল জব্বারের হা হুতাশ পরিত্যাগ সার। রাজপুরী হইতে গুপ্তভাবে বহির্গত জনতার মধ্যে আত্মগোপন। সংসারে ঘৃণা পরিনামে ফকিরী গ্রহণ। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল, তাহা হইয়া গেল। বিধবা হইলাম। পূর্ণ বয়সে স্বামী সুখে বঞ্চিত হইলাম। আর কোথায়? কোথায় যাইব? পিত্রালয়ে আসিলাম।

"পাপাত্মা এজিদ মনসাধ পূর্ণ করিবার আশা পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহার নিজ মনের ভাব ও গতি অনুসারে কাসেদ পাঠাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। স্ত্রীলোক যাহা চায়, তাহাই আমার আছে, ধনরত্ন, অলঙ্কারের তো অভাব নাই। তাহার উপর দামেস্ক রাজ্যের পাটরাণী। প্রভু হাসানের প্রস্তাব শুনিয়া এজিদের ধনরত্ন পদমর্যাদা দামেস্কের সিংহাসন এই পায় দুরে নিক্ষেপ করিয়া মোসলেমের শেষ প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলাম; পরিণয় গ্রন্থি ছিন্ন হইবার পর আর সংসারে মন লিপ্ত হইল না। পরকালের উদ্ধার চিন্তাই বেশি হইয়াছিল। জগৎ কিছু নয়, সকলই অসার। ধন, জন, স্বামী, পুত্র, মাতা, পিতা, কেহ কাহার নয়, যা কিছু সত্য সম্পূর্ণ সত্য, সেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা। পরকালে মুক্তি হইবে, সেই আশাতেই প্রভু হাসানের মুখ পানেই চাহিলাম; কিন্তু বড় কঠিন প্রশ্নে পড়িলাম। এক দিকে জগতের অসীম সুখ অন্য দিকে ধর্ম ও

পরকাল–অনেক চিন্তার পর দ্বিতীয় সঙ্কল্পের দিকেই মন টলিল। মহারাণী হইতে ইচ্ছা হইল না। সময় কাটিয়া গেল, বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। সময়ে প্রভু হাসানের দর্শন লাভ ঘটিল। ঈশ্বর কৃপায় সে সুকোমল পদসেবা করিতে অধিকারিনী হইলাম। প্রভু ধর্ম শাস্ত্রমতে আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আবার সংসারী হইলাম প্রভু হাসান অতি সমাদরে মদিনায় লইয়া নিজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিলেন। নূতন সংসারে, অনেক নূতন দেখিলাম। পবিত্র অন্তঃপুরে পবিত্রতা ধর্মচর্চা, ধর্মমতের অনুষ্ঠান, ধর্মক্রিয়া অনেক দেখিলাম। অনেক শিখিলাম; মুক্তি-ক্ষেত্রে আশালতার অঙ্কুরিত ভাব দেখিয়া মনে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হইল। সংসার চক্রের আবর্তে পড়িয়া সপত্নীর মনোবাদ ও হিংসা আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে হইল। তাহাতেই বুঝিলাম, জগতে সুখ কোথাও নাই! দৈহিক জীবনে মনের সুখ কোন স্থানেই নাই। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন; দুঃখী, ভিখারী মহামানী মহামহিম বীরকেশরী আন্তরিক সুখ সম্বন্ধে সকলেই সমান– রাজরাণী ভিখারিণী ধনীর সহধর্মিণী, দুঃখিনীর নন্দিনী সকলেই মনের সুখ সমতুল্য। প্রাণে আঘাত লাগিলে মুখ বন্ধ থাকে না। পবিত্র পুরী মধ্যে থাকিয়া এই হতভাগিনী সপত্নীবাদেই সমধিক মনোবেদনা ভোগ করিয়াছে। সপত্নী সহ একত্র বাস, এক প্রকার জীয়ন্তে নরক ভোগ। আমি কিন্তু প্রকাশ্যে ছিলাম ভাল। কারণ যেখানে প্রভুর আদর সেখানে অন্যের আদরের দুঃখ কি? সপত্নীবাদের রহস্য আছে। যেখানে সপত্নীবাদ, সেইখানেই শুনা যায়, স্বামীর পক্ষে কনিষ্ঠা স্ত্রীই আদরের ও পরম রূপবর্তী। পূর্বে জাএদার ভাগ্যাকাশে যে যে প্রকারে স্বামীর ভালবাসার তারকারাজি ফুটিয়া চমকিয়াছিল, আমার ভাগ্যবিমানেও তাহাই ঘটিল। আমিই যখন কনিষ্ঠা স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসায় আমিই সম্পূর্ণ অধিকারিনী। সাধারণ মত আমিই স্বামী হৃদয় অন্তর প্রাণ ষোল আনা অধিকার করিয়া বসিয়াছি। এই কারণে আমি জাএদার চক্ষের বিষ। এই কারণেই স্বামীবধে মহাবিষের আশ্রয়। এই বিষের কথাতেই এত কথা মনে হইল। প্রভু– অন্তঃপুরে জাএদার চক্ষের বিষ জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়াই বাস করিতে হইল। স্বামীর হাবভাব, বিচার ব্যবস্থায় তিন স্ত্রীর মধ্যে প্রকাশ্যে ইতর বিশেষ কিছুই ছিলনা। জাএদার চক্ষে আমি যাহা কিন্তু হাসনেবানুর চক্ষে তাহার বিপরীত। স্বামীগত প্রাণ স্বামীকে অকপট হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। সেই ভালবাসা স্বামীর গুপ্ত ভালবাসা আমাকে ভাবিয়া ভালবাসার ভালবাসা জ্ঞানে আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিলেন। বিশ্বাস করিলেন ভালবাসার কারণ আমার মনে হইল যে সপত্নী জাএদা তাহার অন্তরে যে প্রকার দুঃখ দিয়াছিল, আমার দ্বারা তাহার পরিমাণ অনুযায়ী পরিশোধ হইল ভাবিয়াও বোধ হয় আমি ভালবাসা পাইলাম। জাএদাকে তিনি যে প্রকার বিষ নয়নে দেখিতেন জাএদা আমাকে সেই প্রকার বিষ নয়নে দেখিতে লাগিল সুতরাং শত্রুর শত্রু মিত্র। ইহাতেই আমি হাসনেবানুর প্রিয় সপত্নী সপত্নী সম্পর্ক কিন্তু স্নেহে আদরে ভালবাসায় প্রিয়তমা সহোদরা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠাকে যে যে প্রকারের সুমিষ্ট বচনে উপদেশ আজ্ঞা সতর্ক করিতেন, হাসনেবানু আমাকে সেই প্রকারে

ভালবাসার সহিত নানা বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করিতেন। আমিও তাহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছি, এ পর্যন্ত দেখিতেছি। কোন সময়ে জাএদা বিবির সহিত চোখে মুখে নজর পড়িলে সর্বনাশ, সে তীব্র চাহনীর ভাব যেন এখনও আমার চক্ষের উপর আঁকা রহিয়াছে বোধ হয়। পারেনত চক্ষের তেজে আমাকে দগ্ধ করিয়া ছাই করেন, জীবন্ত গোরে পুতিতে পারিলেই যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। এমনই রোষ এমনই হিংসার তেজ যে অমন সুন্দর মুখখানি আমার মুখের উপর নজর পাড়িতেই যেন বিকৃত হইত। কে যেন এক পেয়ালা বিষ মুখের উপর ঢালিয়া দিত। কিছু দিন যায় এক দিন অতি প্রত্যুষে মেঘের গুড় গুড় শব্দের ন্যায় ডঙ্কা, কাড়া নাকড়া ধ্বনি কানে আসিল। মনে আছে খুব মনে আছে। প্রভাত হইতেই মদিনাবাসীরা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীর মনে মাতিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে যুবা বৃদ্ধ সকলের শরীরেই চর্ম বর্ম তীর তরবারির শোভা পাইতে লাগিল। রূপে আভা সজ্জিত আভায় সমুদিত দিনমণির অদ্বিতীয় উজ্জ্বলাভা সময়ে সময়ে যেন মলিন বোধ হইতে লাগিল।

"প্রভুও সজ্জিত হইলেন। বীরসাজে সাজিলেন। সে সাজ আমার চক্ষে সেই প্রথম। এখনও যেন চক্ষের উপর ঘুরিতেছে। দেখিলাম প্রভুই সকলের নেতা। কিছুক্ষণ পর দেখি বীর প্রসবিনী মদিনার বীরাঙ্গনারগন মুক্তকেশে অসি হস্তে দলে দলে প্রভুর নিকটে আসিয়া যুদ্ধে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কাহার সহিত যুদ্ধ কে সে লোক যে কুলবধুয়া পর্যন্ত অসি হস্তে যে মহাপাপীর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইয়াছে? শেষে শুনিলাম, এজিদের আগমন, মদিনা আক্রমণের উপক্রম। ধন্য মদিনা! বিধর্মীর হস্ত হইতে ধর্মরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা জাতীয় জীবন রক্ষা, হেতু নারী জীবনের রণ বেশ, কোমল করে লৌহ অস্ত্র হৃদয়ের সহিত তোমায় নমস্কার করি।

"প্রভু আমার রণ-রঙ্গিণীদিগকে ভগিনী সম্ভাষণে কত অনুনয় বিনয় করিয়া যুদ্ধ গমনে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় মদিনাবাসীর সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। বিজয়ী বীরগণকে মদিনা ক্রোড় পাতিয়া কোলে লইল। আমার ভাবনা, চিন্তা, এজিদের ভয় হৃদয় হইতে একেবারে সরিয়া গেল। এজিদের পক্ষ- পরাস্ত- আনন্দের সীমা নাই কিন্তু একটি কথা মনে হইল। এ যুদ্ধের কারণ কি? প্রকাশ্যে যাহাই হউক, লোকে যাহাই বলুক, রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে জয়নাব- লাভ- আশা যে এজিদের মনে ছিল না তাহা নহে! ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। কিন্তু জাএদার চিন্তা জয়নাবের সুখ- তরী- বিষাদ- সিন্ধুতে বিসর্জন করা। সোনায় সোহাগা মিশিল। মায়মুনার ছলনায় জাএদা ইহকাল পরকালের কথা ভুলিয়া সপত্নীবাদে হিংসার বশবর্তীনী হইয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে বিষ ঢালিয়া দিল। খর্জুর উপলক্ষ্য মাত্র। জাএদার কার্য জাএদা করিল কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন, প্রাণে বাচিলেন, প্রভু রক্ষা পাইলেন। কিন্তু শত্রুর ক্রোধ দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়া প্রাণ বিনাশের নূতন চেষ্টা হইতে লাগিল। চক্রীর চক্রভেদ করা কাহারও সাধ্য নহে, সেই মায়মুনার চক্রে সেই জাএদার প্রদত্ত বিষেই প্রভু আমার জগৎ কাঁদাইয়া

জগতে চির বিষাদ বায়ু বহাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। জয়নবের জপাল পোড়া কপাল আবার পুড়িল। আবার বৈধব্যব্রত সংসারসুখে জলাঞ্জলি!

"হায়! হায়! পাপীয়সী জাএদা আমাকে মহাবিষ না দিয়া প্রভু হাসানকে কেন বিষ দিয়া প্রাণসংহার করিল? আমার পরমায়ু শেষ করিয়া জগৎ হইতে দূর করিলে আবার যে সেই হইত। আবার স্বামীর ভালবাসা নূতন প্রকারে পাইত্ তাহার মনের বিশ্বাসেই বলি হতভাগিনী জয়নাব জগৎ চক্ষু হইতে চিরদিনের মত সরিলে তাহার স্বামী আবার তাহারই হইত। স্বামীর ভালবাসা ক্ষেত্র হইতে জয়নাব কন্টক দূর হইলে আবার প্রণয়কুসুম শতদলে বিকশিত হইত। তাহা করিল না কেন? পাপীয়সী সে সুপ্রশস্ত সরল পথে পদ বিক্ষেপ না করিয়া এ পথে স্বামী-সংহার পথে কেন হাটিল। মায়মুনার পরামর্শ। আর হিংসার সহিত দুরাশার সমাবেশ। একত্র সম্মিলন। ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতি বাহ্য সুখ প্রিয় বিলাসিনী রমনীগনের আকাঙ্খা উত্তেজনা। রত্ন অলঙ্কার মহামূল্য বসনের অকিঞ্চিৎকর আকর্ষণ। অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিনী শেষে পাটরাণী হইবার আশার কুহক। পাটেশ্বরী হইয়া দামেস্ক রাজ সিংহাসনে এজিদের বাম পার্শ্বে বসিবার ইচছা। স্ত্রীজাতি প্রায়ই বাহ্য সুখ সম্ভোগপ্রিয়া। প্রভু হাসান সংসারে বিলাসিতার নাম ছিল না। সে অন্তপুরের রমনীর মনোমুগ্ধকারী সাজ সরঞ্জাম উপকরণ প্রচলন ব্যবহার দূরে থাকুক, ধর্মচিন্তা, ধর্মভাব বিশুদ্ধ আচরণ ভিন্ন সুখ সম্পদের ছটা নামগন্ধের অণুমাত্র কাহারও মনে ছিল না,- এজিদ- অন্তঃপুরে জগতের সুখে সুখী হইবার সকলই আছে; এজিদের মতে সেই প্রকার সুখসাগরে ভাসিবার আর বাধা কি? কয় দিন- স্ত্রীলোকের মন কয় দিন? দুরাশার বশবর্তিনী হইয়াই জাএদার মতিচ্ছন্ন মদিনার সিংহাসন শুন্য প্রভুর জলপানের সোরাহীতে হীরকচুর্ণ। হায় এক কথা মনে উঠিতে কত কথা মনে উঠিতেছে। এ কথা শুনে কে? মন তো কিছুতেই প্রবোধ মানে না এখন এ সকল কথা মনে উঠিল কেন? উহু! আমি ত স্বামীর পদতলেই শয়ন করিয়াছিলাম। প্রভু আমার বক্ষোপরি পবিত্র পদ দুইখানি রাখিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পাপীয়সী জাএদা কোন সময়ে কি প্রকারে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল? বিবি হাসনেবানুর এত সতর্কতা, এত সাবধানতা-খাদ্য সামগ্রী পানীয় জলে যত্ন, ইহার মধ্যে কি প্রকারে কি করিল?আমার কপাল পুড়িবে, তাহা না হইলে নিদ্রাঘোরে অচেতন হইলাম কেন? কত রাত জাগিয়াছি, কত নিশা বসিয়া কাটাইয়াছি, হায়, হায়, সে রাত্রে নিদ্রার আকর্ষণ এতই হইল? জাএদা কক্ষমধ্যে আসিয়া পানীয় জলে বিষ মাখাইল কিছুই জানিতে পারিলাম না। পাপীর অধোগতি দুর্গতি ভিন্ন সদগতি কোথায়? আশা মিটিল না, যে আশার কুহকে পড়িয়া স্ত্রী-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে বিষ ঢালিয়া দিল, সে আশায় ছাই পড়িল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না, কিন্তু কার্যফলের পরিনাম ফল ঈশ্বর এইটুকু দেখাইয়া দিলেন। জাএদার নব প্রেমাস্পদ কপট- প্রেমিক প্রাণাধিক শ্রীমান এজিদ- হস্তে প্রকাশ্য দরবারে প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ সহিত বিষময় বাক্যবাণ, শেষে পরমায়ু প্রদীপ নির্বাণ

করাইলেন। দরবার- গৃহে চক্ষুই দেখিল- জাএদা আর রাজরাণী এজিদের বাম অঙ্কশোভিনী স্বর্ণ সিংহাসনে পাটরাণী। সেই মুহূর্তেই সেই চক্ষেই আবার দেখিল, অস্ত্রাঘাতে এজিদ- হস্তে জাএদার মুন্ডপাত। জাএদার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। দরবার- গৃহের মর্যাদা রক্ষা পাইল। বিচার আসনের গৌরব বৃদ্ধি হইল। আমার মনে কথা ইতি হইল না। মায়মুনাও পুরষ্কারের স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া লইতে পারিল না।"

পুনরায় জয়জয়কার ক্রমেই যেন নিকটবর্তী। কান পাতিয়া শুনিলেন, জনকোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি। মুখে বলিলেন, "আজি এত গোল কিসের? কি হইল? যাক, ও গোলযোগে আমার লাভ কি? মনের কথা উথলিয়া উঠিতেছে।"

স্থির করিলাম, এ পবিত্র পুরী জীবনে পরিত্যাগ করিব না। যেখানেই যাইব নিস্তার নাই। এজিদের হস্ত হইতে জয়নাবের নিস্তার নাই। ইহা ভাবিয়া প্রভু হোসেনের আশ্রয়েই রহিলাম। এজিদের আশা যেমন তেমনই রহিয়া গেল। এত চেষ্টা এত যত্ন, এত কৌশলেও জয়নাব হস্তগত হইল না, সম্পূর্ণ বিঘ্নই আশ্রয়দাতা । আশ্রয়দাতাকে ইহজগৎ হইতে দুর করাই এজিদের আন্তরিক ইচ্ছা! প্রকাশ্যে রাজ্যলাভের কথা কিন্তু মনের মধ্যে অন্য কথা। এজিদের চক্রেই প্রভু হোসেনের কুফায় গমন সংবাদ।

পরিজনসহ প্রভু হোসেন কুফায় গমন করিলেন। হতভাগিনীও সঙ্গে চলিল। হায়! কোথায় কুফা, কোথায় কারবালা! কারবালার ঘটনা মনে আছে সকলই কিন্তু মুখে বলিবার সাধ্য নাই। হায়! আমার জন্য কি না হইল? মহাপ্রান্তর কারবালাক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিল; শত শত সতী পতিহারা, পুত্রহারা হইয়া আজীবন চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল; মহা মহা বীরসকল এক বিন্দু জলের জন্য লালায়িত হইয়া শত্রুহস্তে অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিল। কত বালক বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ছটফট করিতে করিতে পিতার বক্ষে মাতার ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। কাসেম সখিনার কথা মনে হইলে এখন ও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। শোকসিন্ধুমধ্যে বিবাহ কি নিদারুন কথা! কাসেম সখিনার বিবাহের কথা মনে পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, সে দুর্দিনের শেষ ঘটনায় যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল। সে অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা নাই, প্রভু হোসেন তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সীমারের খঞ্জরে দেহত্যাগ করিলেন। হায় হোসেন হায় হোসেন রবে প্রকৃতির বক্ষ ফাটিতে লাগিল ।আমরা তখনই বন্দিনী। নূরনবী মোহাম্মদের পরিজনগণ তখনই বন্দিনী। দামেস্কে আসিলাম। আর রক্ষা নাই। এজিদ হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ডুবিলাম আর উপায় নাই। নিরাশ্রয়ার আশ্রয়ই ঈশ্বর। আশা ভরসা যাহা সম্বল ছিল ক্রমে হৃদয় হইতে সরিয়া এক মহাবলের সঞ্চার হইল; এজিদ নামে আর কোন ভয়ই রহিল না। এই ছুরিকা হস্তে করিতেই মন যেন ডাকিয়া বলিল,-এই অস্ত্র দুরাচারের মাথা কাটিতে এই অস্ত্র। সাহস হইল বুকেও বল বাধিল। পারিব সে অমূল্য রত্ন রমনীকূলের মহামূল্য রত্ন, দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, হয় দস্যুর

জীবন, নয় ধনাধিকারিণীর জীবন ছুরিকার অগ্রে,—হয় এজিদের বক্ষে প্রবেশ করিবে, নয় জয়নাবের চির-সন্তাপিত হৃদয়-শোণিত পান করিবে। আর চিন্তা কি! নির্ভয়ে সাহসে নির্ভর করিয়া বসিলাম। পাপীর চক্ষু এ পাপচক্ষে কখনই দেখিব না, ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিয়তির বিধানে সে প্রতিজ্ঞা রহিল না। দামেস্কে আসিবামাত্রই এজিদে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইল। পাপীর কথা শুনিলাম। উত্তর করিলাম সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকাও দেখাইলাম। মহাপাপীর হৃদয় কম্পিত হইল। মুখের ভাবে বুঝিলাম নিজ প্রাণের ভয় অপেক্ষা জয়নাবের প্রাণের ভয়ই যেন তাহার অধিক। কি জানি জয়নাব যদি আত্মহত্যা করে তবেই তো সর্বনাশ।

"যাহাই হউক, ঈশ্বর কৃপায় পাপাত্মার মনে যাহারই উদয় হউক, সে সময় রক্ষা পাইলাম, কিন্তু বন্দীখানায় আসিতে হইল। এই সেই বন্দীগৃহ। জয়নাব এজিদের বন্দীখানায় বন্দিনী। প্রভুপরিজন এজিদের বন্দীখানায় এই হতভাগিনীর সঙ্গিনী! আমার কি আর উদ্ধার আছে? আমার পাপের কি ইতি আছে? না আমার উদ্ধার আছে?

"দয়াময়! তুমিই অবলার আশ্রয়, তুমিই নিরাশ্রয়ের উভয়কালে আশ্রয়। করুনাময়! তোমাকেই সর্বসার মনে করিয়া এই রাজসিংহাসন পদতলে দলিত করিয়াছি; রাজভোগ পাটরাণীর সুখ সম্ভোগ ঘৃণার চক্ষে তুচ্ছ করিয়াছি; তুমিই বল, তুমিই সম্বল। তুমিই অনন্তকালের সহায়।"

পাঠক! ঐ শুনুন! ডঙ্কা তুরী ভেরীর বাদ্য শুনিতেছেন? জয়ধ্বনির দিকে মন দিয়াছেন?

"জয় জয়নাল আবেদীন!" শুনিলেন? দামেস্কের নবীন মহারাজ পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। পূজনীয়া জননী মাননীয় সহোদরা এবং অপর গুরুজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। বেশি দূরে নয় প্রায় বন্দীখানার নিকটে। কিন্তু জয়নাবের কথা এখনও শেষ হয় নাই। আবার শুনুন এদিকে মহারাজও আসিতে থাকুন।

জয়নাব বলিতেছেন , "আমার জন্যই প্রভু পরিবারের এই দুর্দশা। এজিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে মদিনার সিংহাসন কখনই শূন্য হইত না। জাএদার হস্তে মহাবিষ উঠিত না। সখিনাও সদ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিত না। পবিত্র মস্তকও বর্শাগ্রে বিদ্ধ হইয়া সীমার হস্তে দামেস্কে আসিত না।মহাভক্ত আজরও স্বহস্তে তিন পুত্রের বধ সাধন করিত না। কত চক্ষে দেখিয়াছি, কত কানে শুনিয়াছি। হায় হায় সকল অনিষ্টের সকল দুঃখের মূলই হতভাগিনী। শুনিয়াছি, সীমারের প্রাণ মদিনা প্রান্তরে সপ্ত বীরের তীরের অগ্রভাগে গিয়াছে। আম্বাজ অধিপতি মোহাম্মদ হানিফা দামেস্ক নগরের প্রান্ত সীমায় সসৈন্যে মহাবীর নরপতিগণ সহ আসিয়া এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উদ্ধারের জন্য মোহাম্মদ হানিফা এবং তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। এজিদও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। কত কথাই শুনিলাম শেষে শুনিলাম ওমর আলীর প্রাণবধের সংবাদ। শূলদন্ড এজিদ শিবির সম্মুখে

খাড়া হইয়াছে। কত লোক ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে দৌড়িয়াছে। কারবালার যুদ্ধ সংবাদও শিবিরে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম, দামেস্ক- প্রান্তরের যুদ্ধ সংবাদ এজিদের বন্দীখানায় থাকিয়া শুনিয়াছি। কারবালায় যথাসর্বস্ব হারাইলাম। এখানে হারাইলাম, ইমাম বংশের একমাত্র ভরসা জয়নাল আবেদীন। এ কি শুনি "জয় জয়নাল আবেদীন!" কিরূপ ঘোষণা!ঐ তো আবার শুনিতেছি, "জয়! নব ভূপতির জয়!" সে কি কথা, আমি কি পাগল হইলাম! াকি কথার পরিবর্তে কি কথা শুনিতেছি। ভেরী বাজাইয়া স্পষ্ট জয় ঘোষণা করিতেছে। এই তো একেবারে বন্দীখানার বর্হিদ্বারে! এই কথা বলিয়াই জয়নাব শাহরেবানু ও হাসনেবানুর কক্ষে যাইতে অতি ব্যস্তভাবে উঠিলেন। জয়নাবের মনের কথা আর ব্যক্ত হইল না। উচ্চৈঃস্বরে জয়রব করিতে করিতে সৈন্যগণ বন্দীখানার মধ্যে আসিয়া পড়িল । দীন মোহাম্মদী নিশান জয়ডঙ্কার তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল। নবীন মহারাজ আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনসহ বন্দী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! এই অবসরে লেখকের একটি কথা শুনুন। সুখের কান্না পুরুষেও কাঁদে, স্ত্রীলোকেও কাঁদে। তবে পরিমাণে বেশি আর কম। জয়নাল আবেদীন বন্দী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা সহোদরা প্রভৃতি প্রিয় পরিজনগণ সুখের কান্নায় চক্ষের জল ফেলিলেন, কি হাসিমুখে হাসিতে হাসিতে প্রিয়দর্শন জয়নালকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, কি কোন কথা কহিয়া প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।দামেস্ক কারাগার সৈন্যসামন্তপরিবেষ্টিত হইলেও প্রত্যক্ষ দেখাইতে যে না পারি, তাহাও নহে; "কার সাধ্য রোধে কল্পনার আঁখি!" তবে কথা এই যে, তাহাই দেখিবেন, না মোহাম্মদ হানিফা এজিদের পশ্চাৎ ঘোড়া চালাইয়া কি করিতেছেন, তাহাই দেখিবেন? আমার বিবেচনায় শেষ দৃশ্যই এক্ষণে প্রয়োজন এজিদবধের জন্যই সকলে উৎসুক। গাজী রহমানেরও ঐ চিন্তাই এখন প্রবল। মোহাম্মদ হানিফার কি হইল? এজিদের ভাগ্যেই বা কি ঘটিল?

নবীন মহারাজ তাহার মাতার পদধূলি মাথায় মাখিয়া অন্য অন্য গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া বন্দীখানা হইতে বিজয়ডঙ্কার বাজাইতে বাজাইতে জয়পতাকা উড়াইতে উড়াইতে প্রিয়পরিজনসহ রাজপুরী মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করুন, আমরা মোহাম্মদ হানিফার অন্বেষণে যাই। চলুন এজিদের অশ্বচালনা দেখি।

চতুর্থ প্রবাহ

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়। ঘটনাচক্রে যত দূর গড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় যেন পূর্ব আশা পূর্ণ হইল। এই পূর্ণ বোধ হইতে হইতে দুই তিন চারি, এমন কি পঞ্চ প্রকারের আশা পঞ্চাশ ভাগে পঞ্চ শত বিভাগে ঘটনালিপ্ত মানুষের হৃদয়াকাশে

সচঞ্চল চঞ্চলার ন্যায় ছুটিতে থাকে, খেলিতে থাকে। জীবনের সহিত আশার সম্বন্ধ! আকাঙ্খার নিবৃত্তি, আশার শান্তি, জীবনের ইতি, এই তিনেই এক, আবার একেই তিন। সুতরাং জীবন্ত দেহে মনের আশা মিটিবার নহে। আশা মিটিল না- মোহাম্মদ হানিফার আশা পূর্ণ হইল না।

যুগল অশ্ব বেগে ছুটিয়াছে। এজিদের অশ্ব অগ্রেই রহিয়াছে। হানিফার মনের আশা, এজিদকে না মারিয়া জীবন্ত ধরিবেন, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু তাহা পারিতেছেন না। এজিদ অশ্বচালনায় পরিপক্ক, প্রাণের দায়ে পথ, অপথ, বন, জঙ্গলের মধ্য দিয়া অশ্ব চালাইতেছেন, পলাইতে পারিলেই রক্ষা, কিন্তু পারিতেছেন না। হানিফাকে দূরে ফেলিয়া আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সেই সমান ভাব। যাহা কিছু প্রভেদ;-অগ্র আর পশ্চাৎ। এজিদ প্রাণপণে অশ্ব চালাইতেছেন, কিন্তু হানিফাকে দূরে ফেলিয়া তাঁহার চক্ষু অগোচর হওয়া দূরে থাকুক, হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে সূচী পরিমাণ রোষও বাড়িতেছে। যতই ক্লান্তি, ততই রোষের বৃদ্ধি।

মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বলগা দন্তে ধারণ করিয়া এজিদকে ধরিবার নিমিত্ত দুই হস্ত বিস্ত ার করিয়াছেন। দুলদুল প্রাণপণে দৌড়িতেছে, কিন্তু ধরিতে পারিতেছেন না। এই ধরিবেন, এইবারেই ধরিবেন, আর একটু অগ্রসর হইলে ধরিতে পারিবেন, অশ্ব হইতে চ্যুত করিবেন, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না।

এজিদ প্রাণভয়ে পলাইতেছেন! অন্য কোন কথা সে সময়ে মনে উদয় হইবার কথা নহে। প্রাণ বাঁচাইবার পন্থাই নানা প্রকারে মনে মনে আঁকিতেছেন। আর একটা কথাও বেশ বুঝিতেছিলেন যে, মোহাম্মদ হানিফা তাঁহার প্রাণবধের ইচ্ছা করিলে বহু পূর্বে শেষ করিতে পারিতেন, অথচ তাহা করিতেছেন না। মন ডাকিয়া বলিতেছে, "এজিদকে হানিফা ধরিবেন,-মারিবেন না-প্রাণে মারিবেন না।" হইতে পারে এজিদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ নিষেধ। এ দুয়ের এক না হইয়া এরূপভাবে বীরের সম্মুখে-বীরের অস্ত্রের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সৌভাগ্যের কথা। "এখন কোন উপায়ে ইহার চক্ষুর অগোচর হইতে পারিলেই রক্ষা। হানিফা চিরদিন দামেস্কে বাস করিবেন না। এই সন্ধ্যা পর্যন্ত যমের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারিলেই প্রাণ বাঁচে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই প্রকার ঘোরাফেরা করিয়া কাটাইতে পারিলেই আর ভয়ের কারন নাই। আমার পরিচিত ও হানিফার অপরিচিত দেশ ও পথ। আমি অনায়াসে অন্ধকারে চলিতে পারিব । আজিকার অস্তই আমার শুভ অস্ত,- জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়।"

এই সকল চিন্তা শ্রেণীর বদ্ধরূপে যে এজিদের মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাণান্ত সময়ে পূর্ব লক্ষণ ক্ষণকাল বিকার, ক্ষণকাল অজ্ঞান, ক্ষণকাল ঘোর অচৈতন্য, ক্ষণকাল সজ্ঞান। সেই সজ্ঞান সময়টুকুর মধ্যে চিন্তার ঢেউ ঐরূপ সময়ে সময়ে এজিদের মনে উঠিতেছিল। এজিদ হস্ত হইতে অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিলেন। সজোরে কশাঘাত করিতে

লাগিলেন। এখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। অশ্বের স্বেচ্ছাধীন গতিই তাঁহার গতি। অশ্বের মনোমত পথই তাঁহার বাঁচিবার পথ- আর দক্ষিণে বামে ফিরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন না। ঘোড়া আপন ইচ্ছামত ছুটিয়াছে।

হানিফা কিঞ্চিত দূরে পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,- "এজিদ! হানিফার হস্ত হইতে আজ তোমার নিস্তার নাই। কিন্তু এজিদ! এ অবস্থায় তোমায় প্রাণে মারিব না, জীবন্ত ধরিব। তোমার খণ্ডিত শিরের ধরালুণ্ঠিত ভাব, শিরশূন্য দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার দৃশ্য,-হানিফা একা দেখিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষ বীরের আঘাত চারি চক্ষু একত্র করিয়া। আমি কাপুরুষ নহি যে, তোমার পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। হানিফার অস্ত্র আজ পর্যন্ত কাহার পৃষ্ঠদেশে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অগ্রে চক্ষে ধাঁধা না লাগাইয়া অদৃশ্যভাবে কাহারও শরীরে প্রবেশ করে না। তুমি মনে করিও না যে, তোমার পিছনে থাকিয়া পৃষ্ঠে আঘাত করিব। তুমি জঙ্গলে যাও, পাহাড়ে যাও, হানিফা তোমার সঙ্গ ছাড়া নহে।"

এজিদ হানিফার রক্তমাখা শরীরের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন। একবার মাত্র চারি চক্ষু একত্র হইয়াছে। এজিদ হানিফার দিকে দ্বিতীয়বার চাহিতে সাহসী হন নাই কিন্তু সে রক্তজবাসদৃশ আঁখি, রক্তমাখা তরবারি তাঁহার চক্ষের উপর অনবরত ঘুরিতেছে, হৃদয়ে জাগিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণ কাঁপিতেছে। আতঙ্কে দক্ষিণে বামে দেহ দুলিতেছে, কোন কোন সময়ে সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। অশ্বচালনে বিশেষ পরিপক্কতা হেতুতেই আসন টলিতেছে না।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বীরবিক্রমে বলিতে লাগিলেন, "এজিদ! বহু পরিশ্রমের পর তোর দেখা পাইয়াছি। কখনই চক্ষের অন্তরাল হইতে পারিবি না। তুই জানিস, হানিফার বল বিক্রম প্রকাশে আজই শেষ দিন। আজই হানিফার ক্রোধাঙ্কের শেষ অভিনয়। আজ বিষাদের শেষ,-বিষাদ-সিন্ধুর শেষ.-তোর জীবনের শেষ। ঐ দেখ, সূর্য অস্ত যায়। এই অস্তের সহিত কত অস্তের যে যোগ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি দেখিতেছি, তিন অস্ত একত্র মিশিবে, একসঙ্গে একযোগে ঘটিবে-তোমার পরমায়ু, দামেস্কের স্বাধীনতা এবং উপস্থিত সূর্য। চাহিয়া দেখ-যদি জ্ঞানের বিপর্যয় না ঘটিয়া থাকে, তবে চাহিয়া দেখ-গমনোন্মুখ সূর্য কেমন চাকচিক্য দেখাইয়া স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে, নির্বাণোন্মুখ দীপও ঐরূপ তেজে জ্বলিয়া উঠে। প্রাণবিয়োগ-সময়ে শয্যাশায়ী রোগীর নাড়ীর বলও ঐরূপ সতেজ হয়। তোর কিঞ্চিৎ অগ্রসরতাও তাহাই। আর বিলম্ব না। যে একটুকু অগ্রসর হইয়াছিস, সে বাঁচিবার জন্য নহে, মরিবার জন্য। মরুভূমিতে ঘুরিয়াছ, বনে প্রবেশ করিয়াছ, পর্বতে উঠিয়াছ, চক্ষু হইতে সরিয়া যাইতে কত চক্রই খেলিয়াছ, সরিতে পার নাই.-হানিফার চক্ষে ধূলি দিয়া চক্ষের অন্তরাল হইতে সাধ্য নাই। এখন নিকটে বন জঙ্গল নাই যে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বাঁচিয়া যাইবি, তুই নিশ্চয় জানিস, এই রঞ্জিত অসি, তোর অপরিশুদ্ধ হৃদয়ের বিকৃত রক্তধারে আবার

রঞ্জিত করিব। সূর্যরাগে মিশাইয়া উদয় অস্ত একত্র দেখিব। তুই যাবি কোথা? তোর মত মহাপাপীর স্থান কোথা?"

অশ্বারোহী যদি বাগডোর জোরে না রাখে, ঘোড়ার ইচ্ছানুযায়ী গতিতে যদি বাধা না দেয়, তবে অশ্বমাত্রই আপন বাসস্থানে ছুটিয়া আসিতে চেষ্টা করে। এজিদ নিরাশ হইয়া হস্তস্থিত অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কোন পথে কোথায় গেলে পশ্চাদ্ধাবিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়াই তুরঙ্গ-গতিস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছেন। রাজ-অশ্ব রাজধানী অভিমুখে ছুটিয়াছে। দামেস্ক এজিদের রাজ্য। পথ ঘাট সকলই পরিচিত, রাজধানী অভিমুখে অশ্বের গতি দেখিয়া তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে নূতন একটি আশার সঞ্চার হইল-রাজপুরী মধ্যে যাইতে পারিলেই রক্ষা; মনের ব্যগ্রতায় এবং প্রাণের মায়ায় আকুল হইয়া দুই হস্তে অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই যেন প্রাণ বাঁচাইতে পারেন। যুগল অশ্ব বেগে দৌড়িতে থাকুক, এই অবসরে এজিদের নূতন কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি।

হযরত মাবিয়ার লোকান্তর গমনের পর এজিদ মারওয়ানের মন্ত্রণায় দামেস্কপুরী-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যে ভূগর্ভে এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ গুপ্তপুরীর প্রবেশদ্বারও এমন সুন্দর কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে, উদ্যোনালঙ্কার নিকুঞ্জ ভিন্ন দ্বার বলিয়া কেহই নির্ধারণ করিতে পারিত না। যে সময়ের অপেক্ষায় ঐ পুরী, আজ সেই সময় উপস্থিত। এজিদের প্রিয় পরিজন, আত্মীয়-স্বজন প্রাণভয়ে সকলেই ঐ গুপ্তপুরী মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার প্রমাণও পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। যেখানকার যে জিনিস, সেইখানেই পড়িয়া আছ, জনপ্রাণী মাত্র নাই। কোথায় যাইবে, শত্রু-সেনাপরিবেষ্টিত পুরী মধ্য হইতে কোথায় পলাইবে। ঐ গুপ্তপুরীই প্রাণরক্ষার উপযুক্ত স্থান-এজিদের মনে সেই আশা। সে নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে এ একমাত্র আশা-জীবনের নব অঙ্কুর। পুরীর কথা মনে পড়িতেই পরিবার-পরিজনের কথা মনে হইয়াছে। কিঞ্চিৎ আশ্বস্তও হইয়াছেন। রাজপুরী পরহস্তগত হইলেও পরিবার-পরিজন কখনই পরহস্তগত হইবে না। দামেস্কপুরী তন্ন তন্ন করিলেও তাহাদের বিষাদিত কায়া চক্ষে পড়া দূরে থাকুক, ছায়া পর্যন্ত নজরে আসিবে না। এখন উদ্যান পর্যন্ত যাইতে পারিলেই আর পায় কে? লতা-পুষ্পজড়িত কুঞ্জ পর্যন্ত যাইতে পারিলেই হানিফা দেখিবেন যে, এজিদ লতাপাতায় মিশিয়া গেল, পরমাণু আকারের পুষ্প-রেণুর সহিত মিশিয়া পুষ্পদলে দেহ ঢাকিয়া ফেলিল। যাহা হোক, উদ্যান পর্যন্ত যাইতে পারিলেই এজিদের জয়। নগরও নিকটবর্তী। এজিদের জন্মের মত দামেস্ক নগরের পতন-দৃশ্য দেখিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরের সুরঞ্জিত সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন দ্বার অবারিত প্রহরি-বর্জিত! মৃতদেহে রাজপথ পরিপূর্ণ। শবাহারী পশুপক্ষিগণ মহা আনন্দিত। চক্ষের পলকে দ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী চক্ষে পড়িতেই দেখিলেন, উচ্চ উচ্চ মঞ্চে নানা আকারে নূতন পতাকা সকল নগরের লোহিত আভায় মিশিয়া অর্ধচন্দ্র এবং পূর্ণ তারা

প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দামেস্কের পতন-দৃশ্য দর্শকগণে দেখাইতেছে, বিয়ে-বাজনা তুমুল বেগে কর্ণে আসিতেছে। ক্রমেই নিকটবর্তী, রাজপুরী অতি নিকটে! বন্দীগৃহ দূর হইলেও দৃষ্টির অদূর নহে। চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামেস্কের বন্দীগৃহ পড়িতেই মনে যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল! এমন সঙ্কট সময়েও এজিদের মন যেমন কেমন করিয়া উঠিল। যে রূপ হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয়া আসিল। কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। চিত্তক্ষেত্র হইতে সে রূপরাশি একেবারে সরিয়া গেল। নামটি মনে উঠিল, মুখে ফুটিল না। দীর্ঘনিশ্বাসও বহিল না। প্রমাণ হইল, প্রমোদ অপেক্ষা প্রাণের দায়ই সমধিক প্রবল! এই সামান্য অন্যমনস্কতায় অশ্বগতি কিঞ্চিৎ শিথিল হইল।

মোহাম্মদ হানিফা এই অবসরে ঐ পরিমাণ অগ্রসর হইয়া গভীর গর্জনে বলিতে লাগিল, "এজিদ! মনে করিয়াছ যে, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেই আজিকার মত বাঁচিবে। তাহা কখনই মনে করিও না। এই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে তোমারজীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইবে। তোমার পক্ষে দামেস্ক রাজপুরী এইক্ষণ সাক্ষাৎ যমপুরী। কি আশায় সে দিকে দৌড়িয়াছ?" দেখিতেছ না? উচ্চ মঞ্চে কাহার নিশান উড়িতেছে, দেখিতেছ না? রে নরাধম! তুই সেই এজিদ,যে আরবের সর্বপ্রধান বীর হাসানকে কৌশল করিয়া মারিয়াছিস! ওরে! তুই কি সেই পামর, যে সীমার দ্বারা হোসেনের মস্তক কাটাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিস?

মোহাম্মদ হানিফা ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বের কশাঘাত করিলেন। দ্রুতগতি অশ্বপদ-শব্দে পুরজনগণ চমকিয়া উঠিলেন। বিজয়-বাজনা, আনন্দ-রোল, জয়রবের কোলাহল ভেদ করিয়া অশ্ব-পদশব্দ; মহাশব্দে সকলের কর্ণ প্রবেশ করিল। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে সিংহদ্বার দিকে ছুটিলেন! এজিদ অশ্ব হইতে প্রথমে উদ্যান, শেষে পুষ্পলতাসজ্জিত নিকুঞ্জ দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন।

মসহাব কাক্কা প্রভৃতি মহারথিগণ, কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে দ্রুতপদে অসি-হস্তে আসিতেই হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! ক্ষান্ত হও! দোহাই তোমার ঈশ্বরের-ক্ষান্ত হও! এজিদ তোমার বধ্য নহে। বাধা দিও না। এজিদের গমনে বাধা দিও না। এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না।"

মোহম্মদ হানিফার কথা শেষ হইতে না হইতেই এজিদ এক লম্ফে অশ্ব হইতে নামিয়া উদ্যান অভিমুখে চলিলেন। হানিফাও এস্তভাবে দুলদুলের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অসিহস্তে এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। এজিদ যথাসাধ্য দৌড়িয়া উদ্যানস্থ নির্দিষ্ট নিকুঞ্জ মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফাও অতি নিকটে। বিকৃত ও ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হানিফা ক্ষান্ত হও। আর কেন? তোমার আশা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার মুখেই রহিল, এজিদ চলিল।" এই কথা বলিয়াই এজিদ গুপ্তপুরী প্রবেশ-দ্বার কূপমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা রোষে অধীর হইয়া– "যাবি কোথা নরাধম!" এই কথা বলিয়া বীর-বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া অসি হস্তে কূপ মধ্যে লম্ফ দিবার উপক্রমেই বজ্রনাদে শব্দ হইল, "হানিফা! এজিদ তোমার বধ্য নহে।" মোহাম্মদ হানিফা থতমত খাইয়া উর্দ্ধদিকে চাহিতেই প্রভু হোসেনের তেজোময় কায়া দেখিয়া চমকিয়া পিছে হটিলেন এবং ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন।

পুনরায় গভীর নিনাদে শব্দ হইল, "হানিফা ক্ষান্ত হও, এজিদ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় চক্ষু মেলিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মহাঅগ্নিময় মহাতেজ অসংখ্য শিখা বিস্তারে সহস্র অশনিপাত সদৃশ বিকট শব্দ করিয়া নিকুঞ্জ মধ্যস্থ কূপমধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল। এজিদের আর্তনাদে উদ্যানের পক্ষিকুল বিকট কণ্ঠে ভয়ে ডাকিয়া উঠিল, বাসা ছাড়িয়া, শাখা ছাড়িয়া, দিগ্বিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ভূকম্পনে তরুলতাসকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল্ গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী প্রভৃতি উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া নির্বাকে হানিফার পশ্চাতে দন্ডায়মান রহিলেন। মোহাম্মদ হানিফার ভাব ভিন্ন। মুখাকৃতি বিকৃত অথচ হিংসায় পরিপূর্ণ। হৃদয় হিংসানলে দগ্ধীভূত। স্থির নেত্রে উর্ধ্বমুখ হইয়া দন্ডায়মান। তরবারি মুষ্টি দক্ষিণ হস্তে অগ্রভাগ বাম স্কন্ধে স্থাপিত।

আর দৈববাণী "হানিফা দুঃখ করিও না। এজিদ কাহারও বধ্য নহে। রোজ কেয়ামত (শেষ দিন) পর্যন্ত এজিদ এই কূপে এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবে পুড়িতে থাকিবে অথচ প্রাণ বিয়োগ হইবে না।

মোহাম্মদ হানিফা চমকিয়া উঠিলেন। তরবারি অগ্রভাগ স্কন্ধ হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। অশ্ব বলগা বাম হস্তে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, " এজিদ আমার বধ্য নহে। আর কি করিব? ইচছা করিলে এক তীব্র তীরে নরাধমের কলিজা পার করিতে পারিতাম; হৃদয়ের রক্তধারে তরবারির দ্বারাই নারকীর দেহ দুই খন্ডে বিভক্ত হইত। তাহা করি নাই চক্ষে চক্ষে সম্মুখে সম্মুখে না বুঝিয়া অস্ত্রের চাকচিক্য না দেখাইয়া কাহারও প্রাণ সংহার করি নাই। ইহজীবনে কাহারও পৃষ্ঠে আঘাত করি নাই। এজিদ পৃষ্ঠ দেখাইল। আর অস্ত্রের আঘাত কি? জীবন্ত ধরিব সকলের সমুখে ধরিয়া আনিব একত্র এক সঙ্গে মনের আগুন নির্বাণ করিব তাহা হইল না্ মনে আশা মিটি না। এত পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এখন কি করি প্রিয় গাজী রহমান ভাই মসহাব হানিফার মনের আগুন নিভিল না আশা পূর্ণ হইল না কি করি?

এই বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন, চক্ষের পলকে উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। গাজী রহমান মহা সঙ্কটকাল ভাবিয়া মসহাব কাক্কা, ওমর আলী প্রভৃতিকে বলিলেন ভাবিলাম আজই বিষাদের শেষ্ ভাবিয়াছিলাম, আজই বিষাদ সিন্ধু পার হইয়া সুখ সিন্ধুর সুখতটে সকলে একত্রে উঠিব, বোধ হয়, তাহা ঘটিল না। শীঘ্র আসুন বিলম্ব করিবেন না। আমি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দেখিতেছি। আম্বাজাধিপতির মতি

গতি ভাল বোধ হইতেছে না। শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করুন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত দয়াময়ের লীলা বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্য নয়।"

পঞ্চম প্রবাহ

এখন আর সূর্য নাই–পশ্চিম, গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, সম্পূর্ণ নহে। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ সন্ধ্যা–সীমান্তিকনীর সীমন্তে উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন। ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন, আবার দেখিতেছেন্ মানব দেহের সহিত তারাদলের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু বহু দূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে কে দেখিতে পারে? অন্যায় নরহত্যা অবৈধ বধ কোন চক্ষু দেখিতে পারে? আজিকার সূর্যে উদয় না হইতেই হানিফার রোষে উদায় তরবারি ধারণ। সে সূর্য অস্তমিত হইল। দামেস্ক প্রান্তর মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল কিন্তু মোহম্মদ হানিফার জিঘাংসা বৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। "এজিদ তোমার বধ্য নহে" দৈববাণীতে মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে রোষ এবং ভয় একত্র একসময়ে উদিত হইয়াছে। উদ্যান–মধ্যে উর্ধ্বমুখ হইয়া স্থির নেত্র ক্ষণকাল চিন্তার কারণও তাহাই। এক সময়ে দুইবার পরস্পর বিপরীত ভাব নিতান্তই অসম্ভব; কিন্তু হইয়াছে তাহাই ভয় এবং রোষ। বীরহৃদয় ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে সে কিঞ্চিৎ কাঁপিতেছিল, তাহা দৈববাণী বলিয়া প্রভু হোসেনের জ্যোতির্ময় পবিত্র ছায়া দেখিয়া, কিন্তু পরিশেষে নির্ভয়ে হৃদয়ে ভয়ের স্থান হইল না; সতুরাং রোষেরই জয়। প্রমাণ অশ্বে আরোহণ সজোরে কশাঘাত।

কানন দ্বার পার হইয়া এজিদের গুপ্তপুরী প্রবেশদ্বার আবরণকারী লতাপত্র বেষ্টিত নিকুঞ্জ প্রতি একবার চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন দুর্গন্ধময় ধূমরাশি হু-হু করিয়া আকাশে উঠিতেছে, বাতাসে মিশিতেছে! রাজপুরী পশ্চাৎ রাখিয়া দামেস্ক নগরের পথে চলিলেন। যে তাহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল তাহারই জীবন শেষ হইল। বিনা অপরাধে হানিফার অস্ত্রে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া খন্ডিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জয়নালভক্ত প্রজাগণ এজিদের পরিনাম দশা দেখিতে আনন্দোৎসাহে রাজপুরীর দিকে দলে দলে আসিতেছিল্ হানিফার রোষাগ্নিতে পড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না আপন প্রতিপালক রক্ষকহস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল।

নগরের প্রবেশদ্বারে প্রহরিগণ বসিয়াছিল। এজিদসহ মোহম্মদ হানিফা নগরে প্রবেশ করিলে প্রহরিগণ মোহাম্মদ হানিফাকে দেখিয়াই সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত কর্তব্যকার্যে তৎপর হইল। নিকটে আসিতেই প্রহরিগণ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল।

গাজী রহমান মসহাব কাক্কা প্রভৃতি যথাসাধ্য ত্রস্তে আসিয়াও মোহাম্মদ হানিফাকে নগরে পাইলেন না। সিংহদ্বারে আসিয়া যাহা দেখিবার দেখিলেন। প্রান্তরে আসিয়া স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার জীবন শেষ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এখনও ঘোর অন্ধকার দামেস্ক প্রান্তর আবৃত হয় নাই।

ঘোরনাদে শব্দ হইল "মোহাম্মদ হানিফা"

নিজ নাম শুনিতেই মোহাম্মদ হানিফা একটু থামিয়া দক্ষিণে বামে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গাজী রহমান প্রভৃতিও ঐ শব্দ শুনিয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; স্থির ভাবে দাড়াইলেন এবং স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, যেন আকাশ ফাটিয়া প্রান্তর কাপাইয়া শব্দ হইতেছে হানিফা একটা জীবন সৃষ্টি করিতে কত কৌশল তাহা তুমি জান? সৃষ্ট জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারনে জীবের জীবনলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারি দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকুলের জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এ প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্ত হইল না। জয়ের পর বধ অপেক্ষা পাপের কার্য আর কি আছে? নিরপরাধের প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে দুলদুল সহিত রণবেশে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক"।

বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্বতমালা হইতে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ পাতাল কাপাইয়া বিকট শব্দে মোহাম্মদ হানিফাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফা বন্দী হইলেন। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিবেন।

গাজী রহমান মসহাব কাক্কা প্রভৃতি এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া শত শত বার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। ম্লানমুখে মন্দ মৃদু গতিতে প্রাচীরের নিকট যাইয়া নিকট মাথা নোওয়াইয়া কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন প্রাচীর মধ্যে ঘোড়ার পদশব্দ। মসহাব কাক্কা প্রভৃতিও সে শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঠক সে প্রাচীর এক্ষণে পর্বতে পরিণত। ঐ পর্বতের নিকট কান পাতিয়া শুনিলে আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যায়।

রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মদ হানিফা ঐ প্রাচীর মধ্যে অশ্বসহ আবদ্ধ থাকিবেন। দৈববাণী অলঙ্ঘনীয়। "যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল। যাহা দয়াময়ের ইচ্ছা ছিল, সম্পূর্ণ হইল। আর বৃথা এ প্রান্তরে থাকিয়া লাভ কি? গাজী রহমান এই কথা বলিয়া নগরাভিমুখী হইলেন. সঙ্গীরাও তাহার পশ্চাৎবর্তী হইলেন।

অন্ধকার আবরণে জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। এ মহাকাব্য "বিষাদ সিন্ধুর ইতিও এইখানে হইল। সিন্ধু পার হইয়াও হইতে পারিলাম না আশা মিটিল না। পূর্ণ সুখ

জগতে নাই। কাহারও ভাগ্য ফলকে ষোল আনা সুখভোগের কথা লেখা নাই। সুতরাং বিষাদ সিন্ধু পার হইয়া সুখ সিন্ধুতে মিশিতে পারিলাম না।

জয়নাল আবেদন পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পরিবার পরিজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত রাজভবনে আনিয়াছেন। মদিনা দামেস্ক উভয় রাজ্যই এখন তাহার করতলে উভয় সিংহাসনই এখন জয়নাল আবেদীনের বসিবার আসন। পরম শত্রু পৈতৃক শত্রু এজিদের সর্বস্ব গিয়াছে; ধন জন রাজ্যপাট সকলই গিয়াছে। যদিও প্রাণ যায় নাই কিন্তু দৈবাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত কূপ মধ্যে এজিদ দেহের অন্য কোন ক্রিয়া নাই। সে দেহ মনুষ্যের আর দেখবার সাধ্য নাই। সুতরাং সাধারণ চক্ষে এজিদ বধই সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুখের একশেষ আরও অধিক সুখের কথা হইতে যদি মোহাম্মদ হানিফা দৈবনির্বন্ধে প্রস্তর প্রাচীরে চির আবদ্ধ না হইতেন্ হায় হায় আক্ষেপ শত আক্ষেপ সিন্ধু রহিয়া গেল। হায় হোসেন হায় হোসেন হায় মোহাম্মদ হানিফা মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া সজল নয়নে বিদায় হইতে হইল।

উপসংহার

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। নিয়তির বিধানফল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহাজগতে মানব চক্ষে যাহা দেখিবার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সকলেই দেখিল। যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিল। নানা চিন্তায় এজিদের পরিণাম মোহাম্মদ হানিফার জীবনের শেষ ফল ভাবিতে ভাবিতে দামেস্ক রাজ প্রাসাদে নব ভূপতিও মন্ত্রিদলের নিশাবসান হইল। সম্পূর্ণ সুখভোগে মনের চক্ষুজল সহিত অতি ক্লান্ত অতি বিশ্রান্ত হইয়াও অনিদ্রায় ঊষার সহিত সম্মিলিত হইল। প্রভাতীয় উপাসনার আহ্বানধ্বনি (আজান) রাজপ্রাসাদ জাগাইয়া তুলিল। উপাসনার পর সকলেই দরবার গৃহে উপবেশন করিলেন। .

উপস্থিত কার্যাদির বন্দোবস্ত করাই গাজী রহমানের ইচ্ছা। সময়ে নবীন মহারাজ রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। গাজী রহমানের আদেশে মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানকে আহ্বান করিয়া প্রধান মন্ত্রীতে বরণ করা হইল। মন্ত্রি প্রবর হামান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিলেন,–

"ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। যাঁহাদের সিংহাসন তাহারাই অধিকার করিলেন। মহারাজ এজিদের কর্মফল এবং পিতৃ অভিসম্পাতে অধঃপতন। উষ্ণ মস্তিষ্ক এবং উষ্ণ শোণিতবলে যে রাজা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, যাহা সম্ভবপর নহে, সাধারণের অনুমোদনীয় নহে, বিজ্ঞ বুদ্ধিমান পন্ডিতগণের অভিমত নহে, বহুদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ প্রাচীন প্রধান কার্যকারকগণের ইচ্ছা নহে, সেই অঘটন কার্য ঘটাইতে গেলেই এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। এজিদের পতন, রাজ্য হইতে বিচ্যুতি এবং আত্মজীবন বিনাশ ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। অবিবেচক অপরিপক্ক মস্তিষ্ক উদ্ধত যুবকদিগের কার্যফল এইরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপ কহিয়া নবভূপতির মঙ্গল কামনা করিয়া নতশিরে অভিবাদন করত মন্ত্রিপ্রবর হামান উপবেশন করিলেন, রাজকার্যের সমুদয় ভার তাহার প্রতি অর্পিত হইল। নবীন মহারাজ আত্মীয়-স্বজন-পরিবারসহ পবিত্র ভূমি মদিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মদিনাবাসীরাও মহাআনন্দে নবীন মহারাজ সহিত মদিনা যাইতে উদ্যোগী হইলেন।

বিজয়ী বীরগণসহ সৈন্যসামন্তসহ আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনগণসহ বিজয় পতাকা উড়াইয়া বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে নবীন ভূপতি দামেস্ক হইতে মদিনার পথে বহির্গত হইলেন। গাজী রহমানের আদেশে এই শুভ-সংবাদ সংবাদ লইয়া বহুসংখ্যক দূত অশ্বপৃষ্ঠে মদিনাভিমুখে ছুটিলেন। দামেস্ক বিজয়, এজিদের পরাজয় পলায়ন মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধ বিবরণ ইতিপূর্বেই মদিনাবাসীগণ পরম্পরায় শুনিয়া মহানন্দিত হইয়া উৎসুকচিত্তে রাজকীয় সংবাদ আশায় দিবারাত্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। সময়ে দামেস্ক হইতে প্রেরিত কাসেদগণ প্রমুখ এই শুভ সংবাদ পাইয়া মদিবাবাসীগণ হযরত মোহাম্মদের রওজায় যাইয়া নবীন ভূপতি জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা

করিলেন এবং নবভূপতিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য সমুচিত আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। নবভূপতির আগমনদর্শন দর্শনাশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় দল কাসেদ একদিন উপনীত হইয়া ঘোষণা করিল,–জয় জয়নাল আবেদীন! জয় ইমাম বংশের শেষ রাজদন্ডধর! আজ মদিনা প্রান্তর পর্যন্ত,–ঐ প্রান্তরেই সসৈন্য নিশাযাপন। আগামীকল্য প্রত্যুষে নগরে প্রবেশ। প্রথম হযরতের রওজা জেয়ারত, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ।

ঘোষণা প্রচার মাত্র মদিনা নবসাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। নবভূপতিকে পরিজনসহ, বিজয়ী বীরবৃন্দসহ গ্রহণ করিতে মদিনা স্বর্গীয় সাজে সজ্জিত হইল, উচ্চ উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর উচ্চ মঞ্চে অর্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারকাখচিত লোহিত নিশান সকল উড়িতে লাগিল। এতকাল পর্যন্ত যে যে স্থানে নীলবর্ণ নিশান উড়িয়া হাসান হোসেনের শোক জ্ঞাপন করিতেছিল, আজ সেই সেই স্থানে লোহিত, পীত এবং মনোগুগ্ধকর নানা রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকাসকল বায়ুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহরাজি নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত পুষ্পহারে অলংকৃত হইয়া প্রকৃতি শোভাবর্ধন করিল। গৃহসকলের প্রতি গবাক্ষ সুরঞ্জিত আবরণ বস্ত্রে আবৃত পুষ্পহারে সজ্জিত হইয়া অমরাপুরীসদৃশ পরিশোভিত হইতে লাগিল। যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এজিদ বধ কৃতসঙ্কল্পে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার পরিজন মনের আনন্দে কেহ বসন ভূষণে সজ্জিতা, কেহ মহাহর্ষে বস্ত্রালঙ্কার সাজসজ্জার বিষয় ভুলিয়া যেরূপে ছিলেন, সেই প্রকারে আনন্দিত মনে পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালাসকল সম্মুখে করিয়া গবাক্ষদ্বারে কেহ গৃহ প্রবেশের সোপান শ্রেণীতে দন্ডায়মান রহিলেন। পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন মদিনা সজীব ভাব ধারণ করিল। চতুর্দিকে আনন্দ কোলাহল, রাজপথে রাজসংশ্রবী গৃহ সোপানোপরি অধিবাসীগণের গৃহদ্বারে দলে দলে নগরবাসীগণের সুরঞ্জিত ও সজ্জিত বেশে সমাগম, আগন্দ কোলাহলে নগরময় কোলাহলে পরিপূর্ণ; ঐ আসিতেছে, ঐ ডঙ্কাধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; ঐ ভেরীরব ভীষণ রবে প্রান্তর কাঁপাইতেছে। বিগত নিশায় অনেক চক্ষুই নিদ্রার আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত ছিল। মনের আনন্দে মনের উত্তেজনায় বহু চেষ্টাতেও নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই, কেহ কেহ প্রভাত সময়ে শরীরের ক্লান্তি শ্রান্তি হেতু অবসাদে উপবেশন স্থানেই শয়নশয্যাবিহীন, উপাধানবিহীন উপবেশন স্থানেই অর্দ্ধশায়িতভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। সুনিদ্রার আকর্ষণ হইলে আর কি বিলম্ব আছে? না সুখশয্যার অপেক্ষা আছে? যেখানে চক্ষের পাতা ভারী, সেখানেই নিদ্রা, অচেতন। তাহার পর জনকোলাহলে হঠাৎ জাগিয়া কি করিবেন, কি শুনিবেন, কোথা যাইবেন, কি অপকর্ম করিয়াছি, ক্ষণস্থায়ী অনুতাপ সহ্য করিয়া চতুর্দিক চাহিয়া গম কথাসকল ক্রমে স্মরণপথে আনিয়া মহাব্যস্তে মনোমত স্থানে যাইয়া উপবেশন

করিলেন। একদৃষ্টে রাজপথ পরিশোভা, সজ্জিত গৃহশ্রেণীর নয়নরঞ্জন মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে নিদ্রাবেশের অলসতা দূর করিলেন।

নগরবাসীগণ নব সাজে সজ্জিত হইয়া দলে দলে নগরের প্রান্তসীমা সিংহদ্বার পর্যন্ত যাইয়া বিজয়ী আত্মীয়স্বজনকে আশু বাড়াইয়া আনিতে উৎসুক নয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সময় হইল, প্রথম পদাতিকশ্রেণী বিজয়-নিশানসহ দেখা দিল,-তৎপশ্চাৎ যোধসকল শ্রেণীবদ্ধরূপ সিংহদ্বার পার হইল। তৎপরে উষ্ট্রোপরি নকীবদল বাঁশরী বাজাইয়া নব ভূপতির জয় ঘোষণা সহিত আগমন ঘোষণা অতি সুমিষ্টস্বরে নাকাড়া সহিত বাদ্য করিতে করিতে আসিল। তৎপরে নানারূপে বস্ত্রাভরণে সজ্জিত বীরকেশরীগণ অলংকৃত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া হাসি হাসি মুখে নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রাজ-আত্মীয় মহা মহা বীরগণ রত্নখচিত জড়িত সাজে সজ্জিত হইয়া বৃহদাকার সজ্জিত অশ্ব আরোহণ ও ভীমকায় রক্ষিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পর সুবর্ণ ও রজতদণ্ডে স্থাপিত কারুকার্যখচিত অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণতারকাসংযুক্ত বহুসংখ্যক নিশানধারী অশ্বারোহীদের পশ্চাতে, সুবর্ণাদণ্ডে স্থাপিত কারুকার্যখচিত শুভ্র বন্দ্রাতপ তশিক্ষিত উষ্ট্রোপরি স্থাপিত হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিতেছে এবং ঐ চন্দ্রাতপ নিম্নে মক্কা মদিনার রাজা, মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্মজগতের সর্বপ্রধান ভূপতি, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার বংশধর মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীন নিষ্কোষিত অস্ত্রে সজ্জিত, সহস্র অশ্বারোহী রক্ষি পরিবেষ্টিত হইয়া বীরসাজে অশ্বারোহণে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে সিংহদ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অমনই দর্শকশ্রেণীমুখে জয়নাল আবেদীনের জয়, মদিনার সিংহাসনের জয়, জয় নব ভূপতির জয়-এইরূপ রব তুমুল আরাবে বারবার ঘোষিত হইতে লাগিল। পরিবার পরিজনদিগের বস্ত্রাবৃত আম্মারী পৃষ্ঠে উষ্ট্র সকল রক্ষিগণ কর্তৃক বিশেষ সাবধানে পরিলক্ষিত হইয়া মহারাজের পশ্চাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। জনস্রোতের সহিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত দেখিতে দেখিতে পবিত্র রওজা সম্মুখে উপস্থিত অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বাড়া নাকাড়ার কার্য সকল ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইল পতাকাসকল অবনতমুখী হইয়া পবিত্র রওজার মর্যাদা রক্ষা করিল।

মহারাজ জয়নাল আবেদীন যাত্রীদল সঙ্গীদল ও আত্মীয়-স্বজনগণসহ পবিত্র রওজা মোবারক সপ্তবার তওয়াফ মান্যের সহিত অতিক্রম করিয়া পূর্ব সাজ সজ্জা ও বাদ্য বাজনার সহিত জয়নিশান উড়াইয়া রাজপুরী প্রবেশ করিলেন। পরিবার পরিজনেরা বহুদিনের পর বহু যন্ত্রণা উপভোগের পর ঈশ্বরের নাম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গাজী রহমান ও ওমর আলী প্রভৃতি কিছুদিন নবীন মহারাজের পদসেবা করিয়া হারিয়ে বিষাদ মিশ্রিত মনোভাব স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। হরিষের বিষয় জয়নাল আবেদীনের সপরিবারে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার রাজ্যলাভ। বিষাদের কারণ আর কি বলিব মোহাম্মদ হানিফা চিরবন্দী।